সঞ্জয় ভট্টাচার্য

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং
৯৩, হারিসন রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ
৭ই আষাঢ়, ১৩৬২

পাঁচ টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা : অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : সত্যপ্রসন্ন দত্ত
পূর্ব্বাশা লিমিটেড
৫৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩

উৎসর্গ

অগ্রজদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত

'সৃষ্টি' উপন্যাস পূর্ব্বাশা পত্রিকায় ১৯৫০-৫১ সনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। শেষের অধ্যায়টি এই গ্রন্থে পরিবর্ত্তিত হয়েছে।

—গ্রন্থকার

[পাঠকের অবগতির জন্যে]

আপনারা যাঁদের লেখা পড়েন আমি তাঁদের কেউ নই। শুধু এটুকু বলে চুপ করে থাকলেও ফাঁকি দেওয়া হয়। আমি লেখকই নই। কিন্তু বন্ধুবান্ধরা খুব অল্পেতেই খুসী হয় জানেন, ওঁদের মহলে কয়েকটা বিয়ের নিমন্ত্রণচিঠি এবং সভার আমন্ত্রণলিপি লিখে দিতেই ওঁরা মনে করলেন আমি সাহিত্যিক। ওঁদের ভুল ভাঙতে চেষ্টা করলাম, ওঁরা ভাবলেন বিনয়। অবশ্য আপনারা আমায় এখন প্রশ্ন করতে পারেন : যদি আমি নিজেকে লেখকই মনে না করছি, তাহলে আমার কলম কেন এই বাক্যগুলো রচনা করে চলেছে! জিজ্ঞেস করা-টা স্বাভাবিক। নিজেকেও আমি জিজ্ঞেস করতে পারি : ঠিক আগেকার বাক্যটি পর্য্যন্ত পরপর ছিয়াত্তরটি শব্দ সাজিয়ে গেলাম কেন? এবং কেনই বা আরো সাজাতে থাক্‌ব? লেখক হবার জন্যেই ত! সহজ যুক্তি এ-কথাই বলবে। লেখক হবার একটা ধারণা আমার মনে জন্মেছে বলেই আমি লেখকোচিত কর্ম্ম করে চলেছি। যুক্তিটি প্রাচীন এবং জনপ্রিয়, কিন্তু তার চাপে আমার মন ঠিক জব্দ হচ্ছেনা। আমার মনে হচ্ছে, কাজটা আমি করে যাচ্ছি বলেই একটি কর্ম্মোচিত বিশেষণে আমাকে বিভূষিত করা হবে। তাই, 'আমি' বলে যে একটা ব্যাপার আছি, তা এক্ষুণি এই বিশেষণের ফোঁটা-তিলকে নিজের পরিচয় দিতে রাজি নই—কালক্রমে হয়ত রাজি হব কিন্তু এতোটা নগদ-নগদ নয়। কেন? কেননা, আমরা শীগ্‌গির কিছু-একটা হয়ে উঠ্‌তে নারাজ।

এখন হয়ত বুঝতে পারছেন, বিনয় প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তি আমার কিছু নেই—আমি লোকটা অহম্বাদী (অহঙ্কারী বল্‌বনা, কেননা কথাটার অর্থ কদর্য্য হয়ে গেছে)—নিজেকে খুব সহজে ছেড়ে দিতে রাজি নই। আর তারি জন্যে, আমি, অনিরুদ্ধ ঘোষাল, আমার বন্ধু দীপায়ন চৌধুরীর কথা বলতে গিয়ে যতটুকু সম্ভব নিজেকে সামনে টেনে আনছি। তবে এ কথা ঠিক যে দীপায়নকে বুঝতে হলে আমাকেও আপনাদের বুঝে নেওয়া দরকার। আমি যেমন বাংলা কাগজগুলোর পুজো-সংখ্যার লেখকগোষ্ঠীর কেউ নই, তেম্নি দীপায়নও একজন মহাপুরুষ নয়। বাংলাদেশের সাধারণ একটি মানুষ ও, বন্ধু বলেই আমাদের কাছে ওর যা-কিছু

বিশেষত্ব। আর-আর বন্ধুবান্ধবের অনুরোধেই ওর কাহিনী আমি লিখতে বাধ্য হচ্ছি ওর জীবনীতে বন্ধুবান্ধবরাই উৎসুক। দীপায়নের জীবনী-পাঠে যে ভবিষ্যৎ বাংলা গড়ে উঠ্‌বে এমন গর্হিত আশা আমরাই যখন পোষণ করিনে, আপনারা-ও নিশ্চয়ই তা করবেন না। এখন কথা হচ্ছে—আপনারা মানে কারা ? নিশ্চয়ই তাঁরা নন, যাঁরা ইদানীং কোনো বই-এর অষ্টম, নবম বা দশম সংস্করণের জন্ম দিচ্ছেন। তবে ? তবে ওই ভবভূতির মতো বিপুলা পৃথ্বী এবং নিরবধি কালের উপরই আশা। তাছাড়াও ভাবছি : প্রত্যেক সহরে অন্তত একজন এমন বেয়াড়া পাঠক থাকেন যিনি নীলকণ্ঠ—যাঁর কাছে সর্ব্বজন-পরিত্যজ্যই গ্রাহ্য।

লেখক ও পাঠক সম্পর্কে একটু ভূমিকা দিয়েও ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারছিনে। মনে হচ্ছে বিষয়টি সম্পর্কেও খানিকটা ভূমিকার দরকার। দীপায়ন আমাদের বন্ধু বটে কিন্তু ও আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন 'আপনাদের বন্ধু দীপায়ন চৌধুরী লোকটি কেমন, মশাই ?" তাহলে আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করব, কিছু বলতে পারবনা। হয়ত এই অসুবিধেটা দূর করবার জন্যেই বন্ধুবান্ধবরা ওর জীবনী লিখতে আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন। নিমন্ত্রণচিঠি এবং আমন্ত্রণলিপি লেখার সুবাদে এ গুরুভার আমার উপর ন্যস্ত। কি আশ্চর্য্য দেখুন, সতর্ক হতে গিয়েও আবার লেখক-আমি-র আবির্ভাব হচ্ছে ! বিষয়ের কথা বলতে বিষয়ী উঁকি দিচ্ছে ! সাধে কি আর শঙ্করাচার্য্য বিষয়-বিষয়ী এক করে ফেলেছিলেন ? কিন্তু দর্শন মাথায় থাক্—দীপায়নের কথাই চলুক। নিজের জীবনী রচনা সম্বন্ধে দীপায়ন খুব বেশি নিরুৎসুক নয়। বরং কৌতূহলী। বলেছে : "দেখ্‌ব আমি মানুষটা কেমন !" আমরা হেসে উঠেছি : "চ্যালেঞ্জ না কি ?" "তা কেন ?" –মুখভরা ছোট-ছোট হাসির ঢেউ তুলে দীপায়ন অন্যমনস্ক চোখে আকাশের দিকে তাকিয়েছে : "চল্লিশ বছর ধরে এখানে, এই বাংলা দেশে, আমি থেকে যাচ্ছি - বেঁচে এসেছি, নিজের সম্বন্ধে তার বেশি আর কি কিছু জানি ?" জানে—নিজের সম্বন্ধে দীপায়ন ঢের কথা জানে, কিন্তু সেদিন, দেখুন, কেমন বেমালুম গোপন করে ফেল্‌ল। এবং যখন ও জানতে পারল, সত্যি আমি ওর কাহিনী লিখতে সুরু করেছি, আমার অনুপস্থিতিতে আমার ঘরে এসে আমার টেবিলের উপর একটা মোটা বাঁধান-খাতা রেখে গেল। নাম-পৃষ্ঠায় লেখা :

'১৯৪২······'। ওর নিজের রোজনামচা। রোজকার ঘটনা অবশ্য নেই, কিন্তু অনেক কিছুই আছে। সঙ্গের চিঠিতে ছিল: "পড়ে দেখো—ব্যবহার করা যায় কিনা। তোমার তৈরী কলম যদি চালাও, এ থেকে খানিকটা উদ্ধার করা যাবে হয়ত—হুবহু কোনো অংশই চলবেনা।" পড়ে দেখ্‌লাম। হুবহুই চল্‌বে—আমার লেখার পাশাপাশিই চলবে আর তা আমার বাক্যরচনার চাইতে হয়ত ঢের ভালোই শোনাবে। খুঁজে বার করলাম দীপায়নকে—বললাম, "তোমার কথা তুমিই লেখো!" ও বল্‌লে, "খাতা ফিরিয়ে দাও, ছিঁড়ে ফেল্‌ব ও-মানুষটা নেই, কাজেই ওর রেকর্ড থাকাও উচিত নয়।" দীপায়ন যে ঠিক এ-ধরণের একটা কথা বলে বসবে তা ভাবতে পারিনি, ওর সঙ্গে পঁচিশ বছরের পরিচয় থাকা সত্ত্বেও ভাবতে পারিনি। কাজেই, দেখুন, ওকে ঠিক ধরা যায় না। আমাদের মতো সহজ চেহারায় ও গড়ে ওঠেনি। কথাটাতে যে ও অভিমান প্রকাশ করল তা মনে হলনা, মনে হল খাতাটা ফিরে পেলে হাসতে-হাসতে তক্ষুণি ওটা ও ছিঁড়ে ফেলত। অথবা এমনও হতে পারত যে খাতাটা বগলদাবা করে ও পিঠটান দিত এবং একটি পুরো বছর ওর সঙ্গে আমার আর দেখাই হতনা। যেদিন দেখা হ'ত সেদিন হয়ত আগেকার দীপায়নকেই ফিরে পেতাম, কেন যে ওর সঙ্গে একবছর দেখা হয়নি, আমি বা ও কেউ তা মনে করতে পারতামনা। খেয়ালী। মনে-মনে নিশ্চয়ই দীপায়নকে তা-ই ভেবে নিচ্ছেন আপনারা। কিন্তু কস্মিন্‌কালেও তা নয় ও। খেয়ালীর ঘর এমন সাজানো-গুছোনো থাকেনা। হষ্টেলে অনেকদিন একই ঘরে ছিলাম আমরা। ওর যন্ত্রণায় দেয়ালে একটু আঁচড় কাটা যেতোনা। পেন্সিলে ধোপার হিসেবটা লিখে রেখেছিলাম একবার দেয়ালে, তা নিয়ে ও এক মহামারী কাণ্ড ঘটাবার উপক্রম করলে। করযোড়ে ক্ষমা চাইতে হল। কুঁজোর জল মেঝেতে একটু গড়িয়েছে কি, ওয়ার্ড-সার্ভেণ্টের তলব পড়ত—মুছে দেবার জন্যে নয়—অপরাধটা কার তা-ই জানবার জন্যে। তখনও ফ্যাসিষ্ট কথাটা চালু হয়নি হলে হয়ত আমি দীপায়নকে ও-আখ্যাতেই বোকা বানিয়ে নিজের খেয়ালখুসী মাফিক চলতে সুরু করতাম। ওর উদাহরণে আর উপদেশে শৃঙ্খলার পাঠ নিতে সুরু করতাম না। এবং ভাবতে চাইতামনা ও আমার উপকারী বন্ধু। এ-ধরণের রুম-মেট্‌কে নিশ্চয়ই আজকাল আপনারা বরদাস্ত করেন না।

তবে কড়া শাসন করলেও, দীপায়ন আমাকে বন্ধু বলেই মনে করত। ওর বাড়ীঘরদোর, বাপমা, দাদা-বৌদি, বন্ধুবান্ধবদের সম্পর্কে হেন কথা নেই যা আমাকে বলেনি। ওদের ছোট সহরটা ও আমার চোখের উপর তুলে ধরেছিল। ও-সহরে ছেলেবেলায় আমিও কিছুদিন ছিলাম কিন্তু দীপায়নের ভাষায় যেন সহরটার আরেক ছবি দেখলাম। ছবি দেখাবার শক্তি ওর অসাধারণ। তাই ওর বন্ধুবান্ধব এতো বেশি। ব্যক্তিত্ব বলে যে একটি অর্থহীন কথা বাজারে চলতি আছে, তা যাদের রপ্ত তারা হয়ত দীপায়নকে ব্যক্তিত্ব-মণ্ডিত দেখবে। কিন্তু আমরা দীপায়নের মুখে কি দেখতে পেয়েছি? কথা বলতে-বলতে হঠাৎ ঘুমন্ত শিশুর মতো করুণ, অসহায় হয়ে ওঠে ওর মুখ—যেন ব্যথায় ভারি হয়ে ওঠে গলার স্বর। তাতেই ঝুঁকে পড়তে হয় ওর দিকে। তারপর ও কড়া শাসনই করুক আর কটু কথাই বলুক, কিছুই গায়ে মাখতে ইচ্ছে করেনা। মুখে একটা নরম ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারে বলেই ওর চারপাশে বন্ধুবান্ধবের এত ভীড়! এবং বন্ধুবিচ্ছেদ বলে উপসর্গটিও জীবনে নেই। দীপায়ন কম্বল ছাড়তে চায়, কিন্তু কম্বল ওকে ছেড়ে দেয়না। অন্তত আমার চরিত্রে এই নাছোড় কম্বল-প্রকৃতিটা অত্যন্ত প্রগাঢ়। কাজেই আমি একটি স্বাভাবিক গর্ব্ব ভুঞ্জন করে আসছি—দীপায়নকে আমি সবার চাইতে বেশি জানি। ও নিজেও তা-ই বলে। "অনির চাইতে আমাকে আমি বেশি জানিনে!"

"কিন্তু সে-জানাটা কি ঠিক?" কেউ-কেউ জিজ্ঞেস করত।

"হয়ত ঠিক!"

"জানাটা তাহলে মনে-মনে সাজিয়ে দেখতে হয়।" বলেছিলাম।

হো-হো করে হেসে উঠেছিল দীপায়ন। হাসির অর্থ হয়ত এই যে অতীতের কবর খুঁড়ে আমায় আর কতোটুকু পাবে! আমায় চিনতে পারো কিনা গ্যাখো: এই মুহূর্ত্তে আমি কতোটুকু তা তুমি ধরতে পারো কিনা চেষ্টা করো। পারিনে। সত্যি কথা। কিন্তু দীপায়ন চৌধুরী, তুমি কি এই মুহূর্ত্তেরই সবটুকু মানুষ? মুহূর্ত্তবাদী কেন হতে চাও? কেন দেখাতে চাও যে তুমি মুহূর্ত্তবাদী! তোমার অনেক চেহারা আছে জানি। কিন্তু এক-একটি নক্সায় আসতে তোমার অনেকদিন কেটে যায়। তাছাড়া মূলে সবসময়ই তুমি বলে একটা প্রাণী আছো। তা হিন্দুদের আত্মা না হতে পারে কিন্তু

বায়োলজির একটা সত্তা ত বটে। তা গা'-ঢাকা দেবে কোথায়? আমি হয়ত তার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারিনি কিন্তু আমার চোখকে তা বেমালুম ফাঁকিও দিতে পারেনি।

তারপর এখন তোমার রোজনামচা আমার হাতে। তুমি নিজের দিকে নিজে কি ভাবে তাকাচ্ছ তার খবর পাওয়া যাবে এখানে! কতোটুকু আলোতে আর ছায়ায় নিজের কাছে নিজে তুমি ধরা দিয়েছ তার হিসেব নিশ্চয়ই তোমার রোজনামচায় আছে। তারপরও যদি তুমি পালিয়ে যাও, তারপরও যদি গোপন কিছু থাকে তোমার, তা দিয়ে আমাদের দরকার নেই। তা থেকে তোমারও কোনো উপকার হচ্ছেনা। যা তোমার চেহারায়, স্বভাবে, কথা-বার্ত্তায়, আচরণে কোনো চিহ্ন ফেলতে পারেনি তা যদি তোমার অন্তর্গত হয়ে থাকে, আমরা তার খোঁজ করবনা।

কাজেই এরপর থেকে যে অক্ষরগুলো সাজিয়ে যাব তাতেই তোমার সবটুকু সত্তার ছাপ থাকবে—যেমি তোমার রক্তে মাংসে, স্থানে-কালে দীপায়ন চৌধুরীর সত্তার ছাপ আঁকা আছে।

[এক]

২০.২.৪৩ ইং।

রাত্রির স্বপ্নটা। ভুলতে পারছিনে। আলো আর ছায়ার অদ্ভুত রঙগুলো চোখ থেকে যেন কিছুতেই মুছে যাবে না। চোখ যে এমন আশ্চর্য্যভাবে কোনো ছবি ধরে রাখতে পারে তা জানতামনা। জানতাম স্বপ্ন আমি ভুলে যাই। তাই মনে হত, স্বপ্ন দেখিনে। স্বপ্ন দেখবার বিলাসিতা থাকলে চলেনা বলেও নিজেকে শাসন করেছি অনেকদিন।

একটা ফিকে সবুজ আলো। কোনো অদৃশ্য আকাশের আলো। সবুজ বলেই মনে হয় জীবন্ত। যেন ওর শরীর আছে, প্রাণ আছে। যেন এক্ষুণি কথা কয়ে উঠ্‌বে—ভোরের দিকে কলকাতার রাস্তার কোনো গ্যাসপোষ্টের নীচে দাঁড়িয়ে যেম্নি মনে হয়। আর সপ্তমীপূজার রাত্রিতে গাঁয়ের বিলে শ্বেতপদ্ম তুলতে গেলে। আর কোথায়? আরো দেখেছি। কিন্তু কোথায়? মনে পড়ছে। চোখের স্নায়ু মনে সাড়া তুলে দিচ্ছে। মেঘনার ঘাটে—ষ্টীমারে-রাত দু'টোয়। ষ্টীমারের ছাদে তারের খাঁচায় আলোর থাবা—ওদের চারপাশে দেয়ালি-পোকা ঘুরছে। এঞ্জিনের গহ্বরটার পাশে আমরা দাঁড়িয়ে আছি: বাবা, মা, দাদা আর আমি। নকুল গাড়ী থেকে মালপত্র নামিয়ে এখনো এসে পৌঁছয়নি। হাতে চোখ রগড়াচ্ছি—চোখে ঘুম। মোটা মোটা-দড়িতে-বাঁধা তক্তা দিয়ে সিঁড়ি তৈরী—ষ্টীমারে পৌঁছুবার সিঁড়ি। অনেকদূর অবধি। মনে হচ্ছিল এর শেষ নেই। বাবা আমার হাত ধরে ছিলেন—আমার সঙ্গে হাঁটতে গিয়ে পেছনে পড়ে গিয়েছিলেন। সিঁড়িটা দুলছিল - থেমে গিয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। বাবা কথা বললেন না—আমাকে কোলে তুলে এগিয়ে চল্‌লেন। ষ্টীমারে এসে হাঁপাচ্ছিলেন বাবা। "হাঁপাবেন না?"—মা বলেছিলেন: "কোনোদিন কাউকে কোলে-কাঁখে নিয়েছেন না কি উনি!" বাবা মুচকি হেসে পকেট থেকে পোলো-সিগারেটের বাক্সটা তুলে নিয়েছিলেন।

তখন আট বছর বয়েস আমার, দাদার পনেরো। সেবারই আমি প্রথম

গাঁয়ের বাড়িতে যাচ্ছি। এ-আলোও সেই প্রথম দেখলাম। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় একে কি বলা যায়না, 'প্রথম আলোর চরণধ্বনি' ?

সত্যি, এ প্রথম আলো। নইলে আজ ছাব্বিশ বছর পর এ-আলো তার হাতে-গড়া সবটুকু ছবি নিয়ে আমার মন থেকে কি করে উঠে এলো ? আমার ত আজ মনে হচ্ছে একেক ধরণের আলো একেকটি জীবনের সঙ্গে মিশে জীবন্ত হয়ে ওঠে। আমার জীবনে যে আলো জীবন্ত তাকে আমি ভুলতে পারিনে। এম্নি হবে বলেই কি আমার নাম দীপায়ন রেখেছিলেন ন'দাদু ? দী-পা-য়-ন। প্রথম অক্ষরের ঈ-কারটা আকাশ-প্রদীপের মতো উঁচু হয়ে আছে।

কিন্তু কাল রাত্রিতে আবার হঠাৎ এ-আলোর আবির্ভাব কেন ?

হঠাৎ কি ?

এ-আবির্ভাবের জন্যে কি আমি তৈরী ছিলামনা ?

আজ দশ দিন আগার্খাঁর প্রাসাদে গান্ধীজি উপোস করছেন। মরে যেতে পারেন তিনি। মরে যেতে জানেন। মরতে পারাটা কি খুব বড় কথা ? হিটলারও ত মরতে পারেন। কতো মানুষই ত মরতে পেরেছে। তাতে কি হ'ল ? সত্যি কি হয়না কিছু ? হিটলারের মৃত্যু কি তাঁর অত্যাচারের কদর্যতা ভুলিয়ে দেবেনা জার্ম্মানীর মনে ? মৃত্যুর পবিত্রতা অদ্ভুত ! স্বেচ্ছামৃত্যুর পবিত্রতা আরো অদ্ভুত। কুরুকুলের পাপ ভীষ্মকে স্পর্শ করেছে বলে আমরা ভাবতে পারিনে। *"Whosoever shall lose his life shall preserve it"—Gospel* ।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান গান্ধীজির জানা নেই বলে তর্ক করেছি, বক্তৃতা দিয়েছি। বলেছি, গান্ধীজি আমাদের ভুল পথ দেখাচ্ছেন। তাঁর 'কুইট ইণ্ডিয়া' ধ্বনি কেমন যেন বেসুরো ঠেকেছে আমাদের কানে সেদিনও। বাসবের সাম্যবাদী মন জনযুদ্ধে তার জবাব দিয়েছে। পুরোপুরি আমি বাসবকে সমর্থন করতে পারিনি কিন্তু গান্ধীজির 'কুইট ইণ্ডিয়া'-ধ্বনি থেকে দুর্ব্বলতার দু'একটি সুর ত টেনে বার করতে চেষ্টা করেছি। আমার মার্ক্সবাদের সঙ্গে গান্ধীজির বনিবনাও কি করে হবে। বাসবের জোড়াতাড়া-দেওয়া মার্ক্সবাদের সঙ্গে আমার বিশুদ্ধ মার্ক্সবাদের (বাসব অ:শ্য বলে,অশুদ্ধ মার্ক্সবাদ) গরমিল ঢের—তবু পক্ষ যদি নিতেই হয়, আমি ভাবতাম, সাম্যবাদীদেরই পক্ষ নেওয়া উচিত, গান্ধীজির পক্ষ নয়। গান্ধীজির দেশ মানুষের সমষ্টি, তালগোল পাকানো

কতগুলো মানুষ—ভাবতাম! মানুষের শোভাযাত্রা ছিল আমার চোখের উপর—নূতন ধরণের অজস্র, অসংখ্য মানুষ, যারা দেশের সীমায় চিহ্নিত নয়, জাতির জলায় বদ্ধ নয়—বসুধা যাদের কুটুম্ব, তেমন মানুষ। "তাহলেই জনযুদ্ধের থিসিসে আসতে হয়—" বাসব বলত: "পৃথিবীর প্রগতিশীল জনগণ আজ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিষ্টকে রুখতে যাচ্ছে!"

গান্ধীজি উপোস করছেন। ক'দিন থেকেই ফিরে-ফিরে কথাটা জিভের উপর গড়িয়ে চলেছে—'গান্ধীজির দেশ মানে এমন-কিছু যা তাঁর দেহের শরীক'। আদর্শ এখানে আর আদর্শের রাজ্যে নেই—রক্তমাংসের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। তিলে তিলে মরতে সুরু করেছে দেশ—শাসকের অত্যাচারে—বন্যায়—যুদ্ধের কদর্যতায়। তাই তিলে তিলে মরতে চান গান্ধীজি। এ-বুঝি তাঁর দেহের অভিমান—আর তা বাঁচতে চায়না। দেশের বিরাট মৃত্যুকে নিজের দেহে বরণ করছেন! কিন্তু আমরা ত বেঁচে এসেছি—বেঁচে থাকছি। আমি, বাসব, আমরা সবাই! তবু কিনা আমরাই দেশকে ভালোবাসি, গান্ধীজি ভালোবাসেননা!

বাসবের সঙ্গে যদি আমার সম্পর্কে চুকে গিয়ে থাকে ভালোই হয়েছে! পেণ্ডুলামের মতো ওরা অনবরতই দুলছে—একবার ডানে একবার বাঁয়ে। আমিও দুলছি কিন্তু ওদের মতো এতো দ্রুতলয়ে নয়। তাছাড়া আমি একা, আমি দল গড়িনি, দলে ভিড়িনি। ৪২-এর শোভাযাত্রার পাশে-পাশে হেঁটে আমি বিরোধী ইস্তাহার বিলি করিনি—বলিনি চেঁকে, আন্দোলন করোনা। স্বাধীনতার আন্দোলন জীব-দেহের মতো বেড়ে চলে, তোমার বিধিনিষেধের ধাক্কায় তা থেমে যায়না। দলের ধাক্কাধাক্কিতে তেতে ওঠা যায়, মেতে ওঠা যায়, বাসব, পুরো দৃষ্টিতে তাকানো যায়না। আমি একা বলেই যতোটুকু খুসী চোখ মেলাতে পারি। আমি ব্রাউনিয়ান মুভমেণ্টের কণা!

আট বছর—গত আট বছর মার্ক্স আমার কাছে সত্য ছিল। আজও হয়ত মিথ্যা হয়ে যায়নি। কিন্তু তোমরা তাকে মিথ্যার এলাকায় ঢুকিয়ে দিচ্ছ। মানুষকে ভালবাসতেন কার্ল মার্ক্স—তাঁর পাণ্ডিত্য আর রণহুঙ্কারের পেছন থেকে এ-সত্যটাই কি বারবার উঁকি দেয়না? এ-সত্যের মোহেই মুগ্ধ ছিলাম আমি ছ' বছর। আমার এ-মোহ তোমরা ভেঙে দিতে চাও, বাসব! তোমরা মানুষকে ভালোবাসনা!

আমি গান্ধীজিকে শ্রদ্ধা করি, যেমন একদিন কার্ল মার্ক্সকে শ্রদ্ধা করতাম।

১৯৩৭ সন আমার জীবনে যেম্নি উল্লেখযোগ্য ছিল, আজ ১৯৪৩সন আমার মনে ঠিক তেম্নি।

খুব ভোরে পার্কে বেড়াতে গিয়েছিলাম। অন্ধকার ছিল তখনো। মোড়ের গ্যাসপোষ্টটার নীচে গিয়ে চমকে উঠ্‌লাম। এক মুহূর্ত্তের জন্যে মনে হ'ল, আমি রাত্রির সেই স্বপ্নে আছি। তারপর মনে হল গান্ধীজি উপোস করছেন—তাঁর মুখ পাণ্ডুর—কিন্তু উজ্জ্বল চোখ! তাঁর নীল্‌চে চোখে কি ঠিক এম্নি আলো নয় এখন—আলো অথচ কী ঠাণ্ডা। যেন গায়ে মেখে নেওয়া যায়, মনে তুলে নেওয়া যায়, তারপর কোনোদিন আর তাকে ভোলা যায়না!

আজ সারাদিন ষ্টীমারের সেই আলোটা মনে পড়ছে আর জলের গন্ধে, গাছের ছায়ায়, মাটির রঙে ভরে উঠ্‌ছে মন। কিন্তু আট বছরের একটি ছেলে, পান্নু, তার প্রথম-দেখা পাড়াগাঁ ফিরে পাচ্ছেনা আর—চৌত্রিশ বছরের এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, দীপায়ন চৌধুরী, পান্নুকে দেখতে পাচ্ছে পেয়ারা গাছের নীচে, মোরগঝুঁটি ফুলের বাগানে, খালের ধারে মাদারের গুড়িতে! সাচি পানের লোভে শেফালিদের বাড়ি যাচ্ছে সে, শেফালির সঙ্গে ভয়ে-ভয়ে সাঁকোর উপর পা বাড়াচ্ছে পুকুরের ঘাটে নেমে চোখপানি মাছ ধরছে! গ্রাম! কতো যুগ থেকে মানুষ তৈরী করে আসছে যার জল আর মাটি! সে-গ্রামকে ফিরে পাচ্ছে দীপায়ন পান্নুকে পেয়ে। কি অদ্ভুত!

হয়ত অদ্ভুত নয় কিছু। সব-কিছুরই মানে: আমি বুড়ো হয়েছি। নইলে ছেলেবেলাকার কথা কেন মনে পড়বে? দিগ্বিজয়ী রাজার মেজাজেই মানুষ চলে—সামনে আর যখন জয় করবার মতো দেশ নেই তখন পেছন ফিরে বিজিত দেশের দিকে তাকায়। হিসেব করে, কি পেলাম, কতোদূর এলাম।

কিছু পাইনি বলিনে। আমরা কিছু-না-কিছু পাই। তবু বলি পেলাম না। কেন বলি? মানুষকে হয়ত অনেকদূর যেতে হবে, তাই এমন বলতে হয়। কতোদূর? কেউ জানেনা। মার্ক্সের কল্পনার শেষও অনেকদূর। চরৈবেতি।

আজ যদি দীপায়ন গাঁয়ে যায়—কাল রাত্রির সেই স্বপ্নের শেষে আজ—যখন গান্ধীজি দশ দিন উপোস করছেন—উপোসের দশম দিন আজ—আজ গাঁয়ে গেলে দীপায়ন কি আগেকার মতো মহাজনের সঙ্গে চাষীদের দেনাপাওনার হিসেব নিয়ে ইস্কুলের মাঠে বৈঠক বসাতে পারবে? ইস্কুলের ছেলেরা কী পায়নি, কী পেতে হবে তাদের, তার তালিকা তৈরী করে দিতে পারবে কি

আর আজ দীপায়ন! সব ছবি মুছে গিয়ে কি ১৯১৮-র একটি ছবি ভেসে উঠ্‌বেনা তার চোখের উপর? পানুর আর শেফালির ছবি। দু'টি বাচ্চা ছেলেমেয়ে। দীপায়নের তারা কেউ নয়। তারা গাঁয়ের। এক সময় কোনোদিন তারা গাঁয়ের রোদে-জলে ছায়া তৈরী করেছে, আকাশকে ছোট-ছোট মিহিন কথায় ভরিয়ে দিয়েছে, বাতাবি গাছের সবুজ অন্ধকার আর হলুদ আলো হাতছানি দিয়েছে তাদের, নীল কচুরি ফুলে আর লাল শাপলায় ঢেলে দিয়েছে তারা চোখের ক্ষুধা! তাদেরই দেখতে পাবে দীপায়ন—যারা হারিয়ে গিয়েছিল ফিরে আসবে তারা। তার চোখের উপর চলাফেরা করতে সুরু করবে পানু আর শেফালি—কথা বল্‌বে, হেসে উঠ্‌বে, অভিমানে মুখভার করে থাক্‌বে।

দুপুরের জাহাজে চৌধুরীবাড়িতে কা'রা এসেছে সহর থেকে, শেফালি শুনতে পেয়েছিল। পুজোর মুখে রোজই এ-গাঁয়ে যাত্রী নামে, রোজই গাঁয়ে সাড়া পড়ে। ষ্টীমার-ষ্টেশনের লাগোয়া হাট—হাট থেকে যারা ফিরে আসে, তাদের মুখে-মুখে খবরটা রটে যায়। সদর সহর থেকে দীনেশবাবু এসেছেন! মস্ত উকীল, কাজেই আজকের খবরটাও মস্ত। শুনতে বাকি নেই কারো।

উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে ডুরে-শাড়িটার আঁচল দাঁতে চিবোচ্ছিল শেফালি—এগিয়ে আসেনি। পিশিমা দেখতে পেয়ে ডাকলেন ওকে, "হুঁ—আয়, এই ত এসেছে ওরা—" মার দিকে মুখ ফেরালেন পিশিমা: "রোজ এসে মেয়ে খবর নিচ্ছে তোমরা কবে আসবে—শুনেছে দীপু আস্‌বে—"

"পানু বলতে পারোনা, বারবার দীপু-দীপু বল্‌ছ!" এই নিয়ে চারবার পিশিমার, ভ্রম-সংশোধন করল পানু। খুশীর তোড়ে সবসময়ই হাসছিলেন পিশিমা, এবার গলাভরে হাসলেন, শেফালিকেই ডাকলেন আবার: "শেফালি, আয় না!" কিন্তু এবার যখন মার দিকে তাকালেন তখন তাঁর মুখ ভার; "গেলো বছর ওর ভাইটা মারা গেল—দশ বছরের ছেলে! নাদুস-নুদুস কি চমৎকার! বলা নেই, কওয়া নেই তিন দিনের জ্বরে চলে গেল!"

মা চুল খুল্‌ছিলেন, হাত থেমে গেল, জিজ্ঞেস করলেন: "কাদের বাড়ির মেয়ে?

"চক্রবর্ত্তীদের"—পিশিমা শেফালিকে আনতে চললেন। তখনও ও দাঁড়িয়েই ছিল—ওকে নিয়ে এত্তো কথা হচ্ছে তবু। পানু অবাক হচ্ছিল। দৌড়ে পালায় না কেন মেয়েটা?

দৌড়ে যদি পালাতই ও……পরদিন কথাটা মনে করে হাসতে সুরু করেছিল পানু, তাহলে আজ ওর সঙ্গে বারান্দায় বসে কি করে গল্প করত সে ?

"তোর ভয় করেনা একটুও ?" পানু কাগজ ভাঁজ করে জোড়া-ডিঙি তৈরী করছিল।

শেফালি ঘামাচি-লতায় শিউলি গেঁথে চলেছে: "আগে করত এখন করেনা।"

"কেন ?"

"আমি কি লেবু বাগানে যাই ?"

"কিন্তু ওরা বেরোয় ত! তখন তেড়ে আসেনা ?"

"উহুঁ।"

"আসে, তুই জানিসনে !"

"কেন তেড়ে আসবে—আমি ত কিছু করিনে ওদের !"

"ক'টা আছে রে ?"

"অনেক।"

"চক্কোর আছে মাথার উপর ?--দাঁড়া, দেখাচ্ছি আমি—এম্নি চক্কোর আছে কি না" ঘরে ঢুকে পানু একটা ছবির বই নিয়ে এল—জঙ্গলের গল্প—তার পূজোর বই—দাদা কিনে দিয়েছেন। ফণা-তোলা একটা সাপের ছবি শেফালির চোখের সামনে ধরে জিজ্ঞেস করল পানু: "ঠিক এম্নি দেখতে ? দেখেছিস তুই ?"

"কালো, আরো কালো।"

"কিন্তু দেখতে এম্নি ত !"

"আরো বড়ো--" শেফালি দু'হাত ছড়িয়ে দিলে. "এম্নি বড়ো।"

"কি খায় ? ব্যাঙ, না ?" পানু চোখেমুখে মুচকি হাসতে সুরু করে।

"মাছ খায়।"

"ও, তাহলে ঢোঁড়া !"

"না, কালসাপ—মা বলেন।"

"ও, তাহলে তোর মা দেখেছেন—তুই দেখিসনি !"

"ঈস্—চলো—তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি—" যাবার জন্যে সত্যি তৈরী হয়ে গেল শেফালি।

পান্নু বই বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইল খানিকক্ষণ. তারপর জ্ঞানীপুরুষের মতো বল্লে : "জানিস, ওখানে যেতে নেই। যদি কামড়ে দেয় কখনো।"

"আমি যাইনে ত—শুধু একবার গিয়েছিলাম—দেখতে !"

"কামড়ে দিলে কিন্তু মানুষ মরে যায়।"

"জানি, সেদিন বংশীকাকার ছেলে যদুকে কেটে দিয়েছে সাপে !"

"মরে গেছে, না ?"

"ওঝারা বাঁচাতে জানে !"

"বাঁচল যদু ?"

"না।"

"তবে ?"

তবে ? কে আর কি বল্‌বে ? দু'জন ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। বড়ো চোখ মেলে পান্নর মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল শেফালি, হাসল একটু, তারপর শিউলির মালায় মন দিলে আবার। পান্নু পা দোলাতে সুরু করল।

"তোমার বই-এ ওদের কথা লিখে রেখেছে, না পান্নুদা ?" মাথা না তুলেই একসময় জিজ্ঞেস করল শেফালি।

"হুঁ।"

"বল্‌বে কি লিখেছে ?"

"পড়—পড়ে ছাখ !"

মাথায় একটা ঝাকুনি তুলে চুলের আড়াল থেকে মুখ বার করে নিলে শেফালি : "আমি পড়িনে !"

"কেন ?" পান্নু অবাক হল।

"পড়তে আমি পারিনে ত—"

"ক-খ-ও পড়িসনি ?"

"উহুঁ।"

"পড়বিনে কোনদিন ?"

"বাবা বলেছেন পরে পড়াবেন—"

"তোর বাবা খুব কড়া মাষ্টার—না রে—আমাদের ড্রিল-মাষ্টারও ভীষণ কড়া—ঠিক ওম্নি দেখতে !"

"বাবাদের ইস্কুলে তিন জন মাষ্টার—" পানুর কথার উত্তরে শেফালি আর কিছু বলতে পারলনা।

"মোটে?" চোখ পিট্-পিট্ করে ঠোঁট ভেঙে দিলে পানু: "ওকে আবার তবে ইস্কুল বলে না কি!"

"অনেক ছেলে পড়ে--এখন ত ছুটি তাই দেখছনা।"

"আমাদের ওখানে পাঠশালা আছে না—বঙ্গমাষ্টারের পাঠশালা—ব্যাঙ-পণ্ডিতের পাঠশালা—ওম্নি ইস্কুল তোদের জানি আমি!"

শেফালি একবার মুখ তুলে তক্ষুণি আবার মুখ নামিয়ে নিলে: "দাদা পড়ত ইস্কুলে। অনেক বই পড়ত!"

"তোর দাদা?" যেন একটা হাসি চাপতে চাইল পানু।

হাত থেমে গেল শেফালির, পানুর দিকে তাকাল সবটুকু দৃষ্টি নিয়ে, কথা বললনা।

"যে মরে গেছে সে-ই?" পানু হাসতে লাগল।

এবারও শেফালি কথা বল্‌লনা কিন্তু ঠোঁট কাঁপছে ওর। মনে হ'ল, কিছু বল্‌বে। কিন্তু কাঁপতেই লাগল ঠোঁট—চোখ ভরে জল এলো—দু'গালে গড়াতে লাগল জল। কোঁচড় থেকে ফুলগুলো ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল শেফালি—কান্নার কচি ঢেউ তুলে বলতে লাগ্‌ল: "তোমার কি? মরে গেছে তোমার কি?" তারপর দু'হাতে চোখ ঢেকে দৌড়ে নেমে গেল উঠোনে—পূবের ঘরের কোণ ঘেঁসা বাইরে যাবার রাস্তা ধরল। কোন্ দিকে তাকাবে পানু ঠিক বুঝতে পারছিলনা—শেফালির দিকে, না ফুলগুলোর দিকে। মা ঘরেই ছিলেন, কান্না শুনে ছুটে এলেন।

"কি রে, শেফালিকে মেরেছিস না কি তুই?" চোখ রাঙালেন মা।

"না ত!"

"না ত? কথা বলছিল মেয়ে এতোক্ষণ—কেঁদে ছুটে পালাল!"

"আমি কি জানি?" ভুরু কুঁচকে বললে পানু: "ওর দাদা মরে গেছে বলতেই কাঁদতে লাগল!"

ওর কান্না থামাতে ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন মা। পড়শীদের সব ছেলে-মেয়ের জন্যেই কাপড়-শাড়ি বরাদ্দ ছিল—অষ্টমী পুজোর দিনে দিতেন। শেফালির শাড়িটা সেদিনই হাট থেকে আনিয়ে মা বিকেলবেলা শেফালির হাতে দিয়ে

এলেন। কিন্তু তাতেই কি ও খুসী হত? মা তখনও ফেরেননি ওদের বাড়ি থেকে—শেফালি চুপি-চুপি বেরিয়ে এসেছে। সটান এ-বাড়ির বাইরের উঠোনে নিমগাছের নীচে। দুটো পাঁঠা বাঁধা ছিল, ওদেরও কাঁটাল পাতা খাইয়ে চলেছে। দাদাকে আর বিশুদাকে খুঁজতে পিশিমা পাঠিয়েছিলেন পানুকে—সবাইকে নিয়ে কোন্ এক জ্যাঠামশায়ের বাড়ি যাবেন। (পানু সেজেগুঁজে ফিটফাট। দাদাদের পাত্তা নেই। পিশিমা বল্‌ছিলেন : দাদাকে পেয়ে না কি বিশুটার চার-হাতপা গজিয়েছে—খেয়েদেয়ে সেই কখন বেরিয়েছে ওরা! ঘাটে নৌকোটাও নেই—নৌকো নিয়ে পাড়ি দিয়েছে আর কি! "গেলিত গেলি, পানুকে নিয়ে যেতিস—" সারাদিন পানুর মুখভার দেখে বলেছিলেন পিশিমা। মুখভার থাকবেনা? শেফালিটা এমন ছিঁচকাঁদুনে কে জানত?) বেড়ার এ-ধারে এসেই পানু চেঁচিয়ে উঠ্‌ল : "আরে—"

শেফালি হাতের একটা ডালের উপর মুখ গুঁজে রইল। পানু এগিয়ে এলো। কান্নার কথা শেফালিকে সে জিজ্ঞেস করবেনা। দুপুর বেলা মা তাকে বলেছেন, শেফালিকে ওসব কথা বলতে নেই, মনে ও কষ্ট পায়। তখন থেকে মুখভার পানুর। অন্যায় হয়ত একটা-কিছু করেছে সে, ভাবছিল। নইলে মা তাকে বলবেন কেন, "ছিঃ—"? বিশুদাকে পিশিমা বোকা বলেন, গাধা বলেন কিন্তু মা ত তাদের 'ছিঃ' ছাড়া আর কিছু বলেন না। কিন্তু তাতেই কেমন যেন শুকিয়ে ওঠে মুখ। দেবুর ততোটা নয় কিন্তু ছিঃ-শুনে পানুর চোখে যেন অন্ধকার নেমে আসে!

"শেফালি, একটা জিনিষ নিবি?" ভিজে আর নরম শোনাল পানুর গলা।

"কি?" শেফালি মুখ তুলে তাকাল, আলো-খুসীর আলো চিকিয়ে উঠেছে ওর চোখে।

লাল আর গোলাপিতে নক্সা করা একটা রুমাল বার করে নিয়ে এলো পানু তার ডুরি-কাটা পাঞ্জাবীটার পকেট থেকে। শেফালির হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, "নিয়ে যা—"

দু'হাতের চিমটিতে রুমালটা তুলে ধরে শেফালি বল্‌লে : "পুতুলের শাড়ি হবে, না পানুদা?"

"ছিঁড়ে?" একটু বিষণ্ণ হ'ল পানু।

"দুটো—তিনটে শাড়ি হবে!"

"হবে।" পানু ঘাড় নাড়তে সুরু করল।

১৯৪৪ ইং।

ভাবছিলাম শেফালির নামটা শুধু ডাইরির পাতায় লিখে রাখব কিন্তু কি আশ্চর্য্য কিছুতেই ও একটি লাইনের আধ ইঞ্চি জায়গা নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে চাইল না। ও যে এতোটা জাঁকিয়ে বসবে, ওর সবটুকু কাহিনী না বললে যে আমার কলমকে থামতে দেবেনা—লিখতে বসে ত' এক মুহূর্তের জন্যেও আমি কল্পনা করিনি। কল্পনা করবার উপায়ও ছিলনা—আমি জানতাম ওর কথা আমার মনে নেই। কে জানত যে আমাদের মন থেকে কিছুই হারায় না। যা হারিয়ে গেছে বলে ভাবি তা-ও যে হারায় না। মনের দিকে নিবিড়ভাবে তাকালেই অতল অবধি পাওয়া যায়।

সমস্ত পুজোর ছুটিটা টুকরো-টুকরো ছবির মতো আমার মনে পড়ছে। নিজেকে মনে হচ্ছে জাতিস্মর। ও-জীবনকে মনে-পড়া জাতিস্মরতা ছাড়া আর কি? আরেক জীবন—আরেক জন্ম ছিল তখন। তখনকার পানু আজকের দীপায়ন চৌধুরীকে চিনতে পারবেনা—দীপায়নও পানুকে আপন বলে চিনতে পাবেনা আজ। তারা দুই পৃথিবীর মানুস—দুই বাংলাদেশের। সে-পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে কোথাও সে-বাংলাদেশকে দীপায়ন খুঁজে পাবেনা! শুধু খুঁজে পাবে মনে। মন নষ্ট হতে পারেনা বলেই খুঁজে পাবে।......

"পানুটার কপালে কি রকম একটা লাল দাগ দেখেছ ঠাকুরঝি—" মা বলছিলেন: "একটা কালির টিপ দিয়ে নিয়ে যাও। ওর মুখের দিকে তাকালে আমার ভয় করে!"

"ও ত রাজতিলক—দাদারও নাকি ছিল—" পিশিমা কাজললতায় আঙুল ঘষছিলেন।

"আমাদের কোন্ রাজতিলকে কাজ নেই!" মা শুকনো মুখে বললেন।

দুই ভুরুর মাঝখানে চওড়া করে খানিকটা কালি চড়িয়ে দিয়ে পানুর থুতনি ছুঁয়ে পিসিমা নিজের আঙুলেই চুমু খেলেন। তারপর মাকে চাঙ্গা করে তুলবার জন্যেই হয়ত বললেন: "মার শাপ যেমনি লাগেনা, চোখও লাগেনা বৌদিদি—"

"কে জানে!" অবিশ্বাসে ঠোঁট ভাঙলেন মা।

একঘণ্টা পর অতুলদার বাড়ী থেকে পিশিমা প্রায় কাঁপতে-কাঁপতে ফিরে এলেন। পান্নুকে গায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আঁচল ঢেকেই আনতে চেয়েছিলেন, পান্নু অবাধ্য হয়ে উঠল বলেই পান্নুর হাত ধরে ছুটতে হ'ল তাঁকে। পিশিমার হাত কাঁপছে বুঝতে পারছিল পান্নু। কিন্তু কেন? পিশিমা কথা বলছিলেন না।

দাদা আর বিশুদা ফিরে এসেছেন। দাদাকে 'ছিঃ' দিচ্ছিলেন মা। পিশিমা হুড়মুড় করে তাঁর কাছে গিয়ে পড়লেন: "সর্ব্বনাশ বৌদিদি— অতুলদার সেই মাসী, আমি ভেবেছিলাম বুড়ী বিছানা নিয়েছে! কোথায় কি! তেড়ে এসে পান্নুর মাথায় হাত বুলাতে সুরু করলে— "

"গঙ্গাজলী সন্দেশ দিলেনা খেতে?" পান্নুর কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল।

"কেশবমাষ্টারের ছেলের মাথায় সেবার হাত বুলোলে—শেফালির—" পিশিমার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

পিশিমা কাবু হয়ে পড়েছেন বলেই হয়ত মা ততটা কাবু হতে চাইলেন না: "শুনেছি থাকে ওম্নি কেউ-কেউ—কী আর হবে!"

"তিনকুল খেয়ে এসেছে বুড়ি—অতুলদাদা ছাড়া কেউ নেই আর ডাকের লক্ষ্মী! আর অতুলদাদাকেও না কি দেখলাম! বাতে শয্যাগত হয়ে আছেন! নইলে দাদা এসেছেন শুন্‌লে আসেননা তিনি ছুটে?"

মা হাই তুলতে লাগলেন—এম্নি জোরে যে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল তাঁর। আর তাই হেসে উঠে বললেন: "তোমার যতো বিতিকিচ্ছি কথা ঠাকুরঝি—"

পিশিমা দমে গেলেন। হয়ত ভাবলেন একবার, তিনিও যে বিধবা— একটি মাত্র ছেলে নিয়ে নিজেও যে তিনি বাপের বাপের বাড়ীতেই আছেন তবে অতুলদার মাসীর মত অবস্থা তাঁর নয়। ভাসুর-দেওর আছে। ওঁরা রাখতে চেয়েছিলেন তাঁকে তিনি থাকেন নি। বাবাই না কি বলেছিলেন: ওখানে থেকে দরকার নেই—এ-বাড়ী পড়ে আছে কার জন্যে?—তুই এসে থাক্‌। বাবার এটুকু কথাকেই পরম আদর বলে মনে করে নিয়েছিলেন পিশিমা। খুসী হয়ে উঠেছিলেন। আমরা তাঁকে খুসী-খুসীই দেখেছি বরাবর।

কাজেই দমে গেলেন তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যে। পরের মুহূর্ত্তেই বিশুদার দিকে রুখে দাঁড়ালেন: "কোথায় গিয়েছিলিরে তুই দেবুকে নিয়ে?"

"ও বলুল নৌকা বাইবে—"

দাদা বেগতিক দেখে পিশিমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন : "বিশু বাজিতে হেরে গেছে পিশিমা—বলেছিল নাগাড়ে দু'মাইল আমি লগি ঠেলতে পারবনা—" পিশিমাকে শুদ্ধুই নেচে উঠতে চাইলেন দাদা।

"উঃ ছাড়—" হাসতে লাগলেন পিশিমা : "দেখি তোর হাত—নিশ্চয় ফোস্কা পড়েছে—দেখি—"

হাত ছড়িয়ে দিয়ে দাদা দাঁড়ালেন—তেলো দু'টো লালচে দেখাচ্ছিল।

"হেঁ নিশ্চয় ফোস্কা পড়বে—দেখবে কাল—" শঙ্কা ফুটে উঠল পিশিমার চোখে : "বিশুটার একটা-না-একটা দস্যেমি করা চাই—"

"ফোস্কা পড়লে বাজিতে হারবে দেবু—" দস্যুর ভঙ্গীতেই বললেন বিশুদা।

"বাজি হারানো দেখাচ্ছি তোমায়—দাঁড়াও --"

কিন্তু বিশুদা দাঁড়াবেন কেন ? দে ছুট। পিশিমা নারকেল তেল আর চূন গুলে নিয়ে এলেন দাদার হাতে মাখাবার জন্যে—তাতেও হলনা—নকুল বাবার জন্যে তামাক নিয়ে বাইরে যাচ্ছিল, তাকে বলে দিলেন : "নকুল, লক্ষ্মীবাবা, উত্তরের বাড়ী থেকে একটা ঘৃতকাঞ্চনের পাতা নিয়ে আসবি ?—চাইলেই দেবেন ওঁরা !"

১৯৪৪ ইং।

আমার মনে হ'ত বাইরের উঠোনে চেয়ার-টুল, মোড়া-পিঁড়ি পেতে শুধু গল্প করবার জন্যেই বাবা গাঁয়ের বাড়িতে এসেছেন। আট বছর পর সবার সঙ্গে দেখা—কাজেই গল্প আর ফুরোয় না। ভেতর-বাড়ি থেকে হরদম পান-তামাক সরবরাহ হচ্ছে—নকুল ডাকের মাথায় আছে। সকাল-বিকেল রোজ এ-রকম। আড্ডার আর-আর মানুষগুলোর মুখ-বদল হত—কিন্তু একজন অবিকল থাকতেন—তারিণী ভট্টাচার্য্য। গুরুগিরি করতেন—পুজোর আগেই শিষ্যবাড়ি ঘুরে এসেছেন—এ সময়টাতে তাঁরও ছুটি। বয়সে বাবার সমানই হবেন, তুই-তুকারি চলত ওঁদের। দাস মশায় আসতেন, রায়-বাড়ীর তহশীলদার—চওড়া সাদা গোঁফ, কলেজের দারোয়ান পাঁড়েজির মতো। আচার্য্য-দাদু টুলে বসে শুধু হুঁকো টানতেন—বাবা শশীকাকা বলে ডেকে মাঝে-মাঝে তাঁর তামাক-তপস্যা ভেঙে দিতেন। হেসে তিনি মাথা নাড়তেন একটু, তারপরই আবার

যে-কে সে-ই। কার্ত্তিক-গণেশ বাগ্দী দু'ভাই ত আমাদের বাড়িরই মানুষ! নৌকোর তদারকে ছিল কার্ত্তিক, আর বাইরের উঠোনের লাগোয়া বিঘেটাক জমির ভার ছিল গণেশের উপর। লাউ-কুমড়ো-বেগুন ফলাতে আর একটা গাই রাখবার জন্যে সবসময়ই সে আবেদন উপস্থিত করত। পিশিমা বলতেন, "আড়াই পয়সা করে সের এমন চমৎকার দুধ বাড়ি বয়ে এনে দিয়ে যায়—ও ঝঞ্ঝাট করতে যাবে কে?" অগত্যা সর্দ্দার সখ ছেড়ে গণেশকে ফুলের বাগিচার দিকে ঝোঁক দিতে হয়েছিল। তা-ও আবার পিশিমার শিবপুজোর সাদা ফুল বনে-বাঁদাড়েই পাওয়া যায়, বাসক, ভাঁট, দ্রোণ-ফুলের অভাব কি?—তাই গণেশ গোপাটি আর মোরগঝুঁটি বেছে নিলে বর্ষা আর শীতের জন্যে। বাবা এসে এবার মোরগঝুঁটি গাছগুলোর খুব তারিফ করেছেন—বাস্ গণেশকে আর পায় কে?

বাবার রোজকার গল্পের আসরে পানু বসে থাকতনা। মনে পড়ে, একদিন মাত্র সে ছিল। বাজারে নিয়ে যাবেন পানুকে—বাজির দোকানে, তাই সে আর সেদিন বাবার সঙ্গ ছাড়া হতে চাইছিল না।

তারিণীকাকা মত্ত হয়ে হাত-পা ছুঁড়ছিলেন: "কাঁপিয়ে দিলে ত সবাইকে—একা একটা দেশ। সুবোধ বাগবেই না বা কেন? শুনেছি সব সংস্কৃত পুঁথি-পত্তর নিয়ে জড়ো করেছে নিজেদের দেশে। জর্ম্মণ ভাষাও না কি সংস্কৃতেরই মতো! আমাদের যেসব অস্ত্রশস্ত্র ছিল পুঁথি থেকে জেনে নিয়ে তৈরী করে চলেছে ওরা একে একে—শতঘ্নী, শব্দভেদী বাণ, দিব্যাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র—এইসব!"

বাবা হাসছিলেন, "হেঁ, শক্তি ত আছেই। নেপোলিয়ন বলেছিলেন, অ্যাণ্টোয়ার্প যে দখল করবে সমস্ত ইউরোপ তার মুঠোয় আসবে!"

তারিণীকাকা নকুলের হাত থেকে ছোঁ মেরে হুঁকোটা ছিনিয়ে নিয়ে বললেন: "তবে যে আপনি বলছিলেন, 'ওরা বর্ব্বর!'"

"ফরাসীরা যুদ্ধের সাবেক রীতি-নীতি মেনে চলে—ওরা মানেনা, তা-ই বলছিলাম।"

যুদ্ধের কথায় বাবা কেন হাসছিলেন, পানু বুঝতে পারছিলনা। চারবছর আগে সদর রাস্তায় বাজির কি যে একটা চমৎকার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল পানু! দৌড়ে বেরোতে হয়েছিল শুনে। সবাই বলা-বলি করছিল গোরাসৈন্য যুদ্ধে যাচ্ছে—যুদ্ধ হচ্ছে যেন কোথায়। পানু শুধু তাকিয়ে দেখছিল ঝকঝকে

বাদ্যযন্ত্রগুলো আর ওদের জামা-জুতোর রঙ-চঙ। আর কেমন লাল-টুকটুকে মুখ ওদের, চীনেমাটির পুতুলের মতো! যুদ্ধ বলতে অনেকদিন পান্নুর চোখের ওপর ও ছবিটাই এসে হাজির হয়েছে। তারপর আরেকদিন আরেক ছবি। সায়েবের মতো দুজন লোক যুদ্ধের জন্যে পল্টন নিতে এসেছেন, শুনেছিল পান্নু। জেলাস্কুলের মাঠে। পান্নু দেখতে গিয়েছিল। ফটো তোলা হচ্ছে। দাঁড়ি-গোঁফওয়ালা বুড়োমত একজন বাঙালী সায়েবী পোষাকে পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পাশে জোয়ান মতো আরেক জন। (বাবা কি সুরেন-বাড়ুয্যে আর সেনগুপ্তের মতো ছিলেন দেখতে? না ত!) সামনে মেটে-রং-এর হাফ-প্যাণ্ট-পট্টি-কোট পরা কয়েকজন লোক ঘাসের উপর বসে আছে। ওদের একজনকে যেন চেনে পান্নু—ফুটবল খেলত টাউনক্লাবে। গোল-ঠেকাবার ওস্তাদ। তারপর দাদার কাছে শুনেছিল, গোলা লেগে সৈন্যরা যুদ্ধে মরে যায়। গোলা-লাগা কেমন—মরে যাওয়া-ও আবার কেমন? 'হরিবোল' বলে পাটিমুড়ে কি একটা যেন একবার কতগুলো মানুষ কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছিল—পেছনে পেছনে একজন বুড়োমানুষ চোখ মুচতে-মুছতে যাচ্ছিলেন—রাস্তার দোকানদাররা বলেছিল—বুড়োর ছেলে মরে গেছে—পুড়তে নিয়ে যাচ্ছে ওকে! তাহলে মরলে মানুষকে ওভাবে পাটি মুড়ে নিয়ে যায়! মরলে তবে ওদের পুড়ে ফেলবে?—ওই সৈন্যদের? টাউনক্লাবের ওই হাফব্যাক্ আর খেলতে আসবেনা? কিরকম যেন অদ্ভুত মনে হয়েছিল পান্নুর! শুধু অদ্ভুত নয়, ভালো লাগছিলনা তার ভাবতে। হয়ত হাফব্যাকের বাবা ঠিক সেই বুড়োমানুষটির মতো কাঁদছেন, ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছিল। তারপর অনেকদিন দাদার স্লেট পেন্সিল নিয়ে পান্নু সৈন্যের চেহারা আঁকতে বসত—গায়ে গলফ-কোট, কোমরে বেল্ট, হাফপ্যাণ্ট, পায়ে পট্টি আর বুট—আঁকা হতনা কিন্তু একেকটা রেখা যে একেকটা জিনিসের চিহ্ন নিজে সে তা চিনতে পারত। শেফালির দাদাও ত এম্নি মরে গেছে—তা বলতে গিয়ে তাহলে সে ওদিন হাসছিল কেন? যুদ্ধের কথা বলতে বাবা যেম্নি হাসছেন, সে-ও তা-ই করেছে ওদিন, মা তাই বলেন তাকে, ""তুই তোর বাবার মতো হচ্ছিস্—দেবু আমার মতো!"

ওঁরা গল্প করে চলছিলেন, পান্নু টুলে বসে পা দোলাচ্ছিল—ভাবছিল, আজ দুপুরবেলা যুদ্ধের গল্প বলে শেফালিকে তাক লাগিয়ে দেবে। বানিয়ে সৈন্যদের

চেহারার কথা বল্‌বে—ঠিক-ঠিক মতো বলতে গেলে শেফালি মনে করবে ও কিছু নয়। ও বিশ্বাসই করবেনা ওরা যে গোলা ছুঁড়তে পারে, তাহলেই বলতে হবে ওদের ইয়া গোঁফ, ইয়া বাবরী—কালো মিশ্‌মিশে চেহারা, দাঁড়ালে আকাশ ছুঁয়ে যায়! ভয়ে হিম্‌সিম্‌ খেয়ে যাবে শেফালি। কেমন ও ভয় পায়না দেখবে পান্নু।

হঠাৎ পা-ঢুলুনি থেমে গেল পান্নুর! শেফালির বাবা, কেশব মাষ্টার, এসে হাজির। কেন? কেন আবার! মাষ্টারদের নালিশ ছাড়া আর কি দরকার থাকে?

মাষ্টার হাতের মুঠো খুলে ম্যাজিকওয়ালার মতো পান্নুর রুমালটা বার করে বাবাকে বললেন, "রুমালটা শেফালি নিশ্চয়ই আপনাদের বাড়ি থেকে নিয়ে গেছে—আমি অবাক হয়ে গেছি—মেয়েটা চুরি শিখছে।"

মাষ্টারের ভঙ্গী দেখে বাবা হো-হো করে হেসে উঠলেন, "যদি নিয়েও থাকে, মাষ্টার, ওকে কি অতবড় একটা নাম দেওয়া যায়—চুরি?"

বাদবাকি লোক বাবার কথায় হেসে উঠলেন। মাষ্টার খুসী হলেন না।

বাবা চুপ করে থাকলে হয়ত পান্নু পালিয়ে যেত। এখন অকুতোভয়ে সে ওদের কথায় নাক ঢোকালে: "ওটা ত আমি দিয়েছি শেফালিকে।"

এবার রোগা চোখ-মুখের সবটুকু আক্রোশ মাষ্টার পান্নুর দিকে ফেরালেন: "তুমি বা শেফালিকে ওটা দিতে গেলে কেন?"

কেন? প্রশ্নটা সত্যি জটিল। পান্নু কি বলবে পুতুলের শাড়ি তৈরী করবার জন্যেই ওটা দিয়েছিল সে শেফালিকে? কিন্তু এতো সহজে মিথ্যা কথা বলতে ত শেখেনি সে। মিথ্যা কথা সে বলে কিন্তু এতো দেরি করে আর হোঁচট খেয়ে বলে যে ধরা পড়ে যায়।

বাবাই পান্নুকে রক্ষা করলেন: "ওটা ছেলেপিলেদের দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার, ওতে আমরা নাক ঢোকাই কেন, মাষ্টার? শেফালিকে ফিরিয়ে দাও রুমালটা!"

মাষ্টার এবার হেসে নাক চুলকোতে লাগলেন: "না, আমি ভেবেছিলাম বুঝি কাউকে না বলে শেফালি ওটা নিয়ে গেছে!"

১৯৪৪ ইং।

দীপায়নের আজ পান্নুর এই রুমাল-কাব্যটির কথা মনে পড়ছে গাঁয়ের প্রথম স্মৃতির সঙ্গে। মনে পড়ছে কয়েকটি মুখ—কয়েক টুকরো হাসি। সে-হাসির

ধ্বনি আর নেই এখন, তার সবটুকুই আলো, সবুজ জ্যোৎস্না। যেন আকাশের কোথায় এখনও তাকে পাওয়া যাবে। মন থেকেই যেন একটা দীপ্তি কোথায় ছড়িয়ে পড়ে আকাশে। যা আছে তা-ই কি আমাদের সব? যা ছিল তা কি কিছু নয়? দীপায়ন কি বলতে পারে পানু তার কেউ নয়? রাত্রির সেই স্বপ্নের পর—সেই আলোর পরও কি আজ বলবে প্রত্যেকটি মুহূর্তে আমি নূতন? নিজেকে শুনিয়ে, অপরকে শুনিয়ে আমি বলেছি অনেকদিন: আমি নামহীন, গোত্রহীন, পরিচয়হীন—আমি নাড়ী ছিঁড়ে দিয়ে একা দাঁড়াতে পারি—নূতন সত্তায় ঝলমল করে উঠ্‌তে পারে আমার শরীর। কিন্তু পারলামনা ত! কোথায় কি যেন ছিল আমার রক্তমাংসের কোষতন্তুতে—কি এক দুনিরীক্ষ্য গতি, বিদ্যুতের কি এক ঐক্যতান পথ এঁকে দিচ্ছে আমার অন্ধকারের বুক চিরে! একসময় আমার ইচ্ছা পথ তৈরী করতে চেয়েছিল—তার নিঃসঙ্গ, উদ্ধত ভঙ্গী ভালো লেগেছিল আমার। কিন্তু আমি কি জানতাম আমার ইচ্ছা আমারই একার নয়! অনেক ইচ্ছার ভীড়ে যে তা হারিয়ে যাবে আমি ভাবিনি! আমার গাঁয়ের ইচ্ছা—পিশিমার, শেফালির, হয়ত কেশব মাষ্টারেরও ইচ্ছা, আমার সহরের ময়নার আর বীণাদির ইচ্ছা, আর সবচেয়ে বড়ো ইচ্ছা বাবার আর মার—ও সব ইচ্ছাইত একে একে মিশেছে এসে আমার ইচ্ছার গায়ে! দাদার ইচ্ছা আর আমার সেই ন'দাদুর ইচ্ছা—তা-ও কি কম? কি করে আমার ইচ্ছা একা দাঁড়াতে পারে? আমার ইচ্ছা বলেও বা কিছু ছিল কি কখনও? পৃথিবীর প্রথম মানুষ নই আমি। আমি অপাপবিদ্ধ, অস্থাবির নই। আমার রক্ত শুধু আমারি রক্ত নয়, আমার মন শুধু আমার হাতেই তৈরী নয়। যাঁদের আমি দেখিনি, জানিনে কোনোদিন, তাঁরাও হয়ত আছেন আমার দেহে—কোনো অণুতে, কোনো পরমাণুর ছন্দে! ন'দাদুরও আগে—তারও আগে যাঁরা ছিলেন বাংলাদেশের গাঁয়ে আর সহরে—ক্ষেতের আলে-আলে হেঁটে গেছেন যাঁরা, প্রাচীন বট-অশ্বত্থের নীচে বসে বিশ্রাম করে গেছেন, নৌকোর পাল তুলেছেন বিলে-সায়রে, নদীর হাওয়ায় আর যাঁরা ইঁট-কাঠ পাথর-লোহা জড়ো করেছিলেন, পুঁথিকেতাবের দুর্গ তৈরী করে স্বর্গ রচনা করবেন ভেবেছিলেন—তাঁরা সবাই কি তিলতিল করে রক্ত-মাংস, হৃদয়-মন দিয়ে এই অপূর্ব্ব শিল্পটি তৈরী করেনি যার নাম দীপায়ন চৌধুরী?

[দুই]

তখন পান্না ফিফথ্ ক্লাশে পড়ে, আমার সঙ্গে তার যখন প্রথম আলাপ। একই ক্লাশে কিন্তু অন্য সেক্‌শনে ভর্তি হয়েছিলাম আমি। প্রথম দিনই টিফিনের সময় স্কুলের মাঠে ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললাম: "আমার চেহারাটা ঠিক তোমার মতো দেখতে, না?" জানতাম, উঁচু ক্লাশের ছেলেরা প্রথম পরিচয়ের সময় 'আপনি' বলে—আমিও পান্নুকে আপনি বলতে পারতাম কিন্তু কেন জানিনে, ইচ্ছে হলনা। লাজুক মেয়ের মতো হাসল একটু পান্নু কিন্তু অনায়াসেই বললে: "তাই নাকি? কে বল্‌লে?"

"কে আবার বলবে? আয়নায় কি আমি নিজের মুখ দেখতে পাইনে আর তোমার মুখও কি দেখতে পাচ্ছিনে এখন?"

কিন্তু পান্না তাতে জব্দ হলনা বরং এক অদ্ভুত প্রশ্ন করল: "আচ্ছা ভাই, আয়নায় আমরা আমাদের মুখ ঠিক-ঠিক দেখতে পাই?"

"তা না হলে আয়না কেনে কেন সবাই?" সোজা জবাব দিয়ে হাসতে সুরু করেছিলাম।

"তোমার নাম কি?" আমার সঙ্গে ওর মিলগুলো খুঁটে-খুঁটে দেখছিল হয়ত পান্না।

"অনিরুদ্ধ ঘোষাল।"

"বাঃ, আমার মতোই অদ্ভুত নাম!"

"তোমার?"

"দীপায়ন চৌধুরী।" পান্না একটু দুঃখিত হয়েই যেন বল্‌লে: "বি-সেক্‌শনে গেছ?"

"তুমি যে এ-সেক্‌শনে আছো, তা ত জানতামনা!"

"চট করে ভর্তি হতে গেলে কেন? আর এখন ত আমাদের ইস্কুলেই কেউ ভর্তি হযনা, সবাই ন্যাশন্যাল স্কুলে যায়।"

"কিন্তু আমি যেতে পারিনে—" পকেট থেকে একটা পেয়ারা বার করে পান্নুর হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, "থাক্ ওসব কথা—খাও।"

দীপায়নের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের কাহিনীটা গোড়ায় বলতে হল এজন্যে পাছে আপনারা ভেবে বসেন পানুকে আমি কি করে জানতে পারি। দীপায়নের মতো ক'রে না হোক, আমিও পানুকে জানতাম। ফিফথ ক্লাশের পানুকে। প্রথম আলাপের পর ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জমে উঠতে আমার একটি দিনও দেরি হয়নি। ঘনিষ্ঠতা মানে সুযোগ পেলে একসঙ্গে থাকাই নয়, ও যখন আমার সঙ্গে থাকতনা তখনকার ছবিও আমি দেখতে পেয়েছি বলেই তার নাম দিয়েছি ঘনিষ্ঠতা। এতোদিনের কথা মনে থাকবার কথা নয় কিন্তু মনের ক্রিয়াকলাপ মনে না থাকলেও বাইরের কাজকর্ম্মগুলো আমাদের মনে থাকে। ধরুন, আপনাদের ছোটবেলায় আপনাদের মা-রা কি ভাবতেন বা বলতেন তা হয়ত হুবহু মনে তুলে আনতে রীতিমতো ধ্যানের দরকার হবে কিন্তু তাঁরা কি ভাবে হাঁটতেন, কথা বল্‌তেন, হাসতেন বা রাগ করতেন সে-ছবি আপনারা অনায়াসে চোখের উপর ভাসিয়ে তুলতে পারেন। পানুর সে-ধরণের ছবিগুলোই আমার মনে আছে। সার্কাসের ক্লাউনের লাথি-চড় খাওয়া বা সার্কাসওয়ালীর তারের উপর হাঁটা কি আমরা ভুলে যাই?

ওর ন'দাদুর কথা, বাবার আর দাদার কথা তখন ও খুব বেশী বলত আমার কাছে। ওর দাদা দেবোত্তমবাবুকে আমি দেখেছি—তখন কলেজে পড়তেন—মুখ-ভার, ভুরু-কুঁচকোনো এক ভদ্রলোক, কেমন যেন একটা ভয় করত দেখলে।

"দূর্" পানু বল্‌ত, "দাদাকে তুই জানিসনে!" তার মানে, বাড়ীতে হয়ত তাঁর চেহারা ছিল আরেক রকম।

কি রকম?

"রাত করে বাড়ী আসেন একদিন—বাবা টের পান কিন্তু কিছু বলবার আগেই কি-সব স্বদেশী কথা জুড়ে দেন বাবার সঙ্গে, বাবার আর মনেই থাকেনা ওঁকে বকাঝকি করতে।"

মা? মা কিছু বলেন না?

"মাকে বোঝান নার্স করতে গিয়েছিলেন---কোথায় কোন্ কলেজের ছেলে কোন্ পাড়ায় একা একঘরে কলেরায় মারা যাচ্ছে, এম্নি সব কথা বলেন।"

কথা, শুধু কথা—ওঁর কথায় চাকর-ঠাকুররাও কেউ তিষ্ঠোতে পারেনা। নকুলকে বলে, লাঠি খেলা জানোনা এতো বড় শরীর রেখেছ কি করতে? তোমাদের গাঁয়ে লেঠেল নেই একজনও? কি আশ্চর্য্য! তাহলে এক কাজ

'কর'। হাটের দিনে চক-বাজার থেকে মজবুত দেখে একটা বাঁশ কিনে নিয়ে এসো—আমি তোমায় লাঠিখেলা শিখিয়ে দোব। তামেচা-বাহেরা ক'টাই বা আর প্যাঁচ!

লাঠিখেলা আমারও শিখতে ইচ্ছা করত কিন্তু ছেলেমানুষ বলে হয়ত তিনি আমাকে আমলই দেবেন না ভাবতাম। পান্নু বলত, ভয় কি—বল্‌না! শেখাতে মজা পান দাদা। আমাকে সাঁতার শিখিয়েছেন কলসী ভাসিয়ে। একদিন প্রায় ডুবে গিয়েছিলাম। দাদা হাসতে-হাসতে বললে, সাঁতার শিখতে গেলে খানিকটা জল খেতে হয়। লাঠি খেলতে গিয়ে হাত ভেঙে গেলে দেখবি তোকেও ঠিক ওম্নি বল্‌বেন। 'দেবুদা'—বলে অনেকদিন এগিয়ে গেছি ওঁর কাছে—কিন্তু লাঠিখেলা শেখার প্রস্তাব পেশ করা হয়নি, হয়ত ওঁকে জিজ্ঞেস করেছি, 'ভ্রষ্ট' মানে কি, দেবুদা?

হো-হো করে হাসতে সুরু করেছেন তিনি, "তোরা যা তা-ই! রোজ যেম্নি স্বদেশী-মীটিং-এ গিয়ে বসে-বসে কথা গিলিস! আর ওঁরা-ও যা কথা বলতে পারেন—বাবার সব বন্ধু-বান্ধবরা! কাজ নেই, শুধু কথা। ভ্রষ্ট মানে তা-ই!"

তা যে নয়—এবং তা বলতে গেলে যে বাংলার মাষ্টারমশাই শুনতে চাইবেন না সে ধারণা আমাদের ছিল। কিন্তু সঠিক মানে দেবুদা ইচ্ছে করে না বললে আবার ওঁকে জিজ্ঞেস করে জানবারও ভরসা হতনা। আমার অবস্থা বুঝে শেষটায় হয়ত দয়া হত ওঁর, তাই বল্‌তেন: "তোদের ইস্কুলের মানে 'পতিত'। মানে ঠিকই আছে।"

তখন শুনলেও বুঝতে পারিনি, হয়ত তিনি বলেছিলেন অথবা আমাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সাবেক কথার মানেগুলো সাবেককাল থেকে ঠিকই আছে আমরা নিজেদের বদলে ফেলতে চাই বলেই তাদের মানে হারিয়ে যায়।

হরিসভার মাঠে রোজ বিকেলে তখন স্বদেশী সভা হ'ত। আমি আর পান্নু যেতাম। হিন্দুমুসলমান উকীলরা কাছারীতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন, কাজেই রোজ বিকেলে একবার করে নিজেদের তাতিয়ে তোলার দরকার ছিল তাঁদের। দল-ভেঙে কেউ-কেউ কাছারীতে আনাগোনা সুরু করে দিয়েছিলেন এরই মধ্যে—সি-আর-দাশের কাছে যে-শপথ নিয়েছিলেন তাতে চিড় ধরে গিয়েছিল। পান্নুর বাবা কাছারীতে যাওয়া বন্ধ রেখেছিলেন মাত্র সাতদিন—সাতদিন পরেই মক্কেলের খোসামোদে অতিষ্ঠ হয়েই না কি বারলাইব্রেরীর

জনবিরল ঘরে গিয়ে হাজিরা দিতে হয়েছিল তাঁকে। পান্নু একটু বিমর্ষ হয়েই সে গল্প বলত আমার কাছে। সরকারী উকীল জলধরবাবু না কি ঠাট্টা করে বলছিলেন দীনেশবাবুকে: 'এক মাঘে শীত যায় না!' সহরের সবচেয়ে বুদ্ধিমান বলে খ্যাতি ছিল জলধরবাবুর। আর সেই বুদ্ধির চক্‌চকে পালিশের দরুণই হয়ত তাঁর অসামাজিক কাজকর্ম্মগুলো ছায়ার মতো পেছনে সরে থাকত। সমাজচ্যুত হবার ভয় ছিলনা তাঁর—কারণ তিনি জানতেন কোনো-না-কোনো সময় সহরেব সবারই বুদ্ধির দরকার হবে। মেয়ের বিয়ে, ছেলেদের পড়াশুনো, সরকারী মহলে দরবার, টাকা খাটানো, পড়শীর সঙ্গে ঝগড়া—কতো সমস্যাই ত সহরের নগণ্য মানুষদের আছে আর তার সব সহজ সমাধান হাতের আমলকির মতো তাঁর আয়ত্তে। কাজেই তাঁকে ঠেলে ফেলে দেয় কার সাধ্য? মাথা উঁচু করে উঠছিল যে উকীলের দল, দীনেশ ত ছিল তাদেরই পাণ্ডা—দীনেশেরও মাথা হেঁট হল! দীনেশ গেছে স্বদেশী করতে!—হয়ত ভাবতেন জলধরবাবু—সৌখীন মানুষ, জামাজুতো দেখলেই মালুম হয়, ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি ছিল তার—যখন বাবুআনার অঙ্গ ছিল ওটা, এখন দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে হাল-আমলের বাবু সেজেছে—দীনেশ করবে স্বদেশী! দু'পয়সা কামাচ্ছ—কামিয়ে নাও—তোমার এ-ঘোড়ারোগ কেন? প্র্যাক্‌টিস যাঁদের ছিলনা, তাঁরা গেছেন-গেছেন, তুমি কেন? মুখভার করে পান্নু বাবার কাছে শোনা কথাগুলো গড়-গড় করে বলতে থাকত, আমি তখন হেসে উঠ্‌তাম। দীনেশবাবুর পিঠ চাপড়ে জলধরবাবু যে নিজের উঁচু আসনটা আরো উঁচুতে তুলতে চাইতেন তা বুঝতে পেরে হাসতামনা হাসতাম পান্নুকে দেখে।

"তাহলে তুই ন্যাশন্যাল স্কুলে গেলিনে কেন?" পান্নুর দুঃখের একটা কারণ আবিষ্কার করে জিজ্ঞেস করতাম।

"চেয়েছিলাম যেতে। মা বারণ করলে—তাছাড়া দাদা—"

"দেবুদা? বারণ করলেন দেবুদা—"

"বলেন, পড়তে চাস, না চরকা ঘোরাতে চাস?"

ন্যাশন্যাল ইস্কুলের ছেলেরা চরকা কাটে, চরকার গান গায়, বাংলায় অঙ্ক করে—ডেস্ক-বেঞ্চে বসেনা, মাদুরে গোল হয়ে বসে ক্লাশ করে—সবকিছুই আরেক রকম। পান্নু আমার কাছে ওদের খবর বলত—লোভে চক্‌চক্ করে উঠ্‌ত ওর চোখ।

"তোর ভালো লাগবে ওখানে পড়তে ?" দেবুদার মতো আমিও ওকে ঠাট্টা করতে চাইতাম।

"হুঁ। ওরা সবাই পড়ছে, অমল-বিভূতি-রঞ্জিত ওরা সব।"

ওরা পড়ছে বলেই ও মাঝে-মাঝে ন্যাশন্যাল স্কুলের মাঠে গিয়ে ঘুর-ঘুর করত। ওদের হারিয়েই ওর দুঃখ, বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু রোজ স্বদেশী-মিটিং-এ কেন যে যেতো—আমার ইচ্ছা না থাকলেও কেন যে ছোট-খাট একটা স্বদেশী বক্তৃতা দিয়ে আমাকে উদ্দীপ্ত করতে চাইত তা বুঝে নিতে আরো কয়েকটা দিন কেটে গেল। একদিন জানা গেল, অমল-বিভূতি ওরা ওর নাইন্‌থ্ ক্লাশের থেকে গা-মাখা সহপাঠী আর ওরা-ই কিনা একদিন ওদের ইস্কুলের মাঠে পানুকে দেখে 'গোলাম-খানা' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

"আমি না কি গোলাম—বল্‌লে ওরা আমায় —" পানু প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলেছিল আমাকে।

—"বাড়িতে আমি চরকা কাটি—মা-ও কাটেন—জনিস, অনি! ইস্কুলে বসে চরকা না কাটলেই কি গোলাম হয়ে যায় ?"

- "ওরা আমায় গোলাম বললে—অমল-বিভু আর রুণু। দেখা হলে আর কথা বলেনা ওরা আমার সঙ্গে!"

পানুর দুঃখ দেখে ওরা যে মানুষগুলোই খারাপ তা-ই আমি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি কিন্তু তাতেও ওর ঘোরতর আপত্তি ছিল। ওদের খারাপ বলতে কোথায় যেন ওর বাঁধত। বলতে সুরু করত বিগত দিনের কাহিনী। অগাধ ভাব ছিল ওর ওদের সঙ্গে। লেখাপড়ায় ভালো নয় কেউ, তবু। কেন দেখতে ভালো বলে ? ভাবতাম তখন। এখন মনে পড়ছে, কেমন যেন মেয়েলি ছাঁদ ছিল ওদের মুখে, পানুর বা আমার মুখের মতো ধারাল মুখ নয় কারোর—নরম-নরম চোখ, পুরু ঠোঁট, নরম-নরম চাউনি। হয়ত তারি জন্যে ওদের এতো ভালো লাগত ওর।

বছরের শেষ দিকে পানুর আফ্‌শোষটা অনেক কমে গিয়েছিল। সভায় প্রায় যেতোই না, ন্যাশনাল ইস্কুলের নামও ওর মুখে শুনিনি আর। সহরে রাষ্ট্র-হওয়া জলধরবাবুর একটা গল্প বলাবলি করে দুজনে তখন বেদম হাসাহাসি করতাম। গল্পের শেষটুকু পানু ওর বাবার মুখে শুনে যেদিন আমার কাছে বলতে এলো, সেদিন ওকে দেখে মনে হয়েছিল কি একটা শক্ত অসুখ যেন ওর

শরীর ছেড়ে চলে গেছে। গল্পটা ক্রাশময় ছড়িয়ে দিয়েছিল ও,—সবার কাছে বলতে একই রকম উৎসাহ, তেতো লাগত না যেন একটুও।

জলধরবাবু আর কি করতে পারেন, তিনি যে-সময়কার মানুষ তখন বাংলাদেশে পুরোদমে কাঞ্চন-কৌলীন্যের যুগ চলেছে। সরকারী উকীলের উপার্জ্জন নিয়েও তিনি তুষ্ট ছিলেন না, তাই স্ত্রীর নাম দিয়ে মহাজনী ব্যবসা করতেন। তাতে শুধু তাঁর টাকাগুলো চাকার মতো বেড়েই চলতনা, খাতির দেখাবার জন্যে চিরদিনের জন্যে একটা খাতকের দলও তৈরী হয়ে থাকত। জলধরবাবু একবার আশুবাবুর পাল্লায় পড়লেন। আশুবাবু মানে, দীনেশবাবুর এক বন্ধুর ছোট ভাই আর তাঁরই মক্কেল। গুজব ছিল, আসাম থেকে বিস্তর কামিয়ে এসেছেন আশুবাবু। কোন্ সায়েবের চা-বাগানে কাজ করতেন, এখন নিজেই বাগান করবেন। সহরের আট মাইল পূবে লুসাই পাহাড়ের যে ফাঁড়িটা এগিয়ে এসেছে (অবশ্য লুসাই-এর ফাঁড়ি নামটাও আশুবাবুরই দেওয়া) বাগানের পক্ষে না কি তা এক আদর্শ জায়গা! চা-গাছের একটা চারা হাতে নিয়ে তিনি একদিন জলধরবাবুর বৈঠকখানায় এসে হাজির। আপনা থেকেই না কি চা-গাছ গজিয়ে আছে পাহাড়ের গায়ে, আশুবাবু গিয়ে দেখলেন, কাজেই এ-সোনা পায়ে ঠেলা যায়না, একটি কোম্পানী করে এ-সপ্তাহেই দেড়শ'-দু'শ টিলা কিনে ফেলতে চান তিনি। জলধরবাবুর চোখের সামনে প্রচুর লোভ সোনালি রঙ ধরে দাঁড়াল। সন্দেহের অবকাশ ছিলনা। সন্দেহ যদি থাকে, বেশত, একদিন চলুন জলধরবাবু তাঁর সঙ্গে টিলাগুলো দেখে আসবেন স্বচক্ষে। জলধরবাবু রাজি। গরুর গাড়িতে একদিন সন্ধ্যানাগাদ টিলার কাছে গিয়ে পৌঁছুলেন তাঁরা। আশুবাবু হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলেন ছোট-ছোট ঝোপ। জলধরবাবু এগিয়ে গেলেন। একটা ঝোপ থেকে ডাল ভেঙে নিয়ে এলেন। দেখতে পেলেন, আশুবাবু যে-গাছ দেখিয়েছিলেন তারই ডাল। পরের দিনই পাঁচহাজার টাকার কয়েক তোড়া নোট বার করে হবু বাগানের আদ্ধেক অংশীদার হয়ে গেলেন জলধরবাবু! কিছুদিন আগেই চা-বাগানে ধর্ম্মঘট গেছে তবু ইদানীং যে চা-বাগানই লক্ষ্মীর খাস তালুক তা তিনি বিলক্ষণই জানতেন। তারপরই আসল ঘটনা। মানে, দুর্ঘটনা। জানা গেল চা-গাছ বলে যাদের জেনেছিলেন জলধরবাবু, ওগুলো বুনো গন্ধরাজ গাছ। এবং আরো সর্ব্বনাশ এই যে ওখানে কস্মিনকালেও চা-

বাগান করা যাবেনা। আশুবাবু অম্লান বদনে বল্‌লেন, "তাতে কি! আনারস ত হবে। পাঁচ হাজার টাকায় কিছু চা-বাগান হয়না!" নিরুপায় হয়ে জলধরবাবু দীনেশবাবুর শরণ নিলেন যদি এক-আধ হাজার টাকা এখনও আশুবাবুর গহ্বর থেকে বার করা যায়! দীনেশবাবু হাসতে লাগ্‌লেন: "শুধু কি ফাল্গুন নিয়ে থাকা যায়, দাদা, গ্রীষ্ম আসবেই!" "মাঘের কথাটা তুমি মনে রেখেছ দেখছি—" জলধরবাবু দুঃখিত দেখালেন: "আমি কি ওভাবে কথাটা বলেছিলাম দীনেশ—বলেছিলাম দু'দিনের আন্দোলনে স্বাধীনতা আসবেনা!"

দীনেশবাবু নাকি টাকাটা ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন আশুবাবুকে। আশুবাবু অনুরোধটাকে হেসেই উড়িয়ে দিলেন: "কি যে বলেন আপনি, দাদা! ওর হাতে ও-টাকা ফিরে গেলে কি হবে বলুন ত। সহরের একটা গরীব পরিবারের কয়েকটা কুঁড়ে ঘর উঠে গিয়ে জলধরবাবুর আরেকটি পাকা বাড়ি তৈরী হবে! তার চেয়ে এই কি ভালো নয়—সহরের বাজারে হাজার কয়েক আনারস আসবে, চার-ছ পয়সায় সবাই এক-আধটা আনারস কিনে খেতে পারবে!"

বুদ্ধিমান জলধরবাবু বোকা বনে গেলেন বলেই যে পানু খুসী হয়ে উঠেছিল তা নয়, তাঁর মুরুব্বিআনাটাকেই যেন পানু সহ্য করতে পারতনা। পরেও দীপায়ন আমাকে বলেছে অনেকদিন, "জানিস্ অনি, নষ্ট লোক ছাড়া মুরুব্বি-আনার মতলব কেউ করতে পারেনা।" বলেই সে তার ন'দাদুর কথা বলতে সুরু করত—নিজেকে নাকি তিনি কোনোদিন একজন উল্লেখযোগ্য মানুষ বলে মনে করতেন না, কলকাতার বোর্ডিং-এ বসেও দীপায়ন আমাকে সে-কথা বহুবার শুনিয়েছে। কিন্তু তখন ন'দাদুকে ঠিক আর মানুষের চেহারায় ধরা যেতনা—মনে হ'ত আদর্শের খানিকটা হাল্কা মেঘই যেন মনের দিগন্তে কোথায় উঠে আসছে। তাঁকে মানুষ হিসেবে পাওয়া যেত পানুর ইস্কুলের দিনের কথাবার্ত্তায়—আমার চোখের উপর যেন একটি মুখ দাড়ি দুলিয়ে হেসে উঠত।

"তোমার এতো বড়-বড় দাড়ি কেন ন'দাদু?" পানু নাকি জিজ্ঞেস করত।

"দাড়ি! তোমার বাবারও ছিল দাদু—নব্যবাবুদের মতো—ফ্রেঞ্চকাট্।"

"বাবার ত নেই—তোমার আছে কেন?"

"তান্ত্রিকের গোষ্ঠী ত আমরা! দেখাতে হয় যে!"

"তান্ত্রিক? সে আবার কি!"

ন'দাদু বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা বই নিয়ে এসে কাপালিকের কথাগুলো পড়তে সুরু করতেন।

''কিন্তু তোমার কপালকুণ্ডলা কই ?'' সাংঘাতিক প্রশ্ন করে বসত পানু।

''আছে—ছিল—ছিল—আমারও কপালকুণ্ডলা!'' মাথা নাড়তে থাকতেন ন'দাদু।

''হেঁ ছিলনা—''

''ছিল।'

''কই তবে ?''

''সে আর নবকুমারকে ছেড়ে আসবেনা—দামোদরের কপালকুণ্ডলা হয়ে গেছে—'' তুল্‌কি তালে হেসে উঠ্‌তেন তিনি।

পানুও হাসত—ন'দাদু হাসছেন বলেই হাসত কিন্তু বুঝতে পারতনা কিছু। তবে কপালকুণ্ডলার আসল নামটা আদায় হ'ত একসময়। পানু জানতে পারত ওরই মা, ন'দাদুর মিনু, মৃণালিনী, তাঁর কপালকুণ্ডলা।

''ন' কাকার কথার ছিরি ওম্নি—'' শুনে মা বলতেন। ''বুড়ো হয়ে গেলেন, কোথায় গীতা-মহাভারত পড়বেন—'' আরো বলতেন মা: ''না, বসে-বসে নাটক-নভেল পড়া!''

কলেজ-পড়া দীপায়ন বলত, ''বঙ্কিমচন্দ্র আমি বেশি পড়িনি, তাঁর সব বই আমার ন'দাদুর মুখে শোনা!''

আমরা যখন দল বেঁধে দীঘির পাড়ে বেড়াতে যেতাম—উঁচু একটা ঢিবির উপর আড্ডা জমে উঠ্‌ত আমাদের—পানু যে চমৎকার গল্পগুলো বলত তখন, তা সবই বঙ্কিমচন্দ্রের। ভাবতাম, আমাদের কোনো বই-এ ত নেই এমন সুন্দর রূপকথা—কোথায় আছে এগুলো ? কবে পড়তে পাব, পড়ে বুঝতে পারব কবে সেসব বই।

দেবুদা নাকি জিজ্ঞেস করেছিলেন একদিন: ''ন'দিদিমা মারা গেছেন, মা ?''

''ক'জনই ত ন'কাকিমা ছিলেন আমাদের—'' মা হাসিটাকে চেপে ধরেছিলেন ঠোঁটে: ''বয়েসের কালে দেখতে সুপুরুষ ছিলেন ন'কাকা—গাঁয়ে কেন, সহরেও ওঁর মতো সুন্দর বড় কেউ ছিলেন না!''

একেকদিন ন'দাদু ছড়া কাটতেন:

"আমি যে হই সে হই আমি যে হই সে হই
জিনিয়াছি পণে মালা ছাড়িবার নই··" কথাগুলো পান্নু মামাবাড়ি থেকে একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে মনে তুলে নিয়ে এসেছিল, যে-কোনো কথার পিঠে কয়েকদিন নাগাড়ে ও-ছড়াই কাটত। কথাগুলো যে কোনো স্বয়ম্বর সভার নায়কের উক্তি তা অনেকদিন পর বুঝতে পেরে ন'দাদুকে সেকালের ডন জুয়ান বলেই মনে হয়েছিল আমার। কিন্তু তখন মনে হত, দাদু বলতে হয়ত ন'দাদুর মতো মানুষকেই বোঝায়— ছড়া কাটছেন, দেদার গল্প বলছেন, দাড়ি দুলিয়ে হেসে উঠ্‌ছেন---ফূর্তির অভাব নেই কোনোসময়। ন'দাদুর পক্ষ নিয়ে পান্নু মার সঙ্গে ঝগড়া করত·· কেন মিছিমিছি মা ওঁকে বাঁকা-বাঁকা কথা বলেন, ভালোমানুষ বলেই ত উনি হেসে হজম করে নেন কথাগুলো —নইলে। "বাবাকে ত দেখিসনি, ভালোমানুষ দেখবি কোত্থেকে—" মা পান্নুকে জব্দ করে দিতেন। কিন্তু পান্নু অবাক হত, নিজে থেকে যেদিন মা ন'দাদুর কথা বলতে সুরু করতেন, সেদিন যেন তাঁর গলার স্বরই আরেক রকম -কেমন যেন ভিজে-ভিজে আর হাওয়ায় ভরা---যেন হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে কথাগুলো, ধরা যাচ্ছেনা আর তাই স্পষ্ট শোনা যাচ্ছেনা যা তিনি বলছেন।

"ন' কাকা কোনোদিন আমাদের ভাবতে দেননি যে আমাদের বাবা নেই---" বলতেন মা: "বিদেশে চাকরি-বাকরি করেই কাটিয়েছেন জীবন—আমাদের সঙ্গে কী-ই বা ওঁর পরিচয় ছিল—কিন্তু বাবা মারা যেতে সেই যে দেশে ফিরে এলেন, একদিনের জন্যও আর বাড়ি-ছাড়া হননি! ছেলেপিলে নেই নিজের—তবু কী যে ভালোবাসতেন আমাদের! এখনও তা-ই। কাকিমার মেজাজ ভালো ছিলনা, একেকসময় ফেটে পড়তেন তিনি ন'কাকার উপর কিন্তু ন'কাকার মুখে এম্নি হাসি! বলতেন, 'আমার উপর তোদের ন'কাকির রাগ কেন জানিস্‌, আমাকে সবাই পছন্দ করে, ওটা ওঁর সয়না!' কাকিমার জীবনটা দুঃখেই কেটেছে!"

"ন'দিদিমাও দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন, না মা, ন'দাদুর মতো?" পান্নুর প্রশ্ন।

"কিসে আর কিসে! কিন্তু তা বলে ন'কাকা অশ্রদ্ধা করতেন না কাকিমাকে!"

"তাহলে দুঃখ হত কেন তাঁর ?" দেবুদা জেরা ধরতেন।

"নিজে দেখতে ভালোনা—ন'কাকা দেখতে ভালো— তাই।"

"তাহলে রাগারাগি করতেন কেন ন'দাদুর সঙ্গে—"

"তা ওঁর খুসী—তোর না জানলেও চলবে—" মা হাসতে-হাসতে ধমক দিতেন দেবুদাকে।

আমাদের প্রমোশনের পর বড়দিনের ছুটির মুখে ন'দাদু না কি এসেছিলেন। আমি একমাস ছিলামনা—কিন্তু ফোর্থ ক্লাশের গোড়ার দিকে পান্নুকে নিয়ে স্কুলে যে একটু হৈ-চৈ পড়েছিল সে-কাহিনী বলতে গিয়ে ও ন'দাদুকেই আমার চোখের উপর তুলে ধরল।

স্বদেশীতে তখন ভাটা পড়ে গেছে—তাই হয়ত কলকাতা থেকে এক নাটকের দল এসে হাজির হ'ল সহরে—আরো দু'একবার এসেছেন ওঁরা কিন্তু এবার এসে তোপের মুখে পড়লেন। ওঁদের উপলক্ষ করে ভাটা-পড়া স্বদেশী ফুলে-ফুঁসে-গর্জ্জে উঠল। কি সর্ব্বনাশ, মাতৃজাতির নাচ! গেটে পিকেট বসাও, পিকেটিং করো! ভালান্টিয়াররা জোড়হাতে দর্শক ফিরিয়ে দিতে লাগলেন। কিন্তু ন'দাদু বললেন, "সেই কবে দেখেছি কলকাতায় থিয়েটার—অমর দত্তের অভিনয়,—খাসা গোবিন্দলাল করতেন। যেম্নি চেহারা, তেম্নি গলা! আর কুসুমকুমারী রোহিণী—চমৎকার। এখন ওটা কেমন, দেখে যাই কি বলিস মিণু ?"

"তোমায় ঢুকতে দেবে ভলান্টিয়াররা ?"

"আমি বুড়োমানুষ আর পান্নু ছেলেমানুষ—আমরা দেখলে কি ক্ষতি ?"

পিকেটিং এড়িয়ে 'উর্ব্বশী'-পালা দেখে এলো পান্নু ন'দাদুর সঙ্গে। অমর দত্তের মতো কেউ নেই—দাদু বল্‌ছিলেন। কিন্তু পান্নুর নাকি মনে হচ্ছিল, ও অপ্সরার রাজ্যে বসে আছে—এমন সুন্দর মেয়ে উর্ব্বশী এমন হয়, রাজা পুরূরবাকে এতো ব্যথা দেয়, থম্‌থম্ করে উঠেছিল পান্নুর মন! দীপায়ন পরে বল্‌ত, "সে-সময়েই পান্নুর মনে পুরুষের মন ব্যথা পেতে সুরু করেছে!"

পান্নু যা-ই ভাবুক আর না-ভাবুক ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে মাতৃজাতির নাচ—ওখানে মেয়েরা মেয়ের ভূমিকায় নেমেছে, সহরের ড্র্যামাটিক পার্টির নাটকে যেমন পুরুষরা মেয়ের ভূমিকা নেয়, ওখানে তা নয়! ভলান্টিয়ারদের মধ্যে

পান্নুর স্কুলের ছেলেরাও ছিল। কাজেই পরদিন স্কুলে হেডমাষ্টারকে সভাপতি করে টিফিনের সময় বিচার-সভা বসল। ফোর্থ ক্লাশের ফার্ষ্ট বয় দীপায়ন চৌধুরী এমন জঘন্য কাজ করলে আর-আর ছেলেরা কি আদর্শ পাবে—হেডমাষ্টারমশাই সরোষে জিজ্ঞেস করলেন পান্নুকে। পান্নু দ্বিরুক্তি না করে ক্ষমা চাইল।

ব্যাপারটা ন'দাদু শুনতে পেয়ে হাসির হিক্কা তুললেন, "কিরে মিনু—ছেলেকে তোর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পাঠিয়েছিস না কি—সহরে আর ইস্কুল ছিল না?"

"গিয়েছিলে ত তোমাদের জামাইকে নিয়ে গেলেই পারতে—পান্নুকে কেন?" মা চোখে হাসি ফুটিয়ে তুললেন।

"এসে অব্দি দেখছি ব্যাটা মুসাবিদায় ডুবে আছে—ওর পালিশটাই যেতে বসেছে টাকার ধাঁধাঁয়।"

"টাকা ছাড়া আবার পালিশ পড়ে না কি কারো?"

"খানিকটা টাকা—" ন'দাদু হাতের আঙুলগুলোতে একটা গোলাকার ভঙ্গী তৈরী করলেন, "তার বেশিতে ওটা রুখে দাঁড়ায়—পালিশে মর্চে ধরায়।"

বলা যায়না, ওটা-ও ন'দাদুরই প্রভাব কি না—তখন যে মাঝে-মাঝে আমরা বাড়ি থেকে পালাবার মতলব করতাম। প্রমোশন না পেয়ে ফণী, মতি, কিরণ আর ভূপেশ অবশ্য অতি-স্থূলভাবেই উদাহরণটি আমাদের দেখিয়ে দিয়েছিল, তবু মনে হত ন'দাদু নিশ্চয়ই ছেলেবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন। খবরটা জানবার জন্যে পান্নু ওর মাকে জিজ্ঞেস করেছিল—সত্য-মিথ্যা কিছুই জানা যায়নি, কাজেই আমাদের অনুমানকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেবারও কোনো কারণ ছিলনা। আমাদের অনেক অনুমান ত এভাবেই সত্য!

ফণী-ওরা রেঙ্গুনে যাবে এবং পায়ে হেঁটে—যুক্তি এঁটেছিল। সহরের কেউ-কেউ তখন শরৎবাবুর শ্রীকান্ত পড়তেন—ওখান থেকেই ছুটে-ছিটকে প্রেরণাটা ওদের কাছে এসে থাকবে। কিন্তু আট মাইল পথ যেতে না যেতেই খবর পেয়ে কিরণের বাবা নায়েবমশাই দলশুদ্ধ ওদের পাকড়াও করে নিয়ে এলেন। সোজা ইস্কুলে এনে হাজির করলেন সবাইকে! পরিব্রাজকের দলটিকে দেখে বেশ ভালই লেগেছিল আমাদের। অপরাধীকে দেখে যে করুণা হয় তা হয়ত ঠিক এম্নি ভালো লাগে—তাই অপরাধ আমাদের হাতছানি দিতে থাকে।

পালানো সম্পর্কে আমার আর পান্নুর যুক্তিতর্কের অন্ত ছিলনা আর তাই শেষ পর্য্যন্ত পালানো হ'লনা। যা হ'ল ওটাকে বেড়ানো বলাই ভালো।

সহরের দীঘির ধারে, নদীর পাড়ে, মাঠের ঘাসে ঘোরাঘুরি না করে সহরের বাইরে একটু বেড়িয়ে আসা। ফিরে আসা একটু দেরি করে যাতে আমাদের অনুপস্থিতিটা বাড়ির ঘড়ির কাঁটায় ধরা পড়ে আর আমাদের জন্যে বাড়িতে দুশ্চিন্তা সুরু হয়ে যায়।

অনেক ভেবেচিন্তে পানু বলেছিল, "অশোকতলা যাবি ?—আলিদের বাড়ি ?"

"আলি ? সে আবার কে ?"

"সৈয়দ আলি। আমাদের সঙ্গে পড়ত—ফিফথ ক্লাশে উঠেই এলোনা আর স্কুলে ! ভালো ছেলে ছিল—অঙ্কে খুব ভালো।"

"অশোকতলা ? সে কোথায় ?"

"আড়াই মাইল হবে—আর সেখান থেকে পাহাড় চার মাইল !"

তার মানে পাহাড়েই আমরা বেড়াতে যাব—আলি একটা ষ্টেশন মাত্র। শনিবার—স্কুলে বই-খাতা কিছুই নিয়ে যাইনি—স্কুল-ছুটির পর সটান পারিব্রাজ্য।

অশোকতলা ত বল্‌লে পানু, কিন্তু কোথায় যে আমাদের সেই শিশুতীর্থ আর কোথায় বা সতীর্থ আলির কুটির তা কে বল্‌বে ? কিন্তু মিছে ভাবনা।

"বলবে রাস্তার লোক—গাঁয়ের মানুষ !"

"আলিকে চেনে সবাই ?" রেল-লাইন পার হয়ে আমরা তখন কাঁচা সড়ক ধরেছি।

"কেন চিন্‌বে ? তবে, কেউ ত চেনে !"

তাহলে আর মুস্কিলটা কোথায় ? সেই 'কেউ' কে খুঁজে নিলেই হল। কাজেই পরিকল্পনাটার মানে এখন এই দাঁড়াল যে আলি বা পাহাড় কিছু না হলেও আমাদের চলবে—রাস্তার সাদা নরম ধুলো আর শীত-বিকেলের মিষ্টি রোদ ভুঞ্জন করে যেতে পারলেই যথেষ্ট।

কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই দেখা গেল তা নয়। পানু অশোকতলাকে ভুলে যায়নি। বললে, 'অশোকতলা যখন নাম—অশোক গাছ নিশ্চয়ই আছে।"

"অশোক গাছ ?"

"হেঁ, গাছ। চিনিস নে ? রামায়ণে পড়িসনি সীতাকে অশোক বনে রেখে দিয়েছিল ?"

"এখনও আছে সে-অশোক গাছ ?"

"তুই দেখিস্‌নি ? ক্বা ? কচি আমপাতার মতো তামাটে ওদেরও কচি-পাতাগুলো। কিন্তু লজ্জাবতীর মতো মুষড়ে থাকে—একটার গায়ে একটা।"

সড়ক ছেড়ে সোজা গাঁয়ে ঢুকবার জন্যে ক্ষেতের আল ধরেছিলাম আমরা—হঠাৎ পান্নু একটা সব্জীর ক্ষেতের পাশে বসে পড়ল। আমি ভয় পেয়ে থেমে গেলাম : "কি রে ?"

"তিল ফুল।" লম্বাটে সাদা কয়েকটা ফুল তুলে নিচ্ছিল পান্নু।

"যাঃ—" অবিশ্বাস নয়, নিজের উদ্বেগটাই উড়িয়ে দিলাম এক ঝলক সশব্দ হাওয়ায়।

"তিল ফুল"—ফুলগুলোতে আঙ্গুলের আদর বুলোতে-বুলোতে উঠে এলো পান্নু : "সত্যি নাকের মতো দেখতে—অর্জ্জুনের নাক এম্নি ছিল, জানিস অনি ?"

"এতো ছোট ?" মুচকি হাসলাম।

"তার মানে বুঝি তা-ই ? দেখতে এমন ছিল—সোজা।"

কথা না বলে হাঁটতে সুরু করলাম—ফাঁকা মাঠ ছেড়ে তাড়াতাড়ি গাঁয়ে পেঁ ছনো চাই—কে বলবে এ গাঁ-ই অশোকতলা কি না, না কি আরো কয়েক গাঁ ছাড়িয়ে! মাঠ, ক্ষেত, ফাঁকা জায়গা পেলে এবার হয়ত পান্নু প্রজাপতি ধরতে ছুটবে—রেল-লাইন পেরিয়েই যা ছেলেমানুষি সুরু হয়েছে ওর! কাঁচা সড়কে একসময় হাঁটু অবধি ডুবে গিয়েছিল ধূলোয়—ওর নাকি ভারি ভালো লাগছিল, এগোতে চায়না, ঠায় দাঁড়িয়ে রইল—ধূলোর মেঘ উড়িয়ে একটা গরুর গাড়ি আস্‌ছে, তাতেও হুঁশ নেই! ওর এ খেয়ালিপণায় আমি রাজি হব কেন ? কাজেই পা চালিয়ে দিলাম তাড়াতাড়ি।

কিন্তু তাড়াতাড়ি পা চালিয়েও অনেকক্ষণ চলতে হ'ল—কদ্দূর যে এলাম ঠিক নেই—গাঁয়ের গাছপালাগুলো পেছনে সরতে সুরু করল না কি ? রোদ পড়ে যাচ্ছে—পান্নুর হলদে র‍্যাপারটা আর ঝক্‌ঝক্ করছেনা।

তবে গাঁয়ে ঢুকবার মুখে সুখবর পাওয়া গেল যে এই আমাদের কামনার রাজ্য অশোকতলা। অশোক গাছের বাপ্পও নেই—মোটা-মোটা তেঁতুলগাছ তাল তাল অন্ধকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তারপরই নারকেল-সুপারি গাছের ঢলাঢলি।

"আছে অশোকগাছ—কোথাও না কোথাও আছে—" পান্নু তবু হাল ছাড়লনা।

"গাছ দিয়ে কি হবে? আলি কোথায়?"

"আলি বলত থলোথলো লাল ফুল ফুটে থাকে—অশোকগাছ না থাকলে বলত কি করে?"

অস্বস্তি লাগছিল আমার। গাছের জন্মে ক্ষেপে না উঠে মানুষটারই খোঁজ করা দরকার। এক ঘণ্টাও হবেনা পরিচিতের এলাকা ছেড়ে এসেছি—তবু মনে হচ্ছিল যেন কতোদিন ধরে কতো দূরেই না এসে অজানা-অচেনা পথে একা-একা হাঁটতে সুরু করেছি। আলিকে পেলে যেন তবু কিছু পাওয়া যায়। পান্নুর ছেলেমানুষির সঙ্গে বনিবনাও হচ্ছিলনা আমার মতো চিন্তাশীলের।

একটি রাখালছেলে গাইবাছুর নিয়ে ঝোপ-ঢাকা সরু ফাঁড়ি পথ থেকে বেরিয়ে আসছিল--নিরুপায় হয়ে ওকেই জিজ্ঞেস করলাম, "আলিদের বাড়ী কোনটা বলতে পারো—সৈয়দ আলি?"

তাকিয়ে আমাদের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ছেলেটি বললে, "কোন্ আলি? ইস্কুলে যে পড়ত?"

গাঁয়ে যে অনেক রকম আলি আছে তা হয়ত পান্নু জানত, তাই ও এগিয়ে এসে বললে, "হাঁ—সে-ই!"

"সামনে যাও—টিনের ঘর আছে একটা -- আতাগাছ আছে—ওটাই।"

"সামনে গিয়ে ঝোপ-ঝাড়ের রাজ্যে একটু ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেল—সাদা মাটির ফর্সা একটু উঠোন আর তার পেছনে মাটির ঘর, টিনের ছাউনি। কিন্তু জনমানব নেই। মাদারের বেড়ায় খানিকটা জমি – মূলোর পাতায়-ফুলে জমাট, দুটো লাউ-মাচা লতায়-পাতায় উছলে উঠেছে! গাছ-গাছড়াই সব। খানিকক্ষণ পরে যাকে পাওয়া গেল পাছাপেড়ে শাড়ির ছোট্ট একটু আঁচলে কপাল পর্য্যন্ত তার ঘোমটা ঢাকা—নাকের বেসরটি চিকচিক করছে। বাঁকা কাঁখে কলসী নিয়ে আতাগাছের ধার ঘেঁষে বাড়ি ঢুকছিল বৌটি। তাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করবার সময় পাওয়া গেলনা—আমাদের দিকে এক নজর তাকিয়েই যেন আরো দ্রুত পা চালিয়ে দিল সে।

"কে—আলির মা?" জিজ্ঞেস করলাম পান্নুকে।

কার কথা কে শোনে ? পান্নু বলছিল, "কি অদ্ভুত ডাকছে পাখাটা—গুঁড়ো-গুঁড়ো কান্নার মতো শোনায় ! পাখীটার নাম জানিস অনি ?"

"কি আর হবে। পান্নু।" সত্যি বলতে, চটে গিয়েছিলাম আমি।

"তোর ভাল লাগছেনা শুনতে ?" পান্নু অবশ্য হাসির ছায়া ফুটিয়ে তুলেছিল মুখে।

[এ-ছায়াই আর একদিন দীপায়নের মুখে দেখতে পেয়েছি যখন ও বলছিল, কান্নার সুরই বাংলাদেশের অন্তরঙ্গ ধ্বনি। শুধু বাংলা-ই বা কেন, প্রকৃতি যেখানে বন্ধ্যা নয়, সেখানেই এ-সুর শুনতে পাবে। জন্মটাই একটা কান্না—সব ধ্বনি কান্না ! গাছের ধ্বনি, জলের ধ্বনি, পশুপাখীর ডাক, মানুষের কথা—সব—সবই কান্নার সুর। ধ্বনি উঁচুতে চড়িয়ে আমরা কান্নাকে চাপতে চাই, চাই অপ্রাকৃত হতে, কিন্তু সেই উঁচু সুরেও কান্নারই সুর থেকে যায় ভেতরে-ভেতরে। সিংহের গর্জ্জন শুনেছ ? ওখানে ধ্বনির আয়তন বেশি কিন্তু ধ্বনির ভঙ্গিটি কান্নার ! কবি কীট্‌স্ এ পরম সত্য কথাটিই বলতে চেয়েছিলেন। আকাশ ধ্বনি তৈরী করে বলেই তার নাম দিয়েছিলাম আমরা ক্রন্দসী।]

এক মিনিট পরই পান্নুর প্রকৃতি-ভুবনে ছেদ পড়ল। আতা গাছের পেছনে উঁকি দিল আলির মুখ। উঠি ত পড়ি করে ছুটে আস্‌ছে আলি।

"দীপেন ! আমি ভেবেছি, তুই।"—'দীপায়ন' নামটা পুরোপুরি মুখে আসেনা আলির, বুঝতে পারলাম। মিশ্‌মিশে কালো ছেলেটি—বড়ো-বড়ো চমৎকার চোখ—পরনে একটা ময়লা লুঙি।

"তোর মা বুঝি বললেন, আমরা এসেছি—?"

"আম্মা বললেন, দুটো বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে—তক্ষুণি ভেবেছি একজন তুই—একে কিন্তু আমি চিনিনে—"

"নুতন ভর্ত্তি হয়েছে আমাদের সঙ্গে—"

পান্নুর কাঁধে হাত রেখেছে আলি অথচ আমি তফাতে দাঁড়িয়ে আছি—কেমন যেন একটু দুঃখ হচ্ছিল আমার। কিন্তু দুঃখটা মুহূর্ত্তের। ঘরের দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে আমরা দুজন যখন নুন দিয়ে কুল খেতে সুরু করলাম, আর আমাদের মাঝখানে বসে আলি অবলীলায় গল্প জুড়ে দিলে—পাহাড়ের গল্প, বাঘডাঁশের গল্প, কলাগাছ দিয়ে সজারু ধরার গল্প, বড়শীতে ব্যাং গেঁথে মাছ

ধরতে গিয়ে সাপ ধরার গল্প—তখন আমি আর পান্নু আলির নজরে যেন এক হয়ে গেছি।

কিন্তু আমাদের মৌলিক প্রশ্নে আলি প্রথমটায় চুপ করে গিয়েছিল। পড়া যে সে কেন ছেড়ে দিলে এ-প্রশ্নে আলির ঠোঁটের আশেপাশে কয়েকটা রেখা ফুটে উঠ্‌ল শুধু। তার নামই হয়ত ব্যথা। পাহাড়ে একটা শন-বন ইজারা নেওয়া আছে ওদের—অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলতে সুরু করেছিল আলি—আব্বা পাহাড়ে ওঠা-নামা করতে পারেন না হামেসা, আলিকেই যেতে হয়। তাছাড়া আব্বা বলছিলেন, সহরে গেলে সে নাকি খেলাফতী হয়ে যাবে; দারোগা-চৌকিদারের জুলুম পড়বে তাদের উপর। কে এই ফ্যাসাদে পড়তে যায়? বিষণ্ন হয়ে উঠ্‌ছিল আলি—ওর কালো রঙে বিষণ্নতাই মানায়, হাসি-খুসী নয়। আমার মনে হয় গাঁয়ের সব কিছুই যেন ছায়া-মাখা, একটু বেশি কালো—মনে পড়ে, সেদিন আলিদের উঠোনে যে বাঁশঝোপের ছায়াটা দেখেছিলাম তা যেন গাছের ছায়ার চাইতে ঢের বেশি গাঢ়!

"তোকে নিয়ে পাহাড়ে যাব বলেই আমরা এসেছি, আলি—" খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে পান্নু কুলের টকে জিভে টাস্‌-টাস্‌ আওয়াজ তুলে বললে।

"পাহাড়ে?—বেলা পড়ে গেছে—এখন আর যাওয়া যায়না।" অভিজ্ঞ লোকের মতো ঘাড় নাড়ল আলি।

"কেন, কি হবে?"

"সন্ধ্যা হয়ে যাবে—বালির খাদে কাল আমি বড়-বড় থাবার দাগ দেখেছি—ও বাঘডাশ নয়।"

"বাঘ?"

"শীতে বাঘ নেমে আসে ত!"

কাজেই পাহাড়ের প্রস্তাবটা মুলতুবি রাখতে হল—আর তাই আরো খানিকক্ষণ বসে গল্প করা ছাড়া আর কিছু কাজই রইলনা আমাদের। দু'বার উঠে অন্দরে গিয়ে ঢুকল আলি, ভাবলাম তার আব্বা কি আম্মা আলাপ করতে আসবেন, কিন্তু কেউ তাঁরা এলেন না। শেষবারে আলি দু'হাতে দুটো পাকা পেঁপে নিয়ে হাজির হল।

"আম্মা তোদের দিতে বললেন দীপেন—আমাদের গাছের!" আমাদের

কোলের উপর পেঁপে দু'টো গড়িয়ে দিয়ে আলি বললে : "মূলো নিবি—এবার এ-মূলো আমি করেছি !"

"পেঁপে আমি নেবনা—শুধু একটা মূলো !" পানু হাসতে লাগল।

আর তার ফলে পেঁপে আর মূলো দু'-ই নিয়ে ফিরতে হ'ল আমাদের। রেল-লাইন অবধি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এলো আলি তারপর আর এগোলনা। পানু ডাকল তাকে : আরেকটু আয় না- "

"আব্বা সহরে যেতে মানা করেছেন।" আলি হাসতে লাগল।

আলির সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও হয়ত হেসে উঠেছিলাম কিন্তু বাকি পথটুকুতে যেন আর আমাদের কথা জমতে চাইলনা। বাড়ির ভাবনা হয়ত ছিল কিন্তু দু'জনেই মনে-মনে আলির সঙ্গে কথা বলতে সুরু করেছিলাম। পানু এক-সময় হঠাৎ বলে উঠল, "জানিস অনি, এইট্‌থ ক্লাশে হস্তশিল্পের পিরিয়ডে আমরা মাটি দিয়ে ফল-মূল গড়তাম—আমি ফার্ষ্ট হতাম—আলি কিচ্ছু গড়তে পারতনা !"

তিন

অসঙ্কোচে স্বীকার করছি ক্লাশের সবাই আমরা পানুকে নায়ক বলে মেনে নিয়েছিলাম। নেতা নয়, নায়ক। নেতা হবার কোনো রুচিই ছিলনা ওর। কেউ ওর কথা শুনে চলুক এমন ইচ্ছা পানুর দেখিনি কোনোদিন, বরং কথায় কেউ সায় না দিলেই যেন খুসী হত ও সবচেয়ে বেশী। বলা যায়, বিরোধীদলকে হজম করবার একটা নেশাই ওকে পেয়ে বসেছিল কিন্তু তা হলেও তা নেশা-ই, উপরে উঠবার সিঁড়ি নয়।

মাষ্টারদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ছোঁওয়া থেকে মনকে যখনই বাঁচিয়ে আনতে পারতাম তখনই পানুর প্রসঙ্গ আমাদের মন অধিকার করে বসত—এমন কি, বিরোধীদলেরও। ওর টেরী-কাটা বা কাপড়ের পাড়টাও যেন ছিল আলোচনার মস্ত বিষয়। এবং দু'চার দিন পরেই তার অনুকরণ। ওকে অনুকরণ না করে আমাদের উপায় ছিলনা। আর সে অনুকরণ ছিল এম্নি হাড়ে-হাড়ে মেশা যে আমাদের খেয়ালই থাকতনা, আমরা যে পানুকে অনুকরণ করছি। ক্লাশ-মাষ্টার রজনীবাবু যদি একদিন আমাদের ও-ব্যাপারটায় সচেতন করে না দিতেন তাহলে হয়ত আজ এ-কথাগুলোও এখানে বলা হতনা।

''দীপায়নের মতো ফিন্‌ফিনে জামা পরা চাই—" প্রতুলকে হেঁকে উঠেছিলেন রজনীবাবু: "কিন্তু পড়ার বেলায় লবডঙ্কা! বলত—কগ্‌নেট্‌ অব্‌জেক্ট কাকে বলে?"

প্রতুল চোখ পিট-পিট করে ঘাড় চুলকাতে সুরু করেছিল।

"জামার সাজে কুটুম পাতানো যায়না!" গুরুবাক্য নিঃসৃত হল।

পানু লাল হয়ে উঠছিল—পেন্সিল দিয়ে ডেস্কের উপর একটা সরু রেখাকে মোটা করে তুলছিল ও ক্রমশ।

পিরিয়ডের শেষে ঠোঁট সরু করে পানু বললে: "ফিন্‌ফিনে জামা দেখলে ওঁর চোখ টাটায়—জানিস। পড়া ঠেকিয়ে আমায় গাল দিতে পারেন না বলেই ও-রকম বলেন!"

"চরকা কাটিস, কিন্তু তুই খদ্দর পরিসনে কেন ?" পানুকে টীচারি ক্যায়দায় ফেলতে চেষ্টা করল হিমাংশু।

"খদ্দরে গায়ের চাদর হয়—জামার কাপড় হয় না কি ?"

আমাদের ইস্কুল যে খদ্দরে বিশেষ উৎসাহী ছিল তা নয়, কর্ত্তৃপক্ষ উৎসাহী ছিলেন শুধু সাদাসিধে জীবন-যাপনে। রজনীবাবু হাতাকাটা পাঞ্জাবী পরতেন—অনেক মাষ্টারই তেম্নি। কেউ-কেউ প্লেন লিভিং-এর পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্যে উদোম গায়ে একটা মোটা চাদর জড়িয়ে আসতেন মাঝে-মাঝে। হেডমাষ্টার মশাই-এর ছিল লংক্লথের গলাবন্ধ কোট, বিয়াল্লিশ ইঞ্চি ধুতি আর ব্রাউন-ক্রোমের চটি। শিক্ষকের এ-প্রচণ্ড সাদাসিধে উদাহরণে ছাত্রদের যে কি দুরবস্থা হবে তা চোখে না দেখলেও নিশ্চয়ই আপনারা অনুমান করতে পারছেন। বোধহয় সারা স্কুলে একমাত্র পানুই পাম্প-শু্য পায়ে দিত। সংখ্যাগরিষ্ঠেরই ছিল পা খালি, তা-ও খুব দৃষ্টিকটু নয়, তবে একান্তই হৃদয়বিদারক ছিল ছেলেদের জামা কাপড়ের ধরণ। যে-জামাগুলো গৃহের হস্তশিল্প না হয়ে দরজির মেসিন-শিল্প হবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করত, তারা ইহজীবনে ধোপার হাতের বা ইস্ত্রির স্পর্শ পায়নি—হাতে-শেলাই জামাগুলোর দুর্দ্দশার কাহিনী ত অবর্ণনীয়। পানুর ছাড়া আর কারো জামায় বোতাম দেখেছি বলে মনে পড়েনা। কাপড়গুলোর ছিল যেন মিউজিয়মের কাজ—সংরক্ষণ। রাস্তার ধুলো, মাঠের কাদা, পেয়ারা-লিচুর রস, আঙুল-কাটা রক্ত একের পর এক জড়ো হয়ে তাদেয় বিবর্ণতার রঙ ফলাত। প্লেন-লিভিং-এর পরিহাস নিয়ে মাষ্টারমশাইরা পরম শান্তিতে বসবাস করছিলেন—আদর্শমাত্রেরই ভগ্নস্তূপ নিয়ে মানুষ যা করে থাকে—কাজেই পানুর ব্যতিক্রম তাঁদের মনে একটু অস্বস্তি এনেছিল বই কি ! আবার এ অস্বস্তি, বুদ্ধির অভাবের দরুণ, কেউ-কেউ সরাসরি ব্যক্ত করে ফেলতেন। ভূগোলের মাষ্টার সীতানাথবাবু পানুর নাম দিয়েছিল বাবুছেলে। প্রথম-প্রথম কয়েকদিন নামটির প্রতি খুবই উৎসাহী হয়ে উঠেছিল ক্লাশের ছেলেরা—তা ততো গ্রাহ্য করেনি পানু তবে ওদের উৎসাহেই ও কালো হয়ে যেত—চুপ করে থাকত—অন্যমনস্কের মতো। হয়ত এ ওষুধে নামটি আর কায়েম হতে পারলনা। যা কায়েম হতে চলল তা পানুরই ওই বাবুগিরি। হেডমাষ্টারমশাই না কি শেষটার আফশোষ করতেন, "থার্ড ক্লাশের ছেলেরা অন্যরকম, একটু বাবু !"

তার মানে যে গোটা ক্লাশটাই বাবু, তা নয়—বাবু ছিল বড়ো রকমের একটি দল এবং সে-দলে পান্নুর বন্ধু ও বিরোধী সবাই হাত মিলিয়েছিল। কিন্তু জামা-কাপড়ের ফ্রণ্টে নিজের সাফাল্যকে পান্নু মনে মনে আমল দিত কি না সন্দেহ। ওটা যে একটা ফ্রণ্ট তা-ই হয়ত ভাবতে পারতনা ও। টিফিনের সময় কমনরুমে বসে ও যাদের সঙ্গে আলাপ করত তারা ভালো ছাত্র এবং পোষাকপরিচ্ছদে গর্হিত। বি-সেকশনের ফাষ্ট বয় ভুপতি ছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পোষ্য, কাজেই ওর চুলে তেলের বাষ্পও ছিলনা কোনদিন, সোডায় সেদ্ধকরা জামা-কাপড়ে একটা ফিকে গৈরিক রঙ থাকত সব-সময় আর তাছাড়া চোখ-মুখ ঠোঁট সবই যেন তার একটু বেশী ধোওয়া ধোওয়া—একটু বেশি সাদা। ভাবতাম, ভুপতির সঙ্গে কি এতো কথা আছে পান্নুর—সারা স্কুলে যেন কথা বলবার আর কেউ নেই ভুপতি ছাড়া! আবার ক্লাশে ফিরে এসেই প্রতুল, মানিক, হিমাংশুদেরও সঙ্গে জমজমাট—ক্লাশের সেরা খারাপ ছেলে বলে যাদের বদনাম।

প্রতুলকে জিজ্ঞেস করত পান্নু: "আমি যদি একদিন পান খেয়ে ক্লাশে আসি, কেমন হয় রে তাহলে—পান আমি খাই—জানিস ত!"

"সবাই পান চিবুতে থাকলে বেশ!"

"স্যর দেখলে কি বলবেন বল্‌ত?"

"তোকে বলবেন না কিছু—আমাকে হয়ত জিজ্ঞেস করবেন, বল্‌ ফ্যাক্টেটিভ ভার্ব কি—বলতে পারব না—তাই বেঞ্চের উপর দাঁড়াতে হবে। দাঁড়িয়েই পান চিবুতে থাকব—মন্দ কি!"

পান্নু হাসতে-হাসতে জড়িয়ে ধরত প্রতুলকে। আর তক্ষুণি, লক্ষ্য করতাম, কেমন যেন শুকনো হয়ে উঠত মানিকের মুখ। প্রতুল খোলাখুলি বলে ফেলত, মানিকটা মেয়েদের মতো হিংসুটে! কিন্তু তাতেও মানিকের ঈর্ষা এক বিন্দু উবে যেতোনা। হয়ত দুদিন কথা বলতনা সে পান্নুর সঙ্গে—তৃতীয় দিনে পান্নু যখন বহু সাধ্যসাধনায় তাকে কথা বলাতে পারত, সঙ্গে সঙ্গে সে পান্নুকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিত যে সেদিন বিকেলবেলা শুধু তারই সঙ্গে পান্নুকে পদ্মদিঘীর পাড়ে বেড়াতে যেতে হবে। ভুপতিকে নিয়ে মাথাব্যথা ছিলনা মানিকের—প্রতুলকেই মনে করত সে সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাতে কেমন যেন মিষ্টি-মিষ্টি হাসত পান্নু—ওকেই হয়ত সৌভাগ্যের হাসি বলে।

"জানিস অনি—" মিষ্টি হাসিতেই সুরু করত পানু : "মানিকটা সত্যি মেয়েলি!"

মেয়েলি নামে যে কি বোঝাত আমি তা ঠিক ধরতে পারিনি কিন্তু পানু হয়ত কথাটার মানে নিভুলভাবেই জানত। কাজেই মানিকের প্রসঙ্গে আমি যখন প্রায় বোকার মতো চেহারা তৈরী করতে সুরু করলাম, পানু হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েও আমার বোধোদয়ের জন্যেই কথা বললে : "শেফালিটা-ও ঠিক এম্নি করত!"

শেফালি! নাম শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই মানিকের মুখটা একটি মেয়ের মুখ হয়ে দাঁড়াল আমার চোখের উপর। যেন সে মেয়েটিও স্কুলে যায়—আমরা যেমন স্কুলে যাই অবিকল তেম্নি নয়—দলবেঁধে, রাস্তার এক ধার ঘেঁষে, পরীর ঝাঁকের মতো চলতে থাকে—সোজা সামনের দিকে তাকানো, এপাশ-ওপাশ করেনা চোখ একটুও। মানিকই যদি কোনদিন মেয়ে হয়ে যায় সে কি আর একা-একা যাবে স্কুলে? ওম্নি ছোট-বড় ইস্কুলে-যাওয়া মেয়েদের একটি দলে ভিড়ে যাবে! ছেলে-মেয়ের পার্থক্য নিয়ে আমার এই গভীর গবেষণায় ব্যাঘাত জন্মাল পানু :

"শেফালিকে তুই দেখিস্‌নি অনি—আমাদের গাঁয়ের বাড়ীতে আসত ও!"

"এখন আর আসেনা?"

"বিয়ে হয়ে গেছে—কোথায় মানিকগঞ্জ, সেখানে চলে গেছে!"

"শেফালিও রাগ করত বুঝি তোর উপর মানিকের মতো?"

"যেদিন বাড়ি যেতাম সেদিন বিকেলেই ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করা চাই, নইলে আড়ি দিয়ে থাকত—কিছুতেই কথা বল্‌বেনা যেন আমার সঙ্গে!"

"তাহলে আবার চলে গেল কেন মানিকগঞ্জ?"

"বিয়ে হলে তাই যায়।"

কেমন যেন কাঁদ-কাঁদ একটা হাসি পানুর মুখে দেখতে পেয়েছিলাম সেদিন। কিন্তু আমার হাসতে ইচ্ছা করছিল, বিয়ে হলে যখন মেয়েরা চলে যায়, আর বিয়েও যখন হয় মেয়েদের তা নিয়ে কেউ আবার মন-খারাপ করে নাকি?

"শেফালিকে বুঝি তোর মনে পড়ে খুব?"

"এবার বাড়ি গিয়ে খুব মনে পড়ত—ভালো লাগতনা। ষ্টীমারের সিটি

শুনে রোজ সাঁকোর ধারে গিয়ে দাঁড়াতাম—মানিকগঞ্জ থেকে যদি এসে যায় একদিন ও।”

“এলোনা ?”

“না:—”

“চিঠি লিখেছিল ?”

“চিঠি ?” খানিকটা আলোর উপর যেন চোখ মেলে তাকাল পান্নু: “না ত। কিন্তু লিখতে শিখেছিল শেফালি। একবার আমার হাতে আমার নাম লিখে দিয়েছিল পাখনার কলম দিয়ে!”

নাম। পান্নুর চোখে কি দীপায়নকেই দেখতে পেয়েছিল শেফালি ? ওইটুকু মেয়ের চোখে কি এমন দীপযন্ত্রের তীব্র রশ্মি ছিল যাতে অনেক দূর ভবিষ্যৎ দেখা যায়!

১৯৪৪ ইং।

পান্নু জানতনা, সে একদিন দীপায়ন চৌধুরী হয়ে উঠবে। তবু কেউ জানত। পান্নুর ভেতরেই কেউ—কোনো কোষতন্তু, কোনো গ্রন্থিরস—যাকে আমরা নিয়তি বলি। তার ইতিহাস আছে, হয়ত জ্ঞানও আছে—সে জানে কোথায় তাকে যেতে হবে, কোন্ শিল্পে, কোন্ মূর্ত্তিতে, কোন্ কলেবরে। শুধু সে-ই জানে। একদিন তার নাম থাকে পান্নু, তারপরে আরেকদিন সে দীপায়ন চৌধুরী হয়। যা সে হবে তারই একটা আবছা ছবি তাড়া করে বেড়ায় যা সে আছে তার ধোঁয়াটে ছবিকে। কিন্তু কোনোদিন কি কোনো ছবি স্পষ্ট হয়ে স্থির হয়ে বলতে পারে—এই তুমি! শুধু কি ছবির ঠেলাঠেলি নয় ওখানে ? তোমার শিল্পশালার দেয়াল থেকে অনবরতই তুলে নিচ্ছ ছবি অন্য ছবি ঝোলাবে বলে। মেঘের ছবির মতো—রেখায়-রঙে হয়ত ছবি হতে চায় কিন্তু কোন্ ছবি, কি তার নাম ? মেঘের ছবি। তা-ই নাম—তা-ই তার পরিচয়। যাযাবর মানুষের যেমনি পরিচয়। অজস্র, অসংখ্য কতকগুলো ছবি দিয়ে যেমন দীপায়ন চৌধুরী মানুস! নইলে আর কিছু নেই! সত্যি বলতে এমন কিছু নেই আর, কোনো বস্তু, কোনো বর্ণ-ধ্বনি-গন্ধ-স্পর্শ, যার নাম হতে পারে মানুষ। কোনো ছবি নয়, ছবি হতে চাওয়া-ই সে। এই চাওয়া-ই তার নিয়তি।

একটি মানুষ আরেকটি মানুষকে কি চায় কোনোদিন ? পেতে চায় ? বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে, স্নায়ুর উত্তেজনা পেয়ে যেমন তার জীবন্ততার অনুভব, তেম্নি অনুভবে আর কাউকে কি সে পেতে পারে ? সে হাওয়া পায়, পায় উষ্ণতা আরেকটি মানুষকে পেয়ে, তার বেশী কিছু নয়। অথচ বলে, তোমাকে পাই—তোমাকে চাই। তোমাকে চাই—সত্যি কথা—তৃষ্ণা পেলে এক গ্লাস জল চাই যেম্নি আমার। কিন্তু 'তোমাকে পাই' বলে সে কি ভাবে ? এতো বড় মিথ্যা কথা যুগের পর যুগ মানুষের জীবনে অক্ষত, অম্লান হয়ে চলে আস্‌ছে কোন মন্ত্রবলে ? দু'জনই প্রতারক, তাই হয়ত এ-প্রতারণার মৃত্যু নেই। যে 'পাই' বলে সে-ও প্রতারক—যে 'নাও' বলে সে-ও। দেওয়া-নেওয়ার একটা ছবি শুধু হতে চায় মানুষ—ছবি হয়ে উঠ্‌তে পারে না।

যতো বেশি পাইনে আমরা, ততো বেশি ভাঙা-গড়া আমাদের। তাই আমরা মানুষ, শুধু জীব নই।

আর তাই হয়ত ব্যথা দরকার।

একটি ছেলে, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ব্যথা পেয়েছিল, ব্যথা পেয়ে আসছিল বলেই আজ গান্ধীজি ব্যথার অতীত।

ব্যথাও কি সহজে পাওয়া যায় ? ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায়না—যে-কেউ যে-কোনো-সময় ব্যথা পায়না। ব্যথা পেতে জানতে হয়। ব্যথার ধ্বনি শুনতে হলে মনের ধ্বনি—সুরসপ্তক—শ্রুতি—শুনতে হয়। শোনার ক্ষমতা পানুর কতোটুকুই বা ছিল ! আজ দীপায়ন শুনতে পাচ্ছে। সম্পূর্ণ ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি আজ :

"মা আসতে বারণ করেন—জানো পানুদা—লুকিয়ে আমি চলে এসেছি—" অপরাধের আভায় গালদু'টো চক চকচক করছিল শেফালির।

ছুটি ফুরোলেই অ্যানুএল পরীক্ষা—পড়ার ঘর তৈরী করে নিয়েছিল পানু বাড়ীর গুদোম-ঘরটা পরিষ্কার করে। দু'ঘণ্টার মতো একটা কাজ পেয়ে গণেশের আর ফূরতির সীমা ছিলনা—ছিপ, জাল, টোল-খাওয়া ঘটি-কলসী, কানাভাঙা পাথরের থালা-বাটি, বস্তার স্তূপ সরিয়ে যা বেরল' তা বেশ মজবুত একটা তক্তাপোষ—নৌকোর তক্তায় তৈরী। ওর উপর সতরঞ্চি বিছিয়ে চমৎকার পাঠ-পীঠ তৈরী হল। জানলাটা অপরাজিতা লতায় বোঁজা। হোক গে। আলো আসে ত তবু ডালা খুলে দিলে ! বই খাতার স্তূপ এলো—পানু জানত

আড়াল তৈরী হ'ল—বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী ঢাকবার আড়াল। প্রতুল যোগাড় করে দিয়েছিল বইটি। ন'দাদুর গল্পের খনি লুকিয়ে আছে যেখানে। এ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটির জন্যেই এ-আয়োজন—নিরিবিলি পড়ার ঘর। আকর্ষণের কাছে অ্যানুএল পরীক্ষার ভয় অতি তুচ্ছ ব্যাপার! আর অ্যানুএলের ভয়ইবা কি? পানু কি সারা বছর পড়েনি? ছুটিতেই যদি পড়তে হ'ল, তাহলে সে আর ভালো ছাত্র কেন? পানু সময় অপব্যয় না করে কপালকুণ্ডলা সুরু করে দিয়েছিল। ঠিক হয়ত বুঝতে পারছেনা, কিন্তু ছবি তৈরী হয়ে চলেছে চোখের উপর—চমৎকার ছবি। অনেক আগে মানুষগুলো এম্নি ছিল—এখন নেই। কবে, কোথায় ছিল এমন?

বইটা বন্ধ করে শেফালির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল পানু, মনে হ'ল বই থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে কে যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ ওর কথাগুলো শুনতে তেমন ভালো লাগছেনা—ঠিক-ঠিক বই-এর কথার মতো নয় বলেই যেন ভালো লাগছেনা। পাশে এসে বসল শেফালি—ঘাড় বাঁকিয়ে আবারও পানু ওর চোখে-চোখে তাকাল।

"চলে এলাম পানুদা—" খুসী-খুসী দেখাল শেফালিকে।

"কেন?" এবার পানু শেফালিকেই দেখতে পেল।

"তোমার কাছে চলে এলাম।"

"মা বারণ করেন, তবু কেন এলে?" এখন আবার নিজেকে দেখতে পেল পানু।

"সব সময় মা বলবেন তাঁর ফুল-দুর্ব্বো তুলে দিতে—চাল বেছে পিটুলি তৈরী করতে—মসলা পিসে দিতে—ফরমাসের আর অন্ত নেই!"

মার বিরুদ্ধে নালিশ। হয়ত খুসী হওয়া উচিত ছিল পানুর। খুসীও হল হয়ত। তবু মনে হল, শেফালিকে চলে যেতে বললেই যেন ও সত্যিকারেব খুসী হয়ে উঠ্‌তে পাববে।

"আর এসোনা—কোনদিন না!" কথাটা বলেই পানু দূরে সরে যেতে সুরু করল—এতো দূরে, যেখান থেকে শেফালিকে আর দেখা যায়না। মা বারণ করেন ওকে পানুর কাছে আসতে—তাহলে কেন আসে ও? ও কি জিজ্ঞেস করেছে, কেন বারণ কর, কি দোষ পানুদার? জিজ্ঞেস করেনি, পালিয়ে চলে আসে।

কানের পাশে ছোট-ছোট সোনালি চুলগুলো কাঁপছে—হাওয়ায় কাঁপছে, তা-ই ভাবছিল পান্নু। আজ দীপায়ন দেখতে পাচ্ছে, চুল নয়—শেফালি কাঁপছে। তার চোখের পাতা, হৃদ্‌পিণ্ডের পেশীগুলো থরথর করছে। পান্নু হাসছিল—শেফালি মুখ নীচু করে ছিল বলেই যেন হাসছিল, আর শেফালিকে আরো নুইয়ে দেবার জন্যেই বলেছিল : ''বারণ করবেই—তুমি কি করবে ?—আসবেনা।"

তবু আসত শেফালি। পান্নু গল্প বলতনা আর, তবু। এসে বসত, হাত বাড়িয়ে পান্নুর একটা আঙুল ছুঁয়ে ফেলত—ছুঁয়ে রাখত অনেকক্ষণ। পান্নুর কাপড়ের খুঁটটা হাতে তুলে নিয়ে আঙুল দিয়ে টেনে-টেনে পাড় দেখতে থাকত। পান্নু চুপচাপ—হয়ত ভাবত, পাওনা আদায় হচ্ছে। এ-পাওনা যেন এম্নি ছিল ওর, হাত থেকে কিছু কেড়ে নিয়ে তৈরী নয়! আর তাই পাওয়া বলেও হয়ত মনে হতনা কোনসময়।

কিন্তু একসময় পান্নু জানতে পেরেছিল, ও নিয়েছে—কোনদিন ও পেয়েছে কিছু যা আর পাবেনা। সেদিন শেফালি ছিলনা। কেন নেই শেফালি, এ-কথাটাই বারবার জিজ্ঞেস করেছে ও নিজেকে। আসতে বারণ করেছিল বলেই কি মানিকগঞ্জ চলে গেল শেফালি ? শাস্তি দিতে নয়, রাগ করে ?

তুমিও হয়ত ব্যথা পেয়েছিলে, পান্নু ! কিন্তু সে-ব্যথা তোমার নিজের ক্ষতের ব্যথা—পাওনা হারানোর ব্যথা। শেফালির ব্যথা পাওনি। সে-ব্যথা দীপায়নের, তোমার নয় !

বলতে পারো কি করতে তুমি শেফালিকে নিয়ে ? যে-পাওনাকে পাওনা বলেও মনে হতনা তা-ইত পেতে চাইতে। শেফালিকে চাইতেনা !

মানিকের পাড়ায় যে ছাত্রসমিতি ছিল তার নাম শুনে নাকি পান্নুর হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার যোগাড়, কাজেই মানিক আর সে সমিতির সভ্য হয়নি। 'জ্ঞান প্রদায়িনী সমিতি'—পরেও কোনোসময় নামটা মনে পড়লে জিভে একটা মজার স্বাদই যেন অনুভব করত পান্নু। ইস্কুলের ছেলেরা প্রায়ই তখন এম্নি জ্ঞানবিকাশিনী সমিতির সভ্য। ন্যাশন্যাল স্কুল ভস্মীভূত হয়ে তার প্রাণ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ছিল। স্বদেশী সমিতি—লাইব্রেরী আর জিমখানা। 'নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর' থেকে 'কানাইলাল' আর হাডুডু

থেকে বারবেল। খদ্দর ছিল চরকা ছিলনা—হিন্দি শেখার হুজুগ দমে গিয়ে আদি এবং অকৃত্রিম বাংলা-চর্চ্চাই পুর্ণোদ্যমে সুরু হ'ল আবার। কিন্তু গল্প উপন্যাস নয়, রবীন্দ্রনাথ 'ভারততীর্থের' দরুণ ঠাঁই পেলেন, শরৎচন্দ্র 'ইন্দ্রনাথে'র কৃপায়।

শোনা গেল জ্ঞানপ্রদায়িনীর দাদারা মানিকের ট্রাইবুন্যাল বসিয়ে বলেছেন, "যে পান খায়, উপন্যাস পড়ে—কে বল্‌বে আরো-কি-করে—তার সাকরেদ হতে চলেছো তুমি—কেমন?"

"পান্নুকে টেনে এনে লাভ কি? আমার ভালো লাগেনা, আমি মেম্বার হবনা!" এতো জোর যে মানিক কোথায় পেল বলা কঠিন।

"বেশ, ইচ্ছে হয় গোল্লায় যাও!"

গোল্লায়? মানিকের রিপোর্ট থেকে কথাটা কুড়িয়ে নিয়ে একটু বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল পান্নু। হয়ত ভেবেওছিল একবার মানিককে বুঝিয়ে-সুজিয়ে সমিতিতে ঠেলে দেওয়া যায় কি না। কিন্তু তারপরই ঠাট্টায় ধারাল হয়ে উঠ্‌ল ওর ঠোঁটের রেখাগুলো—দাঁড়াল ও টান-টান হয়ে: "আমরাত গোল্লায়ই যাব, ওঁরা কতো স্বর্গরাজ্যে যান দেখে নেব!"

তারপর ওঁদের স্বর্গরাজ্যের সন্ধান করাটাই যে পান্নুর একমাত্র কাজ হয়ে উঠেছিল তা আমরা জানতামনা। গ্যারিবল্ডি, সিনফিন, নির্ব্বাসিতের আত্মকথা, কারাকাহিনী, দ্বীপান্তরের কাহিনী—কতো যে বই-এর নাম বলত ও তখন শুনে কান ঝালাপালা হবার যোগাড়। স্কুল-লাইব্রেরী থেকে আর ভূপতির সংগ্রহ থেকে আনত এসব বই। কিন্তু দেবুদার বালিশের নীচেই যে একদিন রিভলবারের ছবি আঁকা 'কানাইলাল' বইটি পাওয়া যাবে তা হয়ত পান্নু স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

"সাংঘাতিক বই—" ভয়, আতঙ্ক আর উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়ছিল পান্নু: "পড়বি অনি? এনে দেবো। দাদার খেয়ালই নেই বালিশের নীচে থেকে যে সরে গেছে বইটা! হয়ত ভুলেই গেছেন!"

"দেবুদা এসব বই পড়েন?"

"দাদা সমিতিতেও যান!"

"তোকে যেতে বলেন না?"

"কই, না ত!"

"তুই জিজ্ঞেসও করিসনে ওঁকে সমিতির কথা?"

"করেছিলাম—বল্‌লেন নাটক হবে 'বঙ্গেবর্গী'—তারই রিহাস্থাল চল্‌ছে।"

কানাইলাল নাটকে পার্ট করতেন আর তাই পান্নু এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুল সে যে তা থেকেই দেবুদা নাটক করবার উস্কানি পেয়েছেন। নইলে হঠাৎ— দেবুদাকে নাটকের বাতিকে ধরবে কেন! ন'দাদু কতো সাধাসাধি করেছেন ওঁকে 'উর্ব্বশী' দেখতে যাবার জন্যে—কিছুতেই রাজি হলেন না। সহরের থিয়েট্রিক্যাল পার্টির নাটকে পান্নুকে নিয়ে দু'একবার গেছেন অবশ্য দেবুদা —কিন্তু এক অঙ্কের শেষেই হাই তুলে বলেছেন, "তোর ভালো লাগ্‌ছে?— দেখবি তুই সবটা? তাহলে দ্যাখ—আমি গিয়ে নকুলকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওর সঙ্গে বাড়ি যাবি।"

ফুটবলের মাঠে ছাড়া দেবুদাকে বাইরে কেউ দেখেনি - সভা-শোভাযাত্রায় না, সার্কাস-বায়স্কোপেত নয়ই। ফুটবলের মাঠেও ক্বচিৎ-কদাচিৎ। কলেজ-টীমে মাঝে মাঝে সেণ্টারহাফ্ খেলতেন। সেই দেবুদা কি না সমিতিতে মেতে উঠেছেন—আর শুধু তা-ই নয়, নাটকে লেগে গেছেন।

কিন্তু আমাদের কাছে মস্ত ব্যাপার ছিল পান্নুর স্বাতন্ত্র্য—তার তেজী চেহারাটা। ইস্তক দেবুদা সমিতিতে গেলেন, অথচ পান্নু গেলনা! সমিতি-গুলোর সর্ব্বাধিনায়ক বলে যদি কেউ থাকতেন, তিনি অনায়াসেই তখন আমাদের হেডমাষ্টারমহাশয়ের মতো বলতে পারতেন—"অমুক স্কুলের থার্ড ক্লাশের ছেলেরা অন্যরকম—চরিত্র ভালো নয়।" সত্যি বলতে, পান্নুই আমাদের সমিতি-বিমুখ করে তুলেছিল—আমরা, যারা ওর 'কাছের মানুষ' ছিলাম তারা কেউ কোনদিন কোনো সমিতির একটা ছেঁড়া পুঁথিও হাতে নিইনি। অবশ্য তার দরকারও বোধ করিনি কখনো। আমরা জানতাম সমিতির ছেলেরা যেসব বই-এর কথা বল্‌বে তার চেয়ে ঢের বেশি বই-এর খবর পান্নুর জানা আছে। আর পান্নুর জানা থাকা আর আমাদের জানা থাকা একই কথা। এক রকম ওর আশ্রিতই ছিলাম আমরা। পান্নুর দলে ভিড়ে গিয়ে তাই দুশ্চরিত্র নাম কিনতেও ইতস্তত করিনি। বিরোধিদলের প্রায় সবাই ছিল সমিতিঘেঁষা, কেউ সভ্য, কেউবা সহানুভূতিওয়ালা! ওরা যখন আমাদের চরিত্রহীন বলত, তখন চরিত্রের জন্যে একটুও আফশোষ করিনি— বরং ভেবে অবাক হতাম আর মজা পেতাম, এতো সহজে যে চরিত্রহীন হওয়া যায়!

"এতো যাত্রা-নাটক দেখ্‌লে কি চরিত্র ভালো থাকে ?" প্রতুল বিরোধি-দলের মুখপাত্র সেজে ভেংচে দিতে চাইত পান্নুকে : "যাত্রা শুনতে হয় মুকুন্দ দাশের যাত্রা শোনো—না ভাণ্ডারীর যাত্রা চাই ! তা-ও একদিন-দুদিন নয়—সব পালাতে যেতে হবে। সুবোধ ছেলের নমুনা তা নয় !"

কিন্তু সুবোধ ছেলের মতোই ভারিক্কি হাসি ফুটে উঠত পান্নুর মুখে : "ভাণ্ডারীর 'সীতার বনবাস' দেখেছিলি তোরা—সীতা যে সেজেছিল সে-ছেলেটিকে দেখেছিস ? কি সুন্দর দেখতে আর কি চমৎকার গলা ! ঠিক মেয়ের মতো !"

মানিক, মনে পড়ে, যেন খানিকটা অস্বস্তি বোধ করেছিল : "মুখে পেণ্ট মেখে ওরা সুন্দর দেখায় !"

"ও, তাই বুঝি তুই স্নো-পাউডার মাখিস মুখে ?"

"আর চোখে কাজল পরিস ?"

প্রতুলের দল মানিককে ছেঁকে ধরে হাসতে সুরু করল, মানিক পান্নুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। পান্নু অবশ্য মানিকের মুখরক্ষায় বলতে গেল : মানিকের চোখ এম্নিতেই কালো, এতো বেশি কালো ওর চোখের পাতা যে মনে হয় ও কাজল পরেছে, কিন্তু স্নো-পাউডারের কোনো কৈফিয়ৎ পান্নুও দিতে পারলনা। আব প্রতুলের জেরায় শেষটায় আবিষ্কৃত হল, স্নো-পাউডার মাখবার পরামর্শটা পান্নুরই দেওয়া।

অপরাধী সাব্যস্ত হয়েও বিচলিত হলনা পান্নু—সীতার কাহিনীই বল্‌তে সুরু করল আবার : "ভাণ্ডারীর দল যে-বাড়িতে থাকত আমি দু'তিন দিন গেছি সেখানে—সীতা ছেলেটিকেই দেখতে গেছি। কাপড়ের খুঁট গায়ে এদিক-উদিক ঘুরছে দেখেছি ! কথা বলতে ইচ্ছা হত কিন্তু ওরা কলকাতার ছেলে, আমার কথা কি বুঝবে—ভাবতাম !"

"মানিকের মতো কি করে আর তোর কথা বুঝত ও !" পাকামোতে ভরে উঠ্‌ত প্রতুলের চোখ-মুখ।

পান্নু চুপ করে গিয়েছিল তখন কিন্তু পরে আমাকে বলেছিল : "জানিস অনি, যাত্রার দলটা কিন্তু বেশ। আমরা অনেকে একসঙ্গে আছি—ভাণ্ডারীর দলের মতো অনেকগুলো ছেলে !—খুব ভালো নয় ? তাছাড়া যখন পার্ট করছি—কথা বল্‌ছি—কতো লোক হা করে শুনছে সে-কথা। ভাবতে কেমন ভালো লাগে !"

এ-ধরণের কথায় সায় দিতামনা আমি, চুপচাপ হাসতে থাকতাম! সব ঘটনারই শেষ কথাটুকু আমার কাছে ওর নিবেদন করা চাই—যেন আমিই ছিলাম ওর সবচেয়ে বেশি ধৈর্য্যবান শ্রোতা। এম্নি আরেকদিন ও বলেছিল: "আন্দামানে ওঁদের নিয়ে গেল কিন্তু একসঙ্গে থাকতে দিতনা—কি সাংঘাতিক! আর আন্দামান কোথায়, সমুদ্রের মাঝখানে এইটুকু একটা দ্বীপ! জীবনে আর সেখান থেকে ফিরে আসতে পারবিনে - ভাবতে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসেনা তোর? কি করে ওঁরা ছিলেন, বলতে পারিস?" তারপর সুরু হত ওর ছবি আঁকা—বারীন ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ, উল্লাসকর, কানাইলাল, সত্যেন—ওঁরা দেখতে কে কেমন তারই বর্ণনা চলত খানিকক্ষণ। বর্ণনার প্রায় সবটুকুই ওর মন গড়া, কেবল কানাই-সত্যেনের কয়েদীর পোষাকপরা ছবির খুঁটিনাটি বর্ণনায় সত্যের অপলাপ হতনা। আর সবশেষে, চুপ করে যাবার আগে, বলত ও: "ঈস্—ওঁরা ফাঁসীতে যেতে একটুও ভয় পেলেন না!"

পান্নুর চরিত্র নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা ছিলনা—আঁৎকে উঠ্‌বার মতো এমন কিছু ভীষণ ব্যাপার তার ভেতর থেকে আমরা আবিষ্কার করতে পারিনি, যাঁরা পেরেছিলেন, মনে হয়, তাঁদের স্মরণশক্তি খুবই কম—তাঁদেরও যে ছেলেবেলা বলে একটা বয়েস ছিল তা তাঁরা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের মাভৈ শুনে পান্নু তেমন খুশী হতে পারেনি। আজ মনে পড়ে, চরিত্র নিয়ে ও নিজেও যেন খানিকটা মুস্কিলেই পড়েছিল। একেকদিন খালি পায়েই স্কুলে আসত ও, চুলে চিরুণির দাগ পর্য্যন্ত থাকতনা, কাপড়-পাঞ্জাবীও হয়ত একটু বেশি ময়লা—শেষ বেঞ্চির কায়েমী সীট্ ছেড়ে প্রথম বেঞ্চিতে সেকেণ্ড-বয়-এর পাশে গিয়ে বসত। মুখ ভার—চুপচাপ সব সময়। পিরিয়ড-শেষের ঘণ্টা বেজে গেলেও সীট ছেড়ে এদিক-উদিক করা নেই। পেছনের বেঞ্চিতে যূথচ্যুত মৃগদের কলরব--প্রতুল, অরুণ, সুরজিৎ, সবাই টিপ্পনী ছুঁড়ত। মানিকের দুরবস্থা নিয়ে ওরা প্রায় প্রিয়ংবদা-অনসূয়ার ভূমিকা অভিনয় সুরু করে দিয়েছিল। বেচারী মানিক—মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ত ওর, লজ্জায় নয়, অভিমানে। সচ্চরিত্র বনতে গিয়ে আপনার জনদের যে বিরোধি-দলে ঠেলে দিচ্ছে এ জ্ঞান হয়ত ছিল পান্নুর। তাই পেছন থেকে একটা কাগজের গুটি এসে যখন তার কোলের পাশে পড়ল, অঙ্কের পিরিয়ড চলেছে,

পেছন ফিরে তাকাল ও, চোখে মিনতি। ফিক্-ফিক্ হাসছিল সুরজিৎ—সুদ-কষা অঙ্কের মৌচাক ঘিরে সমস্ত ক্লাশ গুণগুণ করছে এক সুরজিৎ ছাড়া। মাষ্টারমশাই ঝিমুনিতে ঢুলছিলেন—একটা ঢুল সামলাতে গিয়ে পরিষ্কার জেগে উঠ্লেন—সুরজিতের হাসি আর পানুর ঘাড় ফেরানো পাকড়াও করল তাঁর চোখ।

"ইউ—" থম্থমে আওয়াজ করলেন মাষ্টারমশাই। ভ্রষ্ট মৌমাছিযুগল মৌচাকে বসে গেল। কিন্তু মাষ্টারমশাই আর ঝিমোবেননা মনস্থ করলেন, মুখ ফোটালেন: "দীপায়ন পাশে নেই—খুব অসুবিধে হচ্ছে আজ, না? দেখি, নিয়ে আয় তোর খাতা—"

পেছনের বেঞ্চির সবগুলো চোখ মাষ্টারমশাই-এর দিকে উঁচু হয়ে উঠ্ল—কিন্তু তাঁর তর্জ্জনী কম্পাসের অভ্রান্ত কাঁটার মতো সুরজিতকে দেখিয়েই দুলতে সুরু করে দিল: "ইয়েস্—ইউ সুরজিৎ!"

খাতার সাদা পৃষ্ঠা নিয়ে অম্লানবদনে এগিয়ে এল সুরজিৎ।

"বাঃ—নিষ্কলঙ্ক!" বিদ্রূপের ধ্বনি ফুট্ল কিন্তু চোখ-মুখ সাদাসিধে মাষ্টার-মশাই-এর।

"সুদকষা আমি শিখিনি স্যর—ওদিন অ্যাব্সেণ্ট্ ছিলাম।"

"আর যেদিন প্রেজেণ্ট থাকি সেদিন অ্যাবসেণ্ট-মাইণ্ডেড" হাত বাড়িয়ে মাষ্টার মশাই সুরজিতের মাথাটা বাগিয়ে নিলেন, তারপর ওর পিঠে একটা বড়ো কীলের পর ছোট কীল চড়িয়ে দিয়ে বললেন: "একেই বলে ইণ্টারেষ্ট—সুদ!"

সারা পিরিয়ড মাষ্টারমশাই-এর পেছনে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল সুরজিতকে। অথচ ঘণ্টার শেষে বুক ফুলিয়ে পানুর কাছে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে সে: "পড়েছিস?"

হাতের মুঠো থেকে কাগজের গুটিটা বার করে খুলতে লাগল পানু।

"ওটা মানিকের চিঠি—আমি ত ডাকহরকরা।"

কাগজে লেখা: "লুকিং গ্লাস!"

"মানিকই তোর দিকে তাকিয়ে ছিল—" সীটে ফিরে যেতে-যেতে বল্লে সুরজিৎ: "মিছি-মিছি মাষ্টারমশাই আমায় সুদ শিখিয়ে গেলেন!"

যেন ফলার করে নিরম্বু উপোসের শপথ-ভাঙ্গা পানুর মুখ। হয়ত মনে-

মনে কঠিনতর একটা শপথ করে প্রায়শ্চিত্তের জন্যেও তৈরী হচ্ছিল পানু—হয়ত ভাবছিল, আর না—মানিকের সঙ্গে আর মেলামেশাই করবেনা কোনোদিন—চুপচাপ থাকবে আর ছেঁড়া-ময়লা জামাকাপড় পরে তাক লাগিয়ে দেবে মাষ্টারমশাইদের। কিন্তু পরের পিরিয়ডেই শপথসূচি পাল্টে গেল।

রজনীবাবুর ক্লাশ ছিল—ইংরেজি গ্রামার। দ্বিরুক্তি হলেও বলছি—তিনি আমাদের ওই বিদেশী ভাষাটা শেখাতে যতো না তৎপর ছিলেন তার চেয়ে যৎপরনাস্তি উৎসাহী ছিলেন আমাদের চারিত্রশিক্ষা দিতে। অবলোকিতেশ্বর গৌতম বুদ্ধ যেমন ভোরে উঠে চারদিকে একবার তাকাতেন, তিনিও চেয়ারে বসে, বই খুলবার আগে, আমাদের একবার অবলোকন করে নিতেন। সেদিনকার অবলোকনের পালায় অতীনের চোখ থেকে খানিকটা বেয়াড়া আলো ঠিকরে গিয়ে রজনীবাবুর চোখ ধাঁধিয়ে দিল।

মস্ত একটা শিকার পাওয়া গেছে—চোখ সরু করে আনলেন রজনীবাবু: "কি রে, চশমা নিয়েছিস?"

অতীন খানিকটা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল: "চোখে ঝাপসা দেখতাম—ডাক্তার-বাবু বললেন—"

"এখন দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়েছে—কেমন?"

বিরোধিদলের পাণ্ডা অতীনকে অপদস্থ দেখে পেছনের বেঞ্চিতে হাসির ধুম পড়ে গেল। তার মানে, রজনীবাবুর রসিকতার ইজ্জৎ রক্ষা করল শুধু সুরজিৎ-প্রতুল আর মানিকের দল, নইলে আর সবাই চুপচাপ।

অতীন অপমানে মরীয়া হয়ে বল্‌লে: "আমি প্রেস্‌ক্রিপ্‌শ্যন দেখাতে পারি স্যর!"

অতীনের চোখ-খারাপ হওয়াটা যে রজনীবাবু বিশ্বাস করেননি, অতীন তা নির্ব্বিবাদে মেনে নিলেও পারত—তা না করে ও যখন প্রেস্‌ক্রিপ্‌শ্যনের প্রামাণ্য এনে হাজির করতে চাইল, রজনীবাবু তাতে খুসী হলেননা—একটা গোপন মতলব প্রকাশ্য হয়ে পড়লে যেম্নি আমরা রুষ্ট হয়ে উঠি তেম্নি দেখালেন মাষ্টারমশাই আর তক্ষুণি, একটুও ইতস্তত না করে, দ্বিতীয় ফ্রণ্টে আক্রমণ করলেন: "ও-ধরণের ফ্রেম্ নিয়েছিস কেন? সোণার ফ্রেম চাই!—নিকেলের ফ্রেমে চলেনা?"

অতীন মাথা নুইয়ে ফেল্‌ল—জবাব খুঁজে পেলেনা। আবহাওয়াটা এবার

যেন সত্যি গুরুতর হয়ে উঠ্‌ল। অতীনকে পুরোপুরি জব্দ করেছেন ভেবে বই খুলতে যাচ্ছিলেন রজনীবাবু—পান্নু লাফিয়ে উঠে বল্‌লে: "নিকেলের ফ্রেম ত টেঁকেনা, স্যর—অতীনের ও-ফ্রেম খুব টেঁকসই।"

"তা-ই না কি?" খানিকটা বিব্রত হাসি ফুটে উঠ্‌ল রজনীবাবুর মুখে: "কে বল্‌লে?"

"বাবা চশমা নেবার সময় তা-ই বলতেন—শুনেছি।" কথা শেষ করে পান্নু চুপচাপ বসে পড়ল।

"টেক্‌ ইয়োর সীট্‌—" শান্ত গলায় অতীনকে বসবার অনুমতি দিয়ে বই খুললেন রজনীবাবু।

পিরিয়ডের শেষে পান্নু বল্‌লে: "স্যর কিন্তু আমার উপর চটে গেলেন।"

"ওরকম আবোল-তাবোল বললে চট্‌বেন না?" প্রতুল আক্কেল দেখলে।

"এ-ফ্রেম কি সত্যি টেঁকসই—" নম্র হয়ে গিয়েছিল অতীন: "আমি কিন্তু দেখতে ভালো বলেই নিয়েছিলাম!"

"কে জানে টেঁকসই কি না—বলে ত দিলাম—" বেপরোয়া চেহারায় ফিরে এলো পান্নু: "উনিও জানেন নাকি কিছু?"

অনুগতের হাসিতে করুণ হয়ে উঠল অতীনের মুখ।

গুরুদ্বেষী পান্নুকে ফিরে পেয়ে প্রতুলের দল খুসী হল সত্যি কিন্তু অতীনের ব্যাপারটাতে সুখী হতে পারলনা। ছুটির শেষে সুরজিৎ বল্‌লে: "অতীনকে বাঁচাতে গেলি কেন তুই?"

"কি রকম কালো হয়ে গিয়েছিল ও, দেখিসনি? ভারি খারাপ লাগছিল আমার!"

"কালওত বারান্দায় জটলা পাকিয়ে যা-তা বলছিল ও তোকে!"

"দেখবি, আর বলবেনা!"

"তা-ই কিনা!" অভিমানী মেয়ের মতো বললে মানিক: "মুখের ওর লাগাম নেই। কি সব বিশ্রী কথা যে বলে ও আমায়—তোমায়ও!"

"কি বলে?" পান্নু হাসতে সুরু করে।

মানিক চুপ করে যায়, প্রতুলই উত্তর দেয়: "মানিককে বলে, তুই মেয়ে হলে দীপায়নকে বিয়ে করতিস—তা-ই না?—" হেসে ওঠে প্রতুল: "মন্দ বলেনা। তুই-ই বল মানিক—কথাটা এমন কি খারাপ?"

"যাঃ—" হাসির একটা ঝাপসা আলো ফুটে ওঠে মানিকের মুখে।

পরদিনই আবার পান্নু পেছনের বেঞ্চিতে ফিরে আসে। হয়ত মানিককে নূতন করে ভালো লাগে বলেই ফিরে আসে, কিন্তু বলে, "জানিস অনি, ওঁদের কাছে ভালো সেজে লাভ নেই—আমরা মাষ্টারমশাইদের কাছে তেতো হয়ে গেছি!" [কথাগুলো সত্যি আন্তরিক ছিল কেননা পরেও দীপায়ন ছাত্র-আন্দোলনের কথায় এ-ধরণেরই মন্তব্য করত। "ছাত্ররা মাষ্টারদের শ্রদ্ধা করতে পারেনা আজ—ব্যাপারটাকে মনোরম বলছিনে—সত্যি যা তা-ই বলছি। কিন্তু কেন পারেনা শ্রদ্ধা কবতে—দোষ কি সবটুকু ছাত্রদেরই? অরুণি-একলব্য যে নেই আর—কেন? গুরুমশাইরা কি দূরে সরে যাননি অনেক? কোথায় সে-স্নেহ—পুত্র-স্নেহ—ছাত্রদের জন্যে? আইন-কানুন, আচার-আচরণ জীবনের একটা খোলস—জীবনের আসল চেহারা ভালোবাসা। কাকে তুমি কতোটুকু ভালোবাসতে পাবছ তা দিয়েই তোমার জীবনকে মেপে নেব—তাছাড়া মাপবাব আর কোনো পদ্ধতি নেই।"—বাসবের উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলতে-বলতে কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ত দীপায়ন, মনে হত কোন্ একটা অদৃশ্য ক্ষতে যেন আঘাত লেগেছে ওর, তা থেকেই রক্ত ঝরে-ঝরে নিস্তেজ করে দিচ্ছে শরীরের ভঙ্গী।]

সুরজিৎ-প্রতুল বা মানিক ফিরে পেল অবশ্যি পান্নুকে আর তারা আবার ভাবতেও সুরু করলে যে পান্নুর উপর তাদেরই অধিকার, আর কারো নয়, কিন্তু আমি দেখতাম, পান্নু কারো দাবীই যেন অগ্রাহ্য করতে চাইতনা। দাবী কেউ জানাক বা না-জানাক পান্নু ভাবত সবার জন্যেই ওর কিছু করবার আছে। কি যে করবার আছে তা-ও ও আগে থেকে জানতনা—জানত মাত্র তখন, কোনো সুযোগ যখন উপস্থিত হত। মার্কা-মারা নন্দরা এ-সুযোগ অনবরতই উপস্থিত করেছে—পাড়ায় যারা দুর্মেধা অথচ জ্ঞানপ্রদায়িনীর বিশিষ্ট সভ্য, তাদের বেলায়ও মাঝে-মাঝে সুযোগ পাওয়া যেতো কিন্তু মুস্কিল ছিল ইস্কুলের আদর্শ-ছেলেদের নিয়ে। কোনো সাহায্যই যে তাদের করা যাচ্ছেনা তাতে যেন পান্নু খানিকটা দুঃখিতই হত। তাই ভূপতির সঙ্গে কমনরুমে বসে গল্প করা বা কোনোদিন টিফিনের সময় সেকেণ্ড-বয়কে ডেকে নিয়ে চক্রবৃদ্ধি সুদের একটা জটিল অঙ্কে বসে যাওয়া ছিল হয়ত সে-দুঃখ নিরসনেরই কোনোরকম একটা উপায়। বলাবাহুল্য যে অঙ্কটি পান্নুই করতে পারত, সেকেণ্ড-বয়

রাফ্-খাতার কয়েকটা পৃষ্ঠা সংখ্যাকণ্টকিত করে চলত শুধু—আর তার এই নিষ্ফল প্রয়াসের ক্লান্তি দূর করবার সুযোগ পেয়ে পানু খুসী-খুসী হয়ে উঠ্‌ত। ওটাকে বালসুলভ অহঙ্কার বলতে পারেন কিন্তু আমি বলব দীপায়ন সেদিন বালক ছিল কিন্তু অহঙ্কারী ছিলনা।

"এই,—নাচ দেখতে যাবি, পানু ?" শুনতে কুকর্ম্মের পরামর্শের মতোই মনে হল প্রতুলের কথাগুলো।

ঠোঁট টিপে হাসছিল সুরজিৎ! পানু প্রায় ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গের নির্ম্মল দৃষ্টি নিয়ে তাকাল প্রতুলের মুখের দিকে : "নাচ ? কি নাচ ?"

"তিন দিন থেকে হচ্ছে—চকবাজারে।"

"পানু কেন যাবে ?" মানিক মুখ ফিরিয়ে রইল।

"কেন যাবেনা ?" সুরজিৎ হেঁকে উঠ্‌ল : "তুই যাবিনে বলে ?"

"কার নাচ হচ্ছে ?" সবার মুখের দিকে তাকিয়ে রহস্য-সন্ধান করতে লাগল পানু।

"দুপুরবেলা রোজ হচ্ছে—জেলেরা দিচ্ছে নাচ।" ঝিলকিয়ে উঠ্‌ল প্রতুলের চোখ।

"কিন্তু কে নাচছে ওখানে ?" পানু অধৈর্য্য হয়ে পড়ল।

"বাইনাচ বলে—তা-ই হচ্ছে!"

"কি বলে তুই জানিস্ নাকি ?" সুরজিৎ সত্য গোপনের চেষ্টা করে : "একটা মেয়ে নাচে আর গান গায়!"

"খুব ভালো নাচে নাকি!" প্রতুল লোভীর মতো বলে।

পানু হাসতে সুরু করে : "তোরা যাচ্ছিস্—কেমন ত ?"

"তুই বা কেন যাবিনে ? বাইরে দাঁড়িয়ে খানিক ত দেখে আসা—কি হয় তাতে ?"

"কি আবার হবে ?"

মানিকের ঘাড় ভাঙতে লাফিয়ে পড়বে বলেই যেন প্রতুল লাফিয়ে উঠ্‌ল : "শুনে অব্দি মানিক কতো প্যাখ্‌নাই না করছে! বলছে তোকে যেতে দেবেনা, কিছুতেই না।"

"সত্যি ?"

"ওসব দেখতে কে যায় ?" মানিক আন্ধারের আড়ালে ঢেকে রাখতে চাইল পানুকে।

"সবাই মিলে দেখে আসব, কি হবে ?"

সবাই ওরা দেখে এলো কিন্তু ভালো লাগল শুধু পানুর। তবে নাচ নয়, গান। তা-ও নাকি শোনা যায়নি সবটুকু—এতো ডাক-হাঁক আর হৈহুল্লোড়ে কানে পৌঁছয় কি গানের সব কথা আর সুর ? মানিক ত ভয়েই জড়সড়, বল্‌ছিল : ওরা মাতলামি করছে—মেথররা হোলির সময় যেম্নি করে ঠিক তেম্নি। সুরজিৎ হাসি চাপছিল—প্রতুল বল্‌ছিল, অতো রুমাল উড়োচ্ছে কেন মেয়েটা ? কিন্তু পানুর অভিমত : "গানটা কিন্তু বেশ—আমার বেশ লাগছিল। 'যতোদিন দেহে এ প্রাণ রহিবে আমি তোমারি তুমি আমারি'—সুন্দর নয় কথাগুলো ?"

১৯৪৫—এপ্রিল।

চরিত্র নিয়ে ভয়ে-ভয়ে থাকা—আর রোগ-বীজাণুর ভয়ে শরীরকে জামা-কাপড় দিয়ে মুড়ে রাখতে চাওয়া হয়ত একই রকম। আলো-বাতাসে নেমে এসো—থাকুক না বীজাণু, তোমার দেহ ত আলো চায়, চায় হাওয়া, শীত চায়, তাপ চায়। স্বাস্থ্যের জন্যেই তা চায়, আর সে-স্বাস্থ্যই যুদ্ধ চালায় বীজাণুর সঙ্গে। চরিত্রের কি স্বাস্থ্যের দরকার নেই ? আছে। তবু নিষেধের দেয়াল তুলে চরিত্রকে পাণ্ডুর করে তোলাই যেন আমাদের বাহাদুরী ! তাকে সংগ্রাম করতে দাও—হাঁ, জীবন-সংগ্রাম। জয়ের টিকা কপালে তার উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠুক আর পরাজিত যদি হয়ই সে, হোক না—জয় যার হবে তার পরাজয় হবেনা কোনোদিন এমন কি হতে পারে ?

চরিত্র খোয়াবার আশঙ্কা যার জীবনে উপস্থিতই হলনা কি করে নিজেকে সে বলতে পারে চরিত্রবান ? অন্তত একটি যুদ্ধ করো, তবে ত বলব তোমাকে সৈনিক। তুলোর বাক্সে বন্দী থেকে আঙুরের মতো নিটোল স্বাস্থ্যের গর্ব্ব করে কি লাভ ?

চরিত্র নিয়ে ভয় আমাদের ! কাকে ভয় ? আল্ট্রামাইক্রোস্কোপিক কোনো ভাইরাসের ভয় নয়, মানুষকে ভয় ! একটি মানুষ আরেকটি মানুষকে ভয় পায়। চরিত্র কলুষিত করে দেবে এই ভয়। আমার চরিত্র আমার নয় ?

তা যদি কলুষিত হয়, আমিই তার কর্ত্তা। আমি মানে আমার জার্ম-প্লাজ্‌ম্—আমার আদি সত্তা, যাতে বহুযুগের ইচ্ছা আর ইতিহাস জোয়ার-ভাটার মধ্য দিয়ে একটি জটিলতায় এসে বাঁধা পড়েছে। সেই আমি আদিম, আবার আধুনিক। মানুষের সবটুকু ইতিহাসেরই বীজ আছে তাতে, সব রকম প্রাণ, সব প্রেরণা—আমরা বেছে নিতে পারি, অনায়াসেও পারি, পরিশ্রম করেও পারি। বাছাই করার বিদ্যাটাই আসল। কিন্তু সে-বিদ্যা অর্জ্জন করবে কি করে? তাকাতে হবে মানুষের জীবন-ভঙ্গীর দিকে—যে-ভঙ্গীতে জীবন সুন্দর তার দিকে তাকিয়েই বেছে নিতে হবে তোমার পথ। ভঙ্গী বদলায়, সৌন্দর্য্য বদলায়, তোমার পথও বদলায়। কিন্তু বেছে যে নিতে হবে এ-কথা কি ফুরোয়?

কথাগুলো লিখতে আজ মার একটা পুরোণো হাসি ঝিক্ ঝিক্ করে উঠেছে মনের উপর:

"স্মৃতিতীর্থের মেয়ে ন'খুড়িমা শুধু জানতেন, হেন-করোনা, তেন-করোনা—সবই কি আর ইচ্ছে করে' করে মানুষ?"—মা সেদিন ন'দাদুর উকিল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন: "গান ভালোবাসতেন ন'কাকা—বাই-খেমটার আসরে যেতেন। খেমটাওয়ালীদের মহলে ওঁর পসার জমে যেতো, সে কি আর ওঁর দোষ? আসর দিতেন জমিদাররা—পসার হত ন'কাকার!" হাসির ঝলক দেখা দিত মার চোখে: "ন'কাকার চেহারার দোষ—খই ফোটাতে পারতেন মুখে, তারি দোষ! জমিদার বলে ত কেউ আর সেদিনে ন'কাকার চেয়ে দেখতে ভালো ছিলেন না আর পড়াশুনোও বা ওরা কে কতোটুকু করেছেন!" তারপরই উকিল যেন এজলাস ছেড়ে এসে ফের নথিপত্র দেখতে সুরু করতেন, চোখের হাসিটা বিদ্রূপে ধারাল হয়ে উঠ্‌ত হঠাৎ: "কিন্তু ওসব মেয়েদের সঙ্গে কি করে যে চলাচলি করতেন ন'কাকা—ছিঃ!"

'ও-সব মেয়ে'—কি ওরা, কে ওরা—ভাবতে সুরু করেছিলাম হয়ত ছেলেবেলাতেই। তারপর দেখতে পেলাম ওদের একজনকে—ওদের একজনের কঙ্কালই দেখতে পেলাম বোধহয়। গায়ে মাংসের ছিঁটে-ফোঁটাও ছিলনা একটু—হাতের উপর শিরার শিকড় আর কুঁচকানো, কালসে চামড়া—চোখগুলো খুঁজে আনতে হয় গর্ত্ত থেকে, ভিক্ষে করতে আসত মার কাছে। তখনও ডুরে শাড়ি পরত, মাকড়ি ছিল কানে—হয়ত পেতলের, আর হাতে কাচের চুড়ি।

গান গাইত বুড়ি, নাচতেও চাইত। মা মুখে কাপড় গুঁজে হাসি চাপতেন তারপর গম্ভীর হতে গিয়ে হয়ত ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়তেন বিছানায়। বুড়ি সুযোগ বুঝে নাচ-গান জুড়ে দিত : "বেলাফুল কানে দিয়ে নাচিছে কামিনী··।" ওর ভঙ্গীতে মা হাসতেন বলেই হয়ত আমিও হাসতাম কিন্তু হাসির পেছনে আমার সেদিনেও কিছু ছিল যা হাসি নয়।

অবাকই বোধহয় হতাম—কেন বুড়ি ওভাবে নাচতে সুরু করে—আরো যারা ভিক্ষে করতে আসে, তারা ত কেউ নাচেনা, এমন গানও গায়না। একটা একানি ছুঁড়ে দিয়ে মা বলতেন বুড়িকে : "যেম্নি জ্বালিয়েছিস মানুষের হাড়, তেম্নি দশা তোর!"

ওরা কি ভাবতে পারেনা, ভাবেনা কোনোসময়, এম্নি দশায় যে ওদের জীবন শেষ হতে পারে?

হয়ত এ প্রশ্নটা সেদিন আমার মাথায় ঘোরাফেরা করছিল। আজ মনে হয়, এ-প্রশ্নের কেন, কোনো প্রশ্নেরই কোনো মানে নেই। মানুষের শোভাযাত্রাকে প্রশ্নগুলো এক মুহূর্ত্তের জন্যে শুধু এলোমেলো করে দেয়, তারপর আবার মানুষ সারবন্দী দাঁড়িয়ে চলতে সুরু করে। মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনা আর শরৎবাবুর রাজলক্ষ্মী সেই এলোমেলোরই খবর, তারপর আবার 'বেলা-ফুল-কানে দিয়ে' কেউ নাচতে আসে, জেলেদের মজলিসের মেয়েটি হাজার মজলিসে ছুটোছুটি করে নেচে বেড়ায়।

আমরা থামিনে, চলি। চলারই ভঙ্গী এ-নাচ। জীবনেরই ভঙ্গী কদর্য্য জীবন। কদর্য্যতাকে যদি আমরা গভীরভাবেই ভালো না বাস্‌ব তাহলে কি তা এমন স্থায়ী হতে পারে? জীবনের মতোই তা অফুরন্ত, পৌনঃপুনিক। আমাদের রক্তে কোথাও তার ঠাঁই করে দিয়েছি আমরা। তাই সর্ব্বনাশেও ফুলে উঠতে জানে বুকের রক্ত। সর্ব্বনাশও আনন্দেরই মতো।

ভবানীকে মনে পড়ছে—আমার পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট মেসের বন্ধু। চরিত্রের পরীক্ষায় পরাজিত ভবানী। ল' পড়ত কিন্তু শরীরের সাধারণ নিয়মকানুনটুকুও মানত না। ওর কদর্য্যতায়ই কি ওকে ভালো লাগেনি আমার? ওকে দেখলেই কদর্য্যতার একটা রহস্যপুরী ঝাঁপিয়ে পড়ত আমার মনের উপর—ভালো লাগত ওর অপরাধের উল্লাস দেখে।

"ভালো কাজ করছিনে জানি, দীপায়ন—তবু করি। অপরাধকে অপরাধ

বলে মেনে নিয়েই তা করতে হয়, তা না হলে মজা কোথায় ?" মাতাল না হয়েও বলতে পারত ভবানী।

"কেন ? আরো ভালো আর্গুমেণ্ট ত আছে—অপরাধ করাটা মানবিক, পশুর সাধ্যের অতীত।"

"কোয়াইট্! সত্যি তা-ই! পশুর কি আমাদের মতো তুখ্খোর বুদ্ধি আছে—আনন্দ-বোধ আছে—স্ফুর্তি পাবার কলাকৌশল জানা আছে ?"

দেখা গেল উলুবনে মুক্তো ছড়াইনি!

"তবু, কি জানিস, দীপায়ন—" অমনোনয়নের সঙ্কোচ ফুটিয়ে তুলত ভবানীর চোখ: "যখন মনে হয় যে নিয়মের দাস হয়ে যাচ্ছি, কেমন-যেন মনটা খারাপ হয়ে যায়! রোজ সন্ধ্যায় কারো-না-কারো ঘরে যাওয়া চাই—মদের চাইতেও বেশি এ-নেশা। নিজেকে আটকে রাখতে চেয়েছি দু'একদিন—ও হয়না!"

"শরীরটা কি তোর নয়, ভবানী ?"

"নিশ্চয় আমার! তুই কি মনে করিস শরীর থেকে রোগ তাড়াতে ডাক্তারের পকেট কম ভারি করেছি আমি ?"

"তাড়িয়েছিস ত ঠিক ?"

"ডাক্তার ত বলে! আর মেয়েটা কি বলেছিল জানিস্ দীপায়ন—"

জানতে চাইনি তবু ভবানী বলতে ছাড়েনি। যা-ই বলুক ভবানী, আমি আজ ভাবছি, ভবানীর অজস্র পরিচিতারা কাউকে রেহাই দেয়না—নিজের দেহকেও না, পরের দেহকেও না। শুধু টাকার জন্যে।

উদার শুদ্ধোধন একদিন বলেছিলেন, আমার পুত্রবধূ যেন গণিকার মতো সর্ব্বগুণান্বিতা হন! গুণ হারাবে বলেই কি মানুষ চলতে সুরু করেছিল একদিন ? গুণকে যা ধরে রাখে সেই হৃদয় আর মন হারাতে হারাতেই কি ছুটে চল্‌ব আমরা ? শরৎবাবু চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, 'হৃদয় আছে!' কোথায় ? আছে কি ? হয়ত ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের আগেও ছিল। ছিল হয়ত চন্দ্রমুখী আর রাজলক্ষ্মী, কিন্তু তারপর ? তারপর ধ্বসে-পড়া একটা কুৎসিত স্মৃতি হৃদয়ের—তবু ছিল কিছু—রোগজীর্ণ পঙ্গু হাত বাড়িয়ে সান্ত্বনা দিতে চাইত তা দেহের রক্তমাংসকে। মানুষের সেই ভগ্নাবশেষ দেখেছি আমি। আর অবশেষে—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পেছন থেকে উঁকি দিল যারা, তাদের বুঝি হৃদয়ের দরকার

ছিলনা। মানুষের উদ্বর্ত্তনে হৃদয় বাতিল। ওদের কি অপরাধ? পণ্য ভালোবাসি আমরা, পণ্য চাই, পণ্য হতে চাই! পায়ের নীচে আমাদের শক্ত মাটি নেই, নীল আকাশ নেই মাথার উপর—শুধু বন্দরের ঘোলা জল।

কাকে কি দেবে তুমি? কি দেবার আছে তোমার? দিতে পারো শুধু ক্রম্ম, টাকা, ষ্টার্লিং, ডলার। ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠবে তোমার হাতে, আমার হাতে—তোমার চোখে, আমার চোখে। তা-ই নিতে হবে, তা-ই নিয়ে খুশী হতে হবে। দেহের বিনিময় ঘুচিয়ে দিতে পারো কিন্তু তৈরী করবে শ্রমের বিনিময়। দেহের শ্রমে, মাথার শ্রমে, টাকাই আসবে তোমার হাতে। টাকা। আর কিছু নয়—হৃদয় নয়, হৃদয়ের কোনো মেঘ, কোনো বাষ্প, কোনো ছবি, কোনো রঙ নয়।

আমরা হৃদয়হীন, আজ আমাদের তা-ই গর্ব্ব, তা-ই যেন জয়।

আমরা চরিত্র গড়েছিলাম, আবারও চরিত্রই গড়তে যাচ্ছি—একটা সৌখান ছক—হৃদয়ের আর দরকার নেই!

চার

যখন আপনার বয়স কম, গীতার সেই বিখ্যাত শ্লোকের মতো বাস-পরিবর্ত্তন করতে তখন আপনাকে একটুও আয়াস করতে হয় না। একটি সত্তা পরিহার করে আপনি অবলীলায় আরেকটি সত্তায় চলে যেতে পারেন। এ তত্ত্বটি জানা ছিল বলেই আমরা গৌরীদান আর পোষ্য-গ্রহণের মতো দু'টো জাঁকালো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পেরেছিলাম! ভয় পাবেন না, এ-দুটো উদাহরণ মাত্র, ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস বর্ণনা করবার ভূমিকা নয়। ছেলেবেলায় যে খুব সহজেই আমরা নিজেদের বদলে ফেলতে পারতাম, এ অধ্যায় লিখতে বসে তাই মনে পড়ল। আমি সহর ছেড়ে চলে যাচ্ছিলাম,—পানুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবে, খুবই দুঃখ হচ্ছিল। কিন্তু পানুর দুঃখটাকে দুঃখ বললে যেন কিছুই বলা হয় না। অনেকের দুঃখের মতো এ একটা উড়ো হাওয়া নয়, মনে উপর স্থায়ী বাসিন্দেরই মতো। ঘর-বাড়ি তুলে, মনের দৃশ্যটাকেই বদলে দিতে পারে এ। তারপর মানুষটা হয়ে যায় আরেক রকম। মনে হয় নূতন দেহ ধারণ করেছে সে। অল্প-অল্প বিষ খাইয়ে না কি বিষকন্যা তৈরী করা হত—পানু ঠিক তেম্নি তৈরী হয়ে উঠ্‌ল আবার। আমার যাওয়া-টা হয়ত ছিল উটের পিঠে শেষ কুটো-টির মতো, পুরোপুরি ভার চাপিয়েছিলেন দেবুদা। আমি কাহিনীকার হলেও দেবুদার অন্তর্ধানটাকেই বড়ো করে তুলছি—লক্ষ্য করবেন—নিজের অন্তর্ধানকে নয়।

পুলিশ দেবুদাকে ধরে নিয়ে গেল। ধরপাকড়ের হিড়িক চলছিল সহরে —অভিভাবকরা খোলাখুলি ভাবে জানতে পারছিলেন যে পাড়ার সমিতিগুলো মোটেই নিরীহ নয়, এক-একটি বারুদের কারখানা! যেসব ছেলে জবানবন্দী দিয়েই খালাস, তাদের মুখে শোনা গেল, পুলিশের কর্ত্তারা নাকি মন্ত্রের মতো দুটো কথা অবিরতই উচ্চারণ করে চল্‌ছিলেন—'যুগান্তর' আর 'অনুশীলন'! আমাদের কানে অবশ্য মন্ত্রের মতো দুর্ব্বোধ্যই শোনাচ্ছিল কথা দু'টো।

সমিতির দাদারা কেউ রেহাই পেলেন না—যাঁরা গা-ঢাকা দিলেন, ধরা পড়াটাকে দিন কয়েক তাঁরা পেছিয়ে দিলেন মাত্র। দেবুদার জন্যে খানা-

তল্লাসি হল পান্নুদের বাড়িতে। গোলা-বারুদ কিছু পাওয়া গেল না সত্যি কিন্তু যা পাওয়া গেল, তা নাকি গোলাবারুদের চেয়ে মারাত্মক! কাঁড়ি-কাঁড়ি বই পাওয়া গেল, যার এক-একটি ছত্র এক-একটি পিস্তলের গুলি। পুলিশ-মহলের গাম্ভীর্য্যে আর ব্যস্ততায় সমস্ত সহরটা থমথমে হয়ে গিয়েছিল। বাসিন্দেরাও তাঁদের মতো ভাবতে সুরু করেছিল, একদিন হয়ত—জানা যায় না সেটা কোন্ দিন—চারদিকে বোমা ফেটে উঠত, গোলাগুলি চলত, লণ্ডভণ্ড হয়ে যেত সহর! সহর জুড়ে নাকি তারই ষড়যন্ত্র চল্‌ছিল!

"গান্ধী মহারাজ কি আর সাধে আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন—ভাবলেন, এসবই চলবে, অহিংসা নয়!"—অক্ষত পরিবারের অভিভাবকরা রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু রাষ্ট্রনীতি যেহেতু কোনদিন দর্শনের স্তরে উঠতে পারে না, তাই কেউ কেউ বলল: "অহিংসাটা বহির্ব্বাস মশাই, বাংলাদেশের আসল আন্দোলন এই!" এঁদের সৎসাহসে উদ্বিগ্ন হবার কারণ ছিল বলেই এ ধরণের আলোচনা খুব বেশিদিন চলল না। অবশেষে দুর্য্যোগটাকে নিঃশব্দে পার করে দেওয়াই গৃহস্থজনোচিত বলে সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে নিলেন।

ইস্কুলের ক'টা ঘণ্টা ছাড়া পান্নু তখন আর বড়ো-একটা বাইরে থাকত না। বলত, মার নিষেধ। মার নিষেধকে পান্নু গ্রাহ্য করত সত্যি কিন্তু নিষেধটা যে সত্যি ওর মার ছিল আমি তা কোনো সময় ভাবিনি। হয়ত নিজেই ও নিষেধ করেছিল নিজেকে। নিজের ভেতরে ও ঢুকতে সুরু করেছিল সে-ই প্রথম। একা থাকবার পাঠ নিচ্ছিল। ওটা ওর হতই, দেবুদা ধরা না পড়লেও হত, মার নিষেধ-বাক্য শুনতে না হলেও হত।

মানিকের সঙ্গে ক্বচিৎ কদাচিৎ ওকে দেখতে পেয়েছি বায়স্কোপে বা সার্কাসের শো-তে। মানিক আরো বেশি গা-ঘেঁষে আসতে চাইত পান্নুর। পান্নুর মনের আসল চেহারাটা পান্নুর নিজের মুখে ততোটা উঁকি দেয়নি, কিন্তু মানিককে দেখলে মনে হত সে-চেহারাটা যেন পুরোপুরি মানিকের মুখে এসে বসে গেছে।

"মানিককে তোর বেশ লাগেনা, অনি?" পড়ার ঘরে বসে পান্নু জিজ্ঞেস করত আমায়।

দেবুদার ঘরটাই তখন পান্নুর পড়ার ঘর হয়েছিল--মার ঘর থেকে প্রমোশন

নিয়েছিল ও এ-ঘরে। দেবুদার চিহ্ন বলতে দেয়ালে কুস্তিগীরের ভঙ্গীতে ওঁর একটা ছবি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যা থাকবার কথা, তার কিছুটা পুলিশের হেফাজতে, কিছুটা ট্রাঙ্কবন্দী মার ঘরে। দেবুদার ছবিটার দিকেই তাকিয়েছিলাম আমি—পান্নু কি বলতে চাচ্ছিল শুনতে চাইনি।

"চমৎকার ওর মনটা—তুল্‌তুলে নরম।" পান্নু যেন মুগ্ধ চোখে অনুপস্থিত মানিকের দিকেই তাকিয়ে থাকত।

"ভাবতাম দেবুদাকে ও ভয় পেত—কিন্তু তা নয়—"

"তা নয়!" হৃষ্ট প্রতিধ্বনি বেজে উঠল পান্নুর গলায় কিন্তু তারপরই কেমন যেন হোঁচট খেয়ে ভেঙে পড়তে সুরু করল ওর গলার স্বর: "যাকে ভয় পায় তার জন্যে কি কেউ কাঁদতে পারে? কেউ কাঁদেনি, আমিও না—শুধু মা কাঁদছিলেন আর মানিক। ওর কান্না থামানো মুস্কিল হয়েছিল আমার, জানিস? ক্লাশে ও আমার বেঞ্চে বসে না—কেন বলতে পারিস? বলে, আমার কাছে এলেই ওর কান্না পায়! কি রকম ত্থাখ্‌! ওকে বায়স্কোপে-সার্কাসে, খেলার মাঠে নিয়ে গেছি জোর করে, যদি কান্নার রোগ সারে!"

পান্নুর ব্যথা যে মানিকের চোখের জল হতে পারে, সেদিন তা ভেবে নেবার মতো বিচার-বুদ্ধির জোর আমার ছিল না। দেবুদার প্রসঙ্গ, দেবুদার ছবি, দেবুদার ঘর—আমার চোখ-কান আর মনের উপর দেবুদাকেই স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিল।

"দেবুদাকে ছেড়ে দিলেননা ওঁরা?"

"না। বাবা পুলিশ-সাহেবের সঙ্গে কতো দেখা করলেন!"

"কেউ ত ওঁরা কিছু করেননি—খুন-জখম করেননি—শুধু স্বদেশী-দলে ছিলেন বলেই ওঁদের ধরে নিয়ে যাবে?"

"ধরে নিলে কি করতে পারিস তুই?"

সত্যি, কি করতে পারি? সক্রেটিস কি করতে পেরেছিলেন? তারপর যীশু—যোয়ান অ্য আর্ক? কিছুই করা যায়না। পান্নু, কি করে জানিনে, সেদিন এতোবড় একটা সত্য আবিষ্কার করতে পেরেছিল। আমি কিন্তু অবুঝের মতোই বলে উঠ্‌লাম: "বা: অম্নি ধরে নিয়ে যাবে?"

"নিয়ে ত যায়!" কাতর হাসিতে কেমন একটু নিবিড় আর তাই স্বাভাবিক হয়ে এল পান্নুর মুখ: "আর দাদা ত মস্ত অপরাধী! ওর বই-এর মধ্যে

একটুকুরো কাগজ পাওয়া গেছে, তাতে নাকি সাংঘাতিক একটা প্লেজ্‌ লেখা! পুলিশ-সাহেব বাবাকে দেখালেন। লেখা: 'স্বাধীনতার পায়ে জীবন বলি দিলাম।' সাহেব ঠাট্টা করলেন বাবাকে, 'ও ছেলেত তোমার মরেই গেছে চৌধুরী, তাকে আর ফিরিয়ে নিতে কেন এসেছ্‌?—''

"তা-ই শুনে চলে এলেন বাবা?"

"ওঁরা ছাড়বেন না জেনেই চলে এলেন!"

"তারপর?" তারপর যে কি জানতে চেয়েছিলাম তা আমি নিজেই জানিনে।

"তারপর বাবা চুপ করে গেছেন—চুপচাপ থাকেন!"

"মা?"

"একা থাকলেই কাঁদেন!" পান্নুর মুখে একটা সান্ত্বনার ভঙ্গী ফুটে উঠল: "তবে একা থাকেন না মা। কোনসময়ই না। দুপুরে বীণাদি আসেন, আগেও মাঝে-মাঝে আসতেন, এখন ত রোজ।"

মেয়েদের সম্বন্ধে উৎসুক হবার বয়েস যে ওটা একেবারেই নয় তা বলিনে কিন্তু পান্নুর মার আহত আর নিঃসঙ্গ মনের ছবিটাই যেন তখন আমাকে আর কথা বলতে দিচ্ছিলনা। ছেলেবেলায় চারদিকে যেমন আনন্দ ছড়িয়ে থাকে, ব্যথাও ছড়িয়ে থাকে চারদিকে—দীপায়ন প্রায়ই বলত কথাটা। ছেলেবেলা-কার কথা মনে করতে গেলে সত্যি তা-ই দেখা যায়! ছেলেবেলায় এমন ত কতো হয় যে কাউকে কাঁদতে দেখলেই ঠোঁট ভেঙে চোখ গড়িয়ে কান্না এসে যায়! কয়েকদিন আগেই বল্‌ছিল পান্নু—হাসতে-হাসতেই নিজের ছোটবেলার গল্প করছিল—একবার নবমীতে মোষ-বলি দেখতে গিয়েছিল কোথায়—বাচ্চা একটা মোষ খুঁটির সঙ্গে বাঁধা—মুখ তুলে লোকের ভীড়ের দিকে তাকাচ্ছিল—ভীষণ ভয় ওর চোখে! পান্নুর মনে হল, জল গড়াচ্ছে ওটার চোখ দিয়ে! ওম্নি, পান্নুরও জল গড়াতে সুরু করল চোখে, মাটিতে পা আছড়ে বলতে সুরু করল নকুলকে: "নকুলদা—বাড়ি চলো—চলো!" বাড়ি এসেও কি কান্না থামে পান্নুর? মা হাসতে লাগলেন: "দেখতে গিয়েছিলি কেন?" দাদা ভেংচি কাটলেন: "ভীতু খরগোস-।" গল্পের শেষে পান্নু আমাদের বলল: "আমি ভীতু হতে যাব কেন—মোষটার ভয় দেখে আমার কান্না পাচ্ছিল—কাঁদলেই দাদা বলেন ভীতু!"

"দেবুদাকে কোথায় রেখেছে, জানিস তোরা ?" হঠাৎ এ-প্রশ্নের মানে বোধহয় এই ছিল যে আমি জানতে চাচ্ছিলাম, দেবুদার জন্যে যারা এখন কাঁদে তাদেরও কি দেবুদা ভীতুই বলবেন ?

"এখন ওঁরা জানাবেন না।"

"কেন ?"

"আমিও বলেছিলাম, কেন। বাবা বললেন, 'কেন বলতে আমরা শিখিনি'।"

"কতো সভা করেছে আগে কতো মানুষ—এখন কেউ টুঁ শব্দটি করছেনা ! আশ্চর্য্য, কত যে লোক ধরে নিয়ে গেল !"

"সবাই ভাবছেন ওঁরা স্বদেশী-ডাকাত !"

"তা কেন ভাববেন ? ওদের কি কেউ চেনেনা ?"

মা ডাকতেন পানুকে। পর্দ্দার ওপাশ থেকে একটি দুর্ব্বল কণ্ঠ শোনা যেত ! পাশের ঘরে মা এসে দাঁড়িয়েছেন,—পানু উঠে যেত ! কিন্তু ফিরে আসত তক্ষুনি। এসে বলত, "বাইরে যেতে বারণ করলেন মা।"

"তোকে নিয়েও ভয় হচ্ছে মার—তাই !"

"আমি স্বদেশী করতে যাব নাকি কোনোদিন ? দাদা কি আর মিথ্যে বলতেন—আমি সত্যি-সত্যি ভীরু !"

[পানু সোজাসুজি যা বলত দীপায়নও তা-ই বলত, কিন্তু আঁকাবাঁকা রেখায়। ভীরুতার ভেতর খানিকটা দর্শন ঢুকিয়ে দিয়েছিল দীপায়ন, ভীরুতার ভেতরটা যেন দর্শন করতে চাইত। "আত্মরক্ষাকে আমরা জীবধর্ম্ম বা সহজ বৃত্তি বলি—ভীরুতা বলিনা ত—" ত্রিশের সন্ত্রাসী আন্দোলনে বাসবকে ও পেছন থেকে টেনে ধরতে চেয়েছিল একসময় : "মার দিয়েই আত্মরক্ষা করা যায়, মার বাঁচিয়ে করা যায়না এমন ত নয়—অথচ মার থেকে গা-বাঁচাতে গেলেই আমরা ভীরু বনে যাই। বলবি, অনেকেই যখন মারছে আর মরছে তুই কেন গা-বাঁচাতে চাস ? কেন চাই জানিস ? মারামারির বুনো জীবন থেকে একদিন পালিয়ে এসে মানুষ যে সভ্যতা গড়তে সুরু করেছিল, সে-কথাটা অনেকে ভুলে গেলেও আমি ভুলিনি।" বাসব অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল : "তাহলে সাহস মানেই তোর কাছে বর্ব্বরতা ?" "আত্মরক্ষা মানে ভীরুতা হলে সাহসও বর্ব্বরতা।" বাসবের মুখে একটা ঠাণ্ডা হাসি ঠাট্টার ভঙ্গী নিয়ে চিকিয়ে

উঠ্‌ল: "ভাগ্যিস এই বর্ব্বরতা ছিল, তাই না তোদের সৌখীন সভ্যতাটুকু তৈরী হয়ে উঠতে পেরেছে!" দীপায়ন চুপ করে বাসবের মুখের দিকে এম্নিভাবে তাকিয়েছিল যেন কোন দুর্ব্বোধ্য সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে চাচ্ছে। মনে হয় এ-সৌন্দর্য্যের মর্ম্ম-উদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টা চলেছিল দীপায়নের অনেকদিন – সাতবছর পর আমায় বল্‌ছিল ও: "আমরা ভীরু হই কেন, জানিস অনি? যাকে আমরা ভয় পাই তার সবটুকু সত্য জানিনে বলেই ভয় পাই। ভীরু হই জানার দোষে! ছেলেবেলায় আমি মাষ্টারদের ভয় করতাম না, আমি জানতাম পড়ায় ওঁরা আমার ঠেকাতে পারবেন না! দাদা পুলিশকে ভয় করতেন না, জানতেন পুলিশ যে শাস্তি দেয় তিনি নিজেও অপরকে তেম্নি শাস্তি দিতে পারেন! ধর্, আমি যদি এরোপ্লেনের কলকব্জার সবটুকু শক্তিসামর্থ্য জেনে নিই, তাহলে কি আকাশে উড়তে আমার ভয় করবে? আমি যা জানিনে, তাকেই আমার ভয়। যতোটুকু ভয় তাড়াতে পেরেছি আমরা, ততটুকুই সভ্য! বাসব বল্‌বে, সাহসই সভ্যতা, আমি বলি ভয়-তাড়ানোটুকুই সভ্যতা। পুরোপুরি সভ্য হতে পারিনে আমরা কোনোদিন—হয়ত কোনদিনই হতে পারবনা। তবু চেষ্টা চলবে! এটুকুই যা আশা!"]

তবু নিজেকে ভীরু বলতে গিয়ে পানু খানিকটা মুষড়েই পড়ত তাই খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ ওর চেনাশোনা সাহসী লোকদের গল্প জুড়ে দিত: "আমার পিসতুতো ভাই বিশুদাকে চিনিসনে তুই—গাঁয়ে থাকেন! ভয়-ডর ওঁর এক ফোঁটাও নেই! অমাবস্যা রাত্রিতে, গাঁয়ের শ্মশানে, পঞ্চবটির বেলগাছের ডালে, বাজি রেখে ন্যাকরা বেঁধে আসেন বিশুদা! পিশিমা দোহাই পাড়েন, ভয় দেখান, ভূতপেত্নীতে নাকি ওঁর ঘাড় মটকে দেবে একদিন! বিশুদা হাসতে থাকেন, বলেন, সামনাসামনি যদি আসে ওরা, কে কার ঘাড় মটকায় দেখতে পারি, না-দেখাদেখি পেছন থেকে এলে আর কি করা! তারপর আমাদের কাত্তিকদা—নৌকোর মাঝি কাত্তিকদা দেখলে, মনেই হবেনা ওর বুকে এতো সাহস! আমাদের নিয়ে একবার ও তিতাস নদী পাড়ি দিচ্ছিল। নৌকোয় এসে রেলষ্টেশন ধরবেন বলছিলেন বাবা—ষ্টীমারে ঘোরা-পথ, নৌকেতেই ভালো! মা অবশ্যি বলছিলেন, নদী-বিল পড়বে—নৌকোতে ভয় পাবে ছেলেরা—কিন্তু দাদা লাফিয়ে উঠ্‌লেন: "ভয় পাবে তোমার পুঁচকে পানু—আমার কথা বলোনা!" শেষটায় ঠিক হল বড়-সড় তিন-মাল্লাই

নৌকোতে আর ভয় ডরের কথা নেই—দু'জন মাল্লা ত আছেই, আর সঙ্গে থাকবে কাত্তিকদা। কিন্তু তিন মাল্লাই নৌকোতে কি করবে—তিতাসে পড়তেই এলো তুফান! ছোট্ট একটা কালো মেঘ যে এম্নি এলোপাথারি হাওয়া ছুঁড়ে দিতে পারে, ডাঙ্গার মানুষ তা কখখনো ভাবতে পারেনা। আছড়ে পড়তে সুরু করল আমাদের নৌকো! পাল খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মাল্লারা—কিন্তু ওদের মুখ শুকিয়ে গেছে! মা আমায় জাপটে ধরেছেন কোলে, দাদার হাত ধরে রেখেছেন আরেক হাতে! বাবা ছই-এর নীচ থেকে মুখ বাড়িয়ে আকাশটা দেখবার চেষ্টা করছেন! আমরা যে ডুবে যাব তাতে আর সন্দেহ ছিলনা কারো। এক-একটা ঝাপটায় চোখ বুজে ফেলেছিলাম—একবার চোখ মেলেছি কি সামনে দেখতে পেলাম গল্পের একটা দৈত্যকে—সত্যি বল্‌ছি, ওকে আর কাত্তিকদা বলে মনে হলনা—একটা দৈত্যই যেন দাঁড় হাতে লড়াই করছে। উঁচু-উঁচু মাংস ফুলে উঠ্‌ছে হাতে-ঘাড়ে আর বুকের দুপাশে, গামছাটা কোমরে জড়ানো, হেঁকে বৈঠা চালাবার কায়দা বাৎলে দিচ্ছে মাল্লাদের। মুখ তুলে দৈত্যের ছবিটাই আমি দেখতে লাগলাম – কোথায় রইল ঝড়, কোথায় বা ভয়! কিন্তু কি আশ্চর্য্য জানিস অনি, ঝড় থেমে গেলে পর সেই প্রকাণ্ড কাত্তিকদা আর নেই—বাবাকে লুকিয়ে ছই-এর আড়ালে চুপচাপ তামাক টেনে চলছিল আবার সেই আগেকার ছোট্ট মানুষটি।"

আজ পর্য্যন্ত যখন পানুর কথাগুলো হুবহু মনে করতে পারছি তখন অবশ্যই বলতে হবে যে ওর গল্প বলাটা আমি খুব মনোযোগ দিয়েই শুনেছিলাম। পানুর কথায় মনোযোগ দিতে হত—বলার ভঙ্গীর জন্যে নয়, কথায় ওর জীবনেরই একটা ভঙ্গী ফুটে উঠ্‌ত বলে। ওর কথা যেন আমরা শুনতামনা—একটা ছবি দেখতে পেতাম। দীপায়ন অবশ্য বলে, 'কথা আমরা দেখি, শুনিনে—শুনি আমরা ধ্বনি কিন্তু ধ্বনি ত কথা নয়, কথা আমাদের দেখায়—ছবি দেখায়!' উদাহরণ নিয়ে আসে দীপায়ন শরৎবাবুকে: 'শরৎবাবু কথাশিল্পী কেন জানিস—ওঁর কথায় অপর্য্যাপ্ত ছবি ফুটে ওঠে—এমন আর কারো কথায় না! আর তাই—' সিল্কের মতো একটা ঝিক্‌মিকে্‌ হাল্কা হাসিতে শেস করে ও বাকি কথাটুকু: 'আর তাই ওর বইগুলোতে সিনেমার ছবি এতো ভালো হয়।'

নাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলে পানু হয়ত অস্বস্তি বোধ করছিল, তাই একটা অ্যাল্‌বাম্‌ টেনে নিয়ে ও পৃষ্ঠা উল্টোতে সুরু করল।

"কার ছবি ওগুলো ?" হয়ত ভাবছিলাম ওখানে শেফালির বা মানিকের দু'একটা ছবি থাকবেও বা—আর তা যদি হয়, তাহলে পেট ভরে খানিকক্ষণ হাসাহাসি করা যাবে।

"অনেকের ছবি—" হাসতে সুরু করে' পান্নু আমাকে চতুর্গুণ উৎসুক করে তুললে : "সবার ছবি যোগাড় করতে পারিনি—পাওয়া যায়না। যাঁরা নোবেল-প্রাইজ পেয়েছেন শুধু তাঁদের—"

নৈরাশ্য দেখা দিল আমার গলায় : "বড়োলোকদের ছবি !"

"হেঁ—বড়োমানুষদের।"

"ওঁরা অনেক টাকা পান—তাই ত ?" পান্নুর মুখে ভ্রম-সংশোধন মেনে নিতে চাইলামনা !

"ওঁরা মানুষের উপকার করেন, টাকা পাবেন বলে নয় !"

পরাস্ত মন সিনিক হয়ে ওঠে বলেই বল্‌লাম : "ওঁদের ছবি রেখে কি লাভ ?"

"তার মানে ?" পান্নুর চোখে তিরস্কার ফুটে উঠ্‌ল : "কতো ভালো-ভালো বই লিখে গেছেন ওঁরা—ওঁদের ভালো লাগেনা তোর ? বড়ো বলতে ইচ্ছে হয়না ওঁদের ?"

"দেখি—" ম্রিয়মান হাত বাড়িয়ে খাতাটা পান্নুর হাত থেকে তুলে নিলাম। পরিচিত এক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পাওয়া গেল ওখানে, তাতে যতোটুকু উৎফুল্ল হওয়া যায় তা-ই হলাম, অপরিচিতের দল আমার মনে এমন কোনো ইচ্ছা জাগাতে পারলেন না যাতে আমি ভক্তি-গদগদ হয়ে উঠি।

"ওঁদের চেখে দেখ্‌লেই চেনা যায় ওরা যে মস্ত লোক ! মা বলেন, বড়োমানুষদের কান বড়ো হয়—দেখ্‌ছিস, সবারই কান কেমন বড়ো।"

"তা-ই না কি ?" পৃষ্ঠা উল্টে যেতে লাগলাম।

"আচ্ছা অনি, আমার কানগুলো কি বড়ো দেখায় ?"

মুখ তুলে হাসতে সুরু করলাম আমি : "তোর কান কুলোর মতো—কিন্তু যাদের কান কুলোর মতো তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি কিন্তু কিচ্ছু থাকেনা !"

পান্নুও হাসতে লাগ্‌ল ! হয়ত মনে-মনে ভাবছিল ও, মানুষের যে উপকার করে তাকে কি আর কেউ বুদ্ধিমান বলে ?

আমি একা। সবাইকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিলাম, পারিনি। দোষ কার? আমার না বাসবের? বাসব নাকি সাম্যবাদের অভ্রান্ত ভাষ্যকার—বলে ও। মানুষ ভুল করেনা, পার্টি নাকি ভুল করতে পারেনা—কত বড় দাম্ভিক কথা! আমিত ভাবতে পারিনে, আমার সব যুক্তি-তর্কের শেষেও ভাবতে পারিনে—আমি নির্ভুল! সত্য আমরা তৈরী করে নিই—সত্য আমাদেরই সৃষ্টি—তাই ভুলও তৈরী হয়ে চলে—ভুলে জড়িয়ে থাকে আমাদের সৃষ্টি, সত্য। অত্যন্ত সহজ, সাধারণ কথা—কিন্তু বাসব তা বুঝতে চায়না। ওর পৃথিবী নির্ভুল ছক-কাটা—সে ছকের কোনো তথ্যই ওর অজানা নেই। ওর বিশ্বাসী মনটাকে এখনও আমি ভালবাসি। এখনও—যখন আমি জানি ওর পথে আর চলতে পারবনা।

আজও মনের ছাড়াছাড়ি হয়নি বাসবের সঙ্গে আমার। কিন্তু নিঃসঙ্গতার হাওয়া বইছে আমার মনে। মাঠের উপর ধূধূ হাওয়া যেমন। ফাঁকা-ফাঁপা—সে যে সত্যি হাওয়া—ধরা যায়না তেমন-কিছু, তখনই যেন বোঝা যায়। গাছ নেই মাঠে—গাছের পাতা নেই, যাতে দোলার ছন্দ দেখতে পাব, শুধু রোদ, আর হাওয়া!

ঠিক এম্নি হাওয়া বইছিল আমার মনে আরেকদিন। দাদাকে যখন প্রথম ধরে নিয়ে যায়—দাদার প্রথম অন্তরীণের সময়। সেদিনকার পানুকে মনে পড়ছে আমার আজ। নিজের দিকে তাকিয়ে একেক সময় ভাবি, পানু হয়ত বেঁচে নেই। আশ্চর্য্য, হঠাৎ কখন এসে ও উঁকি দিতে সুরু করে আমার ইচ্ছায় আর অনুভবে। যা আমরা হই তা-ই কি শুধু আমরা?—যা ছিলাম তার খানিকটাও কি নই?

দাদা যদি এ-আঘাত তৈরী করে না তুলতেন, তাহলে হয়ত আমাদের পরিবারের চেহারাটাই অন্য রকম হয়ে যেত। বাবা, মা আর আমি যে-ভঙ্গীতে গড়ে উঠলাম, তা হত'না—নির্ব্বিঘ্নে, নিরুপদ্রবে একটানা স্রোতের মুখে কোথায় যে গিয়ে পৌঁছুতাম তা আর আজ ভাবতে পারিনে। ভালো কি মন্দ জানিনে, কিন্তু মোড় ফিরে একটি নূতন পথ ধরে আমি যে কিছুই পাইনি, কিছুই হতে পারিনি এমন মিথ্যে কথা আজ কি করে বলি? যা আমি

পেয়েছিলাম তার হয়ত তুলনা নেই—যাকে পেয়েছিলাম আমি নিবিড়ভাবে। হয়ত সে-পাওয়া নিজেকেই পাওয়া। ছেলেবেলায় আমরা বাইরের পৃথিবীকেই পেতে চাই, নিজেকে পাবার অবসর পাইনে। সেই দুর্লভ অবসর পান্নু পেয়েছিল।

স্কুল থেকে এসে পান্নু জামা খুলছিল—(এম্নি সময় মা উঁকি দিতেন তার ঘরে)। সেদিন মা উঁকি দিলেন না—সূর্য্য ঠাকুর ছায়ার মতো এসে দাঁড়াল। পান্নু বিরক্ত হল—হয়ত ওর মণি-অর্ডার-ফরম লিখে দিতে হবে, নয়ত দু'আনা পয়সা চাইবে চিনির খেলনা কিনে রোদে বসে চুষবার জন্যে। সূর্য্য ঠাকুরের মিষ্টি খাওয়ার অপবাদ নকুলের মুখে-মুখে বাড়িময় ঘুরে বেড়াত কিন্তু অপবাদটাকে ঠাকুর দেদার গুড়-চিনি-মিশ্রির মতোই নির্ব্বিবাদে হজম করে নিয়ে বলত: "বামুনের ছেলের জিভে কি সহজে মিষ্টি ধরতে চায়?" ব্রহ্মণত্বের এই অভ্রান্ত নিদর্শন পান্নু অনেকদিন থেকেই পেয়ে আসছে—আজও তার সে ভয়ই ছিল। অকালে, অকারণে সূর্য্য ঠাকুর উদিত হননা।

দাদাবাবু—"ঠাকুরের কাঁদ-কাঁদ গলায় পান্নু খানিকটা চমকেই উঠল।

"কি হল?" জামা খুলে ভুরু কুঁচকে দাঁড়াল পান্নু।

"মা আজ এক মুঠো ভাতও খাননি—ফেলে উঠে গেছেন!"

"কেন?" ঠাকুরের পয়সা চাওয়াতে যতোটা উদ্বিগ্ন হত পান্নু, তার চাইতে দ্বিগুণ উদ্বিগ্ন দেখাল তাকে।

আমার কিছু দোষ নেই দাদাবাবু! নকুলেরই গাফিলতি! কই মাছ নিয়ে এলো বাজার থেকে—আমি কই-এর কালিয়া তৈরী করলাম মা ভালো খাবেন বলে!"

"বিড়ালে খেয়ে নিয়েছে বুঝি সব মাছ?"

"তা নয়—" অসহায়ের হাসি ফুটে উঠ্‌ল ঠাকুরের মুখে আর সে-হাসিটাকে তক্ষুণি কান্নার নক্সায় ফিরিয়ে নিয়ে সে বল্‌লে: "মা কই মাছ খাবেন না—পরে বল্‌লে আমায় নকুল। আমি কি জানি? বড় দাদাবাবু ভালোবাসতেন কই মাছ—তাই মা খাবেন না!"

"ও"—পান্নু মুখ ফিরিয়ে নিলে।

"লুচি-তরকারী করে রেখেছি, দাদাবাবু! মা বললেন, আপনি এলে খাবেন।"

"আমি যাচ্ছি—যাও !"

পান্নুর মনে হত মা যেন বাড়ি-ঘর, লোকজন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে চান। তাই সে এগিয়ে যেতো মার গা-ঘেঁষে দাঁড়াবার জন্যে। মার যে কি ভালো লাগবে ঠিক বুঝতে পারতনা সে—ভেবে-ভেবে উপায় আবিষ্কার করতে হত। হয়ত হঠাৎ একদিন এক বোতল সিরকা কিনে এনে বলত: "মা তুমি চাটনি তৈরী করোনা অনেকদিন, ফাঁকি দিচ্ছ আমাদের—এই নাও সিরকা, চাটনি চাই আমাদের!" চাটনি তৈরী হত কিন্তু মা তাঁর আগেকার পরিচয় নিয়ে অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে আসতেন না। এবার তবে বিশুদাকে চিঠি লেখা যাক—দাদার জুড়ি ছিলেন বিশুদা— বিশুদাকে দেখে যদি খানিকটা সুস্থ হয়ে ওঠেন মা! পান্নুর চিঠি পেয়ে বিশুদা এসেছিলেন কিন্তু ওঝা ডেকে লাভ হলনা—ওঝাকেই ভূতে পেয়েছে। বিশুদাও কেমন যেন জবুথবু হয়ে গেছেন, বললেন পিশিমা নাকি দেবু-দেবু করে দিনরাত কাঁদাকাটি করেন!

পান্নু আশা করেছিল, হৈ-হৈ করে বিশুদা দিনকয়েক বাড়িটাকে মাথায় তুলে রাখবেন। তা হলনা কিন্তু খানিকটা হ'ল। বিশুদার কাছে গাঁয়ের খোঁজ-খবর নিত সুরু করলেন মা, তারপর নিজে থেকেই গাঁয়ের কথা বলতে সুরু করলেন একটা দু টো করে। যখন নূতন বৌ তিনি, তখন কেমন ছিল আমাদের বাড়ির রকম-সকম, গাঁয়ে তখন কারা ছিলেন ভয় করবার মতো, কি ভাবে চলতে হ'ত, কথা বলতে হত, প্রণাম করতে হ'ত, নিজেকে অন্যমনস্ক রাখবার জন্যেই মা এসব অতীতের কাহিনী বিশুদাকে শোনাতে চাইতেন, বিশুদার পাশে বসে পান্নু শুনে যেতো মার গল্প। মনে হত, সে এক অদ্ভুত দেশ, সেখানকার মানুষ-জন আলাদা রকম, গাছপালা-জলমাটিও বুঝি অন্য ধরনের।

বিশুদা সাতদিন ছিলেন কিন্তু অনেকদিনের জন্যে গাঁয়ের রঙ ধরিয়ে দিয়ে গেলেন মার মনে। তার মানে, বাঁচবার জন্যে আশ্রয় খুঁজছিলেন মা, হাতড়ে চলছিলেন একটি জগৎ যেখানে গিয়ে সহজে শ্বাস ফেলা যায়। জীবন যতো আঘাতই পাক তবু উঠে দাঁড়াতে চায়। ক্ষত-পূরণের ব্যস্ততা চলতে সুরু করে জীবনের ভেতর—বাইরে থেকে তা বোঝা যায়না। মার জীবনকে আহত করে দিয়েছিল সহর কিন্তু উরুভঙ্গ জীবন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পথের ধারে পড়ে রইলনা—যাত্রা সুরু করল গাঁয়ের দিকে। সে-জীবনে পান্নুকেই সঙ্গী করে নিলেন মা। তখন পান্নুই ছিল তাঁর একমাত্র শ্রোতা।

ন'দাদুর কথা বলতে গেলেই তখন মার চোখ থেকে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ত। অথচ কয়েকমাস আগে যখন তাঁর মৃত্যুর খবর এসেছিল, তখন, একদিনের জন্যেও কিন্তু মার চোখ ভিজে দেখায়নি। বরং বলতেন তখন, "বেশি বয়েস হয়ে গেলে ভুগতেনও বেশি! কেইবা দেখাশুনো করত? কারো কাছে যেতেনও না—কারো হাতে সেবাও নিতেন না! গেছেন ভালোই হয়েছে!" কিন্তু এখন বারেবারে আঁচলে চোখ মুছে বলতেন আরেক রকম কথা: "কতোই বা আর বয়েস হয়েছিল—ওঁর চাইতে পাঁচবছরেরও বড়ো হবেন না ন'কাকা! একটু খবরও দিলেন না—শেষ দেখা দেখতে দিলেননা আমায়।" শেষ দেখার কথায় পানুরও বুকটা কেমন যেন খালি-খালি মনে হত। সত্যি-সত্যি যেন হৃদয়ঙ্গম হত ন'দাদুকে যে আর দেখতে পাবেনা! বাবার চাইতে পাঁচবছরের বড়ো কোন গুরুজনকে দেখতে না পাওয়ার ব্যথা তা নয়।

"আমাকে বল্‌তেন—" খানিকটা ফসা হয়ে উঠত মার মুখ: "এখনো বল্‌ মিনু, সরস্বতীর বর নিবি, না বর খুঁজতে বেরোব। তরু দত্ত হবার ইচ্ছে থাকে ত বল!"

"তুমি কি বল্‌তে?" পানু মাকে গল্প বলায় টেনে নিয়ে যেতে চাইত।

"আমি আর কি বলব—মা কাঁদাকাটি করতেন, বলতেন, এই পাগলের আমলে আমার মেয়ের বিয়ে হবেনা!"

"তারপর?"

"তারপর ন'কাকাই বর খুঁজে আনলেন!"

"বাবাকে?"

"দু'জনই এক-ধরণ—ন'কাকার খুব পছন্দ হ'ল!"

মা কি বোঝাতে চাচ্ছিলেন জানিনে, কিন্তু পানুর মনে সেদিন বাবা প্রথম মানুষ হয়ে দেখা দিলেন। ছেলেবয়সে বাবাকে সবাই বাবা বলেই জানে—ভয় পাওয়ার না-হয় ভালোবাসার একটা সমগ্রী। অন্য মানুষের মতো তিনিও যে মানুষ—অন্যেরা যা করতে পারে তিনিও যে তা পারেন, তেমন ধারণা ছেলে-বয়েসে কারো হয়না—কিন্তু পানুর হয়েছিল। পানু কল্পনা করতে পারত, ভাবতে একটুও খারাপ লাগতনা—ওই জেলেদের মতো ন'দাদুর পাশে বসে তার বাবাও বাইজির গান শুনছেন আর হয়তবা, ভাবতে খারাপ লাগলেও ভাবত

সে, ন'দাতুর ধরণেই বাবাও মাকে পছন্দ করেন না, বাবার পছন্দসই হতে পারেননি মা।

"ন'কাকার নাটকের সখ ছিল ত খুব—পুজোতে জমিদার-বাড়িতে নাটক করতেন ওঁরা সবাই মিলে। আমার বিয়ের পর ওঁকেও একবার নাটকে নামালেন, ন'কাকা সেজেছিলেন পূর্ণচন্দ্র আর তোর বাবা কপট সন্নেসী! ন'কাকা বলেছিলেন তুমি বাবা উকিল, কপট সন্নেসির পার্ট তোমার চাইতে আর কে ভালো করবে?"—মা ছবি দেখতে সুরু করেছিলেন, অতীতের ফিতেয় সাজানো ছবিগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে চলছিল তাঁর মন।

"জটামাথায় সন্নেসি সেজেছিলেন বাবা?"

"জটা পরেছিলেন মাথায় কিন্তু সে ত আর সন্নেসির মতো দেখতে নয়!"

"কেন?"

এম্নি ভাবে চুপ করে গেলেন মা যে দেখে মনে হল, তিনি মনে মনে হাসছেন।

"কপট সন্নেসি বল্‌ছ কেন?" কৌতূহল চাপলে তা চড়তেই থাকত পানুর: "সন্নেসি ত সন্নেসিই!"

মার সেই পরিচিত পুরোনো চোখ তখন জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠত—রাত্তিরে পুজোমণ্ডপে প্রতিমার চোখ হঠাৎ যেম্নি দেখায়—হাসি আর বিদ্রূপের বিদ্যুৎ জড়ানো: "মেয়েদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতে পারে যে-পুরুষ তাকে আবার সন্নেসি বলে না কি?"

[এবার পানু থম্‌কে চুপ করে থাকত। বাবাকে ভুলে গিয়ে সে নিজেকেই মনে করতে সুরু করত এবার। মন একটা প্রশ্ন তুলে ধরেছিল, নিজে সে সন্নেসি কিনা। না—সন্নেসি নয়। শেফালিকে দেখে সে মুচকি হেসেছে অনেকবার —অনেকদিন। তাছাড়া আর কাকে দেখে? আরো আছে। হেসেছে—লজ্জা পেলে মানুষ যেম্নি করে হাসতে চায় তেম্নি হেসেছে সে আরো। তাকেও হয়ত মুচকি হাসিই বলে। তাকে দেখতে পেলেই হাসতে সুরু করে বীণাদি—প্রফেসরের মেয়ে বীণাদি। পানুও হেসে মুখ নামিয়ে নেয়। মুচকি হাসিই ত হাসে তারা দু'জনে। উহুঁ—পানু সন্নেসি নয়। কিন্তু সন্নেসি কি সে হতে চায়? সন্নেসিদের সবাই ভাল বলে, তাঁরা ভালো বলেই হয়ত ভালো বলে সবাই। তাই একটু লোভ হয় বইকি—সন্নেসি হতে ইচ্ছে করে খানিকটা।

কিন্তু কোথায় আর তা হতে পারল ! শেফালি আর বীণাদিই হতে দিলেন না ! এবার নাকি শেফালি গাঁয়ে এসেছিল বিশুদা বললেন ! বল্‌লেন : "সেই শেফালি আর নেই রে—ভারিক্কি গিন্নীর ধরণ ধরে গেছে—সাত কথা বল্‌লে তবে এক কথার উত্তর পাওয়া যায় ! একরত্তি মেয়ের কাণ্ডটা ভ্যাখো !" 'আমার কথা বল্‌লে কি কিছু ?'—জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল পান্নুর কিন্তু বিশুদার কাছে আর কি করে ও কথা জিজ্ঞেস করা যায় !]

ন'দাদুর কাহিনীতেই ফিরে আসতেন মা আবার ! বিদ্রূপের ঝাঁকুনিতে তাঁকে অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনত। চোখে আর জলের বাষ্পও থাকতনা। মনে হত ন'দাদু বেঁচে আছেন।

"তবু অনেক গুণই ছিল ন'কাকার---হাসি-গান, ইয়ার্কি-ফুরতি নিয়ে মেতে থাকতেন বলে কি, শরীরে অনেক গুণই ছিল !"

"কিন্তু তোমরা ত কেউ ভালো বলতেনা ওঁকে !"

"বলতাম। আমি বলতাম। মা খুসী হতেন না, তবু ন'কাকার দিক টেনে আমিই দু'চার কথা বলতাম। দাদা-দের কারো সঙ্গে বনতনা ওঁর—দিদি ত ফিরে মার মতোই ছোবল মারত ওঁকে, তাতে ওঁর দুঃখ ছিলোনা, ছড়া-কাটতেন : 'আগে ভালো বল যারে, পিছে মন্দ বল তারে, একথা কহিব কারে, কে বুঝিতে পারে !"

"দিদিমা লোক ভালো ছিলেন না—না ?"

মাতৃ-নিন্দায় কান দিতেননা মা, রূপকথা বলার ঢং-এ বল্‌তে থাক্‌তেন : "আমাদের পাড়ায় মুখুয্যে বাড়িতে একবার আগুন লাগল। গাঁয়ে তখন চৈত্রমাসে খুব আগুন লাগত। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্তির—কিন্তু আকাশ লাল হয়ে সমস্ত গাঁ ফর্সা হয়ে উঠল। আগুন নেভাতে ভেঙে পড়ল হৈ-হৈ করে সবাই। কুয়োতে-পুকুরে জল নেই তেমন, এক আধটু তলানি-মতো পড়ে আছে। তবু পাড়ার লোকেরা সারবন্দী দাঁড়িয়ে কলসীর পর কলসী জল তুলতে লাগল। দূর থেকে ছুঁড়ে দিতে লাগল জল—সামনে যায় কার সাধ্যি ?"

"তাহলে আগুন নিভলনা ?"

"মুখুয্যে বাড়ির একটি ঘরও বাঁচলনা। হাঁউ মাউ সুরু হয়ে গেল চারদিকে। পাড়াশুদ্ধু, গাঁশুদ্ধু ঘর পুড়ে ছাই হবে বলাবলি করতে লাগল সবাই—কেউ আর এগোতে চাইলনা।"

"তোমরা কি করছিলে ?"

"ন'কাকার সঙ্গে আগুন দেখতে গিয়েছিলাম—লোকজনদের কথা শুনে ভয় লেগে গেল ! ন'কাকা বললেন, তোরা বাড়ি যা—আমি আসছি ! মুখুয্যে বাড়ির লাগোয়া চক্রবর্ত্তীদের রান্নাঘর —হায় হায় করছেন তখন চক্রবর্ত্তী-বাড়ির মেয়ে-পুরুষরা—ঘটি বাটি বাক্স প্যাঁটরা ঘর থেকে টেনে এনে মাঠে নিয়ে জড় করছেন। ন'কাকা ছুটে গিয়ে চক্রবর্ত্তীদের বাড়ির ভেতর ঢুকলেন !"

"কেন ?"

"কেন গেলেন আমরাও তাই ভাবছিলাম। খানিকক্ষণ পর দেখতে পেলাম ন'কাকাকে। যখন দেখতে পেলাম, দেখলাম ওঁকে রান্নাঘরের চালার উপর—একটা মস্ত ন্যাকরার পুটলি হাতে। দাদা বললেন, ভিজে কাঁথা ! তুবড়ির ফুলকির মতো আগুনের হলকা এসে পড়ছিল রান্নাঘরের চালায়, ভিজে কাঁথা চেপে-চেপে ন'কাকা তাই নিভিয়ে দিচ্ছিলেন ! চালার উপর সে কি ছুটোছুটি ন'কাকার ! দেখে আমার মাথা ঘুরছিল !"

"আগুন নেভাতে পারলেন ন'দাদু ?"

"চক্রবর্ত্তী-বাড়ি বাঁচল, আগুনের জিভও তা-ই গুটিয়ে গেল—রাত দুপুরে বাড়ি ফিরে এসে খবর বল্‌লেন ন'কাকা। আমরা সবাই জেগে গুটিসুটি হয়ে বসেছিলাম, মা বলছিলেন ঘুমোতে—ঘুমোব কি, কারো চোখে কি ঘুম ছিল ?"

"তোমরা সাবাস দিলেনা দাদুকে ?"

মনে পড়ে, মা তখন হাসলেন। হেসেছিলেন তাই মনে পড়ে, হাসির নক্সাটা মনে পড়ে না। তবু ভেবে নিচ্ছি—সুন্দর কোনো স্মৃতি মনে পড়লে যেম্নি কান্না-হাসি এক সঙ্গে মিশে যায় হয়ত তেম্নি কান্নাহাসি মেশানো একটা ছবি ফুটে উঠেছিল মার চোখে আর ঠোঁটে।

"হাত-পা মুখে কালি-ঝুল মাখা, তা-ই স্নান করতে গেলেন ন'কাকা ! সবাই যে যার বিছানায় চলে গেল। আমি বসে রইলাম। স্নান সেরে এসে বললেন, "একটা ফোস্‌কা দিয়ে গেল ব্যাটা, ওম্নি ছেড়ে দিলেনা। নারকেল তেলে চুন গুলে খানিকটা মলম তৈরী করে দে ত মিনু !"

"কোথায় ফোসকা পড়ল ?"

"বাঁ-হাতের উপর।" দেখে আমার রা বন্ধ হয়ে গেল। কি সর্ব্বনাশ—বাটির মতো এত্তোটা জায়গা পুড়ে কাল্‌সে হয়ে গেছে ! ন'কাকার হুঁসই নেই,

হেসে বল্‌লেন : 'দেবতার সঙ্গে লড়াই করতে গেলে এম্নি হয় খানিকটা—ও কিছু নয়।' মলম মাখিয়ে দিলাম—চুপি-চুপি বললেন তিনি : "অনেকদিন সেবা পাওয়া যাবে, কি আরাম বল্‌ ত!"

মা সেদিন ন'দাদুকে লুকিয়ে রাখেননি, বাবাকে লুকিয়ে রাখেননি, লুকোতে চাননি নিজেকে কিন্তু পান্নু ভাবছিল শুধু ন'দাদুরই কথা। অনেক বড়— বিশাল হয়ে উঠেছিল তার চোখের উপর ন'দাদুর চেহারাটা। ঝড়ের মুখে কার্ত্তিকদার চেহারাটারই মতো। আগুন নিয়ে খেলা করেছেন ওই ছোট্ট মানুষটি, কেউ ভাবেনি উনি এ খেলা খেলতে পারেন! সবাই হয়ত অবাক হয়ে ভাবছিল এ কি কাণ্ড করছে ঘোষাল বাড়ির ন'কর্ত্তা! পান্নুও ঠিক তা-ই ভাবত। হয়ত বলত "ন'দাদু, তোমায় একটা মেডেল পরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে—সার্কাসে সিংহের সঙ্গে যারা লড়াই করে তারা যেম্নি মেডেল পায়, তোমারও তেম্নি মেডেল পাওয়া উচিত!" উত্তরে যে কি বলতেন ন'দাদু তা ভেবে পেতনা পান্নু কিন্তু দীপায়ন জানে সে-উত্তর! ন'দাদু বলতেন : "তোর ছেলে কি বলছে শোন, মিনু! তুই ত আমায় ক'দিন মলম মাখিয়ে দিয়েই খালাস!"

পাঁচ

১৯৪৩ ইং॥

পাতার মোটামুটি একটা নক্সা ফুলে বা ফলে থেকে যায়। আমাদের ভেতরও ছেলেমানুষের একটা-দু'টো নক্সা কিছুতেই মরতে চায়না। বুড়ো হতে চলেছি কিন্তু ছেলেবেলাকার মন সবটুকু হারিয়ে ফেলিনি। যা রয়ে গেছে তা আর যাবেনা! নিজের দিকে নিবিড়ভাবে তাকালে, বৌদ্ধ মনোযোগ নিয়ে তাকাতে পারলে, সবাই হয়ত এই আশ্চর্য্য ঘটনাটা আবিষ্কার করতে পারেন। অত্যন্ত জ্ঞানীপুরুষ বা নিরেট কঠোর মানুষও একেক সময় নিজের ছেলেমানুষির স্বাদ পেয়ে মনে-মনে নিশ্চয়ই হেসে ওঠেন। আর মেয়েদের বেলায় ত এ স্পষ্ট পরিষ্কার। বর্ষিয়সী অনেক মহিলাকে দেখেছি কচি-খুকির মতোই আব্দার করেন! আব্দার করা-টা যেন কিছুতেই ভুলতে পারেন না ওঁরা। কোন প্রৌঢ়া যখন প্রগাঢ়যৌবনার সাজসজ্জা করেন, তাতে আমি যৌনতার স্মৃতি-রোমন্থন তেমন দেখতে পাইনে, দেখতে পাই একটি অপরিণত মন যা ছেলে-বয়সের বেড়া ডিঙিয়ে আসতে পারেনি।

সুপর্ণাকে দেখে আজ আমি ছেলেমানুষ হয়ে গেলাম—বীণাদির মেয়ে সুপর্ণা। বাসবের ডানহাত নীলু—নীলাঞ্জন সেন—বীণাদির ছেলে। অথচ আমি জানতামনা কিছুই! বীণাদি বেঁচে নেই শুধু তা-ই জানতাম। কিন্তু এ খবর কোনদিনই পাইনি যে সুপর্ণার চোখে-মুখে সে হুবহু রয়ে গেছে। বীণাদিকে যখন মনে পড়ত, দেখতে পেতাম রাজপুতানার বালুর ঝড়ে হারিয়ে যাচ্ছে একটি মেয়ে—হারিয়ে যাচ্ছে—হারিয়ে গেছে। আজ জানলাম; বীণাদি হারায়নি, হারায়নি পানুও!

নীলুরও অবাক হবার কথা। 'দীপায়নদা'র যে আরেক পরিচয় আছে তারই মাসীমার কাছে, লীলাদি ওদের বাড়ীতে এসেছেন বলেই কাল প্রথম তা শুনতে পেলো ও। তারপর নিমন্ত্রণ। কে জানত অতীতের একফোঁটা আলো এখনও টলমল করছে আকাশে আর এ তারই নিমন্ত্রণ।...

ত্রিশোত্তর বিগত-যৌবন পানু আর পঞ্চাশের প্রৌঢ়া লীলাদি—যেন আরেক

জীবনে, অন্য কোনো সমাজে আমাদের দেখা হল। জাতিস্মরের মতো একটু-একটু মনে পড়ছিল, লীলাদির যে-হাসিটা মোটা চামড়ার ভাঁজে এখন কদর্য্য দেখাচ্ছে একদিন তা কেমন সূক্ষ্ম অথচ মসৃণ দেখাত—ঘোলাটে চোখগুলো কতো স্বচ্ছ ছিল একদিন! গলার স্বর তেম্নি আছে, তবু কি যেন নেই তাতে—নেই যেন ধার, নিবিড়তা, কারুকার্য্য। লীলাদিও হয়ত দেখতে পাচ্ছিলেন পান্নুর অনেক কিছুই নেই। তবু প্রথা-মতো আনন্দিত হয়ে উঠলেন তিনি: "বাঃ তুমি ঠিক তেম্নি আছো—আমি ভেবেছিলাম, কি এক বিরাট পুরুষকেই না-জানি দেখতে পাবো!"

"কেন, বড় কি আমি হইনি লীলাদি—বুড়ো?" লীলাদির মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে লজ্জিত হবার দায় থেকে মুক্ত হলাম।

"কিন্তু নীলু যা ভীষণ বর্ণনা করে তোমার তা আর কোথায়—আমি ত আমাদের পান্নুকেই দেখতে পেলাম!"

লীলাদির-পাশে-দাঁড়ানো মেয়েটির নিবিড়তা চঞ্চল হয়ে উঠল—আর আমার চোখের সামনে বীণাদি এসে দাঁড়ালেন - আমি যে-বীণাদিকে অনুভব করতাম সেই বীণাদি। একই জায়গায়, একই চেহারায় রয়ে গেছে সে—শুধু আমি চলে এসেছি আঠারো বছর পার হয়ে।

হয়ত আমার চোখে-মুখে ক্লান্তি ফুটে উঠেছিল, বিষণ্ণতাকে ফুটতে না দিলে যেম্নি হয়, বলেছিলাম: "নীলুর কাছে আমি দীপায়নদা হতে পারি--কিন্তু আপনাদের কাছে ত পান্নুই!"

লীলাদি একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাসে পান্নুকে সম্ভাষণ জানালেন—হয়ত তাঁর মনেও বীণাদি এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁর ছোট বোন বীণা, যে আজ নেই কিন্তু ছিল একদিন, এখানে—এ-ঘরবাড়িতে—এ সংসারে আর তার আগে ছিল একটি মফঃস্বল সহরে, প্রফেসরের মেয়ে ইস্কুলে পড়ত, ভালো লাগত তার একটি প্রতিবেশী ছেলেকে, পান্নুকে!

আমি আর লীলাদি কথা না বলে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে পারতাম কিন্তু সুপর্ণা হাসছিল, বুঝতে পারছিলাম কথা বলবার সুযোগ খুঁজছে—তাই বললাম, "নীলুর বোন তুমি—না?"

"বাঃ, তুমি ওকে চেনোনা?" অবাক হলেন লীলাদি। তাই হয়ত যে নামটি

অনুচ্চারিত ছিল এতোক্ষণ, আমাদের মনে ছিল, অসাবধানতায় লালাদি তাকে বাইরে টেনে আনলেন : "বীণার মেয়ে—একটিই মেয়ে।"

"চিনতে পেরেছি।" মরা হাসিতে আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। 'বীণা'- কথাটার ধ্বনি অসহ্য ঠেকছিল আমার কানে।

অসহ্য ঠেকছিল হয়ত সুপর্ণারও কানে—যার পরিচয়ে নিজেকে পরিচিত করতে হয়ত ভালো লাগছিলনা ওর—কাজেই কথা বল্‌ল সুপর্ণা, বল্‌ল : "আমাকেও পানু ডাকে সবাই।"

কথা নয়, অবাক হয়ে ধ্বনি শুনছিলাম আমি—পুরোনো কোন ধ্বনি যেন আকাশে জেগে উঠ্‌ল আবার—প্+আ+ন্+উ - এ-চারটি চিহ্নেরই ধ্বনি—বীণাদির ভগ্নী-কণ্ঠ।

"তাচ্ছিল্যে পানি আর আদরে পানু—" ব্যাকরণ বলে' খিল্-খিল্ করে হেসে উঠল সুপর্ণা।

অনেকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে থাকা যায়না বলেই খুসী-খুসী দেখাতে হল আমাকে, বলতে হল : "ও-নামটার উপর এখন আর আমার স্বত্ব নেই, কাজেই তুমিই তা ভোগ-দখল করতে থাকো!"

একটি সুন্দর বিকেল কাটল আমার। কতদিন পরে যে তার হিসেব নেই! জাপানী ফ্যাসিস্তদের রুখবার প্ল্যান-প্রোগ্রাম নেই, বাসবের সঙ্গে কুইট-ইণ্ডিয়া নিয়ে তর্কের ঝড় নেই, নীলুর অস্বস্তি দেখে দুঃখিত হবার কারণ নেই, প্রমিতার বিদ্রূপ নেই একটি কবোষ্ণ পরিবেশ! হাওয়ার তুলি ছোট-ছোট হাল্কা রেখা বুলিয়ে দিল মনে। ভালো লাগ্‌ল। কি অদ্ভুত ভালই না লাগল বিকেলটা।

ব্যথার একটু স্মৃতি না থাকলে কি এতো ভালো লাগে কোনো সময়কে, কোনো সঙ্গকে, কোনো স্থানকে? সবসময়ই তখন ব্যথার একটা ছায়া ফেলে আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল বীণাদি। ছায়া থেকে সরে এসে নিজের আলোতে দাঁড়াতে চেষ্টা করছিল অবশ্য সুপর্ণা। কিন্তু কার কাছে সে নিজের আলো নিয়ে দাঁড়াবে? আমার কাছে? তা কি হতে পারে? * * *

"এই পানু—" সুপর্ণার মতোই খিল্-খিল্ করে হেসে উঠ্‌ত বীণাদি : "লক্ষ্মীছেলে—একগাছি বেগনি সুতো এনে দাও আমায়—ওরা কেউ রঙ চিনে আনতে পারেনা!"

বীণাদিকে আসতে দেখে কেমন যেন একটু লজ্জা করত—পালাতে চাইত

পান্নু। কিন্তু লক্ষ্মীছেলের বিশেষণ তার পাগুলো থামিয়ে দিত। অক্ষম পলাতক হাসতে সুরু করত ধরা দিয়ে। যেন লঙ্কা-নরম।

ইঞ্চিখানেক একটা রেশমী-সুতো পান্নুর হাতে গুঁজে দিতে গিয়ে বীণাদির কপাল ঠুকে যেতো পান্নুর কপালে। তারপর ঠুকে-যাওয়া জায়গায়টায় যেন আদর বুলোতে সুরু করত বীণাদির কপালের চুলগুলো!

"বেগনি সুতোয় এম্ব্রয়ডারি করে কেউ?" রুচিবান সমালোচক প্রশ্ন করত।

"কেন, কি হয়েছে?"

"অতো চড়া রং—"

"চড়া রং-ইতো ভালো!"

"ভালো হলে দিও—কিন্তু আমার রুমালে নয়।"

"তোমার রুমালে ফুল-তুলতে বয়ে গেছে আমার—" বীণাদি পান্নুর চেয়ারটাতে বসে দাদার ফটোটার দিকে তাকিয়ে পা দুলোতে থাকত।

পান্নু জানত বাইরে যাওয়া তার হবেনা, অন্তত দু'ঘণ্টার জন্যে বীণাদি এখানে আছে। রামায়ণের পাঁচ-সাত পৃষ্ঠা পড়বেন মা, একঘণ্টা ঘুমোবেন, জেগেও শুয়ে থাকবেন চুপচাপ পনেরো মিনিট, তারপর যদি বাইরে বেরোন। বাবা কোর্টে—পান্নুর ছুটি। সব জেনেশুনেই বীণাদি গল্প করতে আসে। কোনোদিন হাতে থাকে সুতোর নমুনা, কোনোদিনবা একটা বাঁকা চুলের কাঁটা। খালি হাতেও আসে কোন-কোন দিন, তখন বলতে হয়: "একটা বই দাওনা পান্নু, পড়ব।" কিন্তু গল্পের শেষে যখন চলে যায়—তখন বই-এর কথা মনে করিয়ে দিলেও নেবার ইচ্ছে তার থাকেনা।

"বই পড়তে ভালো লাগেনা তোমার?" বীণার দুর্বোধ্য ব্যবহারে পান্নু অবাক হয়।

"একটুও না!"

"তাহলে ম্যাট্রিক পাশ করলে কি করে?"

"তখন পড়তে ভালো লাগত বলে!"

"একবার ভালো লাগলে খারাপ লাগে না কি কোনদিন!"

পায়ের দুলুনি বেড়ে যায় বীণাদির: "লাগে। খুব লাগে।" দাদার ফটোটার দিকে তাকিয়ে সে ঘাড় নাড়তে সুরু করে। তারপরই মুখ ফিরিয়ে এনে হাসতে থাকে, তাড়াতাড়ি বলতে চায়: "সব মিছে কথা! কেন

খারাপ লাগবে ? কিন্তু কে আমায় পড়াবে ? এখানকার কলেজে ত আর মেয়েরা পড়তে পারে না ! কলকাতা যেতে হয় !''

''বেশত, কলকাতাই না-হয় যেতে !''

"থাক্—তোমার ওসব বাজে কথায় কাজ নেই !"

ফেল না করেও কেউ পড়া ছেড়ে দেয়, পান্নুর তা জানা ছিলনা। জেনে ব্যথিতই হল পান্নু—আর মনে হল, পড়ার কথায় বীণাদিও হয়ত ব্যথা পায়, তাই ওসব আবোল-তাবোল বকতে সুরু করে। পান্নু নিঝুম হয়ে যায়। বেশ ভালো লাগে তার চুপচাপ বীণাদির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে। বীণাদির মুখ থেকে ধীরে-ধীরে হাসি মুছে যাচ্ছে—বেশ লাগে দেখতে।

"দেবু-দা কবে ফিরে আসবেন, পান্নু ?" হঠাৎ বীণাদি ঘরটাকে থম্‌থমে করে তোলে।

"চিঠি দেয়নি।"

"লিখতে পারেন না, জানি !"

কি করে জানে বীণাদি ? মা বলেছেন ? মা-ও বা কি জানেন ? দাদার খবর ত কেউ জানেনা—পুলিশ-অফিস থেকেও কোনো খবর আনতে পারেন নি বাবা।

"জানো ?" পান্নুর গলাটা কেমন যেন বোকা বনে যায় !

"দুর—কি করে জানব আমি ?" আবার হাসতে সুরু করে বীণাদি—পান্নুর পাশে গা-ঘেঁষে এসে দাঁড়ায় : "লেখা-পড়া করা ভালো, তাই না ? তোমার টেষ্ট-পরীক্ষার পর তোমায় আমি পড়াব !"

''সত্যি ?" পান্নু খুসী-খুসী চোখে তাকায়।

মাথা হেলিয়ে দিয়ে পান্নুর মুখ ছুঁয়ে ফেলতে গিয়ে মুখ সরিয়ে নেয় বীণাদি—দু'আঙুলে পান্নুর ঠোঁটের উপর একটা টুস্‌কি দিয়ে বলে : "খুব সত্যি !"

টুসকি নয়, বীণাদির গরম নিশ্বাসের ছোঁওয়াটাই যেন অনেকক্ষণ ধরে পুষে রাখতে চায় পান্নুর মুখ। এতো ভালো লাগে ! ইচ্ছে হয়, আবার এম্নি আদর দেখাক বীণাদি—আবার, অনেকবার।

কিন্তু এবার বীণাদি পান্নুর মাথার উপর আঙুলগুলো ছড়িয়ে দেন : "তোমার চুলগুলো ভারি নরম আর হাল্কা !"

"কিন্তু তোমার মতো কালো ত নয়!"

"কালো চুল বুঝি ভালো?"

"চুল ত কালোই হবে!"

"উহুঁ। খয়েরী। আর সিল্কের মতো নরম!"

রুচিবান সমালোচক চুপ করে থাকে। প্রশংসার রোদ পোহাতে ভালোবাসে মানুষের স্নায়ু। গাছের ক্লোরোফিলের মতো তখন নিরিবিলি সজাগ সচেতন হয়ে ওঠে তপন-দেহীরা রাধা-রঙে।

"আর চোখ?" একটা অদৃশ্য আয়নায় মুগ্ধ পানু নিজের মুখ দেখে চল্‌ছিল।

"চোখ হবে কালো—চোখের তারাও। পিছিগুলো ঘন আর বড়ো, মনে হবে কাজল পরে আছো!"

"আমার চোখ তেমন নয়—" একটু দুঃখিত দেখায় পানুকে।

"পুরুষের চোখ কি আর তেমন হলে মানায়?"

দুঃখিত পানু জিজ্ঞেস করে: "কেন নয়, বীণাদি?"

বীণাদি পানুর চোখের গায়েই যেন চোখ বুলিয়ে আনে: "মেয়েদের চোখের চাইতে ঢের সুন্দর তোমাদের চোখ—দেবুদার আর তোমার! ঠিক একই রকম দুজনের—ঝক্‌ঝকে!"

খুসী হতে গিয়েও কেমন একটু বাঁধ-বাঁধ ঠেকে পানুর। দাদার ফটো-টার উপর এক পলক তাকিয়ে খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে থাকে।

বীণাদি এবার নিজের হাতের উপর পানুর হাত টেনে নিয়ে বলে: "ঈস কি নরম তোমার হাত মেয়েদের মতো তুল্‌তুলে! পুরুষের হাত এমন হতে নেই!"

কথাগুলো কানে আসছিল পানুর। শেষ কথাটা বলে' পানু ভাবছিল, বীণাদি হয়ত তার হাত ছেড়ে দেবে—কিন্তু তা নয়। হাতট তার রয়েই গেল বীণাদির হাতের উপর আর সেই আগেকার নিশ্বাসের মতোই মনে হল তার হাতের ছোঁওয়াটুকু। খুসীর বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে—পানু বুঝতে পারছিল।

"কখন পড়াবে তুমি? দুপুর বেলা?"

(এ-দুপুর ফুরোলেও ফিরে আসুক আরো দুপুর!)

"যখন বলবে!"

"যখন বলব তখনই আসবে ? তোমার বুঝি আর বাড়িতে কাজ নেই।"

"আছে, এমব্রয়ডারি।"

"তা বুঝি একটা কাজ ?" মিছিমিছি হেসে উঠল পান্নু।

'বাঃ কাজ নয় ? কী সুন্দর একটা ডালিয়া তুল্‌ছি টেবিল-ক্লথে।"

"জানি-জানি তুমি ডাল রান্না করতে পারোনা—লীলাদি কি চমৎকার রান্না করতেন !"

"তেম্নি আবার পান্নুকে পড়াতে পারতেন না দিদি !"

"তুমি টিচার হতে চাও, না বীণাদি ?—তোমাদেরই স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের মতো।"

"দেবুদা তা-ই হতে বলতেন।" স্পষ্ট পরিষ্কার শোনাল বীণাদির গলা। হাত তুলে নিয়ে পান্নুর কপালের চুলগুলো এপাশ-ওপাশ করতে লাগল সুতন্বী—মনে হল কথা তার ফুরিয়ে গেছে, আর কথা বলবেনা। কিন্তু তারপরও বল্‌লে, হঠাৎ কোনো জরুরী কথা মনে পড়লে যেমন আঁৎকে ওঠে গলা, তেম্নি গলায় বললে : "ইস, কী রকম ছোট কপাল তোমার পান্নু, মেয়েদের মতো !"

দু'বছর পর স্কটিশে দীপায়নকে পেলাম। মাত্র দু'টো বছর—সাত শ' তিরিশটি মাত্র সূর্য্যাস্ত—কিন্তু তাতেই যেন পান্নু চিরদিনের মতো অস্ত গেছে। আর আমিও ছোট্ট সেই 'অনি' নই, লম্বা-চওড়া অনিরুদ্ধ ঘোষাল। দু'টো বছর যে মানুষের শরীরে আর মনে এতো প্রচণ্ড কাজ করে যেতে পারে, দীপায়নকে না দেখলে হয়ত তা কোনদিনই জানতাম না। ওর ঠোঁটের উপর কালো-হয়ে আসা গোঁফের রেখা আর গালের উপর এগিয়ে-আসা জুলফির জন্যেই একথা বলছিনে, সমস্ত মুখটাই ওর কেমন যেন থম্‌থমে মনে হল, আর কথার ভঙ্গীতে মনে হ'ল, ও যেন থেমে পড়তে চায়। গম্ভীর ? ঠিক তা তা নয়। ব্যথিত। কিন্তু দেবুদার অন্তরীণের পর ওর মুখে যে-ব্যথা দেখে এসেছিলাম, এখনকার ব্যথাটার চেহারা যেন তার চাইতেও অন্যরকম। মনে হচ্ছিল, ব্যথাটাকে উপভোগ করছে দীপায়ন, রোদের মতো, হাওয়ার মতো, ঝর্ণার জলের মতো, জ্যোৎস্নার ঝর্ণার মতো।

যে-ছেলেরা সহুরে হবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করত, তাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল সহপাঠিনীদের কাছে নিজেদের জাহির করা। ফল যে খুব নিশ্চিত ছিল তা নয়। বিয়ের ফাঁড়া কাটিয়ে যাঁরা কলেজ-পড়ুনি হয়েছে, অনন্যধর্ম্মা হয়ে লেখাপড়া করার একটা বিরাট দায়িত্ব কি তাঁদের মাথায় উপর ঝুলছেনা ? পুঁথিগত দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করা চলে না ত! তোমরা তাকাতে পারো আমাদের দিকে, কিন্তু আমাদের যদি মুখ তুলতেই হয়, মুখ তুলব আমরা মাষ্টারমশাই-এরই মুখের দিকে, তোমাদের দিকে নয়। নিজেদের মধ্যে এক-আধটু গা-টেপাটেপি করি আমরা, কিন্তু তা কেন ? ভাবছ—উস্‌খুস্‌ করছে আমাদের চিত্ত ? মোটেই না। তোমাদের ত আমরা জানি, বোকার মতো যে তাকিয়ে আছো জানি তা—মজা পাই, তাই গা-টেপাটেপি করি। অবশ্য আমারও তা-ই মনে হত। কিন্তু সত্যেন তার বব্‌ করা চুলে নজরুল ইসলামের মতো ঝাঁকুনি তুলে চ্যালেঞ্জ জানাত: "তা-ই বুঝি ? ওদের গুমোর চটকে দিতে আর কতোক্ষণ ? নোট-দে'য়া-নে'য়া সুরু করো ত দেখবে মন-দে'য়া-নে'য়া সুরু হয়ে গেছে!" দীপায়ন অন্যমনস্ক হয়ে থাকৃত—টগবগ করে চলত সত্যেনের মুখ: "দীপায়নটা বোকা! ভালো ছেলে, ওরই ত সুযোগ সব চেয়ে বেশি! আমাদের কতো চেষ্টায় এক-আধখান নোট যোগাড় করতে হয়, আর ওর ত নিজের তৈরী নোটই সাঁচ্চা মাল!"

এমন সুবর্ণ সুযোগও দীপায়নের চোখে আলো ঠিকরে দিতে পারতনা —আফ্‌শোসেরই কথা! অবশ্যি মেয়েদের দিকে তাকাতো ও, কিন্তু মনে হ'ত দৃষ্টি ওর রঞ্জন-রশ্মির মতো ওদের ছাড়িয়ে দূরে চলে যাচ্ছে, এতোগুলো স্থূল শরীরের কোথাও আটকাচ্ছে না। রঞ্জন-রশ্মি বলেই হয়ত তার উপর চুম্বকের আকর্ষণ নেই।

"এরা কেউ বীণাদির মতো নয়, জানিস অনি—" ছোট-ছোট রেখায় ব্যথাটা নড়েচড়ে উঠ্‌ত দীপায়নের মুখে: "কিন্তু বীণাদি কলেজে পড়তে পারল না!" বীণাদিকে আগে খুব বেশি শুনেছি বলে মনে পড়ে না কিন্তু এখন দিনে অন্তত দশবার দীপায়নের মুখে এই দুর্লভ দিদিটির নাম শুনতে হ'ত। প্রতিবেশিনী বীণাদিকে হঠাৎ এম্নি পেয়ে বসল কেন ওর মন ? আর পেলেই যদি, তাহলে আবার মন-খারাপ হয়ে উঠ্‌ল কেন ? ধর-ব্রাদার্স থেকে রুবি কলমের সঙ্গে এক-প্যাকেট নীল খাম আর চিঠির কাগজ কিনে এনেছিল দীপায়ন—

চিঠি লিখত বীণাদিকে, এক-একটি চিঠি দু'তিনদিনের আগে শেষ হতনা— চিঠি লিখত, চিঠি আসত বীণাদির, তারপরও মন-খারাপ। বীণাদি কলেজে পড়তে পারলোনা—তাও কি আবার একটা মন-খারাপের কারণ হতে পারে? এমন ত কতো মেয়ের বেলায়ই হয়—অনেকের বেলাই হয়!

হয়ত ক্লাশ করে হস্টেলে ফিরে এসে শিশির-ভাদুড়ি দেখতে যাব কি না ভাবছি—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুনী চালাচ্ছে দীপায়ন—হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে কেমন-একটু দার্শনিক ভঙ্গীতে হেসে হয়ত বললে: "মেয়েরা আমাদের খুব ভালোবাসে, না অনি?"

"তাই না কি?" ওর এই মহৎ আবিষ্কারে বিশেষ কৌতূহল ছিলনা আমার।

"হু।" খাটে-চড়াও হয়ে কথকতার আয়োজন করল ও।

"নিজের চেহারা দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনে পড়ল বুঝি কথাটা?"

"তা কেন?" দীপায়ন ক্রমে লজ্জিত হতে শুরু করল: "যাঃ—তাই বুঝি? কি সব বাজে কথা বলিস! সব ছেলেকেই ভালোবাসে মেয়েরা।"

"সব মেয়েকেই যেমন ভালোবাসে ছেলেরা!"

"উঁহু।"

ওর ঠোঁট টিপে আপত্তি জানানো দেখে মনে হল ভুল একটা নিশ্চয় করেছি কোথাও। যাকগে, ভুলের বেড়া ডিঙোবার চেষ্টা দেখি ত এখন: "তোর শেফালির খবর কি? সেই গাঁয়ের বাচ্চাটির?"

"ভারি সুন্দর হয়েছে দেখতে শেফালি, আর খুব কথা বলতে শিখেছে। আর কী ভালো যে রাঁধতে পারে! চিঁড়ের মুড়িঘণ্ট আর পায়েস খাওয়ালে আমায় দু'-দিন! পিশিমাও বল্‌লেন, ঠিক-ঠিক পায়েস রান্না করা নাকি ভীষণ কঠিন, 'পানুর ভাগ্যিতে হাত খুলে গেছে শেফালির!'—বললেন।"

"খাওয়ালে ত, কিন্তু ভোজন-দক্ষিণা?"

দীপায়ন হাসতে সুরু করল, মোনা লিসার ওষ্ঠের মতো ওটা হাসি, না কি একটা আশ্চর্য্য সুন্দর কারুকার্য্য, ঠিক বোঝা গেলনা।

"তা-ও পেলাম।" বললে ও: "একসময় আমার সঙ্গে নিরিবিলি হতে পেরেই শেফালি গাঢ় চোখে তাকিয়ে বল্‌লে: 'পানুদা সত্যি তা-ই।' 'কি রে?' 'সত্যি এতো মন দিয়ে রাঁধিনি আর কোনোদিন!' কী সুন্দর আর ভরা-ভরা

দেখাচ্ছিল যে শেফালিকে তখন!" থেমে গিয়ে দীপায়ন এবার ঠোঁটদুটোকে সত্যিকার হাসির ভঙ্গীতে সাজিয়ে নিলে: "মানিক ওকে তখন দেখলে অবশ্যি বল্‌ত শেফালিটা কী সাহসী!"

মানে? শেফালির কথায় মানিক এসে উপস্থিত হতে পারে, কিন্তু টিপ্পনীকার হিসেবে ত নয়! আমি যখন ছিলামনা—এদু'বছরে অনেক কিছু হয়েছে তবে—অনেক কথা, অনেক ঘটনা? এ-বি-সি-ডিই আমি জানিনে, দীপায়ন এসে হঠাৎ 'জেড্' বলে বসলে নিরুপায় না হয়ে আমার উপায় কি?

বোকার তিন দফা হাসির প্রথম দফা আমার মুখে নিশ্চয়ই উঁকি দিয়েছিল তখন, তাই দীপায়নই আবার বলতে সুরু করলে: "যতো অদ্ভুত কথা মানিকের। একবার বাইনাচ দেখতে গিয়েছিলামনা আমরা? তারপর থেকেই মানিকের এই অদ্ভুত কথা! 'মেয়েরা খুব সাহসী, না পানু?—' বলত ও: 'নইলে ওদের বুক অতো উঁচু হয়!'—মানিকটা যে কি"—মৌরি-হাসির আভাস ফুটে উঠল দীপায়নের ঠোঁটে—একটু মিষ্টি, একটু ঝাঁজাল।

ওটা আমাদের বুদ্ধিমান হবার বয়েস বলেই হয়ত মানিকের নির্বুদ্ধিতায় হাততালি দিয়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করেছিল। কী বোকা—সত্যি কী বোকা মানিকটা! বোকটা এখন কোথায় পড়ছে? মফঃস্বলের কলেজেই ভর্ত্তি হয়েছে ত? প্রতুল আর সুরজিৎ? হার্ম্মাদরা কোথায়?

সব—দল বেঁধে সবাই ওই সহরের কলেজেই থেকে গেল! এক পানু এখানে। বাবা রাজি হলেন না ওখানে ওকে ভর্ত্তি করাতে। ওখানে পড়তে গিয়েই ত দেবুর মন বিগড়ল—মফঃস্বলের খেলো-মেলা হাওয়া পড়ার পাট উড়িয়ে দেয়—দেয়াল-ঘেরা কলকাতার হষ্টেল ঢের ভালো।

উকীল মানুষ বাবা—তাই মনস্তত্ত্বও ঘেঁটেছিলেন খানিকটা। একা একা কলকাতার হষ্টেলে থাকতে গেলে বাড়ির জন্যে মনও একটু খারাপ হয়ে থাকবে, মনে আর সহজে পলিটিক্স ঢুকতে পারবে না। বড্ড একা পড়ে গেলেন বলে মার আপত্তি ছিল কিন্তু মা কি ছেলেকে বাঙালী করে রাখতে চান, মানুষ হতে দেবেন না? বাবার এই রাবীন্দ্রিক যুক্তি শুনে পানু না কি অবাক হয়ে ভাবতে লেগেছিল, বাবা রবীন্দ্রনাথও পড়েছেন কিন্তু দেখে ত মনে হয়না আইনের ওই গুঁড়ো-গুঁড়ো ভরাট লেখার বইগুলো থেকে জীবনে আর কোনো দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছেন!

খানিকক্ষণ ঘরোয়া আলাপের পর আবার বীণাদি এসে উঁকি দিল দীপায়নের কথায়। আর তারপর দীপায়নের গলায়ই বীণাদি কথা বলতে সুরু করে দিল অসঙ্কোচে। "বীণাদি বলেছিল আমায়, যেদিন কলকাতা আসব তার দু'দিন আগে—কি বলেছিল জানিস্ অনি—বলেছিল :

'আমি যখন থাকবনা, তোমার কি রকম লাগবে, পানু ?'

'থাকবেনা ?' অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

'যখন আর কোথাও চলে যাব তখন—আমাকে ভুলে যাবেনা ?'

'কোথায় যাবে ?' ব্যাপারটা যে কি কিছুতেই ধরতে পারছিলামনা।

যেম্নি করে বড়দির ছেলেটাকে কোলে তুলে নেয় আমাকেও ঠিক তেম্নি জড়িয়ে ধরল বীণাদি—জড়িয়ে চুপ করে রইল—ওর থুতনির চাপ লাগছিল আমার মাথায়, আমার বুকের পাশে হাতের উপর ওর বুকের নরম একটা তাপ। দু'মিনিট, আড়াই-মিনিট, গা হেলিয়ে আমিও চুপচাপ বসে রইলাম। হঠাৎ মনে হ'ল থুতনিটা কাঁপছে বীণাদির—আঁচল-জড়ানো হাত তুলে নিচ্ছে মুখের উপর। তাকাবার জন্যেই মাথা সরিয়ে নিতে হল আমাকে—দেখলাম বীণাদি ভীষণ চোখ রগড়াচ্ছেন—চোখে চোট লাগলে যেম্নি করে!

'কোথায় যাচ্ছ তুমি, বীণাদি ?' আবারও বললাম বোকার মতো।

'মেয়েদের চলে যেতে হয়না !' থেমে-থেমে বলে হাসতে চাইল বীণাদি। ও, হঠাৎ যেন মনে পড়ল আমার, শেফালির মতো বীণাদিরও ত বিয়ে হয়ে যাবে! আশ্চর্য্য, এতোক্ষণ কিছুতেই বুঝতে পারছিলামনা কথাটা। কিন্তু শেফালি ত ছোট ছিল, বীণাদির মতো এতো বড়ো মেয়েরও বিয়ে হয়ে যায় ? তারপর চলে যায় কোথায় তার আর খোঁজ থাকেনা!

'পানু—' কেমন-যেন ভিজে ভিজে আর ভরা-ভরা শোনাল বীণাদির গলা। আওয়াজটাকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমি। কি রকম তার চেহারা বল্‌ব ? স্নান সেরে চৌবাচ্চার ঘের থেকে যখন বীণাদি চুলে গামছা জড়িয়ে বেরিয়ে আসত, তখন তাকে যেমন দেখাত ঠিক তেম্নি। এমন ভালো লাগছিল দেখতে কথার সেই ছবিটা! কিচ্ছু আর বলতে ইচ্ছে করছিলনা।

'আমি একটুও ভালো না—না পানু ?'

'কেন ?' ঠোঁট নড়ছিল আমার কিন্তু ভাবছিলাম কথা বলতে যদি ঠোঁটও না নড়ত!

"কি জানি! মনে হয় ভালোনা। তোমার মনে হয়না ?'

কী যে বলে বীণাদি! আমার মনে হবে বীণাদি ভালো নয়? তবে হাঁ, চলে যদি যায়ই বীণাদি, তাহলে মনে হবে।—কি মনে হবে? ভালোনা? উঁহু। ভালোনা মনে হবেনা তখনও। কি যে মনে হবে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না তখন। ভালো লাগবেনা—কিছুতেই ভালো লাগবেনা—শুধু এই মনে হচ্ছিল।

'দেবুদার সঙ্গে হয়ত দেখাই হবেনা আর—' আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল বীণাদি কিন্তু একটা ঢোঁকের সঙ্গে কথাগুলো নিশ্চয়ই গিলে ফেল্‌ল।"

দীপায়ন চুপ করল। মনে হচ্ছিল দরদী গায়ক একটি গান শেষ করলেন। মোটা-মোটা টেবিল-চেয়ার-খাট, স্যুটকেস্‌-খাতাপত্র ভর্ত্তি ঘরটাতে সত্যি যেন কেউ সুরের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। সুরটাকে ঠিক চেনা যায়, কথাগুলোকেও। 'জীবনে যতো পুজা হলনা সারা'—এই কথাগুলো, হয়ত শুনেছিলাম কোনোদিন কাউকে গাইতে, ভুলে ছিলাম অনেকদিন, আজ মনে পড়ল। আবার ঠিক সে-রকম করেই মনে বাজতে সুরু করল কথাগুলোর ধ্বনি, সুরের কেঁদে-কেঁদে-ওঠা। কে? কে গাইল আবার এম্নি একটা গান? পানু—না কি বীণাদি?

"বীণাদি গাইতে জানে, পানু ?"

অদ্ভুত প্রশ্নে চোখে হাঁ নিয়ে তাকাল দীপায়ন।

"গান শুনতে তোর ভালো লাগেনা ?"

"লাগে ত। কিন্তু বীণাদি গাইতে পারে না—" প্রশ্নের উত্তর দিয়েও দীপায়ন প্রশ্নটাকে ধরতে পারলনা।

"গাইতে পারলে কিন্তু বেশ হত!"

"না।" শক্ত ভঙ্গীতে দুপাশে আস্তে-আস্তে মাথা নাড়ল দীপায়ন।

পাশের ঘরে হষ্টেলের গায়ক সিতাংশু 'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল' ঝরিয়ে যথারীতি ভাদুড়ীর সীতা-পালার লোভনীয় বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে চল্‌ছিল—ওর গলাতেই যখন এই, কেষ্টবাবুর গলাতে যে তা কী অদ্ভুত শোনাবে তা ভাবতে গিয়ে সত্যি শিউরে উঠ্‌তাম আমরা আনন্দে। সীতাপালা-সাতবার-দেখা দর্শকও ছিল কেউ-কেউ হষ্টেলে—আর একবার দু'বারের ত সবাই! কিন্তু দীপায়নকে কিছুতেই রাজি করানো যাচ্ছিলনা। সিতাংশুর হৃদয়গ্রাহী

পাব্লিসিটিতেও না। ওর না-যাওয়ার দরুণ ততোটা ব্যস্ত হইনি। হস্তপদাদিযুক্ত জীব যখন আমি, একাই যেতে পারি, তাছাড়া যাওয়ার আন্দোলন তুলে সহযাত্রী জুটিয়ে নেওয়াও কঠিন নয় জানি, কিন্তু সত্যি উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, ওর না-যাওয়ার কারণটা জানতে না পেরে।

দীপায়নের মাথায় ঢুলুনির সঙ্গে-সঙ্গে এখন যেন কারণটা ফণা তুলে আমার চোখের উপর দাঁড়িয়ে গেল—খুসী হয়ে উঠ্‌লাম। কিন্তু দুঃখিত হয়েই জিজ্ঞেস করতে হল: "গান শুনলে কেমন-যেন একটু ব্যথা পাওয়ার মতো মনে হয়, না রে পানু?"

"তা-ই কি?" হাসির একটা সরু রেখা ফুটে উঠ্‌ল দীপায়নের ঠোঁটে।

"মেয়েরা গান গাইলে ত আরো।"

"যাঃ—মেয়েদের গান ত শুনতে বেশ—বেশ লাগে।"

ফণা গুটিয়ে নিয়ে কারণটা উধাও হল। আর সেদিনই আমার প্রথম মনে হ'ল, দীপায়নকে হয়ত ধরা-ছোঁওয়া যাবেনা।

১৯৪৩-এ দীপায়ন নিজেও তা-ই বলেছিল একদিন: "বাসব, মানুষকে কি তুমি এতো সহজই মনে করো—গোল-গোল ব্র্যাকেট দিয়ে তাকে নিটোল-ভাবে ফ্যাক্টোরাইজ করতে পারবে? থেকে যায়, এলোমেলো অনেক কিছুই থেকে যায় তার, যা তোমার ফ্যাক্টরের ফাঁদে ধরা দেয়না! মানুষকে জানা যায়না, যতোটুকু জানি তার চেয়ে অনেক বেশি জানিনে তাকে। ধরা ছোঁওয়া যায়না এমন-কিছু আছে বলেই তার নাম ব্রহ্ম দিয়ে কেউ-কেউ খুসী হতে চেয়েছিলেন—ব্রহ্ম মানে আর কি, একটা বুনো রহস্যেরই ত সমাধান।" হো-হো করে হেসে উঠেছিল দীপায়ন, সবাই যেন শুনতে পেয়েছিল কোনো অদৃশ্য পুরুষ-কণ্ঠের ভয়ঙ্কর একটা সঙ্কেত। মনে হয়েছিল সবার, সে-সঙ্কেত ছড়াতে ছড়াতে দীপায়ন নিজেও যেন দূরে যাচ্ছে, দূরে, বহুদূরে, দিগন্তে! তাকে আর দেখা যায়না, শুধু শোনা যায় একটা গুরু-গুরু হাসি, দিগন্তের বজ্রগর্ভ কোন মেঘের ধ্বনি।

ছয়

এক-একটা হাসিতে ভয় পাইয়ে দিত দীপায়ন। ব্যথিত মানুষ হঠাৎ হেসে উঠ্‌লে যেম্নি ভয়ঙ্কর তেম্নি শোনাত সে-হাসি। কিন্তু কী এমন ব্যথা পেয়েছে দীপায়ন যাতে ওকে ব্যথিত মনে করতে হবে! ভাবতাম। ভাবনাতে আকাশ-পাতাল উপস্থিত হলেও সদুত্তরের যে পাত্তা মেলেনা তা জেনেও ভাবতাম। আর তার ফলে এই সম্বোধিই পাওয়া গেল যে অনেকে, বিশেষ করে পানুর মতো নিরিবিলিতে যারা মানুষ হয়ে ওঠে, ব্যথা কুড়োবার একটা ক্ষমতা জন্মিয়ে নেয়। সম্যক বোধটা মনে-মনেই রেখেছিলাম আমি, তা নিয়ে প্রবীণ দীপায়নকে চ্যালেঞ্জ করবার ভরসা পাইনি। কারণ, তখন, মানুষকে কোনো ছঁকে ফেলে দেখতে চাইলে, দীপায়ন কুরুক্ষেত্রে বাধাতে তৈরী ছিল। মার্ক্সবাদ যে নিজের দেহেই এমন একটি দারুণ অ্যান্টিথিসিস্‌ তৈরী করবে তা কে জানত? বাসব কি ভাবতে পেরেছিল যে দীপায়ন একটি আস্ত সাপ—আর সাপকেই সে পুষে চলেছে, লাল-মলাটের বই-এর খাঁটি দুধ-কলা দিয়ে? অনেকদিন দীপায়নের ব্যথার শাঁসটা দেখবার জন্যে বাসবের খোসা খুঁটতে সুরু করতাম: "বাসব কিন্তু দুঃখিত হয়েছে খুব—।" "দুঃখিত? মোটেও না!"—দীপায়ন একটা ডাক্তারী ঔদাসীন্য ফুটিয়ে তুলত চোখে: "বরং বল্‌ ক্রুদ্ধ। কিন্তু তা হলেও বা কি করা যায়! মানুষ এগোবেই—কোনো একটা বোধে জড়িয়ে থেমে থাকবে না!" ওর শেল্‌ফে-সাজানো মার্ক্স-এঙ্গেলস্‌-মেরিঙ-কাউট্‌স্কি-রোজালুক্সেম্‌বার্গের দিকে তাকিয়ে প্রায়-একটা অন্তিম নিশ্বাস বেরিয়ে আসত আমার, অনুনয়ের ভঙ্গীতে প্রশ্ন করতাম: "একটা যায়গায় তুই-ও কি ঠিক একই রকম থেকে যাসনি, দীপায়ন?" হয়ত তখন মুস্কিলেই পড়ত ও-কেননা উপমা ছাড়া সোজা কথা বলার আর ওর উপায় থাকতনা: "জানিস অনি, মানুষ হয়ত য়ুরেনিয়মের নিয়মেই খানিকটা চলতে সুরু করে—আইনওনিয়ম হয়, রেডিয়ম্‌ হয়, শেষটায় সীসে। অনেক আল্‌ফা-বীটা-গামা রশ্মি ছেড়ে-ছেড়ে তবে এই রূপান্তর! আমি য়ুরেনিয়মেরই বংশধর—এটুকু মাত্র বলতে পারিস—কিন্তু বাসব খোদ য়ুরেনিয়ম হয়েই

থাকতে চায়—ওটা জবরদস্তি। নিজেকে বল্‌বে ও বস্তু কিন্তু বস্তুর নিয়ম মানতে চাইবেনা।"

দীপায়নের বস্তুকণা দানা বেঁধে উঠ্‌ছিল স্কটিশেই—নিউক্লিয়াস ইলেক্‌ট্রন জড়ো করতে সুরু করেছিল। বাসবকে আমরা স্কটিশেই পেয়েছিলাম। জমিয়ে নিয়েছিল ওকে দীপায়ন। বন্ধু জুটে যেতো পান্নুর—এসে জুট্‌ত, তা-ই জানতাম, কিন্তু জানতামনা যে বন্ধু ও জোটাতেও পারে। দু'টো বছরেই মস্ত পরিবর্ত্তন—ঘরকুণোর বাইরে হাত বাড়াবার হাত তৈরী হয়েছে! কে তৈরী করল এ-হাত! বীণাদি?

"সত্যি, দুটো বছর যে কি করে কেটে গেল আমার টেরই পেলামনা—" কথা বল্‌তে-বলতে থেমে যেত দীপায়ন, হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের উঁকিঝুঁকিকে চেপে দিতে চাইত আমাকে খোসামোদ করে: "তুই থাকলে হয়তো এমন হতনা—বাইরে বেরোতাম—আর বাইরে বেরোলেই জানতে হত ক'ঘণ্টায় দিন যায় আর কতো দিনে বছর।"

"কিন্তু বাড়ি বসে থেকেই ত চমৎকার হাওয়া-বদল হয়েছে তোর!"

"কই—না ত!" মুখের সবগুলো রেখা মিলিয়ে গিয়ে নির্দ্দোষ দেখাতো দীপায়নকে।

"বেশ সীরিয়স হয়ে উঠেছিস, আবার এক-আধটু মিশুকও!"

শেষের কথাটাকে ঠিক ধরে নিয়ে বলত ও: "ও বাসব? চমৎকার ছেলে এই বাসব—তোর ভালো লাগেনা ওকে?"

"ইস্কুলে থাকতে ও নিশ্চয়ই ক্লাশের মনিটর ছিল।"

কথাটাতে সুখী দেখালনা দীপায়নকে: "কেন?"—নিরীহ প্রশ্ন করলে।

"মেয়েদের নোট জোগাড় করে দিতে কি রকম উৎসাহ দেখিসনে?"

দম-শেষ পুতুলের মতো অনিচ্ছুক মাথা নাড়ল দীপায়ন। কাজেই নিজের কথার উপরই জোর দিতে হল আমাকে: "মেয়েরা যদি ওকে বাসবদা বলে ডাকে তাহলে হয়ত ওর আর খুসীর সীমা থাকবে না।"

"তা-ই কি?" আমার কথার উপর হুড়মুড় করে এসে পড়ল প্রশ্নটা।

"তবে?" নিশ্চিত বিশ্বাস উপরের দিকে টেনে তুল্‌ল আমার ভুরুদুটো: "তাছাড়া আর কি?"

"বাসব স্বদেশী ছেলে।" ছোট্ট ওই কথাটুকুতেই দীপায়ন সব কথা

শেষ করে দিতে চাইল—যেন সব প্রশ্নের উত্তর, সব রহস্যের সমাধান ওতেই আছে। ভক্ত-পার্ষদের প্রচুর জিজ্ঞাসার উত্তরে সাধু-সন্নেসীরা যেম্নি খানিকক্ষণ চুপ থেকে, একটু মুচকি হেসে, তারপর আবার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে একটি ছোট অথচ স্পষ্ট অথবা আপাত-অপ্রাসঙ্গিক কথা বলেন, দীপায়ন ঠিক তা-ই করল! নিস্তেজ হয়ে পড়তে হ'ল আমাকে, হয়ত একটু নিরাশও। বাসবের একটা ছবি, সহজ সাধারণ রেখাচিত্র ঘষে তুলে ফেলে আরেকটা ছবির রঙ আর রেখা সাজিয়ে নিতে দেরী হচ্ছিল একটু।

"আমাদের সহরের নাম শুনেই ও হাসতে লাগ্‌ল। গড়গড় করে বলে যেতে লাগল আমাদের চেনা নামগুলো—সবাই যাঁরা ইণ্টার্ণমেণ্টে গেছেন! আর কি অদ্ভুত—নামের তালিকার শেষ দিকে নিখুঁতভাবে ও বলে ফেলল দাদার নাম—দেবোপম চৌধুরী!"

"দেবুদা-কে চেনে না কি বাসব?" টাট্‌কা বিস্ময় ফুটে উঠ্‌ল আমারও গলায়।

"দাদার দলেরই স্বদেশী ছেলে ও!"

"তাহলে ও ধরা পড়ল না যে?"

"সবাই কি ধরা পড়ে? তাছাড়া ও বলবে নাকি প্রাণ গেলেও যে ও স্বদেশী!"

"স্পাই?" একটা অসতর্ক, অনায়াস প্রশ্ন উগ্‌রে দিয়েই সামলে গেলাম খানিকটা: "স্পাইও ত হতে পারে!"

"যাঃ, আমাদের বয়েসী ছেলেরা স্পাই হয় না কি কোনোদিন?"

হলেও বিশ্বাস করতে চাইতনা দীপায়ন, জানি। বর্ত্তমানকে ভালোবাসতে পারে বলে ওর চোখে সবসময়কার বর্ত্তমানই পবিত্র, নির্ম্মল। এ-ও হয়ত এক ধরণের নিজেকে ভালোবাসা! তুমি যে-বয়সে আছো, সে-বয়সটাকেই ভালবাসতে পারো, তার মানে—তোমার থাকা-টাই আসল। তোমার যৌবন প্রৌঢ়ত্বকে ভয় করে, ঘৃণা করে, আর তাই উপহাস করে। আবার তুমি যখন প্রৌঢ় তোমার প্রৌঢ়ত্বই যৌবনকে বোকা ভাবে, করুণা দেখায় আর হয়ত ঈর্ষাও করে। নিজের দিকে তাকিয়ে থেকে নিজেকে যারা তৈরী করতে যায় এ-দুর্ভোগ তাদের আছেই।

দীপায়নের ও-কথার প্রতিক্রিয়ায় আজ এই তত্ত্বই আবিষ্কার করেছি কিন্তু

সেদিন এ-ধরণের কোনো নীতিবাক্যই আমার মনে আসেনি। দীপায়নের যুক্তি অম্লানবদনে মেনে নিয়ে তখন আমি দেবুদার কথাই ভাবছিলাম। অবাক হয়ে ভাবতে সুরু করেছিলাম, কতো.বড়ো স্বদেশী দলের লোকই না ছিলেন দেবুদা—অথচ তাব বিন্দুবিসর্গও আমাদের জানা ছিলনা! কোথায় পুব বাংলার ক্ষুদে এক সহর আর কোথায় দিনাজপুর! বেতারে খবরবার্ত্তা পাঠাতেন না কি এঁরা সবাই?

"বাসব যখন জান্‌ল আমারই দাদা দেবোপম চৌধুরী—আমাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, 'দেখতে তিনি কেমন, দীপায়ন? কেমন আছেন তিনি, খবর জানো তোমরা কিছু?'—" ব্যথার ছায়া-রঙা তুলিতে আঁকা হয়ে চল্‌ছে দীপায়নের মুখ—দেখতে পেলাম। দেবুদাকে ও খুব ভালোবাসত নাকি? দাদাকে কি খুব ভালোবাসা যায়? আর তা গেলেও সেই খুব-ভালোবাসার কি কোন চেহারা আছে? তেমন কোনো স্পষ্ট, দপ্‌দপে চেহারা, বন্ধুর ভালোবাসায় যা তৈরী হয়, অথবা কোনো মেয়েকে ভালোবাসলে? ব্যথা শুধু রঙ, তুলির কাজ তার নয়—তুলি থাকে ভালোবাসার হাতে। তবু খুব সাধারণ ও সহজ ভাবে আমি হয়ত দেবুদার কথাই ওকে জিজ্ঞেস করতাম কিন্তু নিজেই দীপায়ন ওর ব্যথার জট খুলতে সুরু করলে!

"আমি ঠিক বীণাদির গলাই শুনতে পেলাম জানিস অনি, বীণাদির গলা বাসবের গলায়! বীণাদিও ঠিক এম্নি জিজ্ঞেস করতেন দাদার খবর!"

উঁচু হাসিতে বেলোয়ারি আবহাওয়াটাকে ভেঙে দিতে ইচ্ছে করল, রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে—হাসির ফোয়ারা ছুটুক এখন: "বীণাদি-তে তোকে পেয়ে বসেছে, পানু!"

হাসিতে ক্ষুণ্ণ হলেও কথাটা ও সবিনয়ে মেনে নিলে: "সত্যি তা-ই।"

"কেন?"

"কি জানি!"

"পড়াশুনো চুলোয় যাবে!"

চক্‌চক্ করে উঠ্‌ল দীপায়নের চোখ।

"ঠিক না?" গীতার শ্রীকৃষ্ণের মতো ভালোছাত্রের অভিমান জাগাবার ভার নিলাম।

সহজ হয়ে এলো দীপায়ন, হাসল : "পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়াটা খুব খারাপ। তেম্নি ভালো করাও খারাপ।"

"তার মানে?" অবাক হতে গিয়ে ও-দু'টো কথা বেরল মুখ থেকে।

"আমি ফার্স্ট হলে যে সেকেণ্ড হয় তার মুখটা কেমন যেন ভার-ভার থাকে! সে-ও ত ফার্স্ট হতেই চেয়েছিল কিন্তু পারল না! পরীক্ষায় যারা খারাপ করে তাদের এতো কষ্ট শুধু আমরা কেউ-কেউ পরীক্ষায় ভালো করি বলেইত! মানিক ত ছেলেবেলায় কেঁদেই ফেলত, বলত, আমি তোমার মতো নই কেন পান্নু?—পরীক্ষাগুলোই খারাপ!"

"বীণাদি বলতেন বুঝি এসব কথা?" শ্রান্ত হয়ে বললাম।

"বীণাদি ত পড়তেই পারল না। পড়াশুনার গল্প আর কি করবে?"

"তাই তোরও বুঝি পড়াশুনো ছেড়ে দেবার মতলব!" হাল ছেড়ে বললাম।

"ছিল, ম্যাট্রিকের পর।"

দীপায়নকে হঠাৎ রোগী বলেই মনে হল আমার, গম্ভীর নয়, ব্যথিত নয় রোগী! মনে হল ওর শুশ্রূষা দরকার। কিন্তু কে করবে শুশ্রূষা? তাই রোগ-বীজাণুর ভেতরই প্রতিষেধক পরমাণু খুঁজতে হল।

"তোর ম্যাট্রিকের ফলে বীণাদি নিশ্চয়ই খুসী হয়েছিল।" বললাম।

ঠোঁট নড়ল দীপায়নের, ঠোঁটে ঠোঁট চাপতে গিয়েই নড়ল।

"আই-এ-তে আরো ভালো করবি এ আশাও করেন তিনি নিশ্চয়!"

"অনি—" কেমন একটা ঠাণ্ডা গলায় আদর মাখিয়ে ডাকল দীপায়ন: "আমাদের ঠোঁটের চাইতে মেয়েদের ঠোঁট বেশি নরম—তুলতুলে।" দীপায়ন থামল: "না রে?"

"হুঁ—" তাড়াতাড়িতে উত্তরটা সেরে নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলাম, কোনো কথায়ই আজ কেন দীপায়ন স্থির হয়ে বসতে চাচ্ছেনা! যেন বীণাদির কথায়ও না। ভুল ভেবেছিলাম সন্দেহ নেই। কান্তিমান মানুষকে নিয়ে ভাবায় চিরদিনই ভুল থেকে যায়।

দীপায়ন স্থিরই ছিল। ওর কথার বীণাদিই আবির্ভূতা হলেন আবার!

"গেলোবার হয়ত শেষবার—শেষ ভাইফোঁটা দিতে এসেছিল বীণাদি! আসতে চায়নি, ওর মা-ই জোর করে পাঠালেন! বড্ড মনে লাগছিল আমার—কেন আসতে চায়না—এই ভেবে। বিয়ে ত হয়ে যায়নি এখনো,

আমাদের বীণাদি আমাদেরই আছে—তবে? ভাবছিলাম নেবনা ফোঁটা—দিলেও মুছে ফেলব কপাল থেকে! যে দিতে চায়না তার হাত থেকে পাওয়া সত্যি অপমানের, না? থালা সাজিয়ে আমার পড়ার ঘরেই এল বীণাদি—চন্দন, কাজল, ধানদুর্বো আর মিষ্টি। মুখ নীচু করে শক্ত হয়ে রইলাম। দু'টো হাত আমার টেবিলের উপর থালাটা রাখলো—কারো ছায়া পড়ল আমার গায়ে—মেয়েদের চুলের ফিকে মিষ্টি গন্ধ এলো নাকে—ছায়াটা সরল—আলো-লাগা মেঝের রঙে আঁকাবাঁকা খানিকটা ঝাপসা জায়গা—আবার তক্ষুণি তা নেই—গন্ধ জোরালো হল নাকে—বেড কভারটা কেউ যেন পাশ থেকে একটু টেনে নিল। "কি লাভ?"—কথা শুনলাম, বীণাদি বল্‌ছে: "তোমাদের ফোঁটা দিয়ে কি লাভ বলো?"—বিশ্বাস করবি অনি, বীণাদি কাঁদছিল! যে-কান্না সমস্ত শরীরের ভেতর লুকিয়ে থেকে ফুলে-ফুলে ওঠে ঠিক তেম্নি কান্না!"

"কাঁদছিল?"

"আমিও কেঁদে ফেলতাম। কেঁদেও ছিলাম হয়ত, কিন্তু মনে-মনে। চোখের জল দেখ্‌লেই কি জানি কেন কান্না পায় আমার, আর এ তো বীণাদি! ভেতরে ভেতরে আমিও কাঁদছিলাম কিন্তু শুকনো ছিল চোখ, আর ঠোঁট নড়ছিলনা একটুও।"

"দুজনে মিলে কান্নাটা কি বিশ্রী!"

"তাই ত কাঁদতে পারিনি ঠিক-ঠিক! আর তক্ষুণি দেখতে পেলাম ঠিক আমার চোখের উপর বীণাদির কালো-কালো টল্‌টলে চোখ! খানিকটা জল, খানিকটা আলো আর খানিকটা কালো যেন শুধু - আর কিছু দেখতে পাচ্ছিলনা আমার চোখ, বুঝতে পারছিলনা। গায়ে এসে মেঘ লাগলে কি এম্নি হয়? মেঘের ছোঁওয়ায় ভিজে গেল আমার ঠোঁট—থর থর করে কেঁপে গলে যেতে লাগল যেন! মনে হচ্ছিল মেঘই ছুঁয়ে যাচ্ছে আমার মুখ—তাছাড়া আর কি হতে পারে—এমন হাল্কা, নরম, ভেজা ছোঁওয়া আর কার আছে?"

বুঝতে পারছিলাম, কথাগুলো যেম্নি নরম, দীপায়নের গলার স্বরও তেম্নি শোনাচ্ছে আর তা থেকে যে-ছবি ফুটে উঠছে তা ও যেন কোনো লতার তুলতুলে ফুল। তুলতুল করছে দীপায়ন আর বীণাদি। আমাদের রক্তমাংসের ক্ষুধা যে এম্নি নরম চেহারাতেই দেখা দেয়, মনস্তাত্ত্বিকের এই প্রজ্ঞা তখনো আমার মনে

জন্মায়নি—শরীরে তখনো যৌনতার আসর জমেনি আমার, তাই ছবিটাতে কবিতাই দেখলাম। দেখতে ভাল লাগছিল—চুপচাপ বসে আছে দীপায়ন, তা-ও ভাল লাগছিল উপভোগ করতে কিন্তু বাসব আর এক মুহূর্ত্তও মনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে রাজি হলনা, হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

"বাসব ?" প্রশ্নের সুরে দীপায়নকে একটু ছুঁয়ে নিয়ে থেমে গেলাম, ও চুপ করেই রইল, তাই তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম : "বাসবের সঙ্গে তাহলে তোর খুব ভাব হয়ে গেছে—কেমন ?"

"ভাব আর কি ? মেলামেশা করতে চায়। ও ভাবছে, আমিও স্বদেশী ছেলে।"

"ঠিকই ভাবছে। স্বদেশী হতে ত চেয়েছিলি তুই।"

"আমি ?" দীপায়নের মাথায় বজ্রপাত হয়েছে দেখে খুসী হলাম, তাতে যদি ওর রোগ সারে।

"স্বদেশী পুঁথি-পত্তর পড়তিস্ নে তুই ?"

"তাতে কি ? দাদাই পারলে না আমায় স্বদেশী বানাতে—পুঁথি-পত্তর স্বদেশী বানিয়ে দেবে ?"

খানিকটা প্রতিজ্ঞার মতো শুনিয়েছিল দীপায়নের কথাটা। (দীপায়ন প্রতিজ্ঞা করেছিল! যেন সে মহাভারতের ভীষ্মের মতো খানিকটা অনুশাসন দিয়ে তৈরী একটা মানুষ! কতো-কিছু দিয়েই মানুষ নিজেকে তৈরী করতে যায়—কিন্তু তৈরী করতে পারে কি ? সব শেষে দেখা যায় কিছুই সে তৈরা হয়নি, যে-মানুষ ছিল তা-ই থেকে গেছে—শুধু মানুষ বলেই তাকে চেনা যায়, আর কিছুই না। সে নির্ম্মিত নয়, নির্ম্মাতা—নির্ম্মাণের বাইরে আলাদা একটা চাঞ্চল্য! দীপায়নকে তা-ই দেখেছি আমরা—অনেক প্রতিজ্ঞাই ছিল তার, পরপর বিচিত্র প্রতিজ্ঞা। কিন্তু তা হওয়ার জন্যে নয়, দেওয়ার জন্যে। এক-একটি প্রতিজ্ঞায় আলো-বিচ্ছুরণ করে এক-একটি কক্ষপথে যাওয়া।)

কিন্তু তখন আমি প্রতিজ্ঞা দিয়েই দীপায়নকে চিনতাম। ভেবেছিলাম, যখন ও স্বদেশী করবেনা বাসবের সঙ্গে ভাবও ওর ভাঙতে দেরি নেই।—আশ্চর্য্যভাবে ও নিজেকে তুলে নিয়ে আসতে পারে, ভুলে যেতে পারে পরিচিত পরিজনদের।

"বাসব স্বদেশী না হলে কিন্তু বেশ হত, না পানু ?" ওর সম্মতি পেয়ে ভাবনাটাকে জোরাল করতে চাইলাম।

''স্বদেশী না হলে আর কি-ই বা হ'ত ও ?"

"মনটা ত ওর খুব ভালো।"

''কেন সাদাসিদে জামাকাপড় পরে বলে' ?"

"তা কেন ? দেবুদার জন্যে এমন ভাবতে পারে যে--"

"হুঁ"—দীপায়ন মাথা নেড়ে-নেড়ে জানালায় মুখ ঘুরিয়ে নিলে : "আমরা কিন্তু কারো জন্যেই ভাবিনে !"

"তুই ভাবিস। বীণাদির জন্যে ভাবিস।" বীণাদিকে আনবার ইচ্ছে ছিলনা, তবু আনলাম। চুপ করে যাবার ভূমিকা করছিল দীপায়ন, চুপ করে থেকে একটা বিশ্রী আবহাওয়া তৈরী করার চাইতে বীণাদিই ভালো।

"ভাবতাম।" চুপ করবার নেশা ভাঙলনা দীপায়নের।

''এখন আর ভাবিসনে ?"

"কি লাভ ভেবে ?"

বীণাদিরও ভাইফোঁটা দিয়ে 'কি লাভ', আর দীপায়নেরও বীণাদিকে ভেবে 'কি লাভ'—শোধবোধ। শোধবোধই একরকম কিন্তু জানলাম ওরা নিজেরা এ-রফায় এগিয়ে আসেনি। বাসব এর স্থায়িত্ব দিয়েছে শুনতে পেলাম—দীপায়নই বলতে লাগল : "বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েরা সবাইকে ভুলে যায়—বাপমাকেই মনে রাখেনা, ভাইদের আর কি খবর রাখবে।"

"তাই কি ? শেফালি বুঝি ভুলে গিয়েছিল তোকে।" দেখতে ইচ্ছে হল বীণাদির পাশাপাশি শেফালিকে ওর মনে কেমন দেখায়।

"এখন হয়ত ভুলে গেছে। তা-ই যায়। বাসব বলছিল, ওর দিদির কথা –মা নেই বাসবের, ওদের দিদিই ছিল মার মতো। বিয়ে করতে চাননি দিদি, বলতেন ওম্নি থাকবেন। কথা শুনে হাসতেন বাসবের বাবা। দিদি ভাবেতন বাবারও তাতেই মত—বেশ হ'ল ! কিন্তু হঠাৎ একদিন বাবা ক্ষেপে উঠলেন দিদির বিয়ের জন্যে। কতো কান্নাকাটি করলেন দিদি কিন্তু কিছুতেই মন ফেরালেন না বাবা। বিয়ে দিয়ে দিলেন। কেঁদে-কেঁদে কাটল দিদির বছর—দু'বছর। বাসব-ওরাও ভীষণ মন-খারাপ করে থাকত। কিন্তু এখন, মনেই পড়েনা আর দিদিকে। আর দিদিও মালয় চলে গেছেন—ছেলেপুলে

নিয়ে দিব্যি আছেন সেখানে—বছরে মাত্র একবার, বিজয়া-দশমীর পরে, একটি চিঠিতে বাবাকে প্রণাম জানান—ভাইদের কথা একটি অক্ষরও লেখেন না।”

“মা নেই বলেই বাসব স্বদেশী হয়েছে।” কাহিনীর শেষে এই বিজ্ঞ অভিমত জ্ঞাপন করলাম।

দীপায়ন হাসতে লাগল, মনে হল যেন দেবুদা'ই হাসছেন, মুখের চেহারাতেও যেন দেবুদা উঁকি দিয়ে গেলেন: “তা-ই বুঝি! দাদার কি মা ছিল না? তাছাড়া—” হঠাৎ হোঁচট খেয়ে থেমে গেল ও। আর পাণ্টা আমাকে হাসতে দেখে কথাটা কোনোরকমে শেষ করল, শেষ করল বাঁক ঘুরিয়ে: “তাছাড়া বীণাদিও ত ছিল!”

হাসি থামিয়ে নির্দ্দোষের ভানে বললাম: “মাকেই কষ্ট দিলেন দেবুদা—বীণাদি আর কি।”

“মাকে কষ্ট দেওয়া কি আর কষ্ট দেওয়া?”

“বারে, মা-রা বুঝি আর কষ্ট পেতে জানেন না!”

“তাঁদের লাগেনা!” দীপায়নের মুখের উপর দিয়ে একটা ছায়া উড়ে গেল: “অনেক পান কি না। পেতে-পেতে কষ্ট তাঁদের সয়ে যায়!”

“তুই যে কলকাতা চলে এলি, কষ্ট হয়নি মার!”

“দাদাকেই মা ভালবাসেন বেশি—আমার জন্যে আর কতোটুকু কষ্ট হবে?”

“ইস্কুলে তুই ফার্ষ্ট হতিস—” প্রায় চেঁচিয়ে উঠ্‌লাম মজায়: “কিন্তু আসলে তুই সেকেণ্ড বয়! তাই তোর মুখ ভার!”

স্বয়ম্বরসভায় কুমারী দ্রৌপদীর মতো ঠোঁটের হাসি-হাসি ভঙ্গীতে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাল দীপায়ন। “সত্যি তা-ই।” আর তখন মনে হল, দীপায়ন যেন ভাবছে, মনে-মনে বল্‌ছে: “আমিই পানু!”

১৯৪৯ ইং

বিয়েকে পানু ক্ষমা করতে পারেনি কোনোদিন! কি যে এক দুর্ব্বলতা! তোমারও আছে এ-দুর্ব্বলতা—তোমার—হ্যাঁ—দীপায়ন, তোমার! পানুকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারোনা তুমি মন থেকে। আমি পানু! একেকসময় আজও অনুভব করো কখনো-কখনো। আমি পানু যার চারপাশে একট জগৎ ছিল, তারপর আরেকটা জগৎ তারপর আরো। জঙ্গম জগৎ—পানুও জঙ্গম

ছিল। তাই একদিন সে দীপায়ন। কতোটুকু সে দীপায়ন আর কতোটুকু পান্নু? সবটুকুই পান্নু—দীপায়ন কারো রূপ নয়, হয়ত কোনো-এক সময়কার পান্নুর চারপাশের জগতেরই ধ্বনি, নাম, চিহ্ন, সঙ্কেত। দীপায়ন নামের ধ্বনিতে হেসে উঠছে পান্নু। হেসে উঠ্‌ছি।

আমি নাকি আর সেই পান্নু নই যার মা ছিল, বাবা ছিল, দাদা ছিল,—দশ বছর ইস্কুল, ছ'বছর কলেজ—সবসময় যে খানিকটা পান্নু ছিল, সে আর মোটেই না কি পান্নু নয় এখন? কি আশ্চর্য্য লাগে শুনতে! এখন নাকি সে একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক! ঘোষণা, বাণী, আশীর্ব্বাণী, সভা, অভিনন্দন, মাল্যের স্তূপ থেকে নিজেকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া যায়না আর—শেফালিকে, মানিককে, ন'দাদুকে, বীণাদিকে, তোতাকে...নাকি আর পাওয়া যায়না! তুমি নাগরিক! দীপায়ন ভাবছে, সে নাগরিক। সংবাদপত্র ভাবছে, দীপায়ন চৌধুরী নাগরিক! স্বাধীনতার উৎসব-অনুষ্ঠানে দীপায়ন চৌধুরী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি! তার সোজা-সোজা বিন্দু-বিন্দু অক্ষরের পংক্তিগুলো নীলচে কাগজের উপর ছড়িয়ে থেকে, জড়িয়ে থেকে ভাবছে, আমরা দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য! সাহিত্যিক—দীপায়ন চৌধুরী সাহিত্যিক—দেয়াল-জোড়া বুকসেলফগুলো ভাবছে তার, ভাবছে লাইফ-টাইম্‌ পার্কারটা! আমরা সাহিত্যিকের বুক-শেল্‌ফ্‌, কলম। সৌখীন আসবাব নই। আমারা সম্ভ্রান্ত! সম্ভ্রান্ত নাগরিকের স্পর্শে মুল্যবান!

সত্যেন মাঝে-মাঝে বলে: 'তোর কলমটা কিন্তু আমায় দিস, দীপায়ন—কে জানে কোন্‌ দিন রবিঠাকুর হয়ে দাঁড়াবি, তখন হয়ত আমার বেকার অবস্থা! তবু একটা সম্পত্তি রইল!'

জোড় হাত ভুরুতে ঠেকিয়ে অভিনন্দন সভায় বসে আছে দীপায়ন। ভীরু, আধো-আধো গলা: "আমার খাতাটা—"। ফুট্‌ফুটে একটি মেয়ে—কার মতো? —না, শেফালির মতো নয়। অটোগ্রাফ খাতা! 'দীপায়ন চৌধুরী'—একটি কচি হাসি, তারপর আরেকটি: 'দীপায়ন চৌধুরী'—আরো কয়েকটি, তাই আরো কয়েকবার: 'দীপায়ন চৌধুরী'। নাম—স্বাক্ষর! নিজেরই অক্ষর তার —তোমার নিজের অক্ষর কিন্তু তুমি কি? যে-পান্নুকে মনে পড়েছিল তোমার এক্ষুনি, এ-অক্ষরে কোথায় সে? কোথায় বীণাদির পান্নু—তোতার পান্নুদা? সবাই বলছে, তুমি দীপায়ন চৌধুরী। তুমিও তা-ই বল্‌ছ। ভাবছ তা-ই আমি ভাবছি, "আমি দীপায়ন চৌধুরী!"

ভারি অদ্ভুত, না? কেউ বলবার নেই এখন, কেউ বলেনা: "মেয়েদের সঙ্গে বসে বসে কেউ এতোক্ষণ গল্প করে? ছিঃ—!" অথচ তাকেই বলত কেউ এখনো বলতে পারে কেউ। কেউ বল্‌লে এখনও তার তেম্নি মন-খারাপ হয়ে যাবে পানুর যেম্নি হ'ত। বীণাদির সঙ্গে গল্প করলে কেন বলবেন মা ও-রকম? মাকে মনে হত কেমন যেন ভয়-পাওয়া আর তাই ভয়ঙ্কর। শুকনো ঠোঁট, কুঁচকানো ভুরু—মনে হ'তনা দাদার জন্যে এই মা-ই এখনও চুপি চুপি কাঁদেন, কোনদিন পানুকে খাবার দিতে বসে হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ওঠেন! এই দীপায়নই দেখেছে তাঁকে—এই চোখেই দেখতে পেয়েছে, শুনতে পেয়েছে এই কানই তাঁর কথা! এই মনই অনুভব করেছে তাঁর ব্যথা আর ভয়, খুসী আর হাসি—এখনও অনুভব করতে পারে। কোথায় সে আরেক রকম? অথচ সে দীপায়ন চৌধুরী! সম্ভ্রান্ত সাহিত্যিক, ব্যক্তি, নাগরিক আরো কতো কি! ফার্ষ্ট ক্লাশের ফার্ষ্ট বয় পানু আর নয়। কী অদ্ভুত!

"পড়বে, পানু?" ভেজা ভেজা ঠাণ্ডা মুখ বীণদির, ঈস্, কী কালো চোখগুলো! পিঠে ছড়ানো চুলগুলোর গোছা-গোছা টেনে তুলছে আঙুলের ডগায়।

"হুঁ" চোখ দু'টোকে গোত্তা খাওয়াতে হল বইগুলোর উপর।

"না—। আজ গল্পই করি, কেমন?"

"প্রিমাচিওর ডিকে এসেন্ড দি প্রাইড অব রাজস্থান' মানে কি বীণাদি? যুদ্ধে হেয়ে রাণাপ্রতাপ বুড়ো হয়ে গেল?"

"মন-খারাপ হলে তা-ই হয় না? মাসীমাকে কেমন বুড়ো দেখায় আজকাল!"

"মাকে? কই না ত!"

"সবসময় দেখছ বলে ধরতে পারছ না।"

"এখন মার মন বেশ ভালো হয়ে গেছে!"

"কে বল্‌লে?"

"কে আবার বল্‌বে! আমি বুঝিনে? ঠিক আগেকার মতো কথা বার্ত্তা বলতে সুরু করছেন আবার।"

"দেবুদার কথা?" একটু শুকিয়ে উঠ্‌লো বীণাদির চোখ-মুখ।

"হুঁ—দাদাকে যেম্নি বলতেন!"

"কি বলতেন দেবুদাকে—" একটা জানা খবরই যেন জানতে চাইছে এমনি নিরুৎসুক শোনাল বীণাদির গলা।

"তোমাকে দাদা মাঝে-মাঝে পড়াতেন বলে মেজাজটা খারাপ হয়ে উঠ্‌তনা মার? ঠিক তেম্নি, তুমি আমায় পড়াও বলে, আবারও হচ্ছে।"

"পঞ্চাশ বছর বয়েস হয়ে গেলে মানুষের বনে চলে যাওয়া উচিত।"

"চলে যেতো আগেকার দিনে, না বীণাদি?"

"তা নইলে কি কম বয়েসীরা সুখ পেতো কোনোকালে?"

ঠিক তক্ষুণি, হঠাৎ বীণাদিকে কেমন-যেন রোগা মনে হ'ল খানিকটা, রোগা আর তাই বুড়ো-মতো। টীচার।

"তোমারও—" যে-কথা বলতে চায় পানু তার ভঙ্গীটা যেন খুঁজে পাচ্ছিলনা সে মনে: "তোমারও মন-খারাপ হয়, বীণাদি। তুমিও মন-খারাপ করে থাকো মাঝে-মাঝে।"

"আমি?—দূর—" থুতনি উঁচু করে চুলের ভার থেকে মাথাটা সরিয়ে আনতে চেষ্টা করল বীণাদি।

"আমি জানি।"

"কি জানো?" সাদা-সাদা মরা হাসি ফুটে উঠ্‌ল বীণাদির মুখে।

"দাদার জন্যে তুমিও মন খারাপ করে থাকো!"

"না ত!" যেন আরেক ঘর থেকে, বাইরে থেকে, অনেক দুর থেকে বীণাদি কথা বলল, হয়ত আর-কেউ বীণাদির গলার মতো গলায় কোথাও বলল এ-কথাদু'টো আর পানুর কানে এনে তার সুর পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল হাওয়া, খানিকটা ফাঁকা, ফিকে হাওয়া।

"থাকো।" মুখ নিচু করল পানু।

"তেম্নি তোমার জন্যেও মন-খারাপ লাগবে আমার যখন তোমায়ও দেখতে পাবোনা।"

"লাগ্‌বে?" পানু বীণাদির মুখে তাকাল—ভেজা-ভেজা মুখের দিকে—যে মুখ সবার জন্যে মন-খারাপ হওয়ার ছাপ আঁকতে পারে। ঝক্‌ঝকে খুশী ছিল পানুর চোখে, হয়ত একটু হিংস্রতাও।

ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে রইল বীণাদি। খানিকক্ষণ। নড়ে উঠ্‌ল। হাঁটল। পানুর পাশে এসে দাঁড়াল। পানুর গা-ঘেঁষে বসল।

"আমি রোগা হয়ে যাচ্ছি, তা-ই কি মনে হয় ?" হাতের চুড়ি ক'গাছি কনুই-এর দিকে টেনে আনল বীণাদি : "সবাই বলে। কিন্তু আমার ত মনে হয়না !"

"একেকসময় রোগা লাগে তোমাকে !"

"লাগে ? কেন লাগ্‌বে ?"

"এখন লাগছেনা !"

"তাহলে ?"

'তাহলে' কি ? পানু কি জান্‌ত তাহলেও কেন রোগা লাগবে বীণাদিকে ! কিন্তু বীণাদি জান্‌ত। হাসি-হাসি বীণাদি তাকিয়ে রইল পানুর মুখে। মনে হ'ল যেন সে নূতন করে দেখছে পানুকে, দেখে ভালো লাগাতে হাসিটা খুশীর ঝিলিকে ছলকে দিচ্ছে।

বীণাদির শাড়ির পাড়ে খয়েরী কল্কার দিকে তাকিয়ে পানু নিঝুম হয়ে রইল। নিশ্বাস ভরে উঠ্‌ছিল তার বীণাদির গন্ধে—চুলের গন্ধে, সাবানের গন্ধে—কেমন যেন ফিকে মিষ্টি গন্ধ একটা—সব দিন একই রকম—তেল-সাবানের গন্ধ মেটেই নয়—সব মিলিয়ে বীণাদির গন্ধ। ইচ্ছে হচ্ছিল বীণাদির একমুঠো শাড়ীর আঁচল তুলে নিয়ে শুঁকতে।

"চিঠি লিখবে, পানু ?" পায়রার গলার মতো ভারি শোনাল বীণাদির গলা।

"কাকে ?" মুখ তুলতে ইচ্ছে করছিলনা।

"আমাকে। যখন আমি এখানে থাক্‌বনা !"

"থাক্‌বেনা !" এবার মুখ তুলতে হল।

"কোথায় চলে যাব ঠিক কি !"

"ও" আবার মুখ নামিয়ে চুপ করতে হল। বীণাদির বিয়ে হচ্ছে জানে পানু। নকুল বলেছে, সুর্য্যঠাকুর কথা ছড়িয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছে, মা বলছেন, বীণাদির মা মার কাছে বসে এখনও বক্‌বক্ করেন—শুনেছে পানু। বীণাদি বলেনি, তবু সে জানে। জেনেও ভুলে গেছে সবসময়। মন ধরে রাখতে চায়না বলেই হয়ত ভুলে গেছে। নীচে থেকে বুড়-বুড় করে যদি বা কখনো কথাটার বুদ্বুদ মনের উপর এসে হাজির হয়েছে, তক্ষুণি তাতে টুসকি মেরে বেমালুম করে দিয়েছে তার বাঁকা ইচ্ছা।

কিন্তু সেদিন আর তখন মনে হ'ল কথাটা যেন নিরেট পাথর। তার ভারে কোথায় যে তলিয়ে যেতে লাগল পানু—বীণাদিকে ছেড়ে কতো নীচে, কতো

যে দূরে তার আর ঠিক-ঠিকানা নেই। হাত বাড়িয়ে দিয়ে খানিকটা ফাঁকা শূন্যই মুঠোতে তুলে আনছে সে—কোথা আর বীণাদির আঁচল। কোথায়! এই যে! আঁচলটা খাবলে ধরল পানু। শুঁকবে? শুঁকতে গেলে পাবে কি বীণাদির গন্ধ? আর কি পাবে?

"চিঠি লিখবে, আমিও লিখব—" বীণাদিও যেন দূরে দাঁড়িয়েই বলতে লাগল: "মনেই হবে না আমরা দূরে থাকি!"

বীণাদি তাকাল পানুর দিকে, কিন্তু বীণাদির দৃষ্টিটুকু যেন আর এবার পানুর শরীর ছুঁয়ে গেল না, স্থির হয়ে রইল বীণাদিরই চোখের উপর। মাথা নিচু করে বাধ্য ছেলের মতো ঘাড় নাড়ল পানু।

"দেবুদার ঠিকানাটা দেবে, পানু?"

ঠিকানা খুঁজতে উঠে দাঁড়াবে বলেই কি পানু মুঠো আলগা করে আঁচলটা ছেড়ে দিলে? কিন্তু উঠে ত দাঁড়াল না সে। বীণাদির ধরণেই হাসতে চাইল একটু, বললে: "দেব।"

"আর—"

"আর কি?"

"আর কি, সবই ত হল" হাসিতে খানিকটা হাওয়া ছড়িয়ে দিল বীণাদি।

শেফালিকেও কি ঠিক এম্নি হাসতে দেখেনি পানু একদিন, একবার শ্বাস ফেলে যে-হাসি মরে যায়! যেদিন পানুকে খাইয়েছিল শেফালি, সেদিন? কি অদ্ভুত! বীণাদির মুখেও একই রকম হাসি! কি করে ওরা একই রকম হাসতে পারে!

বীণাদির একটা আঙুল ছুঁয়ে পানু বললে: "বিয়ে হলে কি হয়, বীণাদি?"

পানুর হাতটা নিজের হাতে মাখিয়ে নিয়ে বীণাদি চুপ করে রইল।

"অনেক দূরে চলে যাবে—আমাদের সঙ্গে আর দেখা হবেনা, এইত?"

"দেখা হবেনা?"

"ধরো তা-ই হল—দেখা হলনা—"হঠাৎ সতেজ হয়ে উঠেছিল পানু: "তাতেও বা কি? দাদার সঙ্গে ত দেখা হচ্ছে না আমাদের কতোদিন!"

"দেখা হবে।" সীসের মতো ঠাণ্ডা আর ভারি শোনাল কথাগুলো।

কার সঙ্গে কার দেখা হবে? কি সেদিন বলতে চেয়েছিলে বীণাদি? শুধু একবার আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁর—পরের বছর—যখন ফার্স্ট ইয়ারে

পড়ি। দাদার সঙ্গে একবার ও না—যদিও হয়ে থাকে, দাদা বীণাকে দেখতে পাননি আর,দেখেছেন কোনো এঞ্জিনিয়রের গিন্নিকে ! রাজপুতনায় থাকেন সে মহিলা। ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্ত থেকে পুর্ব্ব-সীমান্তের একটি অখ্যাত সহরে বরাবর যাতায়াত করা যায় না ! যখন এসেছেন, বয়ে নিয়ে এসেছেন একটা গোটা সংসার, কাঁড়ি-কাঁড়ি বাক্স-বিছানা, ব্যাগ-ঝুড়ি : চাকর চাপরাশী কয়েকজন : দোলনায় তোষক-তোয়ালে জড়ানো তুলতুলে একটি বাচ্চা। পরিশ্রান্ত– মনে হয়েছে তাকে– এতো দুরে সংসার বয়ে আনবার পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত। হয়ত ঠোঁট ভেঙে বলেছেন : "কী যে ঝঞ্ঝাট !" বীণার কথায় দাদা কথা বলতে বলতে চুপ করে গিয়েছিলেন কি হঠাৎ ? না কি বলেছিলেন : "জায়গাটা কেমন ?"

তখনও কি মনে পড়েছিল বীণাদির ওটা যে রাণাপ্রতাপের দেশ ? মনে কি পড়েছিল, পান্নুর পড়ার ঘরে কোনোসময়কার একটা কথা : পান্নুর কোনো জিজ্ঞাসা, বীণাদির মন-খারাপের আলাপ ?

হয়ত পড়েছিল। পান্নু চিঠি লিখত না আর, তবু হয়ত মনে পড়েছিল, যে পান্নু চিঠি লিখত, যে-পান্নু ফার্ষ্ট-ইয়ারে পড়ত, তার আগে ফার্ষ্ট ক্লাশে আর সেকেণ্ড ক্লাশে, তাকে। কোনো দিন বীণাদি ভুলতে পারেনি একটি ছেলেকে যার দিদি হতে চেয়েছিল সে। ভুলতে পারেনি দিদি হতে চাওয়া আর হতে না-পারা।

ও বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে আবার জমে উঠ্‌ল আমাদের ছোট সহর—তার মানে, জমে উঠ্‌তে চাইলাম আমরা। প্রতুল-মানিক এণ্ড কোম্পানী ত ছিলই, তাছাড়া বাসব দীপায়নের অতিথি। বললাম অবশ্যি দীপায়নের অতিথি, কিন্তু সত্যি বলতে, দেবুদারই অতিথি, কেননা, দেবুদারই দর্শনপ্রার্থী ছিল সে। হোম্‌-ইণ্টার্ণড্‌ হয়ে দেবুদা তখন বাড়িতে মোতায়েন—চলাফেরার চৌহদ্দি আঁকা—চৌহদ্দির বাইরে থানায় সপ্তাহে একবার হাজিরা দেওয়া। বড্ড একা আর মন-মরা থাকছেন দাদা দীপায়ন বলেছিল বাসবকে; আর দেবুদাকে জানিয়েছিল—আমার সহপাঠী বাসব তোমাকে দেখবার জন্যে পাগল। খানিকটা হাওয়া পেলেন দেবুদা, একটি পোলিটিক্যাল ছেলেকে পেয়ে শ্বাস নিয়ে বাঁচবেন আশা করলেন। পানুকে খবর পাঠালেন: গ্রীষ্মের ছুটিতে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো।

দেখা গেল, বাসবকে পেয়ে দেবুদা সত্যি পুরোদমেই দম নিতে পারছেন। ত্যাগী সাধুসন্নেসীদের শিষ্যের দরকার হয় কেন বুঝতে পারলাম। সবই ত্যাগ করা যায় কিন্তু কথা বলা ত্যাগ করাই মুস্কিল। মৌনীবাবারাও নিশ্চয়ই মনের মধ্যে কয়েকজন শিষ্য তৈরী করে নেন। নূতন সহর কিন্তু আস্তানা থেকে বাইরে বেরোতনা বাসব, বাড়ি থেকে বোরোবার জন্যে দেবুদাও আর ছটফট করতেন না।

কিন্তু ঘরকুণো পানু এবার পুরোদস্তুর বাইরের দীপায়ন। মফঃস্বলের পুরানো বন্ধুদের কলকাতার পালিশ দেখাবার জন্যে ততোটা ব্যস্ত ছিলনা ও, যতোটা আগ্রহ ছিল ওর বাইরের মানুষ হবার। বাইরের মানুষ হ'তে গেলে প্রতুলকে পেতে হয়। আর তাকে পাওয়া তেমন শক্ত ব্যাপারও নয়। যত্রযত্রই তার দেখা মেলে, খেলার মাঠে, দিঘীর পারে, ইট-খোলার সড়কে আর প্রায় প্রত্যেক চায়ের দোকানে। একই পরিমাণ হাওয়া আর চা খেয়ে চলেছে প্রতুল, শরীরটাকে হাল্কা করার জন্যেই যেন। প্রতুলের চুলে এখন রীতিমতো কলেজের পালিশ—মানে ব্যাক্‌-ব্রাশের পালিশ। আধা ব্রহ্মচর্য্য-

বিদ্যালয়ে যে অর্দ্ধসমাপ্ত কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছিল কলেজের মুক্তিতে এসে এখন আপদমস্তক তার প্রতিশোধ তুলছে। কলেজেও অবশ্যি—আর মফঃস্বলের কলেজেই বেশি—ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়ের মাষ্টারদের মতো কেউ-কেউ থাকেন, পোষাকে না-হোক, বাক্যবাণে। পাঞ্জাবির উপর সিল্কের চাদর চড়িয়ে মাসোহারার কৌলীন্য দেখালেও সংস্কৃতের অধ্যাপক মহেন্দ্রবাবু যে দৃষ্টিসায়কে ছেলেদের দৈহিক ও মানসিক বিলাসিতা বিদ্ধ করতে ওস্তাদ, প্রতুলের তা জানা ছিল। তাই চুলের মান রাখতে সে মগজকে খাটাতে রাজি হয়ে গেল—সংস্কৃতের খর্পর থেকে পালিয়ে অঙ্কের গোলক ধাঁধাঁয় পা বাড়াল। 'চুলে যে খাটো নয় মগজেও সে খাটো হয়না—'প্রতুলকে অঙ্কের ক্লাশে ঢোকাবার জন্যে অবশ্যি দালালিও সুরু করেছিল মানিক। ইস্কুলের সঙ্গী কলেজে কতো বড়ো একটা আরাম! প্রতুল বুঝতে দিল মানিকের অনুরোধে পড়েই সে অঙ্কের মজদুরী গ্রহণ করেছে। পানুকে বল্‌লে সে: "মানিকটা একা পড়ে যায়, কি করব, নইলে কোনিক্‌সেক্‌শন্ আছে জেনেও কেউ অঙ্ক নিতে যায়, আর পাজী বাইনোমিয়্যাল এক্সপোনেন্‌শিয়াল থিয়োরেম্-গুলো? তোরই প্রতিনিধির কাজ করলাম—এখন দে আমার অঙ্কের মাথা তৈরী করে!"

"তৈরী আবার করব কি, তোর মাথাটা দেখে যা লোভ হচ্ছে আমার!" দীপায়ন হাল্কা হাওয়ার আরাম খুঁজে পেল: "বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু তোকে, কবি-কবি!"

"কবিতা ও করছে—জানো পানু?" মিষ্টি হাসিতে মানিক পানুর মুখে তাকাল।

"তা-ই না কি? ব্রিজ অব সাই-এর মতো কবিতা হবেনাত শেষটায়—কি রে প্রতুল!"

"এ-মাথা দেখে কি মনে হয় কবিতা হবে?" গভীর হাসিতে ঝকঝকে হয়ে ওঠে প্রতুল: "বড়-জোর কিড্‌-ন্যাপিং, অথবা এলোপমেণ্ট্—তোদের মতো কবিতার মেজাজ কি আমার আছে?"

"তাই ত বলছিলাম ব্রিজ-অব-সাই!"

"ননীর পুতুলরা উইরি অব ব্রেথ্ হয়ে আত্মহত্যা করে—আমার ভাগ্যে ননীর পুতুল আছে বলে ভাবিস না কি?—রবারের বল!"

"ভারি মজার গল্প ত! কি রে মানিক—কি ব্যাপার ?"

"মানিক বলবে কি ?" হাসি ফিকে হতে লাগল প্রতুলের : "আমার ব্যাপার আমিই বলছি! মানিক ত শ্রোতা, কখনো-সখনো বা দর্শক—তাই কবিতা চড়াতে সুরু করবে !"

"কিন্তু তোর বলাতে মুস্কিল কি জানিস—অনেক-কিছু জানা যাবেনা—গোপন করতে চাইবি।"

"প্রতুল বোস খারাপ হতে জানে আর জানে সে খারাপ হচ্ছে, কাজেই কিছু গোপন করবার তার দরকার নেই !" বেশ ভারিক্কি শোনাল প্রতুলকে।

আবছা হাসিতে মানিক মুখ ফিরিয়ে নিল—আগ্রহে উজ্জ্বল দেখাল দীপায়নকে। প্রতুল বলতে সুরু করল :

ময়না তারই প্রতিবেশিনী। এক পেশকারের চতুর্থ মেয়ে। বয়েস ষোল কি বেশি হলে, প্রতুলের সমান—সতেরো। ষোল-তে আট যোগ কর। মেয়েদের বেলায় তা-ই করতে হয়। চব্বিশ বছরের একটি মানুষ নিজেকে যতোটুকু জানে এবং নিজের সম্বন্ধে অপরকে জানায়, ষোল বছরের ময়নাও তা-ই করে। মনে পাক ধরেছে—শরীরে তেমন নয়। অবশ্যি স্বাস্থ্য খুব ভালো, মানিকের ভাষায় খুব সাহসী, কিন্তু তবু চোখে-মুখে খুকী-খুকী দেখায় একেকসময়। তবে দেখায় বলেই যে বাইরের লোকের চোখ তা মেনে নেবে তা নয়, তাদের হিসেবে ওর বয়েস ষোল, অর্থাৎ, বসন শাসন করবার বয়েস, অবোধ-অবুঝ দেখালে তার চলবেনা, কেননা চোখের কোণে তার তড়িৎ ঢালা হয়ে গেছে! (কবিতার ভাষায় ব্যাপারটা বললাম পানু—তাতে তোর সুবিধে হবে।) চতুর্থ মেয়ের বিয়েতে পেশকারবাবুর মন নেই। মানে টাকার যোগাড় নেই। ফিফ্‌থ্ ক্লাশ থেকে ইস্কুল ছাড়িয়েছেন—ইস্কুলের খরচাটা ত বাঁচে! কাজেই বাড়ি বসে-বসে অবসর সময়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখাই হয়ত ছিল ময়নার একমাত্র কাজ। ওর মুখে মানুষ তাকায় আর তাকিয়ে থাকে বলেই আয়নায় ও মুখ দেখতে সুরু করেছিল। হয়ত রূপের জন্যে রূপসী ও নয়, স্বাস্থ্যের জন্যেই রূপসী।

দিঘীর পাড়ে একটা উঁচু ঢিপিতে বসে বিকেলের ঠাণ্ডা হাওয়ায়ও দীপায়নের মনে হচ্ছিল তাকে ঘিরে দুপুর খাঁ-খাঁ করে উঠছে। অচেনা ময়নাকে যেন ও চিনতে পারছিল। খানিকটা বীণাদি, খানিকটা শেফালি আর হয়ত চকবাজারের

নাচওয়ালী, মিলেমিশে একটা চেহারা তৈরী হয়ে উঠ্‌ছিল দীপায়নের মনে। ময়নাকে সে পাচ্ছিল সেখানে—তার চোখ-মুখ-বুক, হাসি-নিঃশ্বাস ঠোঁটের ভঙ্গী সবই অনুভব করতে পারছিল যেন। পাশ থেকে মানিক উঠে গেল জাম কুড়োবার অছিলায়, দিঘীর পাড়ের জাম গাছ্‌টার গুণ গেয়ে গেল দীপায়নের কানে কিন্তু দীপায়নের মনে হল মানিকের উঠে যাওয়া আর কথা বলা ওর চোখের উপর আর কানের ভেতর কতগুলো হিজিবিজি রেখামাত্র। আসল ছবি তৈরী হতে চাচ্ছে ময়নার নামের রেখায়-রেখায়। কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না ওর। খানিকক্ষণ। তারপর যেন মনে পড়ল, প্রতুল হঠাৎ থেমে যাওয়াতেই ওর এমন হয়েছে, বেশি মনোযোগ দিয়ে প্রতুলের কথাগুলো শুনছিল বলেই এখনও ওর মনোযোগ ভাঙছেনা। আর মনে পড়ল বলেই কথা বলল দীপায়ন: "ময়নার সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছে?—ভাব?"

"আলাপ!" প্রতুল যতোটা গম্ভীর হতে জানে তা-ই সে হ'ল: "পাড়ায় দস্তুরমতো বদনাম আমাদের!"

"বদনাম? কেন? কি বদনাম?"

"কেউ মুখ ফুটে বলেনা কিন্তু ভাবে আমরা দুজনে মিলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছি!"

"ভাবলে আর কি হয়!"

"নষ্ট বলতে ওরা কি বোঝে জানিনে—ময়না যা করত তা-ই হয়ত বোঝে!"

কি করত ময়না? দীপায়ন একটা ঢোঁক গিলে যেন কিছু বলতে যায় কিন্তু কি বলবে ভেবে পায়না—মনের উপর শুধু প্রশ্নটাই আওয়াজ তুলতে সুরু করে: 'কি করত ময়না?'

"মলয়-ষ্টোর্সের চিত্তবাবুকে চিনিস, পানু? হ্যাঁ—ঐ যে হ্যাংলা মতো লোকটি—আমাদের পাড়ায়ই থাকেন। মলয়-ষ্টোর্সে গেছিস কোনোদিন? আলমারির সার ভেঙে একটা দরজা মতো করা—পর্দ্দা ঝোলানো—পেছনের ঘরে যাবার দরজা। সামনে থেকে মনে হয় পেছনের ঘরটা গুদোম, প্যাকিং-বাক্স বোঝাই কিন্তু আসলে ওটাও একটা ঘর! ময়না ওখানে যেতো—চিত্তবাবু যেতে বলতেন। তেল-সাবান চুলের ফিতে-কাঁটা এসব দিতেন ময়নাকে!"

একটা চোর কাঁটার ডাটা তুলে চিবোতে লাগল দীপায়ন, দাঁতে-দাঁতে রেখেই বললে: "ময়না নিত ওসব?"

"নিত। ওর বয়েস বা কি তখন—দু'বছর আগে। কিছু ও বুঝত নাকি?"

"এখন ?" ম্লান একটু হাসল দীপায়ন।

"এখন সবাই বুঝতে পারে চিত্তবাবু যা যা করতেন, সব। বলে, কী অসভ্য চিত্তবাবু! বলে কিন্তু হাসে!"

"তুই কি বলিস ?" একটু যেন উদাস শোনায় দীপায়নের গলা।

"আমি আর কি বলব! ও-ই বলে একেক সময়, তুমিও ঠিক চিত্তবাবুরই মতো, না ? বলেই হাসতে সুরু করে!"

দীপায়ন একটু নড়ে-চড়ে উঠতে চায়: "তুইও চুলের ফিতে-কাঁটা দিস বুঝি ওকে!"

"ফিতে-কাঁটা নয়, গল্পের বই।"

"পড়ে ?"

"গোগ্রাসে গেলে। বই জোগাড় করতে আমার প্রাণান্ত!"

একটু অন্যরকম দেখাল দীপায়নকে—একটু যেন শান্ত, তৃপ্ত, খুসী-খুসী। খুব কঠিন কোনো রোগের শেষে যেন সুশ্রী একটি আরোগ্য। কয়েক মুহূর্ত্ত। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে ময়না আরেক চেহারায় ওর মনে ফিরে দাঁড়াল।

"তোর কাছে বই আছে পানু ?" প্রতুল মিহি-মিহি হাসতে লাগল।

"বই—আছে। গল্পের বই ত ?" দীপায়ন কি শুনতে পেল ময়নাই ওর কাছে বই চাচ্চে ?

"কার ? শরৎবাবু-নরেশবাবু কিন্তু ওর পড়া—" প্রতুলের হাসিটায় ঝলসানি এলো, খুসীর নয়, বিদ্রূপের।

"নতুনদের বই আছে।"

"দিবি ত একখানা করে ? আমি অবশ্যি তোর কথা বলব—"

"আমার কথা ?"

"মানে তোর কাছে যে বই পাচ্ছি তা-ই বলব।"

অন্যমনস্ক হতে গিয়েও দীপায়ন অন্যমনস্ক হলনা, খানিকটা দূরে মানিকের দিকেই চোখ ফেরালো। মনে মনে হয়ত বলেও উঠল: মানিক কি করছে এতোক্ষণ ওখানে ? ওর জাম কে খাবে ? কিন্তু দেখা গেল, মানিকের আসবার কোনো লক্ষণই নেই। তাতে বরং একটু আরামই যেন এখন বোধ করল দীপায়ন—মানিক এসে উপস্থিত হলে, মনে হল, কি যেন একটা জিজ্ঞাসা, একটা কিছু জরুরী কথা বুঝিবা বাকি থেকে যেতো ওর। মনের উপর

কথাটা এখনো ঠিক-ঠিক উঠে আসছেনা কিন্তু ভেতরে ভেতরে তোলপাড় করছে ঠিক। না কি জিভের ডগায় এসে গেছে, শুধু লজ্জায় বাধ-বাধ ঠেকছে? দীপায়ন প্রতুলের মুখের দিকে স্পষ্ট চোখে তাকাতে চাইল। প্রতুলকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করবে—এ কেমন কথা? হয়ত কোনো হাসির স্মৃতি মনে পড়তেই মাথা নেড়ে-নেড়ে আপন মনে হাসতে সুরু করেছিল প্রতুল—হাসির ছোঁয়াচে দীপায়নও হাসতে লাগল। ছোঁয়াচে? এম্নিতেই কি হাসিটা তৈরী হয়ে উঠছেনা তার মুখের উপর? দীপায়নের প্রশ্ন শুনে প্রতুল অবাক হয়ে যেতে পারে ভেবেই কি দীপায়ন প্রশ্নের মুখটা হাসিতে হাল্কা করে তুলতে চাচ্ছেনা?

"আচ্ছা প্রতুল—" হাসি আরেকটু গাঢ় করে নিল দীপায়ন।

"বল—" প্রতুল মুখ তুলল না।

"কি করিস তোরা? তুই আর ময়না?" হাসিটা মুখে ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছিল দীপায়নের।

"কতো কিছুই ত করি। ঝগড়া, আড়ি দেওয়া, হাসাহাসি, চিমটি-কাটা, ভেংচানো, কীল উঁচোনো—এম্নি কতো সব।"

"তাছাড়া?" প্রতুলের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল দীপায়ন।

"তাছাড়াও আছে কিন্তু তা বলতে নেই।"

সার্চ্চ-লাইটের মতো সাঁ করে দীপায়ন চোখ ফিরিয়ে আনল প্রতুলের মুখের উপর। দেখতে চাইল ও-কথাগুলোর শেষে প্রতুলের মুখে কোনো ছবি ভেসে উঠেছে কি না। কিসের ছবি? বীণাদির মতোই কি একটি মেয়ের ছবি—প্রতুলের মুখের পাশাপাশি? তেম্নি কি গাঢ় নিঃশ্বাস টানছে মেয়েটি আর তেম্নি ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রাখছে? তারপর একসময় ঘাড় এলিয়ে দিয়ে থুতনি উঁচিয়ে তাকিয়ে থাকছেনা কি ও প্রতুলের বোকা-বোকা চোখের উপর? প্রতুল নড়ছেনা—সাপে জড়িয়ে ধরলে হয়ত এম্নি হয়। 'কি বোকা রে—' নিশ্চয়ই ভাবতে লেগেছে মেয়েটি মনে-মনে—হয়ত বীণাদিও তা-ই ভাবতেন পানুকে। কিন্তু প্রতুল কি আর পানুর মতো সত্যি বোকা? ও দেখতে পেল, আলগা হয়ে গেছে মেয়েটির ঠোঁট—শামুকের মতো চিকচিক করছে ঠোঁটের ভেতরের দিকটা। কিছু বলতে চাইল হয়ত প্রতুল—কিন্তু কি বলতে পারে ও আটাল গলায়? ঠোঁট কাঁপছে প্রতুলের—মেয়েটিও—ছুঁই-ছুঁই করছে—

ছুঁয়ে গেল—নিদালি-দ্রব—মিশে গেল। বীণাদির জিভের স্বাদে মুখের ভেতরটা ভরে উঠ্‌ল দীপায়নের। ঝিরঝিরে হাসিতে চোখ যেন হাওয়া দিতে লাগল।

"ময়নার সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দেব পান্নু—" অগাধ তৃপ্তি উপচে পড়ল প্রতুলের গলায়।

"বেশত।"

"কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলে তোর ভালো লাগবেনা।"

"কেন?"

"বিশ্রী কথা বলার অভ্যাস ওর—পাকামো করার অভ্যাস।"

"কি বলে?" আবার যেন অন্যমনস্ক হতে ইচ্ছে করল দীপায়নের।

"হয়ত বল্‌বে: 'মেয়েদের সঙ্গে ছেলেরা কেন কথা বলতে আসে আমি জানি'—শুনে নিশ্চয়ই তোর ভালো লাগবেনা আর তখন ও ফিক করে হেসে বলে উঠ্‌বে: অবশ্যি আপনাকে বলছিনে, আপনি ত ভালো ছেলে শুনেছি।'—ভীষণ কথা বলতে শিখেছে ও—ফাজলেমি করতে।"

"তোর ভালো লাগে শুনতে?"

"আমার সয়ে গেছে। তাছাড়া মন্দ কি এক-আধটু ফাজলেমি? ফাজলেমির সঙ্গে সঙ্গে চোখ ঝিলকিয়ে ওঠে, চমৎকার ভঙ্গী হয় ঠোঁটের আর ভুরুর, আঁকাবাঁকা হয়ে ওঠে শরীব—দেখতে বেশ লাগে।"

বাইজির আসরে এক কোণে দাঁড়িয়ে দেখছিল পান্নু। দেখতে বেশ লাগে—ভাবছিল সে—আর-আর মেয়েদের মতো ও চুপচাপ, জড়োসড়ো মোটেই নয়—উথলে-ওঠা, উপচে পড়া! ওড়নাটার মতোই যেন হাল্কা ওর শরীর। দীপায়ন দেখতে পেল সে ওড়নাটা সরে গেছে ওর বুকের উপর থেকে—কাঁচুলিও নেই—উদোম শরীর—তারপর দক্ষিণী ঘাঘরাটাও যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ময়না! দীপায়নের মনে হ'ল যেন ময়নাকেই দেখতে পাচ্ছে ও—এ-রকম, ঠিক এম্নি সে। চোখের ইসারায় ডাকছে ওকে ময়না। 'তাকিয়ে কি দেখছেন?'—ময়নার গলাও শুনতে পেল দীপায়ন! গলার ভেতরকার হাসি শুনতে পেল। লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে হল।

"তোর ভালো লাগবেনা—" প্রতুল আবারও বললে।

ভালো লাগবেনা- মনে হল—নিজেকেই যেন নিজে প্রশ্ন করছে দীপায়ন। লজ্জা হবে খানিকটা প্রথম। সত্যি। কিন্তু লজ্জা পাওয়া কি ভালো

না লাগা? দেখতে-চাওয়াকে লজ্জা-পাওয়া কি ভুলিয়ে রাখতে পারে অনেকক্ষণ? কক্‌খনো না—একটু বিদ্রোহের ভঙ্গীতেই মনের একটা জায়গা যেন না বলে উঠল দীপায়নের। আর তারই ছবি আরেক ভঙ্গীতে—বিদ্রূপের ধারাল হাসিতে ফুটে উঠল চোখের উপর।

"ভালো লাগবে না কেন?" বলল দীপায়ন।

"ভাবছি। তুই কি আর আমার মতো?"

ফেটে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছা করল দীপায়নের। খোসা ফাটিয়ে দিয়ে শাঁস বেরিয়ে পড়তে চাইল। প্রতুলের মতো নয় কেন ও? কেন প্রতুল ভাবতে পারে পানু তার মতো নয়? কেন ভাববে? হেরে যাওয়ার একটা বিষণ্ণতা ফুটে উঠল দীপায়নের মুখে কিন্তু হেরে যেতে চাইলনা ও কিছুতেই: "না-ই বা হ'লাম কিন্তু তা বলে কি মেয়েদের ভালো লাগেনা আমার? তাছাড়া—" অনুযোগে এলিয়ে পড়ল দীপায়নের গলা: "তোর ভালো লাগলে আমার ভালো লাগবেনা কেন?"

"বাঃ রে—" ছটফট করে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল প্রতুল: "ভালো ছেলেদের ভালো লাগাটা বুঝি আমাদের মতো?"

"আমি চার মাস কলকাতায় থেকে এসেছি—তা জানিস?"

"তাতে কি?"

"কলকাতায় ভালো ছেলেদেরও রঙ বদলে যায়!"

"তা-ই নাকি?" চোখের আর ঠোঁটের কোণে প্রচুর ভাবে হেসে উঠল প্রতুল।

দীপায়ন মরীয়া হয়ে উঠলো: "আমাদের সঙ্গে মেয়েরা পড়ে—একই ক্লাশে। আর ভালো ছাত্রদের সঙ্গে মেয়েদের ভাব হতেও দেরী হয় না, জানিস ত?"

কিন্তু তাতেও প্রতুল জল হয়ে গেলনা: "পড়ুনি মেয়েরা কি আর ও রকম? ময়নার মতো মেয়েরা কলেজে পড়েনা!"

দীপায়ন বীণাদিকে জানে। ময়না যে আরেক রকম, জানে—কিন্তু কি যে সে রকমটা ও ভাবতে পারছে না এখন! অথচ ভেবে ভেবে রকমারি করে তুলতে ভালো লাগছে আর ইচ্ছে করছে এক্ষুনি মানিককে হেনতেনো বলে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে প্রতুলের সঙ্গে সোজা চলে যায় ময়নাকে দেখবার জন্যে। হঠাৎ

যদি কেউ এসে এখন বলত, বীণাদি এসেছে, তোমায় ডাকছে—তাহলে যেমন ইচ্ছে হ'ত উঠে পড়তে ঠিক তেম্নি একটা ইচ্ছাই খাবলে ধরল দীপায়নকে।

তিনদিন পর, ময়নার সঙ্গে তখন দীপায়নের দেখাশুনো হয়ে গেছে, আমাকে ও দীঘির পাড়ের কাহিনী শোনাচ্ছিল। বেশ সাহসী, স্পষ্ট, পরিষ্কার হয়ে গেছে দীপায়ন দেখতে পেলাম, ধোঁয়াটে ভাবটা আর নেই মনে। খুসী হয়েছিলাম ওকে দেখে, মনে পড়ে। ও আর ব্যথিত নয় দেখে ভালো লাগছিল।

"আমরা ইচ্ছে করলে খুব শীগগীর কাউকে ভুলে যেতে পারি—না রে অনি ?" ব্যথার মুমূর্ষু চেহারাটা তখনও ঠোঁটের আর ভুরুর বাঁক ছেড়ে যেতে চাচ্ছিলনা দীপায়নের।

"ইচ্ছে করলে কী না করা যায়! নীতির বুলি ছুঁড়ে দিলাম নিশ্চিন্ত মনে

"তা-ই !"

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল দীপায়ন। ওর চুপ-করে থাকাটা গাছের সূর্য্যালোক গ্রহণের মতো। আজ লিখতে বসে ভাবছি ইচ্ছার শক্তিকে যেন সেদিন ও প্রথম মনে মেনে নিচ্ছিল। মেনে নিয়ে শেষটায় তার মন্দির তৈরী করে বিগ্রহের মতো প্রতিষ্ঠা করেছিল মনে। দীপায়ন বল্‌ত: "অনেকে কালীকে দেখতে পায়, ঈশ্বরের আদেশ শুনতে পায়, জোন-অ্য আর্ক আদেশ পেয়েছিলেন যুদ্ধ করতে—এগুলো কি জানিস ? যারা তা পায় তাদের মনের গড়নই থাকে অদ্ভুত—ইচ্ছার একটা আশ্চর্য্য শক্তিতে মন তাদের থরো-থরো করতে থাকে। সবার মনই যে ইচ্ছাকে এমন ভারে ধরে-গড়ে তুলতে পারে তা নয়—কেউ-কেউ পারে। রামকৃষ্ণ যেম্নি পারতেন, বিবেকানন্দ তেম্নি পারতেন না। যারা পারে তারা সত্যি আশ্চর্য্য মানুষ !"

যখন কথা-ও বল্‌ল তখনও মনে হ'ল ও চুপ করেই আছে: "ইচ্ছে করলে বীণাদিকেও ভুলে-যাওয়া যায় !"

"কেন যাবেনা ?"

"মনে রেখে কি লাভ ? হয়ত দেখাই হবেনা আর কোনোদিন !"

"হঠাৎ বীণাদিকে মনে পড়ছে যে আজ তোর—কি হ'ল ?"

"পড়ছে।" একটু হাসতে চাইল দীপায়ন, তার মানে ওর ঠোঁটের কোণে রেখাগুলো একটু জোরালো দেখাল।

"ও! নিভবার আগে দপ্ করে জ্বলে-ওঠা?"

"সত্যি তা-ই।" স্পষ্ট করে হাসল এবার দীপায়ন।

"কিন্তু কেন? দেবুদা কিছু ভাবছেন বলে?"

"না-ত! দাদা কি ভাবতে যাবেন! বাসবের সঙ্গেই কথা ওঁর ফুরোচ্ছেনা!"

তবে? আমার কথা ফুরিয়ে গেল। প্রশ্নও। মনে হলনা বীণাদিকে ভুলে যাওয়ার কারণটা আর কোনো প্রশ্নে বিঁধিয়ে তুলে আনা যাবে। প্রশ্নের হৈ-চৈ না করে চুপচাপ থাকলেই ওটা সহজে উঠে আসবে ভাবলাম। আর সত্যি তা-ই হল। রহস্যভেদী শব্দ শোনা গেল দীপায়নের গলায়: "মেয়েরা অনেক রকম হ'তে পারে—কেমন না?"

"হেঁ—আমরা যেম্নি!"

"না, তা বলছিনে! দু'টি মেয়ে অনেকখানি একরকম হঠাৎ একটা জায়গায় আলাদা হয়ে যেতে পারে। আমরা তা নই—আমরা অনেকখানি একরকমই হতে পারিনে—গোড়াতেই আলাদা-আলাদা।"

"অতো মাইক্রোস্কোপ লাগিয়ে কে দেখতে যায়?"

"যারা ঠিক-ঠিক দেখতে চায়।"

"কিন্তু তোর দু'টি মেয়ে কা'রা? শেফালি আর বীণাদি?"

"ওরাও। আবার বীণাদি আর ময়নাও।" বেশ ফুরফুরে হয়ে গেল দীপায়নের গলা: "ময়না! প্রতুলের সঙ্গে খুব ভাব মেয়েটির।"

"তোর সঙ্গেও ভাব হয়েছে বুঝি?"

"দুর—তা কেন?" বিষকুম্ভ কথা বল্‌লে।

"তবে?"

"প্রতুল নিয়ে গিয়েছিল আমায় ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে। কথা বলেনি বেশি—গায়ে মোচড় তুলছিল আর মুচকি হাসছিল। ওর তাকানোটা বীণাদির অনেকসময়কার তাকানোর মতো—অদ্ভুত মিল।"

"প্রতুল তাহলে ভালোই আছে—কেমন? দেখা হলে জিজ্ঞেস করব।" দীপায়নকে আর শুন্‌তে ইচ্ছা করছিলনা আমার। ব্যথার ফাঁস থেকে ছিট্‌কে গিয়ে ও যেন বড্ড বেশি হাল্কা হাওয়ায় দুলতে সুরু করেছে—মনে হল। এক প্রান্ত থেকে যেন আরেক প্রান্তে ছুটে গেছে। ওকে ভালো লাগছিল খানিকক্ষণ তারপর আর না।

কিন্তু দীপায়ন হয়ত আমাকে দেখতে পায়নি, নিজের খুশীতেই মত্ত হয়ে বলতে লাগল: "ইচ্ছে করলে ওর সঙ্গে ভাব করা যায়। থাকেনা এমন কেউ-কেউ সবাইকে যাদের ভালো লাগে? ময়নাও ঠিক তেম্নি!"

ওর হোঁচট খাওয়া দরকার, তাই বললাম: "মানিক? মানিক কি করছে আজকাল? মানিককেও ভুলে যাচ্ছিস ত?"

"কেন?" দীপায়ন পুরোপুরি দৃষ্টিতে তাকাল আমার মুখে: "মানিককে ভুলবার কি আছে?"

"না, ভুলতে সুরু করেছিস যখন, সবাইকেই ত ভুলতে পারিস।"

বাঁকা হাসিতে তীক্ষ্ণ বিষাক্ত দেখাল দীপায়নকে: "একদিন হয়ত সবাইকে ভুলে যাব—যাদের চিনতাম। মন ত আর গুদোম-ঘর নয়!"

"তা জানি।"

"কিন্তু জানিসনে যে তুই খানিকটা গাজ্জিয়ানি করতে ভালোবাসিস।"

ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়াক আমি চাইনি। অবশ্য এমনও ভাবতে পারিনি যে দীপায়ন হঠাৎ তেতে উঠ্‌তে পারে। আমার চোখের আড়ালে ও দ্রুত বদলে যাচ্ছে বুঝতে পারছিলাম। আর আজকাল আমাকে এড়িয়ে থাকতেই যেন চায় ও। প্রতুলের সঙ্গে জুটে গেছে একা-একা, আমি ত ছিলামই না, মানিকও না। দেবুদার আর বাসবের পোলিটিক্সের তাড়া খেয়েই ও ক্ষেপে গেল না কি ভাবছিলাম। না কি বীণাদির বিয়েতে? এমনই যদি হবে ও, তাহলে আর ক্লাশের মেয়েদের কাছে ব্রহ্মচারী সেজে থাকত কেন? কলকাতার চেহারার সঙ্গে ওর এ-চেহারার কোন মিল নেই—রাতারাতি কি অদ্ভুতভাবে বদলে গেছে! যেন একটা আবছা অশ্লীলতাও আবিষ্কার করা যায় ওর চোখ-মুখ হাসি থেকে—হ্যাঁ—সেই ভদ্র, শান্ত ভঙ্গী আর নেই ওর কোথাও।

গুটি কেটে প্রজাপতি বেরোচ্ছে দেখে খুশী হবার কথা ছিল কিন্তু খুশী হতে পারলামনা তেমন। আর তাই মনে হ'ল, সত্যি হয়ত আমি, গাজ্জিয়ানি করতেই ভালোবাসি।

১৯৪৫ ইং

টিউব-ভর্তি গ্যাসগুলো জ্বলন্ত রঙ ছড়িয়ে দিচ্ছে চৌরঙ্গীর আকাশে—লাল আলোর ভয়ঙ্কর ইসারা রক্ত জ্বল্‌ছে। বেগনী সন্ধ্যা গঙ্গার পাড়ে।

তারপর চৌরঙ্গীতে এই ভয়ঙ্কর রাত্রি। রাত্রির হাত কার্জ্জন পার্কের দক্ষিণ-প্রান্ত ধরে গঙ্গার ধারে ধারে অন্ধকার খুঁজছে। তুমি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছো।—না কি ওই লাল জ্বালায়—গ্যাসের আয়নিত বিদ্যুৎ-চাঞ্চল্যে? বোবা আলো--তাপ—তাপের কালো শিখা তোমারও দেহে—ওরও দেহে—ও মেয়েটির।

"কোথায় যাবেন?—" গ্যাস্-পোষ্টের নীচেকার নীল্‌চে আলো খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল।

"কেন?"

"কেন আবার! জানতে চায়না কেউ?"

"তোমার বাড়ি কোথায়?"

"বাড়ি?" চোখের মতো ঠোঁট মটকালো ও: "নিমতলা ঘাট!"

"ও"—মুখ ফিরিয়ে নিল দীপায়ন।

কার্জ্জন-পার্কের অন্ধকার ঠেলে এগোতে লাগল—দু পাশে ঘাসের বিছানায় হয়ত আবছা গুঞ্জন—কিন্তু তার কানে দু'টো কাঠ ঠক্‌ঠক্ বেজে চলেছে, 'নিমতলাঘাট—নিমতলাঘাট—ঘাট—ঘাট!' আগুনে পুড়ছে কাঠ—কাঠের আড়ালে হাড় মাংস। আগুনে পুড়ছে চৌরঙ্গীর আকাশ—বিশ্রী—থিঁতিয়ে-থিঁতিয়ে পোড়া কি বিশ্রী! গ্যাস-পোষ্টের নীচে দাঁড়িয়ে মেয়েটি এখনও পুড়ছে! ওর সস্তা গোলাপী শাড়িটায় কতো আগুন কে জানে? হাসছে হয়ত এখনো আবার—আরো অনেকবার। তারপর কোথায়? ঘাটে—আগুনে? নিমতলাঘাটে? নিমতলাঘাট—আগুন—ঘাট—জল। 'চেরাপুঞ্জীর থেকে একখানি মেঘ ধার দিতে পারো গোবী-সাহারার বুকে?'

কোথায় মেঘ? মেঘ কোথায়—শেফালি নেই, তোতা নেই! ময়না? আছে। কোথায় আছে! এখানে। পানু চারপাশে তাকাল। 'তাকাও পানু—' দীপায়নকে বললে প্রতুল: 'আচ্ছা, ওখানে—ধূলোবালির আর আলোর আকাশে--চৌরঙ্গীতে তাকাও না!'

'তাকাওনি? কোনোদিন না?' দীপায়ন বললে পানুকে বেন্‌টিঙ্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে। চিত্তরঞ্জন এভিনিউর ঝিকিমিকি ফাঁকা অন্ধকার সামনে। পানু জিজ্ঞেস করলে: মুচকি হাসছিল আবছা পানু: আর তুমি? কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

কোথায় গিয়েছিলাম? কোথায়! জানোনা? তুমিই বলোনা—বলো!

পুরীর হোটেলের বাথ-টাবে স্নান করছিলেনা তুমি একদিন? কাকে দেখেছিলে—তোমাকে? না, ময়নাকে?

মানিক কি বলেছিল তোমাকে—মনে কি পড়েনি মানিকের কথাগুলো: 'ওকে নিয়ে কি যে করে প্রতুল!" 'কি যে করার' ছবি মনে তুলে নাওনি তুমি? তারপর ময়নাকে দেখলে কি ইচ্ছে করত তোমার, ইচ্ছে করত না কি ওকে নিয়ে ঠিক তেম্নি করতে—তোমারও ইচ্ছে করত না কি? দেখতে ইচ্ছে করত ময়নাকে—ওর সবটুকু। ওকে দেখতে চেয়েছো তোমাকে দেখে দেখে। তোমাকে দেখছিলে তুমি; শরীরের সব রেখা, সব ডৌল, সবটুকু শরীর, তোমার শরীরকেই মনে হয়েছিল যেন আর কারো—তোমার নয়—অচেনা মেয়ে। মনে পড়েছিল তার চেয়েও অচেনা আরো কিছু আছে—ময়না—ময়নাকে মনে পড়েছিল তোমার। ট্যাপ্ ছেড়ে ছেড়ে দিয়ে শিউরে উঠেছিল তুমি—টক-খাওয়া জিভে ডাক্‌ছিলে: "ময়না—ময়না ··ময়না"!

দেখতে চেয়েছিলে—দেখতে পেয়েছিলে ময়নাকে। তোমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল ও। কিন্তু কতোটুকু দেখেছিলে—ওর হাসি—চোখের আর ঠোঁটের—ওর আঙুল মটকানো—পায়ের আঙুল নাচানো এই শুধু · এই··· আর কিছু না। আর কিছু দেখতে পাওনি। কিন্তু দেখতে চেয়েছিলে।

"এখনও দেখতে চাও—ছুঁতে চাও সমস্ত শরীর"—পানু বললে দীপায়নকে চিত্তরঞ্জন এভিনিউর ফুটপাথে।

"চাই? না-ত!"

"তোমার শরীরকে জিজ্ঞেস করো!"

"আমি কি আমার শরীর?" হো-হো করে হেসে উঠল দীপায়ন।

"নও?"

দীপায়ন তাড়াতাড়ি পা চালালে।

"নও কি—বলো।"

হাওয়ার মতো উড়ে চলল দীপায়ন, মনেই হলনা তার, সে যে হাড়ে-মাংসে একমণ পঁচিশ সের। পারিনে, যা জড়ো করেছি ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারিনে! —পারেনা দীপায়ন মেয়েদের মূর্ত্তি ভেঙে ফেলতে—হাত দিয়ে ছুঁয়ে নষ্ট করে দিতে পারে না এতো সৌন্দর্য্য! তুমি কি শুধু তোমার শরীর? আর কিছু নও? 'নিমতলাঘাট'—ওর জিভটা গড়াচ্ছিল মুখের ভেতর—জোঁকের

মত লেপ্টে গড়াচ্ছিল ! থলো-থলো মাংসের খানিকটা ঢেলা একটা কুৎসিত জীবের মতো তোমরাও মুখের ভেতর নড়ছে, বীণাদির'ও মুখের ভেতর ছিল, ময়নারও। এমন আরো আছে · যা দেখলে ঘিন্‌ঘিন্ করে উঠবে তোমার গা— সাপের মতো কুণ্ডলী তোমার প্লীহা-যকৃতের অদ্ভুত জীবগুলোকে জড়িয়ে— শঙ্খের মতো পেঁচালো মাংসের শরীর তোমার কানের ভেতর—মগজের জেলি মা,! তুমি কি এরা ? এই জীবজন্তুর কিলিবিলি—এই বোবা প্রাণী-গুলোর প্রাণ ? আর কিছু নও ? 'কে বললে আর কিছু নেই ?' সামনের একটা ভেংচানো মুখকে যেন ধমক দিয়ে উঠল বরুণ দীপায়ন। আমার শরীরের বাইরেও চলে যেতে পারি সব সময়—সেই আমিই আমি—দীপায়ন ত্রিমূর্ত্তি। শরীরকে ভালো লাগা আর তাই তাকে ভুলে থাকা—আমি। দেহের চারপাশে একটা সত্তা · গন্ধের মতো, আলোর মতো, নির্ব্বাক ধ্বনির মতো— সেই ত আমি ! আমি আমার মাতৃ-মমতা !

আকাশের দিকে তাকাল দীপায়ন। আকাশের দিকে তাকালাম অনেকদিন পর। কলকাতার ধূসর দিগন্তের ফ্রেমে আঁটা আকাশ—তবু আকাশ তার রাত্রি-পট হারায়নি, রাত্রি হারায়নি স্বাতী-শতভিষা, চিত্রা-বিশাখার দল, তারাগুলো হারায়নি তাদের নীল-সবুজ জ্যোৎস্না - ছায়াপথের অজস্র আশীর্ব্বাদ ! ওরা আগেও ছিল, এখন'ও আছে। ছিল আমাদের ছোট সহরের ঘন-নীল আকাশে। এখানেও আছে চৌরঙ্গীর লাল আকাশের কেন্দ্রে আরেক বৃত্তে।

তোতাকে মনে পড়ল, মনে পড়ল সুপর্ণাকে। দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং।......

আট

হাজরা রোড—কলকাতা

৩. ৪. ৪০

প্রতুল,

'একটা সময়' আজ ক'দিন থেকেই আমার ভেতর নড়ে-চড়ে উঠ্‌ছে—(বাক্যটা তোর কাছে অদ্ভুত মনে হচ্ছে না ? কিন্তু কি করা যায়, নিজেকে বোঝাতে এমন অদ্ভুত বাক্যই তৈরী করতে হল)—তা-ই তোকে এ-চিঠি।

এখন চৈত্রমাস। কল্‌কাতায়ও। বাংলার আলো-হাওয়া ছেড়ে কোথায় পালাবে কল্‌কাতা—বাংলাদেশের পাগলা আকাশ থেকে পালিয়ে কোথায় যাবে ? আমারও পালাবার উপায় নেই ! মনে পড়ছে আমাদের দিঘীর পাড়—বিকেল—সেই আকাশ—নীল—যাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করত।

তোর মনে পড়ে কি না জানিনে, আমার এ-ক'দিন ময়নাকে মনে পড়ছে। সেই গুড্‌-বয় পানু, বেপরোয়া প্রতুল আর তার চাইতেও বেপরোয়া ময়না—এ তিনজন মানুষ আমার ঘরে রথযাত্রা সুরু করেছে। তোকে সে-খবরটাই দিচ্ছি। আমার লেখা যখন পড়িস, চিঠিটা পড়তেও অরুচি হবেনা আশা করি।

আচ্ছা, সত্যি বল্‌ত প্রতুল, ময়না যেদিন প্রথম আমাকে চিঠি লেখে আর তুই তা জানতে পারিস, খানিকটা মন-খারাপ হয়েছিল কি না তোর ? তুই অবশ্যি হাসি-খুসীই দেখাতিস, বোঝাতে চাইতিস ময়না দুষ্টুমিতে ভরা—ওরকম হামেসাই করে—কিন্তু সত্যি-সত্যি কি তা-ই ভাবতে পারতিস তুই ? ধর—তখন যদি আমরা তিনজন একটা ঘরে নিরিবিলি বসতে পারতাম আর কবুল করে নিতাম যা-সত্যি সবাই তা-ই বলব আর তা বলবার শক্তিও যদি থাকত আমাদের, তাহলে যে-দৃশ্যটা তৈরী হত তা তুই হয়ত কখনও ভেবে দেখিসনি—এখন ভাবতে পারিস কি না জানিনে। কিন্তু আমার ঘরে রোজই এহেন অ-দৃশ্য তৈরী হয়ে চল্‌ছে। ছাখ, দৃশ্যটা কেমন :

ময়না ॥ আমি জানি, তুমি আমায় ভালোবাসো না।

পানু ॥ কেন ?

ময়না ॥ কেন আবার ! আমায় কেন ভালোবাসবে তুমি ? (গম্ভীর)

পান্নু ॥ (শঙ্কিত তাই গলায় খানিকটা আদর ঢেলে) কী ছেলেমানুষ

[ঠোঁটে ঠোঁট চাপছে ময়না, দেখে মনে হয় এরপর কেঁদেও ফেলতে পারে]

পান্নু ॥ (কাজেই আর মন্তব্য না করে ভালোবাসাটা ঘোষণা করবার ইচ্ছায়) কেন ভালোবাসবনা তা কি তুমি বলতে পারবে ?

ময়না ॥ (ফিক্ করে হেসে) প্রতুল সব জানে !

পান্নু ॥ (মনে-মনে গত কাল বা পর্শুর উপর চোখ বুলিয়ে) সব জানে ! সব কি ?

ময়না ॥ চিঠি। আ—র—

পান্নু ॥ বাঃ, চিঠির কথাত আমি-ই বলেছি ওকে—

ময়না ॥ তু-মি ? ও—(কাঁধ থেকে আঁচলটা কুড়িয়ে নিয়ে ভালো করে গা ঢেকে দিল) কেন বলতে গেলে ?

পান্নু ॥ আর কিছু ত বলিনি, চিঠি লিখেছ শুধু তা-ই।

ময়না ॥ (শুকনো মুখে, একটু উদাস) তা-ই কেন বলতে গেলে !

[পান্নু ময়নার মুখে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর উঠে গিয়ে দু'আঙুলে ময়নার ঠোঁট নেড়ে দিল]

পান্নু ॥ রাগ করেছ ?

ময়না ॥ দরকার নেই !

পান্নু ॥ কি দরকার নেই ?

ময়না ॥ আমাকে ছোঁবার দরকার নেই।

পান্নু ॥ খুব আছে।

ময়না ॥ (মুখ ফিরিয়ে) না।

পান্নু ॥ কিন্তু আমি ছোঁব।

ময়না ॥ খারাপ মেয়েকে ছোঁয় নাকি কেউ ?

পান্নু ॥ খারাপ ছেলে ছোঁয়।

ময়না ॥ (পান্নুর মুখের উপর চোখ এনেঁ রাখল ধীরে-ধীরে)—নাঁ—কেঁন—

পান্নু ॥ বলেছি কি হয়েছে তাতে—প্রতুল ত কিচ্ছু মনে করেনি !

ময়না ॥ তুমি কেন বল্‌বে ? (পান্নুর গায়ে মাথা এলিয়ে দিল)

পান্নু ॥ আর বল্‌বনা কিছু—

[দু'হাতের থাবায় পান্নু ময়নার মুখটা তুলে ধরল]

[প্রতুল এসে ঘরে ঢুকল, পান্নু পালাল]

প্রতুল ॥ কি হচ্ছিল ?

ময়না ॥ কি আবার ?

প্রতুল ॥ দেখছিলাম যেন—

ময়না ॥ ও, চোখে কুটো পড়েছে একটা, পান্নু তা-ই দেখছিল (আঁচল দিয়ে চোখ রগড়াতে লাগল)

প্রতুল ॥ আগেও অনেকবার পড়েছে আর তাই হয়ত আজকাল চোখে ভালো দেখতে পাওনা।

ময়না ॥ মনে ত হয় আজকাল চোখে অনেক ভালো দেখ্‌ছি।

প্রতুল ॥ তা-ই না কি ? ভালো!

ময়না ॥ নিশ্চয়ই ভালো।

প্রতুল ॥ (বিশ্রীভাবে হেসে উঠে) ভালো দেখবার পালা আর ফুরোবেনা তোমার!

ময়না ॥ তাতে তোমার কি ক্ষতি ?

প্রতুল ॥ ক্ষতি—অনেকগুলো দিন নষ্ট হল আমার।

ময়না ॥ দিন তুমি একা-একাও নষ্ট করতে পারতে! (উঠে পড়ল)

প্রতুল ॥ দাঁড়াও—শোনো—

ময়না ॥ কি ?

প্রতুল ॥ আরো ক'টা দিন নষ্ট হোক না—যদ্দিন না একদম ছুটি নিচ্ছি!

ময়না ॥ (ঠোঁটের দু'পাশ শক্ত করে) ছুটির দরখাস্ত চাও না কি ?

প্রতুল ॥ তা আর কি করে চাইব—দরখাস্ত দাখিল করে ত তুমি ভর্তি হওনি!

ময়না ॥ আমায় যেতে দাও।

প্রতুল ॥ (একটু সরে দাঁড়িয়ে) পথ ত সবসময়ই খোলা!

ময়না ॥ কাজেই!—তুমিও ভালো হতে চলেছ যখন!

[কিছু বলবার জন্য থামল ময়না কিন্তু কিছু না বলেই চলে গেল]

[পান্নু এসে ঘরে ঢুকল]

প্রতুল ॥ মিথ্যাবাদী!

[পান্নু শুকিয়ে উঠ্‌ল]

প্রতুল ॥ ওসব মেয়ে এ রকমই হয়। স্বার্থপররা মিথ্যাবাদীই হয়।

পান্নু ॥ ময়না ?

প্রতুল ॥ (ক্ষুণ্ণ ও ক্ষুব্ধ) আমি কিন্তু ভাবতেই পারিনি, পান্নু, তুই ময়নার সঙ্গে অতোটা গা-ঘেঁষাঘেঁষি করবি! ওর সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষিই করা যায়, আর কিছু না।

পান্নু ॥ কি যা-তা বলছিস তুই।

প্রতুল ॥ ময়না যা তা-ই বলছি। তোকে নষ্ট করতে চাচ্ছে ও এখন। এম্নি হয় কেউ কেউ।

পান্নু ॥ একটি মেয়েকে তুই এসব কথা বলতে পারিস—?

প্রতুল ॥ ওসব মেয়ে নিজেকে এত বেশি করে চায় যে পরের কথা একটুও ভাবেনা।

পান্নু ॥ আমার মনে হয় না—(অন্যমনস্ক)

প্রতুল ॥ হবে একদিন।

পান্নু ॥ না (দৃঢ়)

[য ব নি কা]

এ দৃশ্যটা তৈরী হল কেন জানিস, প্রতুল ? তুই ভাবতিস, ময়না তোর সঙ্গে বা চিত্তবাবুর সঙ্গে যা করেছে আমার সঙ্গেও তা-ই করবে। তুই ভাবতিস এ-কথা। তোর কালো ভাবনাটা সাদাসিধে হাসির চেহারা নিয়ে বাইরে ফুটে উঠত—দেখাতে চাইতিস খুব মজা পাচ্ছিস। আমিও তোকে বাইরের চেহারাতেই ধরে নিতাম, ভেতরে যাবার মন ছিলনা বলেই। 'মন ছিলনা'-টা হু'রকমের! মন ততোটা পাকা হয়নি তখন আর তাছাড়া মনোযোগও দিতামনা তখন তোর দিকে। বিয়ের আগে ময়নার হিষ্টিরিয়া হ'ল—ঠাট্টায় তুই ফেটে পড়েছিলি, মনে আছে ? মেয়েদের ব্যাপারগুলো আমার চাইতে তোর ঢের বেশি জানা ছিল—তা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু বিয়ের আগে ময়না আমাকে কি বলেছিল জানিস - বলেছিল : "তুমি না বললে আমি এ বিয়ে করবনা, না, কিছুতেই না!" মেয়েদের বিয়ে করতেই হয়, তা-ই জানতাম। আমি 'না' বলিনি। এক বছর পরেই ময়নার স্বামী মারা যায়—ব্যাপারটাতে তুই একটু থমকে গিয়েছিলি কিন্তু আমি ? হুঃখিতই মনে হত আমাকে কিন্তু ময়নার

স্বামীর মৃত্যু আমি মনে-মনে চাইতাম বলেই মনে-মনে খুসী হয়ে উঠেছিলাম। গুজব ছিল স্বামীর মৃত্যুতে ময়নার হাত আছে। জানিনে ওটা সত্যি কি মিথ্যে। তুই অবশ্যি বলেছিলি: ময়নাকে দিয়ে সবই হতে পারে। তারপর আমার সঙ্গে ওর মাত্র একদিন দেখা হয়েছিল—সভার মাঠে, পেয়ারা গাছটার তলে। কিছুই বললে না ও, বলতে পারলেনা। আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল আর অতি কষ্টে শুধু বললে: "পানুদা—"

বলতে পারবি প্রতুল, কি ও বলতে চেয়েছিল? না, আমিও সেদিন বলতে পারতাম না, কিন্তু আজ পারি। ময়না বলছিল: "পানুদা—তুমিই খুনী।"

কলকাতায় আমারও পড়া শেষ, আর ময়নাও নার্স হবার জন্যে কলকাতায় এলো।. আমার সঙ্গে আর ওর দেখা হয়নি। কি জানি তোর সঙ্গে যদি হয়ে থাকে, কিন্তু আমাদের দেখা হয়নি আর। ভাবি, এখন যদি হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে যায়। আমি চাই দেখা হোক। মাঝে মাঝে চমকে উঠে কোনো মেয়ের দিকে তাকাইও আমি। কি অদ্ভুত—ভুলে যাই, ময়না যেখানেই যেভাবে আজ থাক, ও যে আর আমাদের সেই সেকেণ্ড-থার্ড-ফোর্থ ইয়ারের সময়কার ময়না নয়।

চিঠিটা পড়ে কেমন লাগে তোর জানাস। ইতি—দীপায়ন।

চিঠিটাকে প্রতুল দীপায়নের রচনা বলেই ভেবে নিয়েছিল আর তাই সযত্নে লাইফ-ইন্সিওরেন্স পলিসির খামে ভরে রেখে দিয়েছিল। আমাকে চিঠিটা দেখাবার সময় অন্তত প্রতুল তা-ই বললে। হতে পারে ওটা ওদের তিন জনের জীবনের হিসাব-নিকেশ কিন্তু প্রতুলের কাছে তা খুব একটা বড়ো ব্যাপার নয়। জিনিষটা দামী, কেননা ওটা দীপায়নের লেখা।

দীপায়ন বলত: ইস্কুলের বন্ধুরা এক চমৎকার মানুষ। ওদের মতো আর কাউকে পাওয়া যায় না জীবনে—এমন কি, স্ত্রীকেও তোমরা তেমন ভাবে পাও না। ভাবতে পারো যে তাদের ভুলে গেছ। ভুলে গেছ কি না ভাবতে গিয়ে দেখবে মনের একটা জায়গা ফর্সা হয়ে উঠল—সেখানে কথা ফুটছে, মুখ ভাসছে—কচি কচি কতগুলো মুখ। যাদের সঙ্গে ঝগড়া করেছি, আড়ি

দিয়েছি তারাও দিব্যি চুপচাপ বসে আছে সেখানে। আর কী যে ভালো লাগছে তখন—হঠাৎ কী রকম যে ভালো লেগে উঠছে তুমি বলতে পারো না! অনেকদিন পর—অনেক বছর পর হয়ত দেখা হ'ল এমন কোনো বন্ধুর সঙ্গে, যে এক আলাদা মানুষ, সে মানুষটাকে হয়ত তোমার ভালো লাগছেনা, এমন কি, পালিয়েও বাঁচতে ইচ্ছে করছে তোমার কিন্তু দেখতে পাবে, হঠাৎ তোমার মনের সে ফর্সা জায়গাটা তোমায় ঘিরে ধরল, যেন কোনো মুমূর্ষুকে বাঁচাতে যাচ্ছ এম্নি আগ্রহ ফুটে উঠবে তোমার চোখে-মুখে! আর সব কিছুই মরে যায়, ওরা মরেনা।

দীপায়নের এধরণের কথায় মানিককেই মনে পড়ত—প্রতুলকে নয়। থার্ড-ইয়ারের পুজার ছুটিতেও মানিককে দীপায়নের ছায়ার মতো দেখতে পেয়েছে সবাই। তখন যেন আরো বেশি গা-ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছিল মানিক—আগেকার মেয়েলি লজ্জাটা আর ছিলনা একটুও। দীপায়নও যেন মানিককে ফিরে আবিষ্কার করেছে, মনে হ'ত।

আমাদের আই-এ পরীক্ষার শেষে দেবুদা বিয়ে করলেন। দীপায়ন বলেছিল, মার পীড়াপীড়িতে নইলে পোলিটিক্স নিয়ে দাদা যা ব্যস্ত বিয়ের কথা ওর মনেই পড়তনা। মনের পীড়াপীড়িতে বিয়ে করেন নি দেবুদা, জানতাম। তবে আবার পোলিটিক্সে ঝুঁকে পড়ছেন বলে হয়ত বিয়েটা ওর দরকার ছিল। পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়া। আমি এখন রীতিমতো গেরস্ত—দ্যাখো—আমার পেছনে লেগে থেকে লাভ নেই!

"কিন্তু বীণাদিকে ভুলে গেল দাদা?" দীপায়ন আমাকেই জিজ্ঞেস করেছিল: "কি করে ভুলল রে?"

"যারা একটা মাত্র জিনিষ মনে রাখে তারা আর সব-কিছুই ভুলে যায়!"

"সত্যি পোলিটিক্স ছাড়া দাদার মাথায় আর কিচ্ছু নেই।"

"বৌদি কি বলেন?"

"শুধু হাসেন। এক-রকম হাসি-হাসি মেয়ে আছে না?—তেম্নি!"

"ভারি ভালো ত!"

"দাদা আছে কি নেই ওর খেয়াল করবার দরকারও নেই। মার যা আদর! মা যেন খেলবার একটা পুতুল পেয়েছেন!"

"আর তুই-ও কথা বলবার একটা সঙ্গী!"

"ও ছেলে-মানুষ—কি আবোল-তাবোল সব বলে!"

"তা ই না?"

"হেঁ—মানিককে সেদিন কি যে অদ্ভুত কথা বলে বসল—"

"মানিককে?"

"মানিকের সঙ্গে ওর খুব ভাব! শোন্ কি অদ্ভুত কথা—বললে—আচ্ছা মানিক-ঠাকুরপো, তুমি মেয়ে হলে পানু-ঠাকুরপোকে বিয়ে করতে, না?"

"বাঃ, চমৎকার!"

"চমৎকার মানে?"

"মানিককেই জিজ্ঞেস করে ছাখ্ ওটা মানিকের মনের কথা কি না!

[মানিক তখন ইম্পিরিয়াল রেকর্ড্‌স্ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করছে—নিউ দিল্লীতে, দীপায়ন তার অতিথি। বিড়লা-মন্দিরের সামনে চওড়া রাস্তায় ফাল্গুনের ঠাণ্ডা বিকেল। রাস্তার এক পাশে উঁচু-উঁচু ঢিবিতে নিউ-দিল্লীর অতীতের স্মৃতি—হাজার বছরের কবরখানা। মানিক গল্প বলছিল: জানো দীপায়ন, আগ্রাতে তাজমহলও একটা ঢিবি হয়ে ছিল—সহরের লোকরা আবর্জ্জনা ফেলত ওখানে, কেউ খবর রাখতনা ওখানে যে এতো বড়ো একটা বিস্ময় লুকিয়ে আছে! দীপায়ন হাসছিল, যে-হাসিতে মনে হয় মানুষটা আর এখানে নেই, অনেক দূরে চলে গেছে—তেম্নি হাসি। তারপর সেই দূরে দাঁড়িয়ে থেকেই যেন বলছিল: "অতীতটা কি অদ্ভুতই না থাকে সবার—মানুষেরও! ছেলে-বেলাটা কি-রকম বেপরোয়া অদ্ভুত, না? সব-চাইতে অদ্ভুত, আমরা তখন কিছুই চিনিনে, মন একটা সাদা কাগজ—একটু আঁচড় নেই তাতে। পিশিমা বলতেন—পানুই আমাদের মেয়ে—তিন বছরের একটি খোকাকে শাড়ি-বালা পরিয়ে দিয়ে খুকী সাজানো হ'ত—সবাই বলত খুকা, কেউ কেউ সত্যি ভাবত! সাজাহান তেম্নি খুকী সাজতেন! আমি যখন ভাবতে শিখি, নিজেকে খুকী বলেও ভেবেছি! অনেকদিন পর্য্যন্ত খোকা আর খুকীকে আলাদা করে ভাবতে পারিনি! আর সে-ভাবনা গিয়ে কোথায় পৌঁচেছিল ছাখো! তোমাকে আর শেফালিকে আমার আলাদা মনে হতনা অনেকসময়!"]

"ও, তুই-ও বৌদিরই দলের!"

"দলের কেন? তবে মনে হচ্ছে বৌদি বোকা মেয়ে নয়!"

"মেয়েরা ককখনো বোকা হয়না—না, অনি ?"

"প্রতুলকে জিজ্ঞেস করিস—না ত মানিককে—"

"প্রতুলকে ? ও ত মেয়েদের চাইতে নিজেকে ঢের বেশি চালাক ভাবে !"

"মানিক ?"

"মানিকের যেন কেমন একটা ভয় মেয়েদের ! ভয় পায় আর অপরের মনেও সে-ভয় ধরিয়ে দিতে চায় !"

"ভারি অদ্ভুত ত !"

"আমাকে বলছিল সেদিন—"

ভেবে নিয়েছিলাম মানিক বৌদিকে নিয়ে কিছু বলেনি, নিশ্চয়ই ময়নাকে নিয়ে কিছু বলেছে। ময়নাকে কিছুতেই সহ্য করবেনা মানিক—জানি। আমার চোখে পান্নু কিছুতেই নীচে নেমে আসবেনা বলেই আমি ময়নাকে মেনে নিয়েছি—তাতে হয়ত ময়নাই খানিকটা উপরে উঠে এসেছে—উঠিয়ে এনেছি পান্নুকে নীচে নামাবনা বলে। কিন্তু আমার চোখে মানিক ময়নাকে দেখতে যাবে কেন ?

"আমাকে বলছিল মানিক—ময়নার কথা। যা-তা বলে ও—প্রতুলকে ওর সঙ্গে জড়িয়ে যা-তা—"

"ময়নার কি দোস—দোষ ত সব প্রতুলের !"

"নিশ্চয় ! কিন্তু মানিক ভাবে উল্টো !"

"ভাবে তোকে ও নষ্ট করে ফেলবে—না ?" একটু বেশি জোর দিয়ে হেসে উঠলাম।

"তা-ই। বলে, তুমি আর কথা বলতে যেওনা ময়নার সঙ্গে—কে যায় ও-ধরণের মেয়েদের কাছে ?—বলতে-বলতে মুখ শুকিয়ে ওঠে ওর !"

"ময়নাকে ঈর্ষা করে !"

"যাঃ—" দীপায়নও একটু বেশি জোর দিয়ে মাথা নেড়ে উঠল।

"হ্যাঁরে—তা-ই ! বৌদি ঠিক ধরেছেন ওকে !"

[দিল্লীতে—খাবার টেবিলে। দীপায়ন আর মানিক। মনিকা ডিশ এগিয়ে দিচ্ছে। দীপায়ন বলছিল : "মনিকাকে নাম দেখে তুই বিয়ে করেছিলি, না মানিক ? তোর নামের সঙ্গে মিল দেখে ! নামকে তুই বৌদ্ধদের মতো মনের গুণ হিসেবেই ভাবিস বুঝি ? মানিকের অম্লান উত্তর :

"বৌদ্ধদের কথা জানিনে, তুমি ভাবতে!" "ও আমি।" হো-হো করে হেসে উঠেছিল দীপায়ন: "আমি ত ভাবি যেম্নি মনের ভেতর মানুষটা আছে নামের ভেতরও সে অনেক সময় আছে!" নিজেকে ঠাট্টা করবার জন্যেই দীপায়ন হেসে উঠেছিল। তখনও সুপর্ণা তার জীবনে আসেনি—তাই যেন হাসির ধ্বনিতে কতগুলো মিথ্যের ধ্বনি উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল হাওয়ায়। আর এম্নিভাবেই নিজেকে হাল্কা করে নিয়ে মনিকাকে বলেছিল: "শোনো মনিকা, তোমরা দু'জন যদি একই রকম হও তাহলে কিন্তু বিপদ আছে। স্বামীস্ত্রীর এক রকম হ'তে নেই--হবে ঠিক বিপরীত—সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতির মতো!" "বাব্বা—" বুক জোড়া একটা নিঃশ্বাস ফেলে মনিকা হাসতে সুরু করেছিল: "এসে অবধি যা শাস্ত্র বলতে সুরু করেছেন আপনি! ভাটপাড়ার বামুন না বলে কে বলবে আপনাকে সাহিত্যিক?" "সাহিত্যিক কেউ বলে না কি!"—মনিকার কথার যতিপতন করতে চাইলনা দীপায়ন। "না বললেও বা কি—রাত দিন শুনতে ত হয়!" "বটে! কি রে মানিক, তোর নিজের বুঝি আর কিছু বলবার নেই? মনিকার কাছেও আমার কথা?" মানিক অসঙ্কোচে বলেছিল: "তোমার কথা বললে কি আমার কথা বলা হলনা?" আবারও হেসে উঠতে গিয়েছিল দীপায়ন কিন্তু মানিকের মুখে তাকিয়ে এবার আর সে মানিককে খুঁজে পেলেনা—একটু লাজুক হাসি, একটি খুসী-খুসী মুখ পনেরো বছরের ধুলো ঝেড়ে ফেলে এক পলক তাকিয়ে গেল দীপায়নের মুখে। পনেরো বছর আগেকার একটি মুহূর্ত্ত কোথায় কোন্ এক অখ্যাত সহরের উপেক্ষিত ইতিহাস থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো যেন কতো দূরে পৌঁছুতে—কতো দুরে দিল্লী, কতোদুরে দীপায়ন, কতো দুরে মানিক! 'সত্যি তা-ই?' বলতে ইচ্ছে করল দীপায়নের, তেম্নি বোঁজা-বোঁজা গলায়, যেম্নি পনেরো বছর আগে বল্‌ত সে মানিককে! শুনতেও ইচ্ছে করল হয়ত মানিকের—কে বলবে। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিল দীপায়ন আর বলতে পারল শুধু এ কথাগুলো: *"Our being's sources like a myth arise from depths like mothers .."*]

দীপায়ন চুপি-চুপি হাসছিল—ভরা মনের হাসি—সব-কিছু পাওয়ার হাসি। আর সত্যি বলতে, আমরা তখন যা চাইতাম তার সবই ত ছিল ওর: বাবা-মার আদুরে ছেলে, বন্ধুর মতো দাদা, খেলার সাথীর মতো বৌদি, আর এই

মানিক, তারপরও ময়না। মেয়েদের ভালোবাসা পাওয়া অবশ্যি তখন নীতিবিরুদ্ধ ছিল, কিন্তু তার জন্যে কি? আমরা চাইতাম ত কোনো মেয়ে আমাদের ভালোবাসুক। আর সবচেয়ে বড়ো পাওয়া—বুদ্ধি। ভালো ছাত্রেরা বুদ্ধিমান ছাড়া আর কি? ভাবতে পারিনি আই-এ-তে এতো ভালো ফল করবে দীপায়ন, কিন্তু করল। তার মানেই একটা বুদ্ধির প্রগাঢ় জগৎ তৈরী হয়ে উঠছিল ওর মনে। পড়াশুনো বেশি করতনা ও, ভাবতাম অমনোযোগী হয়ে উঠছে হয়ত ধীরে ধীরে, কিন্তু এ যে বুদ্ধিরই বিদ্যুৎস্ফুরণ—বিদ্যাকে অতিদ্রুত আত্মসাৎ করে নেওয়া, ভাবিনি। সবাই খুসী ছিল ওর উপর তাই ওকে তখন এতো বেশি খুসী-খুসী দেখাত।

বললাম : "ময়নার কথা বৌদি কিছু জানে রে, পানু?"

"নাঃ—"

"তুই বলিসনি কিছু?"

"কি বল্‌ব? যাদের সঙ্গে আমার আলাপ আছে তাদের সবার কথাই বলতে হবে?"

"ময়নার সঙ্গে শুধু তোর আলাপ আছে, আর কিছু না?"

"তাছাড়া আর কি?" খানিকটা নির্লিপ্ত দেখাল দীপায়নকে : "প্রতুলের সঙ্গেই ওর ভাব বেশি!" মনে হ'ল, কি যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল ওর, কি যেন একটা ছবি অথবা কথা। তারপর ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে ধোঁয়াটে করে দিল ছবিটা, হাসি ফুটে উঠল চোখে : "প্রতুল অবশ্যি ওকে বোকাই ভাবে—কিন্তু ময়না বোকা নয়!"

"বীণাদির চাইতে বোকা নিশ্চয়ই"—দুষ্টুমি করতে হল।

"কেউ যদি খুব খোলা-মেলা হয় মানুষ তাকে বোকা ভাবে—না অনি? হয়তো বোকারাও খোলা-মেলা, তাই ওম্নি ভাবে মানুষ। কিন্তু খোলা-মেলা হয়েও ত জেদী হতে পারে কেউ-কেউ—তাদের কি বোকা বলা যায়?"

"বীণাদির কিন্তু জেদ ছিলনা..."

"বীণাদি আরেক রকম। ময়নার কথায় বীণাদিকে ভাবছিস কেন তুই?"

বোকা বনতে হল আমাকেই। কাজেই প্রসঙ্গটার উপর যবনিকা টেনে দৃশ্যান্তরের জন্যে তৈরী হলাম। ময়নাকে অনেক সুযোগ দেওয়া গেছে··· আর না।

"বৌদির কথাই বল্, পান্থ..." বললাম: "বীণাদিকে চেনেন বৌদি?"

"চেনেন মানে হয়ত শুনেছেন বীণাদির নাম—দাদার কাছেই হয়ত শুনেছেন।"

"কি বলেন শুনে?"

"একদিন শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন, বীণা দেখতে কেমন ছিল ঠাকুরপো? —শুনে আমার কেমন অদ্ভুত লাগল জানিস্—আমি নিজেই ভাবতে সুরু করলাম, সত্যি কেমন ছিল বীণাদি দেখতে? দেখতে যে একেক জনের একেক রকম হতে হয় তা-ই আমার মনে হয়নি কখনো বীণাদিকে দেখবার সময়!"

"বা রে!"

"হেঁ তা-ই। কাজেই বলতে পারলামনা বীণাদি কেমন ছিল!"

"তার মানে তোর আশঙ্কা হচ্ছিল পাছে ধরা পড়ে য'স?"

"ধরা পড়বার কি আছে? বীণাদি ত আমার কাছে সবসময়ই বীণাদি—দিদি নয় তবু দিদির'ও খানিকটা যেন।"

"তুই ত ফ্রয়েড পড়েছিস পান্থ-" ওর ভাসা-ভাসা ভাবটাকে থিঁতিয়ে দিতে ইচ্ছে করল।

"কিছু-কিছু। মিথ্যেকথা পড়ে লাভ নেই। তাই আর পড়িনি।"

"সব মিথ্যে?"

"আমার কাছে মিথ্যে—কারণ আমি রোগী নই। ফ্রয়েড ত ডাক্তার মানুষ, রোগীরা ওঁর লেক্চার শুনুক—আমরা কেন?"

"ফ্রয়েডকে তা-ই মনে হ'ল—তোরও?"

"কেন হবেনা? আমার মনে ত অপরাধ নেই!"

"বাব্বা—ঠিক বাসবের মতো কথা বলতে শিখেছিস—সোজা-সোজা কথা!"

"বাসবকে তারজন্যেইত আমার ভালো লাগে। ওই একটা জায়গায় আমার সঙ্গে ওর মিল—আর-আর পয়েণ্টে দাদার সঙ্গে—ওসব আমার ভালো লাগেনা!

"দেবুদা সত্যি মেতে ওঠেন বাসবের কথা পেলে—"

"আমার তখন তেতে উঠ্‌তে ইচ্ছে করে! স্বদেশী না করলে যেন মানুষ মানুষেই নয়—দাদা তা-ই ভাবেন!"

"স্বদেশীতে মানুষ সত্যি মজবুত হয়ে ওঠে—বাসবকে দেখলেই তা বোঝা যায়।"

"ওটা স্বদেশী নয়—" কেমন যেন আধো-আধো গলায় কথাটা বলেই হঠাৎ মুখ বুঁজিয়ে ফেলল দীপায়ন। একটু হাসতে চাইল তারপর। শেষে একটা খুব জরুরী কথা শোনাবার মতো করে বল্‌লে: "বাসবকেই বেশি চেনেন বৌদি! বীণাদির চাইতে ঢের বেশি।"

"বাসবের কথা বলে বলে দেবুদা হয়ত ওঁর কান ঝালা-পালা করে দিয়েছেন!"

"উহুঁ। গোষ্ঠীর কথা দাদা দেবেন বৌদির কানে? ওসব হল ওঁদের আসল কথা! তোর-আমার কাছেও বা কি বলেন—বাসব বুদ্ধিমান, তেজী মাথাওলা, ভালো ছেলে, এই ত! ওদের স্বদেশী ব্যাপারের টুঁ আওয়াজ করেন কখনো?"

"বিয়ে করেও দেবুদা পুরোদস্তুর স্বদেশীই রয়ে গেলেন!"

"বৌদি তাই হাস্‌তে হাস্‌তে বলেছিলেন আমায় একদিন: তোমাদের বাসবের মতো একটী মেয়ে পাওয়া যায়না, ঠাকুরপো? আমি বললাম: তোমরা আবার স্বদেশী হও না কি? বৌদি বল্‌লেন: কিছুই কি হতে পারি আমরা, হতে দাও? কেমন জব্দ করে দিলেন আমায়—বৌদি ভীষণ চালাক!"

"তবে যে বলেছিলি ছেলেমানুষ!"

"উপর থেকে দেখতে গেলে ত তা-ই! তাছাড়া, ছেলেমানুষদের বুঝি বুদ্ধি থাকতে নেই?"

"তুই মেয়েদের বড্ড ফ্ল্যাটারি করিস পানু।"

"ফ্ল্যাটারি কি? ভালো:কে ভালো বলবনা?"

"সব মেয়েই কি ভালো?"

"সব মেয়েকে ত আর আমি চিনিনে! যাদের চিনি তারা সবাই ভালো।"

"একটিও তাতে খারাপ নেই?"

"দূর থেকে দেখেই আমরা খারাপ ভাবি! যাকে খারাপ ভাবি, কাছে গেলে দেখব সে-ও হয়তো ভালো!"

দু'জনের মনেই হয়ত ময়না এসে দাঁড়াল কিন্তু কেউ ওর নাম উচ্চারণ করলামনা।

বাসবের সঙ্গে সাধারণভাবে মেলামেশা করে অথবা দেবুদার বিশেষণভরা বাক্যগুলো শুনে ওকে কিন্তু আমি ঠিক-ঠিক চিনতে পারতামনা। দীপায়নই বাসবের সত্যিকারের চেহারাটা আমার চোখের উপর তুলে ধরেছিল। দীপায়ন বলত: "মানুষের আদর্শবাদ একটা মস্ত জিনিষ কিন্তু তার চেয়ে মস্ত ফাঁকিও আর নেই। ফাঁকি বলছি কারণ মানুষকেই তা গড়ে তুলতে হয়। আর মানুষের হাতে-গড়া বলে তার চেহারাও নানা-রকম। নানা-রকম চেতনার ভেতরেই ত বাঁচতে হয় মানুষকে কিন্তু তার সবগুলোই মন আঁকড়ে ধরেনা—বাছাই করে একটিকে আর জীবনের সব উপার্জ্জন এই সহধর্ম্মিণীর পায়ে ঢালতে সুরু করে। আর তারই ফলে মানুষের দ্বিতীয় সত্তা হয়ে ওঠে ওটা—শাস্ত্রের সূক্ষ্ম-শরীরের মতো মানুষটার শরীক হয়ে দাঁড়ায়—মানুষ আদর্শবাদী হয়! পঙ্ক থেকেও জন্ম নিতে পাবে এই পঙ্কজ। শেষটায় ফুলের মতো সুন্দব কিন্তু সুরুটা হয় হয়ত কদর্য্যে!" সবার মুখের উপর চোখ-রেখে এ-কথাই বলত ও। কার কি আদর্শ তা যেন খুঁজে বার করতে চাইত। ফাঁকা হোক বা ফিকে হোক একটা-না-একটা আদর্শ সবারই আছে—একটা চেতনা—ক্রমে তা প্রবণতা—তারপর তা তাদের প্রকৃতির স্বাক্ষর! বিশুদ্ধ মানুষটা তা-ই। কিন্তু তাকে কি পাওয়া যায়? অপরের কাছে সে তা নয়। বাইরে সে তার কাজ-কর্ম্মের সমষ্টি, চলা-ফেরার, কথা-বলার, খাওয়া শোওয়ার, জীবিকার, প্রেমের, স্নেহের, হাসি-কান্নার সমষ্টি। নিজের কাছেও সে সবগুলো চেতনার, সবগুলো অনুভবের সবগুলো চিন্তার আর বুদ্ধির, সবগুলো আবেগ আব প্রবৃত্তির সমষ্টি। যেমি অপরের কাছে তেমি নিজের কাছেও সে ধোঁয়া! অথচ ধোঁয়া সে মোটেও নয়—একটা প্রমূর্ত্ত সত্তা—স্ফুলিঙ্গ নয়, অকম্পিত দীপশিখা। সবাই এম্নি—সবাইকে এক মুহূর্ত্তে শিখা হয়ে দাঁড়াতে হয়—হয়ত ইচ্ছাতে নয় তবু তৈরী করে তুলতে হয় একটি সত্তা—একটি মাত্র সত্তা। এ-সত্তার মুখোমুখি কিন্তু দাঁড়াতে পারো তুমি, যে-কোনোসময় কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে, পরিচ্ছন্ন দেখতে পারো কয়েক

পলক, তারপরই তা ফিকে হয়ে যায় তুমি ভুলে যেতে বাধ্য হও তাকে। সে কয়েক মুহূর্ত্তই কি শঙ্করাচার্য্যের 'স্বাত্মন্যবস্থান' নয়? কিন্তু ওটা তোমারই অস্তিত্ব—কোনো শাশ্বত সনের প্রতিভাস নয়—আবার কালাতীত কল্পনাও নয়—অলীক নয়, দুঃস্বপ্ন নয়—বাস্তব। নেহাৎই বাস্তব। ব্রহ্মও নও—বুদ্ধও নও—সত্যিকারের মানুষ—বিশিষ্ট মানুষ তুমি তখন। হয়ত যোগী—নিজের সাযুজ্য খুঁজে বেড়াচ্ছ। জনতা-মুক্ত—কেউ নেই তখন তোমার চারপাশে—শুধু তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছো তুমি—তোমরা দু'জন শুধু—তুমি নাম আর তুমি রূপসী।

কথা বলতে-বলতে রক্তের আভায় লালচে দেখাত দীপায়নের মুখ। মনে হ'ত ও এমন-কিছু ধরতে-ছুঁতে পারছে যা ধরা যায়না, ছোঁওয়া যায়না। "তোমরাও তার ছোঁওয়া পাবে—ভেবে দেখো—দেখবে কতো সত্য সে-ছোঁওয়া" —চক্‌চক করে উঠ্‌ত দীপায়নের চোখ নীলচে আলোতে—অন্ধকারে তৃণভোজী প্রাণীদের চোখে যে-আলো চমকায় সে-আলোতে।

চোখ বুঁজে কথাগুলো শুনতে ফিলজফির মতো শোনাত কিন্তু দীপায়নের মুখের দিকে তাকালে মনে হ'ত এ যেন ওর অভিজ্ঞতা। হয়ত নিজের অস্তিত্বেরই অভিজ্ঞতা কিন্তু উপস্থিত করত ও বাসবের জীবনকে।

অদ্ভুত বাসবের ছেলেবেলাটা। দীপায়ন অবশ্যি বলেছিল বাসব রোগী, তাই ফ্রয়েডের কথাগুলো ওর পক্ষে খুবই সত্যি। কিন্তু আমার মনে হত অদ্ভুত। সবার ছেলেবেলাই এমন অদ্ভুত হতে পারে, হয়না যে কেন তা-ই আশ্চর্য্য।

"আশ্চর্য্য মোটেই নয়"—দীপায়ন মাথা নাড়তে সুরু করেছিল: "সবার বাবা বিহারীডাক্তারের মতো নয়! ডাক্তারের ছেলে রোগী এ-টা অবশ্যি খুব আশ্চর্য্য ছিল! সেকেলে ডাক্তারও ওম্নি হত, হয়ত বিহারীবাবুর মতো। আমাদের নিবারণডাক্তারকে দেখিসনি, কেমন জোয়ান আর জোয়ান বলেই ওঁর 'কল' বেশি। রোগীরা হয়ত ভাবে, ওঁর চেহারা দেখলে যমও ভয় পেয়ে যাবে! বিহারীবাবুও হয়ত ঠিক তেম্নি ছিলেন।"

"বাসব তা-ই বলেছে তোকে?"

"বাসব বলেছিল একটা মোটা, কুৎসিত লোক কল্পনা করে নিতে।

ওর চোখের উপর হয়ত ভেসে উঠেছিল চেহারাটা—আর চোখ ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছিল ও !"

"এম্নি খারাপ লাগে ওর বাবাকে দেখতে ?"

"বাবার কথা ভাবতে আরো খারাপ লাগে ওর। তা-ই ত বল্‌ছিল আমায় !"

"সে কি ?"

"বাবার সঙ্গে ওর ত কোনো সম্বন্ধ নেই ! এক আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে ও পড়াশুনো করছে এখানে—ওদের বাচ্চাদের পড়ায়, খাওয়া আর থাকবার জায়গা পায় ! একটি কাণাকড়িও বাবা ওকে দিচ্ছেন না !"

রহস্য ঘনিয়ে উঠ্‌ছিল। প্রশ্ন তুলে ধরে দীপায়নের কথা কাটতে সুরু করলে ব্যাপারটা জমবেনা মনে হল। দীপায়নও বলেছিল কাহিনীটা বলবার সময় বাসব নাকি একতরফাই বলে গেছে, দীপায়ন চুপচাপ বসে-বসে শুনেছে। আমিও চুপ করে গিয়ে দীপায়নকে একতরফা বলতে দিলাম।

বাসবের নিজের মা নেই—মারা গেছেন—আঁতুড় ঘরে। ওরা পাঁচ-ভাইবোন ছিল। আর সবাই বোন, ও একা ওদের ভাই। ওর ছোট তিন জন। ওর সৎ-মা এখন ঘরে—নাগাড়ে চার ছেলে তাঁর—ওর চারজন সৎ-ভাই। নিজের মা-কে বাসবের খুব বেশি মনে পড়ে না। যখন মনে পড়ে, একটি ভীরু, রোগা মুখই চোখের ওপর ভেসে ওঠে। ভয় পাওয়া মুখ—সারাদিন কেমন যেন ফ্যাকাশে—আর সন্ধ্যের পর থেকেই ভয় ফুটে উঠ্‌তে সুরু করত চোখে-মুখে-গলায়। "মা এত ভয় পায় ! –" হাততালি দিয়ে মজা দেখত বাসবের পিঠাপিঠি বোন লীলা। বাসবও হাসত। এখন বলে বাসব, 'মাকে দুর্ব্বল পেয়েই আমরা ঠাট্টা করতাম—মাকে একটুও ভয়ডর ছিলনা আমাদের —উল্টো মা-ই হয়ত আমাদের ভয় করতেন।

বাসব বলে, একটি ঘটনার ছবি না কি আজও ওকে তাড়া করে বেড়ায় ! দুপুরবেলা পাড়ার মেয়েরা এসে ওদের বাড়িতে আড্ডা জমাতেন—মা ভালোমানুষ—কাজেই উপদ্রব করবার সবচেয়ে ভালো জায়গা। এটা-দাও, ওটা-দাও, এ-করো, ও-করো-তেই শুধু নয় বকো-ঝকো আর ঠাট্টাই করো, মার মুখে টুঁ শব্দটি নেই।

কোনো-কোনোদিন শীতল-পাটিতে কাৎ-চিৎ-উবু হয়ে শুয়ে রামায়ণ-

মহাভারতও পড়তেন ওরা। বাবা তিনটের আগে ত বাড়ি ফিরতেন না কোনদিন, কাজেই বারোটা থেকে দু'টো-আড়াইটে পর্য্যন্ত ছিল ওদেরই রাজত্ব। দিদির বিয়ে হয়ে গেছে—আমি আর লীলা ইস্কুলে—বাড়িটা তখন ওঁদেরই ছিল।

ইস্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছিল একটায় সেদিন, সেই একদিনের ছবিটাই লেগে আছে বাসবের চোখে। ওঁরা মুখ-টেপাটেপি করে মহাভারত পড়ছিলেন! সে-জায়গাটা যেখানে সত্যবতী ব্যাসকে ডেকে আনলেন আর তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন অম্বিকার ঘরে। ব্যাসের কালো চেহারা, ভীষণ চোখ আর দাঁড়িগোঁফজটা দেখে অম্বিকা ভয়ে চোখ-বুঁজে রইল। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হল। হেসে লুটিয়ে পড়ছিলেন ওঁরা আর মাকে ঠেলাঠেলি করছিলেন। মার মুখ শুকিয়ে উঠেছিল—উঠে ওঘর থেকে আমাদের পড়ার বারান্দায় চলে এসেছিলেন মা। সবই আমি শুনছিলাম—দেখেছিলাম। কিন্তু মা আমাকে দেখেন নি। বারান্দায় এসে দেখলেন। আরো খানিকটা কালো হয়ে গেল তাঁর মুখ।—এই ছবি! স্পষ্ট মার সেই মুখ এখনও আমি মনে করতে পারি। সেদিন মা কিছু বলেন নি, কিন্তু এখন সে-মুখ কথা বলতে পারে।

নাকের দু' পাশে ভুরুর ধারদু'টো একটু কুঁচকে উঠেছিল বাসবের, খানিক ক্ষণের জন্যে ঠোঁটগুলো যেন একটু শক্ত হয়েগিয়েছিল। তারপর আবার বলতে সুরু করল: সে-মুখ কি বলে জানো? বলে ওরা এম্নি নির্দ্দয়ই হয়—পুরুষরা—স্বামীরা! আমাদের এক-ছটাক মাংসও ওদের লোভ থেকে নিস্তার পায়না—সব, সবটুকু ওদের নেওয়া চাই! বাসবের মুখের চামড়ার উপর কি যেন কাঁপছিল—শিখার মতো লালচে আভা—হয়ত রাগ। তারপর প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলেছিল: "বাবাকে কিছুতেই আমি ক্ষমা করতে পারবনা!"

বাসবকে দেখে মনেই হতো না এমন একটা ব্যথা আর এতো বড়ো আক্রোশ ও মনে-মনে পুষে রেখেছে। মেয়েদের মতো অনুভূতিগুলোকে ডুবিয়ে ফেলবার সে-এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা! অবশ্য দীপায়ন কোনদিন একে ক্ষমতা বলে স্বীকার করেনি। বলত: "ও দুঃখী, জানিস অনি? আর দুঃখীরা মানুষ হয়—একটা চরিত্র হয়ে দাঁড়াতে পারেনা! দুঃখটা রোগ হয়ে পড়লে মুস্কিল কি না।" শুনতে আমার ভালো লাগতনা কিন্তু দীপায়ন আমাকে রেহাই

দিতে চাইতনা। বাসবকেও অবশ্য ও রেহাই দেয়নি—বাসবকে উদ্ধার করবার জন্যে সে যে ফ্রয়েডের মতো ডাক্তারি সুরু করেছে তা-ও আমাকে শুনতে হত।

ফোর্থ-ইয়ারে প্রায়ই ক্লাশ-কামাই করছিল বাসব। কিন্তু অদ্ভুত—যেদিন ক্লাশে আসত খুব মনোযোগ, যেন ও-ই একমাত্র ছেলে যে অধ্যয়নকে তপস্যা বলে মেনে নিয়েছে—তারপর হয়ত তিনদিন বেমালুম ডুব। নির্বিকার চিত্তে এ অদ্ভুত ব্যাপারটা সুরু করেছিল বাসব, একটু অস্থিরতা নেই। অস্থির হয়ে উঠ্ছিল দীপায়ন।

"তুই কিন্তু নন্-কলেজিয়েট হয়ে যাবি, বাসব—" উৎকণ্ঠা শোনা গিয়েছিল দীপায়নের গলায়।

"তা-ই নাকি? নাঃ—"

"ন-না? নিশ্চয়!"

"কলেজিয়েট হয়েও বা লাভ কি?"

"ও, পরীক্ষা দেবারই মতলব নেই তোর?"

"দেওয়া যদি না-ই যায় তাহলে দেবনা!"

"বাঃ দিব্যি পরমহংস হয়ে গেছিস! আচ্ছা, পরীক্ষা কি করে না দিস আমি দেখ্ছি!"

"পরীক্ষা দেবনা বললাম না কি আমি!" পরাজিতের হাসি ফুটে উঠল বাসবের মুখে।

"বেশত, আজই আমি দাদাকে চিঠি দিচ্ছি—দাদাই এ-পরামর্শ বুঝি দিচ্ছেন তোকে?"

"এই, না—না! দেবুদাকে তুই ওসব লিখতে যাসনে পানু—দোহাই—"

"নিশ্চয় লিখ্ব। লিখব স্বদেশী করতে হলে পরীক্ষার পরও তা করা যায়।"

"তা-ই নাকি?" আবারও বললে বাসব, কিন্তু হাসি মিলিয়ে গেল ঠোঁটে।

"আমি জানি তুই ঘোর স্বদেশী হয়ে উঠ্ছিস্!"

"কি ক্ষতি?" বাসবের গলা একটু শক্ত হয়ে এলো।

সত্যি, কি ক্ষতি? দীপায়ন খানিকটা মুষড়ে গেল। যতীন দাসকে মনে পড়ল ওর। এইত সেদিন সারা কল্কাতা কেঁদে ভেঙে পড়েছিল—একটি আশ্চর্য্য চরিত্র হারাল বলে কাঁদছিলো চরিত্রহীন কলকাতা—কাঁদছিলাম আমরা সবাই। কান্নার ফোঁটা-ফোঁটা জলই ত চায় মানুষের শুকনো, রুক্ষ

জীবন—ভিজে উঠ্‌তে চায়—হাত বুলোতে চায় ভেজা-ভেজা নরম একটা জীবনে। এ ছাড়া আর কি লাভ আছে—কোথাও আর হাতড়ে পাও লাভ? দীপায়ন দুর্ব্বল হয়ে পড়ল।

"ক্ষতির কথা ত বলছিনে—" সদ্য রোগমুক্তের গলায় বললে দীপায়ন: "তুই পরীক্ষা দিবিনে ভাবতে খারাপ লাগছে আমার।"

"ইংরেজের সঙ্গে শক্তির পরীক্ষাটা কি পরীক্ষা নয়?" হেলাফেলায় বলে গেল বাসব।

"কিন্তু তোকেই যেতে হবে সে-পরীক্ষা দিতে?"

"আমি না-হয় আমার মতো কেউ! সবসময়ই যাবে কেউ-না কেউ।"

"যাবি তা আমি জানি কিন্তু পড়াশুনোটা শেষ করে গেলে এমন কি ক্ষতি হত?"

"দু' দিক কি বাঁচানো যায়? পড়াশুনোর মতো এ-ও হোল-টাইম জব। চেষ্টা করে দেখছি আমি, দু'দিক রক্ষা করা যায় না কিছুতেই!"

বাসব একটু নরম শোনাল বলেই দীপায়ন আবার শক্ত হয়ে উঠল: "যায় না কারণ পড়াশুনোটা তোর কাছে বাজে মনে হয়। আর ইংরেজের প্রভুত্বকে মনে হয় অসহ্য।"

"তোর মনে হয়না?"

"ভাবতে গেলে তা-ই মনে হয়। কিন্তু আমি ত সবসময় ভাবিনে। তুই সবসময়ই ভাবছিস।"

"ও ভাবনা ছাড়া আর কি ভাবনা থাকতে পারে আমাদের?"

"থাকতে যে পারে আমাকে দেখলে বোঝা যায়না?"

মাথা নীচু করে কি যেন ভেবে নিল বাসব, তারপর মুখ তুলে খানিকক্ষণ সোজা তাকিয়ে রইল দীপায়নের মুখে, শেষে বল্‌লে: "তুই যে দেবুদার ভাই ভাবতে আমি অবাক হয়ে যাই, পান্নু!"

"দাদাকে স্বদেশী ভাবতে আমিও অবাক হতাম!"

"ওটা তোর বুদ্ধির দোষ দেবুদার মতো লোকই স্বদেশী হ'তে পারেন!"

"না—স্বদেশী হলেই তোর কাছে দেবুদা দেবুদা হয়ে ওঠেন!"

"যাক্‌গে, স্বদেশী হতে পারা-টা তোর পছন্দ হতে না পারে—কিন্তু অনেকেরই তা পছন্দ!"

"হু। কিন্তু দাদার কি করে ও-পছন্দ হ'ল তা-ই ভাবি। হবার কথা ছিলনা।"

একটা হেঁয়ালি শুনছে বলেই মনে হলো বাসবের, খানিকক্ষণ দীপায়নের চোখে চোখ রেখেও কোন স্পষ্ট পরিস্কার আলো খুঁজে পাচ্ছিলনা ও। শুধু এ- ধারণাই যেন হল, ও কিছু না বল্‌লে দীপায়নও আর কিছু ভাঙবেনা। তাই বলতে হল: "বলেইছি ত দেবুদা তোর মতো নন।"

"কিন্তু তোর মতো কি করে হলেন?"

"আমার মতো-ও বা কেন হবেন উনি?"

"তোর মতো স্বদেশী! কিন্তু কারো উপর ত দাদার আক্রোশ থাকতে পারেনা, তোর যেমন আছে!" হঠাৎ, বাসব বুঝতে পারলনা কেন, দীপায়ন ফিক করে হেসে ফেলল।

কিন্তু তার পরের মুহূর্ত্তেই হাসিটাকে ধরে ফেলল বাসব, আর নিজের ঠোঁটেই তা যেন ধরে নিলে: "ও, ফ্রয়েডিআনা হচ্ছে?"

যা-ই বাসবকে শোনাক দীপায়ন উদ্ধারকর্ত্তা হতে পারেনি।

বরং নিজেই ও বাসবের ধরণ ধরে উঠতে লাগল যেন ধীরে-ধীরে। ক'দিন চুপচাপ, গম্ভীর। তার কারণ অবশ্য খুবই সাদাসিধে। খবর এসেছিল সহরের ভাবসাব ভালো না—ধর-পাকড় সুরু হতে পারে। দেবুদা যতোই ভাবুন পুলিশকে ফাঁকি দিচ্ছেন, পুলিশ ত তেমন কাঁচা ছেলে নয়। তবে এবার দেবুদা-ও এগিয়ে যাননি খুব, সভা-সমিতির নামগন্ধও ছিলনা, ক্বচিৎ-কদাচিৎ দু'-একটা বৈঠক বসত হয়ত কোথাও—নিজেরা-নিজেরাই হয়ত আলাপ-আলোচনা করতেন—সহরের চার পাঁচজন ওঁরা। নিজেদের মধ্যেই যেন ওঁদের কোনো সাড়া ছিলনা, সহরে সাড়া থাকা ত দূরের কথা। কিন্তু ওঁরা হঠাৎ পুলিশের নজরে পড়ে গেলেন কি করে? দীপায়ন তা-ই ভাবছিল।

"একটা ঘটনা জমে আসবার আগেই পুলিশ তার গন্ধ পায়, না রে?" আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল দীপায়ন। জিজ্ঞেস করত হয়ত বাসবকেই কিন্তু ওকে পাওয়া যাচ্ছিলনা। বাসবের কলেজ-কামাই-এর দিন সুরু হয়েছিল। ওর আত্মীয়ের বাড়িতে খুঁজতে গেল দীপায়ন— বাসবের বাচ্চা ছাত্র-ছাত্রীবা বললে: "দেশে গেছেন বাসুদা।" দেশে? অদ্ভুত লাগল দীপায়নের। বাসব দেশে যেতে পারে আর? বিহারীডাক্তারের কাছে আর কি ফিরে যাবে বাসব?

অসম্ভব। যেম্নি অসম্ভব ইংরেজ-সরকারের চাকরি নেওয়া। উধাও হয়েছে—কি বা আবার করবে বলে নড়ে-চড়ে উঠছে ওদের দল—তাই 'দেশে গেলেন বাসুদা'!

"বাসব পালিয়েছে—জানিস অনি?" মনে-মনে দীপায়ন যা জানছিল তা-ই আমাকে জানাতে এল।

"ওয়ারেণ্ট আছে না কি ওর নামে?"

"তা হয়ত নয়, গা-ঢাকা দিয়েছে কি-এক মতলবে।"

"বাসবকে আর ফেরানো গেলনা!"

"দুর ওর হাড়-মাংসে স্বদেশী ঢুকে গেছে!"

"দেবুদাই পাকা করে তুলেছেন ওকে।"

"ও পেকেই ছিল—দাদা ত শুধু লুফে নিয়েছেন।"

"কিন্তু দেবুদার খবর কি?"

"কোনো খবর নেই। খবর আর কি থাকবে? যখন খবর আসবে শুনতে পাব ধরে নিয়ে গেছে!"

"কী-রকম বিশ্রী হবে তাহলে? শুধু মা-বাবাই ত নন, বৌদিও ত আছেন এবার!"

"হুঁ।" চুপ করে রইল দীপায়ন।

আবার ও হঠাৎ-হঠাৎ চুপ করে থাকতে সুরু করেছিল—মাঝে দু'-একটা বছর শুধু যেন প্রচুর আলো-হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে, যেন রক্তের ভেতর থেকে হাসি ফুটে বেরত ওর কিন্তু এখন আবার ঠিক ফার্ষ্ট ইয়ারের পানু। মাঝে-মাঝে সেই ব্যথা-পাওয়া পানুই যেন ফিরে আসত দীপায়নের মুখে। বহুদিনের আলো-হাওয়ায় তা খানিকটা আবছা—দীপায়নের সামনা-সামনি খানিকটা নম্র সে-পানু কিন্তু তবু তা পানুরই ছবি।

কেন? ভাবতাম। ময়নার বিয়ে হয়ে গেছে বলে? কিন্তু তাতে নূতন-করে ব্যথা পাবার কি আছে ওর? শেফালির পর বীণাদি, তারপর ময়না—এতো জানাশুনো ব্যথা, মন-খারাপ হওয়া। বারবার কি একই কারণে মন-খারাপ হয় আমাদের? মন কি সয়ে যেতে জানেনা, তৈরী থাকেনা? থাকে। ময়নার বিয়েতে দীপায়ন ফিরে যেতে পারেনা ঠিক আগেকার মন-খারাপে। ব্যথা পেয়েও ব্যথা ভুলে যেতে পারে—পুষে

রাখতে পারেনা ব্যথাকে। "কি বাজে একটা বিয়ে হ'ল ময়নার—" মানিককে বলেছিল দীপায়ন—বিয়েটাকে মেনে নিতে কিন্তু কষ্ট হয়নি ওর। তারপরও প্রতুল যখন বললে: "বাজে? ময়নাকে বলে দেখিস বাজে—কি বলে তোকে!"—দীপায়ন ব্যাপারটাকে আঁকড়ে থাকতে চায়নি: "বেশ ত ময়না যদি খুসী হয় তাহলে ত খুব ভালো! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে বাজে!"

দীপায়নের চুপ করে থাকার কারণ ও নিজেও হয়ত তখন বলতে পারতনা। সাহিত্যিক দীপায়ন, কথা-শিল্পী দীপায়ন, মানুষের আবেগ, অনুভূতি, চিন্তা আর বুদ্ধির উপাদানে যখন নূতন-নূতন মানুষের মূর্ত্তি তৈরী করছে তখন হয়ত সেদিনের দীপায়নের চুপ-থাকার কারণ তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে—নিজের থেকে আলাদা করে দিয়ে, দূরে চলে এসে স্রষ্টা-শিল্পী আবিষ্কার করতে পেরেছে নিজের একটা পুরোনো সত্তাকে—কিন্তু সে নিজে যেদিন সে-সত্তার অন্তর্গত ছিল সেদিন সে শিল্পীও নয়, দূরেও নয়। সেদিন সে ঘটনার সঙ্গে জড়ানো, ঘটনারই একটা উপাদান, স্থান আর কালের মতো উপাদান—আজ সে-ঘটনা পেছনে পড়ে আছে, পেছনে পড়ে আছে সে স্থান আর কাল, পেছনে পড়ে আছে ফোর্থ-ইয়ারের দীপায়ন। আজ সে উজ্জ্বল—তোমার কাছে, আমার কাছে—আজকের দীপায়নের কাছে।

কিন্তু কিছু জানতে চাইলে সেদিন দীপায়ন শুধু বলত: "কিচ্ছু ভালো লাগেনা অনি! মনে হয় দাদা যেন আমাদের বাড়িতে একটা নূতন মানুষ! আমাদের সঙ্গে মিল নেই ওঁর—কেমন-যেন অচেনা অতিথির মতো। গাঁ-থেকে বাবার যে মক্কেলরা আসেন, দু'একজন দু'একদিন থাকেনও আমাদের বাড়িতে—দাদাকে মনে হয় ঠিক তেম্নি।"

"বরাবরইত দেবুদা আল্‌গা থাকতেন একটু!"

"আল্‌গা থাকা নয়—আল্‌গা আমরা সবাই থাকতে জানি—বাবার চাইতে আল্‌গা ত আর কেউ নয়! আমিও পারি আলগা থাকতে। ওটা হয়ত আমাদের রক্তের। কিন্তু যা আমাদের রক্তের নয়, দাদা তা-ই!"

"স্বদেশীগিরি?"

"স্বদেশীগিরি বলেই এখন তাকে চেনা যায় কিন্তু আসল কথা, দাদা কাউকে ভালোবাসেন না!"

হবেও বা। দেবুদাকে মনে পড়ল—তাঁর হাসি-মুখ আর হাসিটাও মনে

তুলে আনতে চাইলাম। মনে হ'ল যেন মস্ত একটা ফাঁকা আওয়াজেই তৈরী সে-হাসি। অন্তত মানুষের আটাল, প্যাঁচানো, চমকানো, ভেজা-ভেজা, নরম বা আবছা হাসির কোনোটাই নয়! দেবতাদের হাসি হয়ত অনেকটা এরকমই হয়।

১৯৪৪ ইং

......বাসব ওর চারপাশের মানুষকে ভালোবাসতে পারবেনা কোনদিন। বলে অবশ্যি মানুষকে ও ভালোবাসে—কিন্তু সে কোন্ মানুষ? তার কি কোন চেহারা আছে? হাত-পা-ওয়ালা না হোক, ভাবের তৈরী কোনো চেহারা? বাসব নিজেকে চেনেনা।

প্রমিতাকে ও ভালোবাসতে পারত। কিন্তু ভালোবাসার নিয়তি ও তৈরা করেনি। ঠিক দাদার মতো।

দেশকেও কি ভালোবাসতেন দাদা? হয়ত ভালোবাসতেন নিজেরই চলা-ফেরার একটা নক্সাকে। আজ আর তেমনি চলতে-ফিরতে পারেন না, তা-ই মনে হয় মানুষটা হাত-পা ভেঙে পড়ে আছে। দেশের জন্যে জীবন দেওয়া—এ কোনো শপথ নয়, চলারই একটা ভঙ্গী।

বিয়ে করবার দরকার ছিলনা ত দাদার। মা-বাবা-ভাই-বোনের যেম্নি দরকার ছিলনা স্ত্রীরও তেম্নি দরকার ছিলনা। ওঁর কাছে আমরা সবাই ধুতি-পাঞ্জাবীর মতোই একটা সহজ ব্যাপার। তার বাইরে কোনো কঠিন, জটিল সত্তা যে আর কিছু থাকতে পারে—আমরা যে থাকতে পারি—থাকা যে দরকার, তা-ই হয়ত দেখবার মন ছিলনা ওঁর। বাবা কি ভাবতেন জানিনে, মাকে কাঁদতে দেখেছি আর কি অদ্ভুত সহিষ্ণুতাই না দেখতে পেয়েছি বৌদির। এমন সহিষ্ণু কেন হয় মেয়েরা—কি করে হতে পারে?

যে তোমায় ভালোবাসেনা তাকে তুমি ভালোবেসে যেতে পারো বছরের পর বছর—সারা জীবন? কোনো অভিযোগ নেই, অভিমান নেই—ভালোবাসাটা যেন তোমার কোলের একটি শিশু—তার দিকে তাকিয়ে আছো, আদর করছ, কথা বল্‌ছ, ধমকে উঠ্‌ছো, চুমু খাচ্ছ! কী রকম অদ্ভুত!

১৯৪৪ ইং—সেপ্টেম্বর

...পুরোনো চিঠিপত্রের গাদা থেকে ১০।৯।৪০-এর তারিখ-দেওয়া একটা

চিঠি পেলাম। আমারই চিঠি, বৌদিকে লেখা। অনেক চিঠির মতো এটা-ও ডাকে দেওয়া হয়নি। ভালোই করেছি—পড়ে দেখলাম।

"…বৌদি, একটা সত্য কথা বল্‌বে? ধরে নিচ্ছি বলবে, তাই জিজ্ঞেস করছি। বিয়ের আগে তোমার আত্মীয়-স্বজন ছাড়া আর কোনো পুরুষকে তুমি দেখতে পেয়েছ কি? মানে, পরিচিত হতে পেরেছো বাইরের কারো সঙ্গে? আমার মনে হয় না।…"

এ-বাক্যগুলোর জন্যেই হয়ত চিঠিটা শেষপর্য্যন্ত ডাকে দিইনি। প্রশ্নের নিজের দিক থেকে দেখতে গেলে প্রশ্নটা তত অন্যায় নয়, কিন্তু জিজ্ঞেস করাটা হয়ত অন্যায়। অন্তত তা-ই মনে হয়েছিল আমার তখন।

তখন দাদা দেউলি থেকে ফিরে এসেছেন—রাজপুতানার কুখ্যাত বন্দী-শিবির থেকে ফিরে এসেছেন দেহে-মনে আঁধির ধুলো আর অন্ধকার জমাট করে নিয়ে। একবারও তাঁর মনে পড়েনি সেই রাজপুতানারই মাটিতে বাংলাদেশের একটি মেয়ে—বীণাদি—হয়ত কোনোসময়, রাত্রিতে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে অথবা অসহ্য নিরালা দুপুরে, তাঁর কথা ভাবছে। যতোটুকু বা মন ছিল দাদার, রাজপুতানার কাঁকরের সঙ্গে মিতালি করে তার সবটুকুই বুঝি রেখে এসেছিলেন সেখানে। দাদাকে দেখে ভয় হচ্ছিল আমার —যেন মাটিতে-আদ্ধেক-পোঁতা মানুষ, নড়তে-চড়তে পারছেনা। কিন্তু বৌদি খুসী হলেন—ঠিক আগেকার মতো, বিয়ের পর যেমন খুসী-খুসী ছিলেন তেম্নি দেখতে পেলাম বৌদিকে। স্বামী ফিরে এলেন বলে খুসী? কিন্তু কী স্বামী ফিরে এলেন?

১৯৪৫ ইং—জানুআরি।

··ধীরে-ধীরে যা ভেঙে পড়ছে—যাকে জোড়াতাড়া দিয়ে কিছুতেই খাড়া করে তোলা যাবেনা—প্রচণ্ড একটা ঘা' মেরে গুঁড়ো-গুড়ো করে তাকে ধুলোতে মিশিয়ে দেওয়াই বিপ্লব। আমার ভেতর এ-বিপ্লব সাড়া পায়। পচে-যাওয়া, ধ্বসে-যাওয়া—মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া ছবিকে আমি নিশ্চিহ্ন করে মুছে দিতে চাই।

দাদা পচিয়ে দিতে জানতেন, খানিকটা ভেঙে দিতে পারতেন তার বেশি আর কিছু না। ভাঙনের একটা শক্তি হিসেবে ভাঙনকেই জড়িয়ে থাকতেন

দাদা, বাইরে এসে হাততালি দিয়ে বলতে পারতেন না: "আমি ভেঙে দিয়েছি!" আমি তা পারি। দাদা পারতেন না বলেই হয়ত আমি তা পারি। দাদা পারতেননা বলেই আমাকে তা পারতে হল!

দাদাই একটু-একটু করে ভেঙে দিচ্ছিলেন আমাদের সুখের নীড়! বাবা স্বস্তি হারিয়েছিলেন, মা শান্তি। বাবাকে দেখতাম, ঊর্দ্ধশ্বাসেই যেন ওকালতি করে চলেছেন—জীবন থেকে তাঁর আর সব-কিছু হারিয়ে গেছে মক্কেলদের নথিপত্র ছাড়া। মা হারিয়ে গেছেন, হারাবার কোনো কারণ নেই তবু। মা-ও এক কোণে সরে গিয়ে একা দাঁড়িয়ে ছিলেন—বৌদি পাশে আছে, তবু একা। কথা বলেন তবু চুপ। যেন চুপ করেই ছিলেন, চুপ করেই আছেন। হাসেন কিন্তু থাকেনা সে-হাসি, কারো মনে থাকেনা। আমরা ভুলে যাই, মনে পড়েনা কোনোদিন মাকে হাসতে দেখেছি বলে। নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছিলেন মা—শান্তির ছবি গড়বেন বলে একদিন যিনি দীনেশ চৌধুরীর সংসারে এসে জড়িয়ে গিয়েছিলেন—সে-শান্তিই আর তাঁর দেহে-মনে কোথাও ছিলনা, লুকিয়েও ছিলনা। তাঁর সত্তার মতোই ছিল সে-শান্তি—মা তাঁর সত্তাকেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। বাবা হারাতে সুরু করলেন—হারাক। মুঠো-ভরা বালুর মতো সব গলে যাক, ঝরে যাক্। প্রৌঢ়ত্ব—মৃত্যুর মিতা—জীবনের সঙ্গে এখন বিচ্ছেদের পালা! আর জড়িয়ে ধরা যায়না এখন, শুধু জট ছাড়ানো! মা মেনে নিয়েছিলেন তাঁর প্রৌঢ়ত্বকে—কোনো খেদ ছিলনা তাঁর, কোনো দ্বিধা ছিলনা, দ্বন্দ্ব, অস্বস্তি কিছুই না।...

১৯৪৪ ইং॥

দাদাই কি ফিয়ে এসেছিলেন দেউলি থেকে—না, আরেকটি মানুষ? মা তাঁর দেবুকে পান নি আর, বৌদি ত তাঁর স্বামীকে কোনোদিনই পেতে আশা করেন নি। বাবার মৃত্যুর পর:

দাদা বলেছিলেন বৌদিকে, 'মার সঙ্গে তুমিও বাড়ি চলে যাও।' দুঃখিত হলেননা একটু বৌদি। আমাকে বল্লেন: 'মার সঙ্গে আমিও যাব!'

'কোথায়?' অবাক হয়ে তাকালাম।

'গাঁয়ের বাড়ীতে। গাঁয়ের বাড়ি ত আমি দেখিনি কোনোদিন!'

'কাজেই সে-তাজমহল দেখতে যেতে হবে? কী যে বল!'

"বা রে—মা যাচ্ছেন আমি যাবনা?"

'না!' ভীষণভাবে চুপ করে গেলাম।

"গেলে কি হয়?"

'দাদাকে ফেলে তুমি দৌড়োবে?'

কথাটা শুনে ব্যথিত হয়ে উঠছিলেন কি না বৌদি মনে পড়েনা। ব্যথিত হলেও সে-ব্যথা এতো গভীরে ছিল যে মুখে তার কোনো আভাস হয়ত ফুটে ওঠেনি। বৌদি গেলেন। মা বারণ করেছিলেন তবু শুনলেন না।

এঁদের মতো মেয়ের জন্যেই হয়ত সহমরণের উন্মত্ততা এতোদিন বেঁচে ছিল এদেশে।

যাঁরা স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতারোহণ করতেন কি ভাবতেন তাঁরা? তাঁদের নারীত্বের কেন্দ্রে, নারীত্বের চারপাশে আর কোন পুরুষ থাকতনা স্বামী ছাড়া। স্বামীর স্পর্শের চাইতে আর কোনো তীব্র উত্তাপ ছিলনা তাঁদের জীবনে। রমণীয় উত্তাপ! আগুনের জ্বালা তার কাছে কিছু নয়, জ্বালা নয়—মনকে তা স্পর্শ করতে পারত না বলে দেহকেও স্পর্শ দিতে পারতনা! দেহত্যাগ করতে পারত তাঁদের মন—অদ্ভুত মন!

এমনও হয়? হতে পারে? হতে যে পারে বৌদিকে না দেখলে হয়ত ভাবতে পারতাম না। ....

১৯৪৪ ইং

............বাবাকে ভয়, না কি ঘৃণা করতেন দাদা? জানিনে। জিজ্ঞেস করিনি, আজও জিজ্ঞেস করতে পারবনা। পিতৃত্ব থেকে দাদা বঞ্চিত। একে বঞ্চিত বলা যায়! নিয়তি। দাদা সন্তান চায়নি—চাইতে পারেন না—বাবাকে চাননি বলেই চাইতে পারেন না। তাই নিঃসন্তান।

ছেলেবেলায়, ছুটিতে, গাঁয়ের বাড়িতে মনে পড়ে দাদাকে। এক মুহূর্ত্তের জন্যেও বাবার সঙ্গে দেখা হতনা তাঁর। পিসিমা বলতেন: "ও আমার পাগ্‌লা শিব—ছাখো ছুটোছুটির আর কামাই আছে কি না?"

বাবাও ডাকতেন না দেবুকে কোনোসময়—দেবু বলে যে একটি ছেলে

আছে তাঁর তা-ই যেন ভুলে গিয়েছিলেন! দরকার হলে পানুকেই দরকার পড়ত বাবার।

বাবার মৃত্যুও যেন দাদার জীবনের বাইরের কোনো ঘটনা—মনের ভেতরে তার প্রবেশ নিষেধ ছিল। 'বাবা নেই'—কথাটা যে কতোখানি শূন্যতা ছড়িয়ে দেয় মনের উপর তা বুঝবার মতো হয়ত মনই তৈরী হয়নি দাদার। তাই সে-মৃত্যুর উল্লেখে অসম্ভ্রমই শুনতে পেয়েছি আমি দাদার কথায়: 'ভালোই গেছেন বাবা, বেশীদিন ভুগতে হয়নি!'

ভুগতে হয়নি? অসুখে না হোক অশান্তিতে কি ভোগাওনি বাবাকে? তুমি আঁচড়ে দাওনি বাবার নিটোল জীবন? তাকে কি আর পেয়েছি আমি আগেকার মতো—মাকেও কি আর পেয়েছি?

বলতে পারো, নিটোল নিষ্কলঙ্ক থাকেনা কারো জীবন, বাবারও তা ছিলনা। তাই আঁচড় কেটেছো তুমি তাতে কিন্তু তাতে কি লাভ হ'ল তোমার? তুমি আজ কী? শুভ্র, পবিত্র, উজ্জ্বল? তোমার পঙ্গু জীবনে অন্ধকার ছাড়া আর কি দেখতে পাও? অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছো তুমি, মুখে মেখে নিয়েছো অন্ধকার, বৌদিকেও তা মাখিয়ে দিচ্ছ! পালিয়ে তুমি কোথায় এলে? মুক্তি-পাগল তুমি, বুঝলাম—কিন্তু এই কি তোমার মুক্তি? বাবার উপার্জ্জনের উপস্বত্ব ভোগ করা—কায়ক্লেশে দিনাতিপাত - এ ছবিতেই শেষে মুক্তির ছবি ফুটে উঠল তোমার? কোথায় গেল তোমার স্বদেশী! ৪২-এর মুক্তি-আন্দোলনে কোথায় তুমি? কোথাও নও। ক্লান্ত, অবসন্ন তোমার মন! পঙ্গুর পঙ্কিল-শয্যা থেকে তুমি তাকিয়ে আছো—শুধু তাকিয়ে আছো।

তবু তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তুমি না থাকলে হয়ত পানু—আজ দীপায়ন হতনা। হ'ত বাসবের মতো কেউ। বাসবের মতো নিয়তি তৈরী করার দায় থেকে তুমি আমায় রক্ষা করেছো। তুমি আমার চোখের উপর ছিলে বলেই তোমার মতো হতে হয়নি আমাকে—হতে পারিনি বাসবের মতো। অসহায়ের চোখে তাকিয়ে থাকিনি মুক্তির মিছিলের দিকে—কিম্বা বাসবের মতো শোভাযাত্রাকে রুখে বলতে যাইনি: 'আন্দোলন বন্ধ করো, জাপানীর হাতে তুলে দিওনা দেশ!'

আমি ভোক্তা। আমি আকণ্ঠ পান করেছি তোমাদের উৎসবের আসব—তোমাদের আনন্দ আর উল্লাস বুক ভরে নিয়েছি, দুঃখ আর হতাশার ব্যর্থ

মনে সাজিয়ে রেখেছি। আমি পেছনে ছিলাম—আড়ালে। কিন্তু ছিলাম। আমিই থাকব—আমিই থাকব—সবসময়—চিরদিন। তির্য্যক নয়, ঋজু—পঙ্গু নয়, নিটোল!

হয়ত এ-ই আমার নিয়তি। তোমার নিয়তির সঙ্গে আমার নিয়তি মেলাতে পারলামনা—বাসব!.........

দশ

উনিশ শ' পঞ্চাশের জানলা খুলে কি আর সেই দূরের আকাশ দেখা যায়? সেই দিগন্তরের আকাশ—উনিশ শ' ত্রিশ সাল? দীপায়ন অবশ্য বলবে বৌদ্ধ মনোনিবেশে তাকাও, চমৎকার দেখতে পাবে। বরং ভালো দেখতে পাবে—তখন যা দেখতে পাওনি এখন তা পরিষ্কার দেখা যাবে। দূর থেকে পদ্মার ঘোলা জলও নদীর নীল!

সত্যি, সেদিনকার দীপায়নকে আজই সত্যি করে দেখা যায়! একখণ্ড থম্‌থমে আকাশ। চারদিককার আকাশে অশান্ত গর্জ্জন আর বর্ষণ কিন্তু খানিকটা আকাশে শুধু কালো ছায়া। ছায়ার উপর ছায়া জমে অতল অন্ধকার তৈরী হচ্ছে খানিকটা জায়গায়, ভীষণ লাগে দেখতে। ঝড়ের হুটোপুটির চাইতে ভয়ঙ্কর। ভয়ঙ্কর দীপায়নকেই দেখতে পাচ্ছি আজ।

আইন-অমান্য আন্দোলনের আগেই দেবুদার জন্যে বন্দীশিবিরে ঠাঁই তৈরী ছিল। এঁরা-ত আর শুধু লবণ-আইন আর একশো-চুয়াল্লিশ-ধারা ভেঙ্গেই চুপচাপ থাকবেন না, 'আইনত স্থাপিত' সরকারকেই ভেঙ্গে-চুরে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে দিতে চাইবেন! গান্ধীজি বলবেন সুঁচ ফুটোতে আর এরা চালাবেন কুড়োল! কাজেই সরকারের আশ্রয়েই থাকুন এঁরা—দেবোপম চৌধুরী আর তাঁরই মতো যে-পাঁচ-সাতজন শান্তিভঙ্গকারী সহরে ঘোরাফেরা করছেন। দীপায়ন ভাবছিল এবার বাসবের পালা আর বাসব ভাবছিল হয়ত দীপায়নেরও পালা এলো এবার। বাসবের সঙ্গে একদিন মাত্র দেখা—অনেক বছরের মধ্যে সে-ই শেষ দেখা বাসবের সঙ্গে—কলেজের-খাতা-থেকে-নাম-তুলে-নেওয়া বাসব, বাসা-ছাড়া, ঠিকানাহীন, রুক্ষ, চকিত বাসব। কিন্তু মুখে একটা অদ্ভুত হাসি—দুঃখ সইতে পারার হাসিই হয়ত।

"সাবধান পানু, তোর পেছনেও ওরা এবার লাগতে পারে—মনে হয়না দেবুদার ভাইকে এরা ওম্নি ছেড়ে দেবে!" বাসবের কপালের রেখায় আশঙ্কা ফুটে উঠ্‌ছিল কিন্তু ঠোঁটের দু'পাশে হাসির গভীর রেখাগুলো তখনও মিলিয়ে যাচ্ছিলনা।

"আমায় ? আমায় কেন ধরবে ওরা ? আমি ত কিছু করিনি।" অপরাধের অস্বীকৃতি নয় বরং কিছু করতে না পারার অপরাধই শোনা গেল দীপায়নের গলায়।

"করিস নি কিন্তু করতে ত পারিস।"

"আমি ?"

"দেবুদাও ত কিছু করেন নি কিন্তু করতে পারতেন।"

"আমি যে পারিনে ওরা তা জানে !" একটা আবছা, নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠ্‌ল দীপায়নের মুখে।

"কে যে কখন কি করতে পারে আগে থেকে তা বলা যায়না।"

"কতগুলো কাজ যে কিছুতেই করতে পারেনা—তা বলা যায়।"

"কি জানি !" বাসব অন্যমনস্ক হয়ে রইল খানিকক্ষণ : "কিন্তু সময় এগিয়ে আসছে, পানু, যখন দেখতে পাবি তোর চারপাশের কতো ছেলে কতো অদ্ভুত কাজ করে যাচ্ছে ! তুই ভাবতেও পারিসনে এমন সব কাজ !"

"তুই যা করবি আমি তা ভাবতে পারি !" দুর্ব্বল শোনাল দীপায়নের গলা।

"আমি কি করব ? কিচ্ছু না।" বাসব হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল নিজেকে।

"কেন মিছে কথা বলছিস ? আমি ত খারাপ বলিনে তা।"

"কি আমি করব যার আবার একটা ভালো-খারাপ আছে ! তোর মাথা-খারাপ হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছি !"

বাসবের কথায় কান দিতে চাইলনা দীপায়ন—যেন আর কারো কথা —কাদের কথা—যারা এখানে নেই—মনে-মনে শুনতে সুরু করেছিল ও। আর তাদেরই মুখ থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে যেন এখন বলতে চাইল : "তুই যতীন দাসকে চিনতিস, বাসব ?"

"নাঃ। কাকেই বা চিনি আমি ?"

"চিনিস কিন্তু বলবিনে—এইত ?"

"মাইরি আমি চিনিনে—" হাসতে লাগল বাসব : "তুই সব বড়ো-বড়ো নাম বলতে সুরু করবি আর তাদের সবাইকে আমার চিনতে হবে ?"

"থাক্—আর বলবনা !" ক্লান্ত আর করুণ দেখাল দীপায়নের মুখ।

কাঁড়ি কাঁড়ি বই খাতা ছড়ানো টেবিলটার দিকে সতৃষ্ণ তাকিয়ে রইল

বাসব খানিকক্ষণ, বোঝা গেল অন্য কথায় যাবার পথ খুঁজছে ও প্রাণপণে। দীপায়নের চোখ নিবিড় হয়ে এলো বাসবের মুখে—কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে—যেমন কোনো মৃতের মুখের উপর নিবিড় হয় আমাদের চোখ, নিবিড় হয় চিরদিনের মতো সে মুখ চোখে ধরে রাখবার জন্যে। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিই আমরা—বিদায় দিই মৃতকে—আমাদের জীবন থেকে বিদায়! দীপায়নও মুখ ফিরিয়ে নিল, উঠে দাঁড়াল, ক্লান্ত পায়ে দরজা পর্য্যন্ত হেঁটে গিয়ে বললে: "চা খাবি, বাসব?"

"শুধু চা?"

"শুধু নয়—খাবারওয়ালা এসে গেছে!"

"তোর বুঝি খাওয়াতে ইচ্ছে করছে আমায়?"

"করছে!"

["আমি হাসলাম—" দীপায়ন বলেছিল আমায়: "কেন হাসলাম জানিস, অনি? হয়ত মনে পড়েছিল আমার—শেফালিও একদিন আমায় খাইয়েছিল। শেফালিকে যেন আরেকটু ভালো করে চিনতে পেরেছিলাম সেদিন—আর নিজেকেও। অন্যের ভেতর দিয়ে নিজেকে খুব ভালো-করে চেনা যায় যেমি নিজের ভেতর দিয়ে অন্যকে। কি-রকম অদ্ভুত—দ্যাখ্!"]

একটা সন্দেশ ভাঙতে-ভাঙতে বাসব বল্‌লে: "খাওয়া-পরা বলে যে একটা ব্যাপার আছে অনেকদিন হ'ল তা ভুলে গেছি! তুই আজ মনে করিয়ে দিলি, পানু!"

"কিন্তু সন্দেশ তোর সব-কটা খেতে হবে—আর রাবড়ি সবটুকু!"

"তোর ভেতর একটা মেয়ে আছে, পানু—" হাসিতে চিক্‌চিক্ করে উঠ্‌ল বাসবের চোখ।

দীপায়নের মুখে হয়ত একটু মেয়েলি লজ্জাও ফুটে উঠ্‌ল: "সবার ভেতরেই তা থাকে!"

"না। খাঁটি পুরুষও থাকে কেউ-কেউ।"

প্রতিবাদ করতে পারত দীপায়ন কিন্তু করতে ইচ্ছে করলনা—নিজের কাছেও নিজেকে যেন খানিকটা দুর্ব্বল, নরম, সহিষ্ণু মনে হচ্ছিল আজ। সত্যি খানিকটা মেয়েলি। আজ যেন ও জোর দিয়ে আর বলতে পারবেনা: "বাসব, তোমাকে ভালো লাগছেনা আমার!" বাসবের মুখ থেকে চোখ

ফিরিয়ে নিতে কিছুতেই রাজি হবেনা মন। মেয়েদের হয়ত এম্নি হয়—হয়ত ময়নার তা-ই হত—বীণাদিরও। রাগ করতে পারেনা। এম্নি সোজা হয়ে যায় মন যে কিছুতেই আর বাঁক নেয়না। অদ্ভুত লাগল নিজেকে দীপায়নের কিন্তু ভালো লাগলো। বারবার চোখ ফিরিয়ে নিয়েও বারবার তাকাতে ইচ্ছে করল বাসবের মুখের দিকে। অপরিচিতকে নিয়ে শিশুরা যেম্নি করে।

চায়ের আগে সন্দেশ-টা মানালনা—কুজো থেকে জল গড়িয়ে নিতে নিতে ভাবছিল দীপায়ন, নোনতা-ই ভালো ছিল, এম্নি গলা জড়িয়ে যেতোনা—চায়ের আগে জল খেতে হবে এখন—ঠাণ্ডা খানিকটা জল তারপর গরম চা! কেমন-যেন বিশ্রী লাগ্‌ল দীপায়নের, খুঁত-খুঁতে হয়ে উঠ্‌ল মন—তার চাইতে চম্‌চম্‌ই ভালো ছিল, ছানা-মিষ্টি-রস সবই আছে, নোনতার মতো ফাঁকি-খাবারও নয় আবার সন্দেশের মতো আটালোও নয়। তবে মুস্কিল যে চম্‌চমে বাসি ছানা থাকে—সন্দেশে তা হবার যো নেই—ধরা পড়ে যায়! কিন্তু ধরা পড়লেই কি বাসব তা ধরতে পারবে এখন?

"সন্দেশগুলো ভালো রে, বাসু?" বাসবের হাতে জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বল্‌লে দীপায়ন।

"খুব ভালো—" সন্দেশে সময় দেবার মন ছিলনা বাসবের। এক ঢোঁক জল খেয়ে হাসিতে মুখ ধুয়ে তাকাল ও: "ঠিক বলছি—তোর মেয়ে হওয়াই উচিত ছিল!"

"পুরোপুরি?" দীপায়ন হাসিতে ফেটে পড়ল: 'তাতে আমি রাজি নই!"

["কিন্তু সেই বিকেলে পুরোপুরি মেয়ের অভিনয়ই করতে হ'ল আমাকে—" ঘটনাটা বলবার সময় দীপায়ন বলেছিল: "বললাম বটে অভিনয়, কিন্তু ওটা অভিনয় নয়! কোনো কথা, কোনো ভঙ্গী আগে থেকে মনে-মনে সাজানো ছিলনা আমার। বাসবই যেন আমাকে ও ধরণের কথা বল্‌তে, হাসতে, তাকাতে, হাত-পা নাড়তে বাধ্য করাচ্ছিল। সত্যি, ওকে খাঁটি পুরুষ বলেই মনে হয়েছিল আমার—আমি যা নই! ওর শুকনো চেহারায় হাড়ের মতো একটা সাদা সত্য যেন দেখতে পেয়েছিলাম। শুধু দেখা নয়। ওটা জাতুর মতো টান্‌ছিল আমায়!")

"পড়াশুনো তোর কেমন হ'ল, পান্নু ?" চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে জিজ্ঞেস করল বাসব।

"কোনোরকম।"

"ফার্ষ্ট ক্লাশ হ'বে ত ?"

'দূর"—মুখস্তের মতো তাড়াতাড়ি বলে উঠ্ল দীপায়ন—যেন এ-প্রশ্ন আর উত্তর ওর অনেকবার শোনা আর অনেকবার বলা। সত্যি তা-ই। নিজেকে নিজেই এ-প্রশ্ন করেছে ও অনেকবার আর উত্তর দিয়েছে ও-কথাটাই বলে। তাই এতো সহজ শোনাল, সহজভাবে বলতে পারল দীপায়ন : দূর্!

"তাহলে অন্যায় করবি!"

কার উপর অন্যায় ?—দীপায়ন হাসতে লাগল—বাবা আর মা ?—তাঁরা কি আর এখন ভাবতে যাবেন পান্নু কি হ'ল, না হ'ল ? সেই বাবা-মা কি আর আছেন ? একবার—মাত্র একবার কোন্ এক ক্লাশের অ্যান্নুএল-পরীক্ষায় সেকেণ্ড হয়েছিল পান্নু—শুনে মা বলেছিলেন : "ছিঃ, কেউ আবার সেকেণ্ড হয় নাকি।" বাবা মুচকি হেসে মুখ ফিরিয়ে বলেছিলেন : "পড়াশুনো করেনা তেমন।" সেই ওঁরা আর নেই। তবে আর কার উপর কি অন্যায় করবে দীপায়ন ? নিজের উপর ? নিজের উপর কে না অন্যায় করে ? কে না শাস্তি দেয় নিজেকে ? ফ্রয়েড তার একটা নাম দিয়েছেন। ফ্রয়েডের নামটা মনে পড়তেই হাসির আভা মুছে গেল দীপায়নের মুখে। বাসবের মতো ও-ও কি রোগী ? কখনো না। না। শব্দ ফুটিয়ে তুলে বললে দীপায়ন : "না।"

"না আবার কি ? নিশ্চয়ই অন্যায়।" বাসব ভৎর্সনার স্বরে বললে।

"যাকগে! পরীক্ষার কথা কেউ বলতে পারেনা।" নিজের বাস্তব চেহারাটা নিয়ে বাসবের কাছে আর উপস্থিত থাকতে ইচ্ছা করছিলনা দীপায়নের : "তাছাড়া পরীক্ষাই হবে কি না কে বলবে ? কংগ্রেস আন্দোলন স্নুরু করলে কি পরীক্ষা হবে ভাবিস্ ?"

"কংগ্রেস আন্দোলন করবে না কি ?" খবরটা যেন বাসব এই প্রথম শুনে কৌতুহলী হয়ে উঠ্ল।

"তুই জানিস্ নে, না ?" বাঁকা চোখে তাকাল দীপায়ন।

"সত্যি জানিনে। কি করে বা জানবো! আমি ত কংগ্রেসের কেউ নই।"

["তখন মনে হয়েছিল মিথ্যে কথা বলছে বাসব –" বারো বছর পর বাসবের ও কথাটা মনে পড়তে বলেছিল দীপায়ন : "কিন্তু কথাটা যে ওর রক্তমাংসের মতো সত্য তা আজ দেখতে পাচ্ছি। যে যা হবে তা নিজের ভেতরই তৈরী হতে সুরু হয়, বাইরে থেকে কেউ এসে তৈরী করে দেয়না! মাটিতে সব-কিছুই আছে— তা থেকে কোন্ গাছ কি টেনে নেবে ওটা গাছেরই কাজ। আমাদের মাটি মানুষ—আমাদের চারপাশের মানুষ—পৃথিবীজোড়া মানুষ—এমন কি যারা এখন পৃথিবীতে নেই তারাও। আমরাও মানুষের মাটি থেকে কাউকে-কাউকে টেনে তুলে নিই নিজেদের ভেতর আর তাদের রসেই তৈরী হয়ে উঠ্তে চাই। হয়ত হুবহু তেমন তৈরী হতে পারিনে, খানিকটা পারি। হুবহু হইনে কারণ আমরা গাছ নই—গাছের চাইতে বেশি।"]

"আমি জানি বাসু, সত্যি কথা তুই বলতে চাসনে—আমিও তা জানতে চাইনে।" দীপায়ন উদাস হয়ে উঠ্ল খানিকটা : "কিন্তু সত্যি আমার দুঃখ হবে যদি একদিন জানি যে স্বদেশীও তুই ছেড়ে দিয়েছিস্।"

বাসব হাসতে লাগল, মনে হল এ-হাসি হয়ত বছরের পর বছর ওর ঠোঁটে লেগে আছে—তাই তার প্রাণ নেই, আনন্দ নেই—যেন ওটা ওর ঠোঁটেরই কোনো ভঙ্গী যা হাসি বলে মনে হয়। একটু ক্লান্ত, একটু করুণই হয়ত সে-ভঙ্গী আর একটি পুরোপুরি পুরুষের মুখে এই ক্লান্তি যেন হঠাৎ দীপায়নকে ব্যাকুল করে তুল্ল।

["মানিককেও হয়ত আমি বুঝতে পারতাম না অনি, যদি সেদিন বাসবের সঙ্গে আমার দেখা না হ'ত—" দীপায়ন বলেছিল : "কাউকে বুঝতে হলে নিজের ভেতর তাকে পেতে হয়। 'হ্যাপি ম্যারেজেস্ আর রেআর্'—বলেই রোলাঁ খালাস, কিন্তু সুখীদম্পতী কেন দুর্লভ? এ-প্রশ্নের উত্তর এখানে। কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে নিজের ভেতর কোনোসময় দেখতে পায়না, স্ত্রী-ও হয়ত তা-ই। কিন্তু পরকে নিজের ভেতর অনুভব করা যে কি আশ্চর্য্য এক অভিজ্ঞতা—স্বাদ যে তার কতো তীব্র, কত অদ্ভুত তা বোঝানো যায়না। আত্মোপলব্ধি, ব্রাহ্মাস্বাদ বলে যে অভিজ্ঞতার কথাগুলো আছে—এ হয়ত তা-ই! নিজেকে তুই তখন এক নূতন নামে চিনতে পারলি—সে-নাম দীপায়ন বা অনিরুদ্ধ নয়, বাসব-মানিক নয়, -শুধু আনন্দ। আমাদের সত্তার নামই

আনন্দরাজ। ওটা মেটাফিজিক্যাল আঁকিবুঁকি নয়, নেহাৎ ফিজিক্যাল—শরীরী। আমরা তখন ইস্কুলে পড়ি—নদীর ঘাটে বিজয়া-দশমী দেখতে গেছি—নীল আলোর শলাই কিনেছিলাম, জ্বেলে প্রতিমার মুখের উপর ধরব বলে। ধরলাম কিন্তু প্রতিমার মুখে নয়—মানিকের মুখের সামনে! দিল্লীতে ঘটনাটা বলছিল মানিক আমাকে। বল্‌ছিল: 'আমার বুক ভরে উঠেছিল সেদিনই! সে-পান্নুকে কি জীবনে ভুলতে পারব?' আমি তা জানতাম কিন্তু বুক ভরে উঠ্‌লে কেমন যে লাগে, কেমন যে লেগেছিল মানিকের তা কি করে জানব? জানলাম সেদিন বাসবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে!"]

চায়ের কাপটা টেবিলের উপর রেখে উঠে দাঁড়াল বাসব। এতো শীগগীর যে ওর চা-খাওয়া হয়ে যাবে দীপায়ন ভাবতে পারেনি। দীপায়নও দাঁড়াল। কাপটাতে তাকাল। না, চা পড়ে নেই। ভীরু-ভীরু গলায় বললে: "চা-খাওয়া হয়ে গেল তোর?"

"একটু-একটু চুমুক দিয়ে খেয়ে কি লাভ?" বাসবের চোখে একটা নীলচে হাসি ঝিলকিয়ে উঠল: "দু'এক টানে শেষ করে দেওয়াই কি ভালো নয়?"

"বাসু—" দীপায়ন এগিয়ে এসে বাসবের জামা থেকে একটা সুতোর ফেসো খুঁটে তুলে আনল।

চমকে উঠল বাসব: "কি রে?"

"কিছুনা।" দীপায়ন হাসতে চাইল।

"তোকে আজ অদ্ভুত মনে হচ্ছে, পান্নু!"

"তোকেও!"

বাসব একটু হেসে দীপায়নের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল। আর দীপায়নের মনে হল বাসব ওর চেখের উপর ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে।

("এমন কি হয়না—" বাস্তব নিয়ে বাসবের সঙ্গেই একদিন তর্ক করেছিল দীপায়ন: "আমাদের চোখের উপর কেউ দাঁড়িয়ে আছে অথচ তাকে যেন আর পাচ্ছিনে আমরা? আমাদের কাছে সে আর নেই—হারিয়ে যাচ্ছে—হারিয়ে গেছে! বাবা যে-মুহূর্ত্তে মারা গেলেন, তাঁর মুখে তাকিয়ে আমি আর বাবাকে দেখতে পেলামনা—মনে হল, খালি বিছানা। তোকেও ঠিক তেম্নি মনে হয়েছিল একদিন আমার—আমার হষ্টেলের রুমে, বি-এ পরীক্ষার

আগে! বলতে পারিস, এ-শুধু মনে-হওয়া, বাস্তব নয়। যা আমরা পাই তার সবইত মনে-হওয়া—মনের কাজ! ইন্দ্রিয়ের পাওয়াগুলোকে যদি মন সাজিয়ে না তোলে তাহলে আর কি পাই আমরা? মনই আমাদের অনেকখানি, অন্তত হাত-পা, চোখ-কানের চাইতে ঢের বড়ো ইন্দ্রিয়!")

"আচ্ছা, আজ চলি, পানু—" বাসব নড়ে-চড়ে উঠল: "আবার একদিন আসছি। সেদিন হয়ত দেবুদার সব খবর পাওয়া যাবে, কি বলিস?"

মাথা নাড়তে গিয়ে থেমে রইল দীপায়ন তারপর হয়ত কিছু বলতে গিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল। বাসব চলে গেল। দরজায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও দীপায়ন বুঝতে পারছিলনা ও যে অনর্থক দাঁড়িয়ে আছে। হয়ত মনে হচ্ছিল ওর, এখন ঘরে ফিরে যাওয়া-ও অনর্থক—একবাসিন্দের ছোট ঘরটা যখন ওকে উগরে দিতেই চাচ্ছে তখন এখানে দাঁড়িয়ে থাকাই ত ভালো—যতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় ততোক্ষণই ভালো।

'প্যারাগনে'র বেনানা-শরবত। তখনও বিষণ্ণ মনের আভিজাত্য নির্ব্বিচারে চাঙ্-ওয়ার্ মদের গ্লাসে গিয়ে পৌঁছয় নি। কারো কারো নাকি পৌঁছুত শুনতাম, এমন কি চাঙ্-ওয়ার কেবিন থেকে প্রমোশন নিয়ে ফারপোর টেবিলেও না কি হাত বাড়াত আমাদের চেনাশোনা কেউ-কেউ। কিন্তু দীপায়নকে দিয়ে তা হলনা। গ্লাস-ভর্ত্তি ঘন ঘোল—হলদেটে রঙ্, চাঁপা-কলার গন্ধ আর বরফের শিরশির-লাগানো কুঁচি—মনকে থিঁতিয়ে দিতে তা-ই ছিল ওর ঢের। দীপায়ন বলত: "ফাল্গুনের দুপুরে এর চাইতে ভালো আর কী পানীয় আছে কলকাতায়—বিশেষ করে পরীক্ষার যখন দেড়মাস বাকি আর তুমি কিছুতেই মন দিতে পারছো না পড়ায় তখন, সেই লম্বা দুপুরে, কলেজ স্কোয়ারে চলে এসো—পনের মিনিট ধরে এক গ্লাস বেনানা-শরবতে চুমুক দিয়ে চলো—দেখবে কী ঠাণ্ডা নেশা!" তখনও বিয়ার-সেলারে নাৎসীদের জন্ম হয়নি—নাৎসী-পানীয় হ্বাকার-ব্রু বা ফ্যাসিস্ট জাপানের সস্তা সাকুরা কলকাতার প্রায় সার্ব্বজনীন পানীয় হয়ে ওঠেনি—হয়ে উঠলে দীপায়ন সেই মিষ্টি মৌতাতে ঝুঁকত কি না কে বলবে? মদ

খাবার মন তৈরী ছিল ওর, তবে শেষ-মুহূর্তে মনকে সাবধান করে দেবার ক্ষমতাও ছিল ওর অসাধারণ।

দীপায়নের পাশেই ছিলাম আমি, কিন্তু, আশ্চর্য্য, ও যেন বারবার আমাকে ভুলে যাচ্ছিল!

কুয়াশা জমে গ্লাসের বাইরের দিকটা ঘোলাটে হয়ে উঠ্ছে—তাকিয়ে তা-ই দেখছিল দীপায়ন। তারপর চোখ তুলে নিলে হয়ত গোল-দীঘির পালিশ, সবুজ জলের দিকে তাকাতে আর মাথা উঁচু করলে গাছের ডাল-পালা-ঢাকা সিনেটহলের মোটা মোটা ধোঁয়াটে থামগুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে নিতে। আমার দিকে নয়। আমি যেন ট্রামের একই সীটের অপরিচিত কোনো সহযাত্রী। আমার দিকে যেন ওর না তাকালেও চলে!

আমি কিন্তু বারবারই নিজেকে ওর সামনে তুলে ধরছিলাম। আমার ছোঁওয়া না লাগলে ও যে নিজেকে খুঁজে পাবেনা সেদিনই সবচেয়ে বেশি অনুভব করেছি।

ঘোলের শরবত আর গোলদীঘির জলের ছবি হয়ত দরকার ছিল দীপায়নের কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম, য়ুনিভার্সিটির হাতছানি ওকে কিছুতেই ছেড়ে যেতে পারেনা।

"বাসবের ভূত শেষটায় তোর ঘাড়ে চাপল, পানু?" ওকে টেনে আনতে চাইলাম বাইরে।

"শুধু বাসব কেন, কতো ছেলেইত পরীক্ষা দেবেনা!"

"বলে, কিন্তু শেষটায় সবাই হলে গিয়ে হাজির—দেখতে পাবি!"

"আমি তা বলছিনে!"

"বলছিসনে, ভাবছিস্! চুপি চুপি যারা ভাবে তারাই সাংঘাতিক!"

"সাংঘাতিক নয় ত কিছু—চুপচাপ সরে পড়া—পরীক্ষা না দেওয়া!"

"তোর পড়া হয়নি?"

"হয়েছে।"

"তাহলে পরীক্ষা না দেওয়ার কথা ওঠে কি করে?"

"যারা পরীক্ষা দিয়ে পাশ করবে তাদেরইত পর।ক্ষা না দেবার কথা!"

"কেন?"

"ইংরেজ সরকারের কেরাণী-গিরির ডিপ্লোমাটা এবারও নিতে হ'বে?"

"ওটা কি শুধুই কেরাণী-গিরির ডিপ্লোমা ?"

"তা নয়, কিন্তু এ-ছাড়পত্রের জোরেই ত সরকারের পায়া তৈরী করা যায়!"

"বিশ্রী লজিক দেখাচ্ছিস পানু—তার মানে, লজিকের জবাই করে অভিমান দেখাচ্ছিস্ !"

"ভালো লাগেনা। জানিস অনি—ভালো লাগছেনা।" গ্লাসের কানায় ঠোঁট ঘষতে সুরু করল দীপায়ন।

ভালো লাগেনা ? কি ভালো লাগেনা ? পরীক্ষা-দেওয়া, দেবুদার কয়েদ, বাসবের পরীক্ষা-না-দেওয়া, বাড়ির আবহাওয়া, না কি থম্‌থমে কলকাতা ? ওর মনের উপর কান পাতলে কি শোনা যেত তখন ? কোন্ বেসুরো ধ্বনি ভালো-না-লাগার কালো হাওয়া ছড়িয়ে দিচ্ছিল দীপায়নের মনে ? শুনতে কি পেতাম কিছু ? পেতাম।

"কী রকম যে লাগে নিজেকে—" শরবতের একটা ঢোঁক গিলে অসহায়ের মতো চোখে একটু হাসির মুমূর্ষুতা ফুটিয়ে তুল্‌ল দীপায়ন: "কিছুই করতে পারিনে। অথচ দাদা খুব সহজেই পারলেন। আর বাসবও তা-ই। শুধু আমিই পারিনে কিছু করতে! কেন পারিনে? বাসব পারে অথচ আমি পারিনে।"

"সবাই কি সব-কিছু করতে পারে ?"

"সব-কিছু ত নয় ! যা করা যায় তা এমন-কি বেশি !"

"বেশত, পরীক্ষা-দেওয়াটা যখন বিঁধছে তোকে, বাবাকে জানিয়ে দে এ বছর পরীক্ষা দিবিনে।"

"তারপর ?" গ্লাসের গায়ে আঙুলের টানে পুরণ-চিহ্ন আঁকতে লাগল দীপায়ন—ভিজে আঙুলের ডগা বুড়ো আঙুলে ঘষতে সুরু করল তারপর !

"তারপর একবছর গেলেই দাগ মুছে যাবে—ঠিক ওম্নি, তোর ভেজা আঙুলের দাগের মতো—তখন পরীক্ষা দিবি।"

"কিন্তু আমায় কি দেখতে হচ্ছেনা মা-বাবা-বৌদির মন ? দাদা যেম্নি আঁচড় কেটেছেন আমিও ঠিক তেম্নি আঁচড় কাটতে পারি ?"

"তা যদি না পারিস তাহলে ত সবই চুকেবুকে গেল !"

"চুকে-বুকে গেল ? না। তাহলেও আরেক দিকে অন্যায় হ'ল !"

"টু-বি অর নট্-টু-বি'-র কোনো সমাধান নেই !"

"তাই বড্ড খারাপ লাগছে নিজেকে। জানিস অনি, কাঁদতে ইচ্ছে করে আমার একেক সময় কেন আমি এমন হলাম! দাদার মতো কেন হলাম না— তাহলেই ত আর ভাবতে হতনা কিছু—জেলে বসে আজ ভাবতে পারতাম, আমার আর ভাবনার কিছু নেই!"

"যা তুই হতে পারিসনি তা কেন হতে পারলিনে সে ভাবনায় লাভ আছে কিছু?"

"লাভ নেই! লাভ নেই, জানি। বাবা-মাকে কেন ভালোবাসতে পারেননি দাদা, আর আমি কেন ভালোবাসতে পারি—কোনো যুক্তি, কোনো ফরমূলা তার কারণ বলে দিতে পারবেনা, জানি।"

"একটা যুক্তি হয়ত উপস্থিত করা যায়।"

"কি?"

"একেক রকমের ভালোবাসা একেক সময় আমাদের মনে বড় হয়ে ওঠে। তেমি স্বদেশীটাই হয়ত দেবুদার মনে খুব বেশি বড়ো হয়ে উঠেছে।"

দীপায়ন নিঝুম হয়ে গেল আর নিঝুম হবার আগে আধো-ঘুমন্ত গলায় যেন বলতে চাইল: "কেন বড়ো হয়?"

'কেন বড়ো হয়'—জিজ্ঞাসা নয়, শুনতে পেলাম, অনুতপ্ত মনেরই কান্না। কেন হয় কেউ কি জানে? এম্নি হয়, হয়ে চলে, হতে থাকে তবু বলি আমরা: 'কেন এমন হয়!' আমরা বদলাই কিন্তু বদলাতে চাইনে—না-চাওয়ার ব্যথা ঘুমের মতো জড়িয়ে ধরে আমাদের—কান্নার মতো জমে ওঠে গলার ভেতর। দীপায়ন বেশি জড়ায়, বেশি জমায়। কিন্তু তবু বাঁচতে পারেনা। বদলাতে হয়। মানিক রাগ করে বলত: "জানিস্—পানু কাউকে ভালোবাসেনা—ও শুধু মজা পায়—আমরা সবাই ওকে ভালোবাসি কি না।" কিন্তু তা-ই কি? ভালোবাসার ঘের থেকে নিজেকে কি বাঁচিয়ে আনতে পেরেছে দীপায়ন? বাঁচাতে চেয়েও কি পেরেছে? "সব-কিছুই স্বীকার করতে হয়, বাসব; শুধু একপক্ষকে স্বীকার করে নিতে গেলে সত্য বলে ব্যাপারটা ফাঁকি দিয়ে পালায়!"—জনযুদ্ধের অধ্যায়ে বাসবকে বলতো দীপায়ন নিজেই। থেমে-থেমে চললেও চলতে হয়। সেদিন 'প্যারাগনে'র টেবিলে গা এলিয়ে দিয়ে দীপায়ন ভাবছিল হয়ত থেমেই থাকা যায়—হয়ত ভাবছিল, থেমে-থাকা এমন কি খারাপ?—কিন্তু ভাবছিলনা যে খারাপ-ভালোর প্রশ্ন দিয়ে শিকল তৈরী করা

মুস্কিল, আরো মুস্কিল তারই পক্ষে যে শরীরের চাইতে মনকে বেশি শরীরী মনে করে।

তারপরেও, সেদিনের সে বেনানা-শরবতের টেবিল থেকে উঠে এসেও, দীপায়ন বাইরে হয়ত আগেকার মতোই ছিল কিন্তু ওর মনের চেহারা আর আগেকার মতো ছিলনা মোটেও। সাধারণ বর্ণনায় বিষণ্ণই বলা যায় সে-মনকে কিন্তু আগেকার ব্যথা-পাওয়া বিষণ্ণ মনের সঙ্গে তার ঢের তফাৎ। মেঘের ছায়ায় কালো-হয়ে আসা কোনো স্ফটিক-জলের ছবি নয় এ, এ-জল কালো, সমুদ্র-গভীর বলেই, এ-কালো জলেরই কায়া। সম্ভাবনার রঙ এ-কালো, সৃষ্টির দুর্ব্বোধ্যতা। তৈরী হচ্ছে কোনো শপথ, কোনো দুর্গম পথ, তৈরী হচ্ছে দীপায়ন, নিজের রক্তমাংস ছিঁড়েখুঁড়ে আবার সাজিয়ে তুলছে একটি মানুষের চেহারায়—যার সুখ-দুঃখ, হাসি কান্না আরেকরকম, যাকে আর চেনা যায়না আগেকার মনের পরিচয়ে তেমন একটি মানুষ তৈরী হচ্ছিল দীপায়নের বিষণ্ণতায়। সেদিন হয়ত ঠিক ধরা যায়নি, আজ ঠিক ধরা যায়। ঝড় চলে গেলেই বোঝা যায় ঝড় কেমন!

আমি জানি সেদিনই প্যারাগন'-থেকে বেরিয়ে গোলদীঘির রেলিং ধরে চুপচাপ খানিকক্ষণ জলের দিকে তাকিয়ে ছিল দীপায়ন আর হয়ত সেদিনই হষ্টেলে ফিরে গিয়ে বৌদিকে এ চিঠি লিখেছিল :

বৌদি,

অনেকেই চলে গেল কিন্তু আমি যাবো না। তোমরা ভয় পেয়েছ জানি, পাছে আমিও যাই। কিন্তু আমাকে যা দেখেছ তাতে কি মনে হয় আমি যেতে পারি? আমি ভীরু সত্যি তা-ই। তাছাড়া আমাকে আর কে কি বলবে? মাথা হেঁট করে থাকবার জন্যেই কেউ-কেউ জন্মায়—আমি তাদেরই একজন।

আচ্ছা, বৌদি, এ-কথাগুলো পড়ে কি তুমি খুসী হচ্ছ? তোমাদের ভাবনা দূর হয়েছে বলেই কি খুসী হতে পারছ? আমি যে কতো ছোট হয়ে যাচ্ছি তা ভেবে কি কষ্ট হচ্ছেনা তোমার? তুমি কি ঠিক মার মতোই ভাববে? সন্তানরা দুর্ব্বল হলেই মা খুসী হ'ন কিন্তু তোমার ঠাকুরপো যে এমন দুর্ব্বল তাতে কি তোমার মন-খারাপ হয়ে যাচ্ছেনা? কাল থেকে তুমুল পড়াশুনো সুরু করব—বাবাকে বলো। বাবা খুসী হবেন কিন্তু তুমি যদি খুসী না হও তাহলে আমি খুসী থাকব॥ —ঠাকুর পো।

চিঠিতে সন-তারিখ নেই—তাছাড়া ওটা পোষ্টও করেনি দীপায়ন। জার্ণাল্‌স-এর একটা পাতায় আঁটা। হয়ত ভেবেছিল, একটি বিকেলের অস্থির ছবিকে চিঠির স্থায়িত্ব দিয়ে কি লাভ? সন্ধ্যায় এ-ছবি মুছে গেছে—রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে আবারও ফুটিয়ে তুলেছে এ-ছবি—ঘুমের মধ্যে শুনতে পেয়েছে বাসবের গলা: 'ভাবতে অবাক হই, পানু, তুই যে দেবুদার ভাই!' —বলেই কোথায় যেন পালিয়ে গেছে বাসব—বড়ো-বড়ো থামের আড়ালে কোথায় যে, পেছন-পেছন গিয়েও দীপায়ন তাকে দেখতে পায়নি—তারপর বিশ্রী ভোর—স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন, সব বোঝা যায়: ওই চেয়ারে এসে সেদিন বসেছিল ও—জানা যায়: ও পরীক্ষায় বসবেনা, কিন্তু দীপায়ন বসবে। বসবে? সত্যি কি মনে-মনে ঠিক করে ফেলেছে দীপায়ন যে পরীক্ষা ও দেবেই? না—না—না! কে বল্‌লে? কে বল্‌লে যে পরীক্ষা ও দেবেই?

অনেক সকাল—অনিশ্চিত, অস্থির। অনেক দুপুর—অশান্ত, উত্তপ্ত। অনেক বিকেল—নিঝুম—অবসন্ন। অনেক উদ্বিগ্ন রাত্রি, অনেক উন্নিদ্র রাত্রি। দরিদ্র একটি বিকেলের অস্থির ছবিকে কি চিঠির স্থায়িত্ব দেওয়া যায়?

এগারো

১৯৪২ অগষ্ট।

'Footfalls echo in the memory
Down the passage which we did not take.
Towards the door we never opened
Into the rose-garden.'

অনেক পথ ত হেঁটেছি—এবার সুরু হবে আরেক পথ-চলা? আরেক পথ, কোনদিন যাইনি যে-পথে, যেতে চাইনি। যেতে চাইনি তবু যেন জানতাম আছে এম্নি কোনো পথ, যে-পথের পদধ্বনি শুনতে পেতাম আমার রক্তের প্রতিধ্বনিতে। আবার এক শৈশব—নূতন এক শৈশব সুরু হবে কি আমার?

কাল সারা রাত্রি গান্ধীজি ছিলেন এখানে—আমার ঘরে—ওখানকার একটি বিছানায়। গান্ধীজি? না কি আর কেউ? সাদা একটি ছায়া -অন্ধকারে ভোরের মতো কোনো ছোওয়া—সাদা ছায়া—মানুষের ছায়া—গান্ধীজির ছায়া!

অনেক পথ হেঁটে এলেন—হাতে লাঠি—কপালে তিলক! গান্ধীজি!

আমি চাইনে ১৯৩০। আবারও সেই ১৯৩০ চাইনে আমি। সত্যি চাইনে।

আমি প্রার্থনা করিনি কোনোদিন। আজ করছি: আর যেন ফিরে না আসে সে দিনগুলো আমার! চাইনে আমি তেমন সুরু—সেই পথ—শরবন।

সব দীপায়ন মরে যাক—দীপায়নের সব ভঙ্গী মুছে যাক- আরেকটা মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই আমি!

বাঁচতে পারোনা—দীপায়ন ভাবছে। কিন্তু আমি ভাবছিনে। দীপায়ন ছাড়াও যে-পরিচয় আছে আমার, সে ভাবছেনা। সে বাঁচতে পারে—সে-ই বাঁচে—পানু মরে যায়, দীপায়ন মরে যায়, সে থাকে।

আজ সে অনেক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ?—১৯৩০-এর মতো আবছা নয়, ঘোলাটে নয়।

কেউ তাকে আজ ঘোলাটে করে দিতে পারেনা—বাসব না, দেবোপম চৌধুরী না, ভবানী, তোতা কেউ না।

না, তোতা আজ একটি নাম। না প্রস্থিরস? তোমার দেহের কোনো বস্তু—তাই তোমার-জীবনের একটা ভঙ্গী। তেম্নি সবাই—যাদের দেখেছ, জেনেছ সবাই তেম্নি। তেম্নি গান্ধীজি। তোমার ভঙ্গী, তোমার সঙ্গ। যখন নিঃসঙ্গ, তখনও ওরা থাকে—ওরা থাকে বলেই তুমি থাকো, নইলে থাকোনা, বাঁচোনা। তুমি ছাড়া আর কে বাঁচে তোমার দীপায়ন? নিঃসঙ্গতায় তুমিই স্পষ্ট হয়ে বাঁচো—সব ভঙ্গীর যোগফল যে-তুমি সেই তুমি। তা-ই তোমার নিজেকে পাওয়া। তোমার মন তখন হিসেব করছে তুমি কি পেলে। তলব করছে দেনেওয়ালাদের—তৈরী করছে তাদের একেকটি ছায়া। তুমি তৈরী হচ্ছ।

মনে নেই, ১৯৩০-এ এম্নি তৈরী হচ্ছিলে যে তুমি? শেফালি, বাণাদি, ময়নারা আসতনা ছায়া-শরীরে তোমার মেসের ঘরে? আসত, কথা বলত, তুমিই কথা বলতে তাদের হয়ে—তোমার সব জমানো কথা তাদের না-বলা কথা উঠ্‌ত!

আসতেন দেবোপম চৌধুরী তাঁর বন্দী-শিবিরের কাঁটা-তার ডিঙ্গিয়ে। তোমাকে হাতছানি দিতে? মোটেও নয়। গল্প শোনাতে আসতেন—যে-গল্প তাঁর কাছে শুনতে চাইতে—যা তুমি জানো অথচ ভাবতে দাদা জানেন না, তা-ই শুনতে চাইতে তাঁর মুখে।

তোমার পথেই তুমি আলো ফেলতে চাও দীপায়ন—অন্য পথ পড়ে থাকে—অন্ধকার। বারবার তোমার পথেই ফিরে এসো, কিন্তু ভাবো, সুরু হল নূতন পথ-চলা। তুমি যে সবকে, সবাইকে তোমার রসে রসিয়ে তুলতে পারো তাকেই বলতে চাও তোমার আসল সত্তা—কিন্তু সে-ই ত দীপায়ন। দীপায়ন, তোমার চেতনা, মোটা রেখায় তুমি। আর কিছু খুঁজতে যেয়ো না, পাবে না।

অসহ্য ১৯৩০-এর দিকে তাকাও আজ, মনের উত্তাপ নিয়ে নয়, শাণিত দৃষ্টি নিয়ে তাকাও—সেখানেও দেখতে পাবে এম্নি ছায়া-শরীরের আলো। পাওনা দেখতে? বলো।

ওরা আসত। ঝাঁক বেঁধে ছায়া-শরীররা আমার চারপাশে এসে বসত। আলোর মতো, হাওয়ার মতো, রোগবীজাণুর মতো আমার ভেতরেও প্রবেশ

করত কেউ-কেউ। সোনালী আলোর ঝর্ণা হয়ে প্রাক্ দেবতারা মর্ত্ত্যের মানুষীর কাছে যেন্নি আসতেন।

রাজপুতানার বন্দী শিবির থেকে দাদা আসতেন কিন্তু সেপাই-সান্ত্রী-ঘেরা ডেটিনিউ নয়—চোখে কালো-আলোর ভীষণ জ্বালা নেই—হাসির সবুজ আভা—সহজ, ঘরোয়া মানুষ একটি।

দাদা বল্‌তেন: "ন'দাদু কি বলেন জানিস, পানু ?"

একদিন ন'দাদুর যে কাহিনী দু'চারটি কথায় মার কাছে বল্‌ছিলেন দাদা তা-ই যেন সেদিন পানুর কাছে সবিস্তারে বলার দরকার ছিল।

"আসলেও চমৎকার মানুষ ছিলেন ন'দাদু—খোলামেলা—একটু হিজিবিজি নেই ভেতরে! অথচ মানুষটাকে কালো ভাবত সবাই—আমাদের দাদু ভীষণ মর‍্যালিষ্ট ছিলেন বলেই ও রকম ভাবত! বলত, এমন সাধু-সজ্জনের ও-রকম অসৎ ভাইও হয়!"

"ন'দাদুকে অসৎ বল্‌ত সবাই ?" পানু অবাক হয়ে ভাবত।

'নিজেও নিজেকে তা-ই বলতেন ন'দাদু! আমাকে বলেছিলেন একদিন: 'দাদুভাই, আমি ভাবি কি জানো, ভাবি, মেয়েমানুষের জাত নেই; ভাবি কেন জানো, ওরা সবাই আমায় একই রকম ভালোবেসেছে, আমিও তা-ই! কিন্তু তুমি ও-কাজ করতে যেওনা—লোকে মন্দ বল্‌বে। আর সত্যি, কাজটা ভালোও নয়!' আমি বল্‌লাম: 'তাহলে আপনিও বা তা করতে গেলেন কেন?' ন'দাদুর মুখ থেকে হাসির আলো নিভে যেতে কোনোদিন কি তুই দেখে'ছিস্ পানু? দেখিসনি। কিন্তু আমি সেদিন দেখেছিলাম। তাতে ওঁর মুখের চেহারাটাই যেন বদলে গেল। একটা গল্প বলতে সুরু করলেন ন'দাদু—তোকে যে ধরণের গল্প শোনাতেন তেমন গল্প নয়। মানুষের গল্প—গল্প বলেই মানুষগুলোকে নকল মনে হয়েছিল কিন্তু ওরা আসল। শোন্ সে-গল্প:

উপাখ্যান

শিবনাথ ভট্চায সে-সময়কার একজন পণ্ডিত-ব্যক্তি ছিলেন। বেদান্ততীর্থ কিন্তু সব শাস্ত্রই তাঁর কণ্ঠে অবস্থিত। তাঁকে ছাড়া ও অঞ্চলের পণ্ডিত-সভা অন্ধকার হয়ে পড়ত। কী তাঁর খ্যাতি আর খাতির! হিন্দুশাস্ত্রকে আইনের ফ্রেমে যদি ইংরেজসরকার বেঁধে না দিতেন, তাহলে শিবনাথের অনেক বিধান শাস্ত্র বলে চলে যেতো।

কিন্তু এম্নি অদৃষ্ট, এহেন শিবনাথেব স্ত্রী হলেন পাগল। পাগল তিনি ছিলেন না, পাগল হয়েছিলেন। শিবনাথ অবশ্য আবিষ্কার করেছিলেন যে স্ত্রীর মাতুল-পক্ষে একটি দু'টি উন্মাদ আছে আর তা-ই তার স্ত্রীর ছন্নতার কারণ। এ আবিষ্কার তিনি সবার কাছেই বলতেন, কেননা সবাই বল্‌তঃ "এমন মহাপুরুষের ভাগ্যেও এ যন্ত্রণা লেখা ছিল!"

'সবাই' বলতে যে সমাজের ছবি পাওয়া যায়, তাতে পুরুষেরই ছিল একাধিপত্য। মেয়েরা গোনার মধ্যেই আসতনা। মনে হত বিদ্যাসাগর-মশাই ভস্মে ঘি ঢেলে গেছেন।

পুরুষ-পক্ষের অথবা সমাজের শ্রদ্ধা-ভক্তি ভুঞ্জন করে শিবনাথ পরম নিশ্চিন্তে কালযাপন করতেন। নিশ্চিন্ত ছিলেন, কেননা তাঁর পদস্থতা দুঃস্পৃশ্য। বৈদান্তিকরা ধনাগম তৃষ্ণা ছাড়তে পারেন কিন্তু মহাজন হবার তৃষ্ণা তাদের ছেড়ে যায় না। অন্তত শিবনাথের বেলায় তাই হতে দেখা গেছে। অত্যন্ত সযত্নে ও সন্তর্পণে তিনি তার আসনটা উঁচু করে তুলেছিলেন।

স্ত্রী-পক্ষ যে তাঁর কাছে ঘেসতেই পারতনা তা কখনো নয়। বিধান চাইতে নানা-বয়েসী বিধবারা আসত—শুভদিন বিচার করাবার স্পর্দ্ধাও কারো ছিল। ওসব অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারে উত্যক্ত হতে মোটেই তাঁর আপত্তি ছিলনা, কারণ তিনি জানতেন যে যতো দুর্ব্বলতাই তিনি দেখান, মেয়েরা তাঁকে ভয়ই করে আর পুরুষরা করে তাঁর সহিষ্ণুতার প্রশংসা। মেয়েরা ভয় পায়, পাছে তাঁর দুর্ব্বলতার কাহিনী বলতে গেলে পুরুষরা ফিরে তাদেরই কুৎসা-রটনা করে। করা খুবই স্বাভাবিক, যেহেতু যতোগুলো গুণবাচক

বিশেষ্য আছে তা দিয়েই তারা শিবনাথের গুণের তালিকা তৈরী করেছিল। এমন মহাপুরুষের নামে কলঙ্ক দেয় কার সাধ্য ?

কিন্তু শিবনাথ কলঙ্কিতই ছিলেন। তাঁর লোভের স্পর্শ বাঁচিয়ে কোনো আত্মীয়া বা পরিচিতা বাঁচতে পারেন নি। কিন্তু কে বিশ্বাস করবে এ-কথা ? মেয়েরা বিশ্বাস করত, তাঁর স্ত্রী বিশ্বাস করতেন—তাতে কি আসে যায় ? মুখ ফুটে বলবার সাহস কার আছে ? তেড়ে আসবে পুরুষ-পক্ষ : কী স্পর্দ্ধা ত্যাখো, নরকের দ্বার হয়ে স্বর্গ স্পর্শ করতে চায় !

স্ত্রীরা তাঁদের স্বামীকে কখনো মহাপুরুষ ভাবেন না, পুরুষই ভাবেন। শিবনাথের কু-অভ্যাসকে পুরুষোচিত ভেবেই তাঁর স্ত্রী প্রথম-প্রথম তা হজম করতে গিয়েছিলেন। ঈর্ষাপরায়ণতার যতো কুখ্যাতিই মেয়েদের থাকুক, তাদের প্রতি স্বামীর আসক্তি কমে না গেলে ঈর্ষার বাষ্পও তাদের মনে দেখা দেয়না। শিবনাথ স্ত্রীর প্রতি আসক্ত ছিলেন, কিন্তু যতোদিন স্ত্রীর দেহ-গৌরব ছিল ঠিক ততোদিন। কিন্তু তৃতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরই স্ত্রীর শরীর ভেঙ্গে পড়ে। আর শিবনাথও শরীর-সন্ধানে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। ফলে স্ত্রীর মনে ঈর্ষার সঞ্চার হতে সুরু করে এবং ধীরে ধীরে শিবনাথের পুরুষ মূর্ত্তিটি পশুর মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়।

বালবিধবা কুসুমমালাই সবচেয়ে বেশি প্রগল্ভতা দেখিয়েছিল (পুরুষের স্পর্শেই মেয়েরা প্রগল্ভা হয়ে ওঠে)—কোনো বাল্যসঙ্গিনীর কাছে কথা প্রসঙ্গে যখন সে ফিক্ করে হেসে উঠে বল্‌ছিল : "এতো বড়ো মান্য লোক, আমি আর কি করতে পারি বল্ !" অবশ্য মান্য লোককে অমান্য না করবার প্রগল্ভতা কাণাঘুষোর মতোই মেয়ে-মহলের গুমোট হাওয়ায় ভেসে বেড়াত, বাইরে আসবার স্পর্দ্ধা করতনা। তাতে শিবনাথের নৈতিক স্বাস্থ্য অটুটই রয়ে গেল, কিন্তু, যেহেতু তাঁর স্ত্রী মেয়ে-মহলেরই মানুষ এবং রুগ্না ও ঈর্ষা-পরায়ণা, তাঁর মানসিক স্বাস্থ্য ছত্রখান হয়ে গেল।

গল্পটির উপসংহার আছে। আর তা থেকে উপদেশ নির্দ্দেশও আহরণ করা যায়।

পরিশেষে খানিকটা অনুশোচনায় ভুগতে সুরু করেন শিবনাথ। তখন তাঁর স্ত্রী বদ্ধ-পাগল। সন্তানরা গৃহছাড়া। ভক্ত-সম্প্রদায় উদ্বিগ্ন হয়ে বলল : "যখন ঘুমিয়ে থাকেন, মত্ততায় উনি হয়ত একদিন আপনার গলাতেই কোপ

বলিয়ে দিতে পারেন ত।" শিবনাথ কথাটাকে হেসে উড়িয়ে দিতেননা, বলতেন: "দিক্।"

কে এই শিবনাথ? পানু ভাবতে সুরু করত। ভাবনারই কোনো কথা হেসে উঠত দাদার হাসির ভঙ্গীতে: "ন'দাদু বলতেন অবশ্যি তাঁদের পুর্ব্ব-পুরুষ কেউ—কে তা বলতেন না। আমি জানি, কে! ন'দাদুদেরই বাবা—মার দাদু।"

"বাঃ, সেত শিবকালী—মা বলেন!"

"তা-ই। গল্পে কখনো নাম ঠিক থাকে?"

"তুমি কি করে জানলে?"

"দাদু বলেছিলেন, শিবনাথের মনটা ভাগ ভাগ হয়ে গিয়েছিল ছেলেদের মধ্যে! তার কি মানে হয়? মানে, মার বাবা ছিলেন সত্যিকারের মর‍্যালিষ্ট কিন্তু ন'দাদু ত আর তা নয়। দু'ভাই দু'রকম!"

"মেয়েদের খুব ভালোবাসতেন ন'দাদু—না?"

"শিবনাথের মতো নয়—আরেক রকম। বলতেন, 'আমি তান্ত্রিক, আমার চোখে মেয়েরা সব দেবীর অংশ!' কি-রকম খোলাখুলি বলতেন ত্থাখ! কোনো পাপ ছিলনা মনে। শিবনাথের মতো মোটেও নয়! অথচ, মার বাবা ছিলেন এম্নি আশ্চর্য্য নীতিবাজ যে ছোট-ভাই-এর খোলামেলা মনটার দিকে কোনোদিন তাকাননি। ওঁর চরিত্রের দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকাতেন!"

"দু'ভাই এম্নি দু'রকম?" পানুর অন্ধকার মুখে আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়ত।

"দু'ভাই ত দু'রকমই হয়!"

বারো

পরীক্ষার শেষেও বাড়ি যাওয়া হয়নি দীপায়নের। বাবার একটা পোষ্টকার্ড এসেছিল, ছেলের ভবিষ্যৎ পড়াশুনোর কথাবার্ত্তায় ভরতি কিন্তু মাঝখানে ছোট্ট একটা বাক্য ছিল: 'এখানে এসোনা'। পান্নু যায়নি সত্যি কিন্তু না-যাওয়ার সুফল মোটেও ফলল না। দেবোপম চৌধুরীর ভাইকে ইলিশিয়াম রো না বাজিয়ে ছেড়ে দিতে পারে না। দীপায়ন চৌধুরীর ফাইলে কাঁড়ি কাঁড়ি কাগজপত্র জড়ো হয়নি কিন্তু মানুষটার উপর স্তূপ-স্তূপ সন্দেহ জড়ো হল। আর সে সন্দেহ সন্ত্রাসে পরিণত হ'ল যেহেতু বাংলাদেশ সন্ত্রাসবাদী হয়ে উঠেছে!

"তুমি জানো।"

কী জানে দীপায়ন ?

"তোমাদের ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে যারা খুন করেছে তাদের জানো তুমি।"

"আমি কি করে জানব ?"

"জানবে। খানিক পরেই জানবে!"

"আমাদের সহরের কেউ হলে চিনবনা এমন ত নয়!"

"তুমি যুগান্তর না অনুশীলন ?"

"তার মানে আপনারা আমায় একটা-না-একটা বলবেনই ?"

"দেবোপম চৌধুরী তোমার দাদা ?—যুগান্তর।"

"হতে পারেন।"

"এখানে চালাকি করে বাঁচতে পারবে না, তা জানো ?"

"আমার চালাকি দেখতে আপনারা আমায় ডেকে আনেন নি, জানি!"

"সূর্য্য সেনকে চেনো—তারকেশ্বর—"

"নামে চিনি।"

"শুধু নামে নয়। কতোক্ষণ আর লুকোবে—দেখ্‌ব!"

একঘণ্টা পর-পর একেকজন—বারবার একই প্রশ্ন। ক্লান্তিতে দীপায়নের মনে হচ্ছিল ও যেন দীপায়ন নয়, আর কেউ। এঁরা যাঁদের-যাঁদের

নাম উচ্চারণ করছেন তাঁদেরই মতো কেউ, কিন্তু অশরীরী। যেন এই অশরীরী সত্তা ঢাকায়, চাটগাঁয়, তাদের সহরে—সব জায়গাতেই ছিল, 'সন্ত্রাস-বাদী'দের আশে-পাশে—অথচ কিছুই সে বুঝতে পারেনি তখন, জানতে পারেনি, করতে পারেনি, শরীরী নয় বলেই! অদ্ভুত সেই লোকটা—যেন এখানেই এতোক্ষণ—এতোক্ষণ নয়, অনেকদিন—অপেক্ষা করে বসে ছিল—অপেক্ষা করছিল দীপায়ন এসে তার বিদেহী সত্তায় প্রবেশ করবে বলে। আরো আশ্চর্য্য যে দীপায়ন সত্যি আজ এসে তার ভেতর প্রবেশ করল আর প্রবেশ করে সে-ই সবটুকু দীপায়ন হয়ে গেল! কিন্তু এ-লোকটাও ত জানেনা এঁরা যা জানতে চান। এরা যদি তাকে হাজতে নিতে চান, বন্দী শিবিরে পাঠিয়ে দেন—টু-শব্দ না করে তা-ই করবে সে, কিন্তু বলতে পারবেনা তেমন-কিছু যা শুনে এঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

শেষ 'প্রশ্নকর্ত্তা দীপায়নের মুখে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। সহিষ্ণুতার দৃষ্টি। তারপর একটু হাসলেন। মোলায়েম হাসি, সেই পরিপার্শ্বিকে তাই আরো ভয়ঙ্কর।

"তোমাকে বিশ্বাস করলাম।" তিনি বললেন: "বিশ্বাস করতে চাই। আশা করছি, যদি কিছু জানতে পারো আমাদের কাছে এসে তা বলবে।"

অশরীরী দীপায়ন বলতে চাইল: "কিছুই আমি জানতে পারবনা, স্যর...", কিন্তু কথাগুলো শব্দ হয়ে বেরুল কি না তা সে বলতে পারবে না।

"আজ যাও। কিন্তু তোমাকে আমরা আশা করব। ভেবে দেখো।"

অনেকদিনই হয়ত আশা করেছিলেন তাঁরা, তারপর তার মেসে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন তাঁদের কেউ-কেউ। বন্ধু-বান্ধবেরও এতো খোঁজ-খবর করিনে আমরা। অনেকদিন এই আত্মীয়তা। অবশেষে ভুলে-যাওয়া। হয়ত উপেক্ষাই।

"উপেক্ষা এতো মধুরও হ'তে পারে!" দীপায়ন প্রায়ই বলত তখন: "আর এমন স্বাস্থ্যকর! ধীরে-ধীরে আমি আবার আমি হয়ে উঠতে লাগলাম! কলি নলের শরীর ছেড়ে চলে গেল! অনি, একেকটা ঘটনায় এসে আমরা কেমন নূতন হয়ে যাই—আরেক রকম হয়ে পড়ি দেখেছিস্!"

আর এ-কথাগুলোই পরে দর্শন হয়ে উঠেছিল দীপায়নের মুখে—বৌদ্ধ-দর্শন: "জীবন একটা বস্তু নয়—গতি-ভঙ্গী। গতিশীলতায় মানুষটাকে

একেকটি মুহূর্তে মাত্র ধরতে পারো তুমি—গতিশীল-বস্তুর একেকটি ষ্টীল ফটোগ্রাফ। একটি মাত্র ফটোগ্রাফ হাতে নিয়ে যদি বলো, এই আমি মানুষকে পেলাম, তার চাইতে মিথ্যা আর নেই। অজস্র ষ্টীল ফটোগ্রাফ—অজস্র ভঙ্গী জুড়েই একটা মানুষের সত্যিকারের চেহারা!"

১৯৪৫ ইং।

মনকে দীপশিখা বলেছেন গৌতমবুদ্ধ। চমৎকার উপমা।

একটি শাশ্বত শিখা নয়। দীপশিখা - ক্ষণে-ক্ষণে এক একটি শিখা—একটির উচ্ছেদ, আরেকটির প্রাদুর্ভাব।

প্রতিমুহূর্তে তুমি তোমার চেতনা-চিন্তা নিয়ে আলাদা মানুষ। আলাদা মানুষ কিন্তু অপর একটি মানুষের মতো ত নও— অনেকগুলো কিন্তু সবগুলো তুমি-ই, আর কেউ নয়—দীপায়ন চৌধুরী অনিরুদ্ধ ঘোষাল নয়।

অজস্র উচ্ছেদ আর প্রাদুর্ভাবের চাঞ্চল্যেও একটি শিখা একটি শিখা বলেই পরিচিত। হয়ে-যাওয়া নয়, হতে থাকা— তবু একটা কিছুরই হতে-থাকা। একটা সুরুরই গতি আর শেষ।

এ-সময়টাতেই দীপায়নের সঙ্গে ভবানীর পরিচয়। একই মেসের বাসিন্দে বলে নয়—বাসিন্দে ত কতোই ছিল কিন্তু একা ভবানীই যেন এসে দীপায়নের মুখোমুখি দাঁড়াল। তার মানে দীপায়ন মনে-মনে ভবানীর মতোই কাউকে খুঁজতে সুরু করেছিল—অশরীরী দীপায়ন শরীরী হতে চাচ্ছিল আবার। শরীরের দরকার ছিল তার। শরীর!

বিকেলবেলা রবীন্দ্রনাথ পড়ছিল দীপায়ন যেদিন প্রতিবেশী ভবানীর প্রথম এ-গৃহে প্রবেশ।

"পড়ছেন ?" রক্তমাংসের একটি মানুষ মসৃণ হাসিতে ঘরের আলোটাকে খণ্ড-খণ্ড স্ফটিকে ঝলমল করে তুলল।

"আসুন—" বই বন্ধ করে দীপায়নও হাসতে চাইল কিন্তু সে-হাসিতে বস্তু নেই। দীপায়নের নিজেরই মনে হল মুখটা হয়ত ওর ফাঁকা দেখাচ্ছে।

"কবিতা পড়ছেন ? ভালো!" ভবানীর কথার শেষে ঘরের সবটুকু হাওয়া অনেকক্ষণ ধরে হাততালি দিতে লাগল।

"পড়ছিলাম—বেরুতে ভালো লাগছে না—তাই।"

"একসময় আমিও পড়তাম—ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর পড়েছেন—বলদেব পালিত? রবীন্দ্রনাথ বড্ড বেশি উঁচু।"

"উঁচু কবিতা আপনার ভালো লাগেনা?" প্রশ্নটার আগে আর পরে লজ্জার উপর হোঁচট খেল দীপায়নের গলা।

"নাঃ—" হয়ত একটু থামল ভবানী অথবা একটা নিঃশ্বাস ফেল্‌ল: "কি জানেন, একবাটি দুধ—হয়ত টাটকা দুধই ছিল—টক দই হয়ে গেছে। কোনো দুধ ক্ষীর হয়—কোনোটা দই—কি করা যায় বলুন।"

সুন্দর শোনাল কথাগুলো—কেন যে সুন্দর শোনাল দীপায়ন বলতে পারবেনা, শুধু মনে হল এ-ধরনের কোনো কথা ওর মনেও ঘোরাফেরা করেছে কোনো-কোনো সময়।

"আমাকে ঠিক ধরতে পারছেন না, না?" ধরা দেবার পুর্ব্বাভাস দেখা দিল ভবানীর হাসিতে।

"তা কেন?" অন্তরঙ্গ হয়ে উঠ্‌তে চাইল দীপায়ন: "ল' পড়ছেন—শৌখীন মানুষ!"

"শৌখীন কি করে? শ্বশুরের টাকায় পড়ছিনে ত!"

"এ-দিনে উকীল হতে চাওয়াই ত শৌখীন ব্যাপার!"

"কিন্তু হতে চাইলেই কি হওয়া যায়! হতে চাই। হতে ত চাই আমরা কতো-কিছু কিন্তু হতে হই একটাই, যা না-হতে-চাইলেও হতাম!"

"তা-ই কি?" কালো-হয়ে-আসা ভবানীর একটা মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল দীপায়ন।

"তা-ই। নিজেরা আমরা একটাই হতে পারি, একটাই হই, অপরে ধরে-পড়ে আমাদের অনেক-কিছু বানিয়ে তুলতে চায় কিন্তু তা হয়না। পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে পড়তে সুরু করেছি ভাই, কেউ আর আটকাতে পারে? ঢালুতে গড়ান সুরু হল যেদিন বাবা-মার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে আমার ছেলেবয়সেরও মৃত্যু হল।"

হেঁয়ালির মতোই মনে হচ্ছিল ভবানীর কথাগুলো। তবু ভবানী হেঁয়ালি করবেনা ভেবেই ভুল করল দীপায়ন: "ছেলে বয়সেই আপনার বাবা-মা মারা গেছেন?"

চটুল শব্দে হেসে উঠ্‌ল ভবানী : "ছেলে বয়েসের সঙ্গে-সঙ্গে ত সবারই বাবা-বা মরে যান। তারপর মানুষ একা। নিজেরই সন্তান সে নিজে!"

দীপায়ন অপদস্থ না হবার চেষ্টা করল : "তা ত নিশ্চয়ই!"

"একা মানুষ কি আর করবে ?" ভবানী রূপকথা বলার ভঙ্গী নিয়ে এলো গলায় : "হয়ত কেউ পাহাড়ের গা-বেয়ে উপরে উঠতে চায়—কেউ নীচে গড়িয়ে যায়! উপরে ওঠার সুবিধে কিন্তু ঢের—তুমি উঁচুটা চোখে দেখতে পাও—জমিন মাপতে পারো। কিন্তু নীচে গড়িয়ে যাবার অসুবিধে কি জানো ? কতো নীচে—কতো অন্ধকারে যে তুমি নেমে যাচ্ছ কোনোদিন তা জানতে পারবে না।"

"যেদিন প্রথম গড়াতে সুরু করে সেদিনও না ?"

"গড়াতে সুরু করবার পর জানতে পারো। খাত তৈরী হয়ে গেছে মনে—তখন আর তাকে বুজিয়ে ফেলা যায় না—বৃষ্টি হলেই জল গড়াতে সুরু করবে সে-খাতে।"

"কেন তৈরী হবে খাত ?"

"খাত-গর্ত্ত-টিলা-পাহাড় এসব নিয়েই ত মানুষকে থাকতে হয়! কখন কোথায় যে জমি ধ্বসে গেছে তা কি আর জানবার উপায় আছে ? টক্ দই ফুলে-ফেঁপে যখন পচে যাচ্ছে তখন আমি জানতে পারছি যে একদিন আমি দুধ হয়েছিলাম! অবশ্যি মনে পড়ে তোমাদের মতো কাউকে দেখলেই!"

১৯৫০ ইং।

(ফরাসীর সবচেয়ে 'অশ্লীল' ও 'ইতর' সাহিত্য তৈরী করছেন যিনি, চোর এবং জেল-খাটা আসামী, Jean Genet বল্‌ছেন :......"the importance of any event in our life is only in the resonance it finds within us, only in the degree to which it makes us move towards asceticism.)

হয়ত ভবানীর জীবনে দীপায়ন সত্যি একটা বড়ো ঘটনাই হয়ে উঠেছিল—কিন্তু দীপায়নের জীবনে ভবানী তা নয়। স্বাস্থ্যকর হাওয়া, প্রোটিন ফুড, টনিক—এদের কি আমরা জীবনের একটা ঘটনা বলে মনে করি ? টনিক

বলেই হয়ত ভবানীকে সহ্য করতে পেরেছিল দীপায়ন, নইলে ভাবা যায়না বাসবের বন্ধু আর দেবোপম চৌধুরীর ভাই তখন এ-ধরনের সহিষ্ণু হতে পারে :

"তোমরা যাকে চরিত্রহীন বলো আমি ভাই, তা-ই। শরৎবাবুর 'চরিত্রহীন' নই, নির্জ্জলা চরিত্রহীন।"

আশ্চর্য্য, ভবানীর বাহাদুরিতে বিরক্ত হলনা দীপায়ন বরং করুণ হয়ে উঠল তার মুখ—খানিকটা সশ্রদ্ধই যেন।

"আমাদের কোন্ শাস্ত্রে আছে না সমাজ-ধ্বংসের একটি লক্ষণ : 'স্ত্রীত্বম্ এবোহপোভোগ হেতুঃ'—আমি তা-ই করে চল্‌ছি!"

"কে আর সমাজকে ধরে রাখছে বলুন" সান্ত্বনা আর সহানুভূতিই ছিল এবার দীপায়নের কণ্ঠে।

"রাখছে, ভাই রাখছে! আর কেউ না জানুক আমি ত জানি, সবাই যদি আমার মতো হত তাহলে নিহিলিজমের মাত্রা কোথায় গিয়ে পৌঁছুত! বেশির ভাগ লোক ভালো আছে বলেই ত গুটিকয় লোক আমরা মন্দ হ'তে পারি!"

"মন্দ হয়েছেন, যদি বুঝতেই পারেন তাহলে কেন আর মন্দ থাকা?"

"থাকতে হয়। বলেছিত না-চাইলেও থাকতে হবে! রোজই হয়ত ভালো হবার কল্পনা মাথায় আসে আবার রোজই তা ভেস্তে যায়—এম্নি হয় তাদের যারা চরিত্রহীন!" পকেট থেকে সিগারেট বার করে 'চরিত্রহীন' শব্দটা বলবার আগে ঠোঁটে গুঁজে দিয়েছিল ভবানী, তাই কথাটা অস্পষ্ট শোনাল আর কথাটা স্পষ্ট শোনালনা বলেই যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল দীপায়ন। কিন্তু দীপায়নের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের তোয়াক্কা না করেই ভবানী বলতে লাগল : "আমাদের তুমি বুঝবেনা ভাই—সিগারেটটা পর্য্যন্ত খাওনা এম্নি মর‍্যালিষ্ট তুমি!"

"মর‍্যালিষ্ট বলে নয়—খেলে মুখটা তেতো হয়ে যায়!"

"অইত বললাম - তুমি আলাদা ধরনের!"

প্রলোভন? উপেক্ষা করে আকর্ষণ জাগিয়ে তোলা? কিন্তু এ-ভুল করবার অবসর ভবানী দীপায়নকে দিলেনা : "মানুষ হওয়াটা-ও তেম্নি মানুষেরই ধর্ম্ম—মানুষই অমানুষ হয়। তুমি হয়ত মানুষ হওয়ার দলে পড়ে গেছ—আমি আরেক দলে! এ ভেবেই সান্ত্বনা পাওয়া—কি বলো?" চোখের বোঁজা ভঙ্গীতে অগাধ সান্ত্বনার ছবি ফুটিয়ে তুলল ভবানী।

কিন্তু এ-ছবি প্রলোভনের চেয়েও বেশি। কেউ যখন তোমার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে খুলে ধরে তখন তোমারও গ্রন্থিগুলো ধীরে ধীরে খুলতে সুরু করে। জলে লবণ গলে যায় কিন্তু জলও কি আর তখন জল থাকে? তখন তা লোণা জল। ভবানীতে গিয়ে মিশতে সুরু করল দীপায়ন। ভবানীর কদর্য্যতায় গা-মাখামাখি করতে লাগল খানিকক্ষণ। সদ্য যাকে খুন করা হল তার সত্তা যেমন সদ্য খুনীর দেহে-মনে বাঁচতে সুরু করে—এও ঠিক তেম্নি!

"মানুষ হওয়ার দলে!" হয়ত মন্ত্রের মতোই মনে-মনে উচ্চারণ করতে চেয়েছিল দীপায়ন কিন্তু ধ্বনিতে যখন তা ফুটে উঠল, ভবানী শুনতে পেল তাতে বিদ্রূপ মেশানো; ভবানীর মনে হল, নিজেকে দীপায়ন ভর্ৎসনা করতে চায়।

"অমানুষের দলে আসতে চেওনা, ভাই, পারবেনা, আর তাছাড়া অপরাধের ভোজবাজিতে জড়িয়েও বা স্বস্তি কোথায়? 'ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসিনে, আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে'—শ্রীধর কথকের কথাগুলোর মানে জানো? আমাদের স্বভাব নিয়ে বড্ড মুস্কিল!"

১৯৪৫ ইং।

কালকের কার্জ্জন-পার্ক আমার গা-ছুঁয়ে সমুদ্রের মতো ছড়িয়ে আছে।

ভবানী বল্‌ত: "অপরাধ আমাদের ফাঁদে ফেলে, দীপায়ন। অপরাধ করবার জন্যে যে-মুহূর্ত্তে তৈরী হ'ল আমার মন, সে-মুহূর্ত্তে আরেকটি মেয়ের অপরাধী মনও হয়ত তৈরী হতে সুরু করল। তৈরী হ'ল অপরাধের মাহেন্দ্র-ক্ষণ। তা ব্যর্থ হবে না। আমরা দু'জন মিলিত হবই। অপরাধী জীবনে অনেকবার তা-ই দেখলাম!"

কাল অপরাধী হয়ে উঠেছিল আমার মন—সেই অপরাধের অদ্ভুত রঙেই ভীষণ দেখাচ্ছিল চৌরঙ্গী।

পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েটের দু'বছর ভবানীই ছিল দীপায়নের সেইফটি ভাল্‌ব। ভবানী হয়ত দীপায়নকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইত। দীপায়ন চাইত নিজেকে পরীক্ষা করতে—ওর চরিত্রের সন্ন্যাস কতোটুকু গভীর, কতোটা দৃঢ় হয়ত তারই পরীক্ষায় জয়ী হতে। 'আগুন নিয়ে খেলা'...'রোগ-বীজাণু ঘাঁটা-ঘাঁটি' ...দীপায়নের সাহসকে তা-ই বলে ঠাট্টা করত ভবানী, দীপায়ন দেখত

ভবানীর হাসির পেছনে কি-রকম একটি বিষণ্ন মূর্ত্তি যে দাঁড়িয়ে আছে। কদর্য্য জীবনের উল্লাস ছাপিয়ে মাঝে-মাঝে সে-মূর্ত্তি দীপায়নের মনে আর্ত্তনাদ করে উঠত : "দ্যাখো দ্যাখো দীপায়ন, আমার সর্ব্বনাশ।"

চাপে আর তাপে মাটির ঢেলা পাথর হতে চেয়েছিল। নিজেকে নিয়ে এ-এক অদ্ভুত পরীক্ষা দীপায়নের। নেশা। নেশায় ডুবে না থেকে এসময়ে কি আর করতে পারতে তুমি? যখন দেউলি-হিজলী-বক্সায় তোমার ঠাঁই হলনা, তুমি যাদের চিনতে, তুমি যাদের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়াতে পারতে, হাসতে পারতে যাদের সঙ্গে তারা প্রায় সবাই সেখানে। তুমি এখানে একা—এখানে কলকাতায় অথবা তোমার মফঃস্বল শহরে। প্রতুল কোর্টে কেরাণী। মানিক গৌহাটিতে পালিয়েছে। সুরজিৎ ডেটিনিউ। কেউ নেই ওরা। যেন মৃত্যুই মুছে দিয়েছে ওদের—একই রকম সবাইকে—যেম্নি দেবুদাকে আর বাসবকে, তেম্নি। কিন্তু দীপায়ন আছে—অবাক হয়ে একদিন দেখতে পেল কলকাতার রাস্তায় ও হাঁটতে পারে, য়ুনিভার্সিটিতে যেন যেতে পাবে, ফিরে আসতে পারে হ্যারিসন-রোডের মেসে। কিন্তু শুধু তা-ই, আর কিছু নেই। ওর সবটুকু অতীত ভেঙে, ধ্বসে গেছে যেন কবে। রোগা আর হাল্কা হয়ে গেছে শরীর! রক্ত আর মাংসের মতো আবার জমিয়ে তুলতে হবে অতীত। চামচে করে বিন্দু-বিন্দু মুহূর্ত্তের মদ পান করতে হবে বহুদিন, তবে যদি আবার একটা ভিত গড়ে ওঠে।

দীপায়ন সত্যি ভাবত, সে আবার দাঁড়াতে শিখেছে।

১৯৪৯ ইং।

একেকসময় সাহিত্যে 'কামরাগো' (কথাটা বৌদ্ধশাস্ত্রের : মানে Lust of the flesh) প্রবল হয়ে ওঠে। ব্যর্থ বিপ্লবের শেষে নানাদেশে এমনি দেখা যায়। স্থিতাবস্থা প্রাচীন বাংলায় দুল্ল´ভ—সব সময় বিপ্লবের মহড়া চলেছে কিন্তু কোনোসময় একটি ব্যাপক বিপ্লবে জাতির দুর্দ্দান্ত আবেগ নিঃশেষ হবার সুযোগ পায়নি। রুদ্ধ কামনা যৌনতার পথ খুঁজে মরে। ফরাসী-বিপ্লব আংশিক বিপ্লব বলে ফরাসীতেও তা-ই। ১৯০৫-এর রুশ-বিপ্লব জারের হাতে মার খেয়ে রাশিয়াকে যৌনতায় তাতিয়ে তুলেছিল। অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতায় বাংলাদেশে ঠিক সে-রকম—ব্রিটিশের কাছে শেখা 'শীল' (বৌদ্ধশাস্ত্র

থেকে কথাটা Morality-র বাংলা হিসেবে গ্রহণ করা যায়) বর্জ্জন করে বাংলা সাহিত্য 'অশ্লীল' হয়ে উঠল সে-সময়।

যে-পথে হোক, কামনাবেগ মুক্তি খুঁজে নেবেই। যেম্নি জাতির জীবনে তেম্নি ব্যক্তির মনে।

আজ রাষ্ট্রনৈতিক নৈরাশ্য বাংলা দেশে—বাংলার তরুণ জীবনে ও সাহিত্যে আবার এই 'কামরাগো' প্রবল হয়ে উঠছে। আমি তাকে 'কামরোগ' বলিনে, কারণ তা অস্বাভাবিক নয়।

অল্প অল্প জ্বর, নেশার মতো জড়িয়ে রাখছিল শরীর। ভবানীর কথা শুনতে শুনতে এক-একবার দীপায়নের চোখ বুঁজে আসছিল। রাত্রির দিকে হয়ত জ্বরটা বাড়বে কিন্তু যতোক্ষণ তা না হচ্ছে ততোক্ষণ এ এক চমৎকার বিশ্রাম।

বিকেল। ভবানীও বেশিক্ষণ আর থাকবে না। চেয়ার ছেড়ে উঠে সে পায়চারি করছিল—এখন বেরিয়ে গেলেই হয়। ভবানীর গতির ছবিটা দীপায়নের বোঁজা-বোঁজা চোখের উপর আলো-ছায়ায় আঁকা হয়ে চলেছে: হ্যারিসন রোড –অ্যামহার্ষ্ট স্ট্রীট—একটা গলির মোড়ে পানের দোকান: খয়ের চূণের পেতলের ঘটিগুলো চিক্‌চিক্ করে উঠল –এক-প্যাকেট সিগারেট, একখিলি মিঠেপান?—গলির পেটে আরেকটা গলি, তার অন্ধকার মুখে কিল্‌বিল্ করছে কয়েকটি মেয়ের শরীর--হাসি---অন্ধ গলির অন্ধকার—পুরোনো ইঁটের ঘর—অন্ধকারেই হাত উঁচু করে দরজার তালা খোলা—সুইচ্ না ল্যাম্প?—উঁচু খাট, পুরু গদি দেয়ালে বস্ত্রহরণ, রাসলীলা ··

"নতুন আর অদ্ভুত অভিজ্ঞতার জন্যে অনেকসময় মানুষ ক্ষেপে ওঠে ·" ভবানী বলছিল: "যাদের অবস্থা এম্নি তাদের একদিন মানুষ খুন করতে হয়। অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মোহই তাকে খুনী করে তোলে। জানতে ইচ্ছে করে, মানুষ মারতে কেমন লাগে! আমারও ইচ্ছে করে একেকদিন!"

মৃতের মুখে যদি হাসির আভাস আবিষ্কার করা যায় তাহলে তা দেখতে অবিকল দীপায়নের ঠোঁটের রেখাগুলোর মতো হবে, মনে হল। "তোমার?" বললে দীপায়ন।

"যাদের বাঁকা মন তাদের সবারই করে। সাহিত্যিকদেরও নিশ্চয়ই

করে। অদ্ভুত অভিজ্ঞতারই ত ছবি আঁকতে চান তাঁরা! সহজ, সাধারণ অভিজ্ঞতার ছবিতে কি সাহিত্য হয়?"

হয়না? ভবানীকে নয়, নিজেকেই জিজ্ঞেস করছিল দীপায়ন। ইংরেজি-বাংলা গল্প-উপন্যাসের সারবন্দী শোভাযাত্রা দেখতে পাচ্ছিল ও চোখের উপর—সত্যি, খুব সহজ, সাধারণ অভিজ্ঞতার ছবি ত এরা নয়—ভবানী মিথ্যে বল্‌ছেনা, চরিত্রগুলোকে সত্যিকারের মানুষ বলে মনে হয় অথচ আসলে এমন মানুষ কেউ নেই—এমন মানুষ হয়নি কিন্তু হতে পারে। ভবানীও ত হতে পারল! ভবানীকে, না দেখলে মনে হত, ও শুধু উপন্যাসেই হয়—আমাদের চারপাশে তৈরী হয় না। দীপায়ন চোখ বুঁজে ভবানীকেই দেখতে লাগল—মনে হল এই ছায়া-ছায়া ভবানীই আসল ভবানী—উপন্যাসের মানুষ—কতকগুলো কথার ধ্বনিতে তৈরী একটি অতনু। কেমন অদ্ভুত মনে হয়, শুধু কথার ধ্বনিতে যে তৈরী হতে পারত সে সত্যিকারের মানুষ হয়ে গেল! চোখ মেললেই দীপায়ন দেখতে পারে ভবানীকে, নিঃশব্দে পায়চারি করে চলেছে। আবার এখানে, তার চোখের উপর হাল্কা ছায়া হয়ে চলাফেরা করছে! কোনটা আসল ভবানী? দু'টোই। ছায়া কি সত্যি নয়? মানুষ ছায়ার রাজ্যে চলাফেরা করেনা? সবই কি আলো? স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন দেখাতে হবে সব কিছু? আর না-দেখালেই মিথ্যে?

Be shelled, eyes, with double dark.

And find the uncreated light: দীপায়নের গলার ভেতর ধ্বনির ছায়া ঢেউ তুলতে সুরু করল: Uncreated light! Created light! Uncreated light..... ঢেউ উঠছে—কে তুলছে ঢেউ? ভবানী!

"সব তৈরী থাকবে এ কেমন কথা—এসো দীপায়ন, আমরা তৈরী করি কিছু......" ছায়া-ছড়ানো একটা *দৃশ্য* থেকে *অদৃশ্য* কেউ বলে উঠল। আরে ভবানী! তুমি?

"এ এক আলাদা জগৎ—মানুষেরই জগৎ—মানুষগুলো অন্যরকম বলে এ জগতের চেহারাটাও আলাদা!"

ভবানীর সঙ্গে হাঁটতে সুরু করেছে দীপায়ন।

"বাঃ, এরা কোত্থেকে এলো—এ-মেয়েরা?" ভবানীকে জিজ্ঞেস করছিল দীপায়ন কিন্তু উত্তর দিল মেয়েদের একজন: "জানোনা, আমি এখানেই থাকি?"

"তুমি? আর মেয়েরা?"

"কোথায় আর মেয়ে?"

সত্যি, কোথায় আর-সব? নেইত। দীপায়ন আর ময়না। আর কেউ নেই। মনে পড়ছে যেন প্রতুলের সঙ্গেই এখানে এসেছে সে। কিন্তু কোথায় গেল প্রতুল।

"ঘরে কেউ নেই।" ময়না হাসছে।

"কিন্তু ওই যে—বসে আছে!"

"ও চিঠি লিখছে!"

চিঠি-লিখুনি মেয়েটি ফিরে তাকাল। "আমি গান শিখছি!"

"গান? টেবিলে মুখ গুঁজে?"

"আমি গান শিখছি, তোমাকে তা-ই লিখছিলাম পানুদা!"

ঘুম ভেঙে গেল দীপায়নের। ঘুমিয়েছিল নাকি ও? এখনও তবে ঘুম। নইলে 'পানুদা'র সুরটা এখনও কানে লেগে আছে কি করে? দীপায়ন মাথা হেলিয়ে ভবানীকে খুঁজতে চাইল। ঘর অন্ধকার। আলো জ্বালায়নি ভবানী, হয়ত দীপায়নের চোখে লাগবে বলে। কিন্তু কোথায় ভবানী? নেইত! তবে ঘুমুচ্ছেই দীপায়ন। ও চোখ বুঁজল।

কিন্তু তক্ষুণি আবার চোখ মেলে দীপায়ন একটু হাসল। ঘুমের ভেতর কেউ আবার চোখ বোঁজে না কি?

"আমি গান শিখছি......" সকালের ডাকের একটা চিঠির কথা স্বপ্নে গিয়ে ঢুকল। কি অদ্ভুত!

আর চিঠিটাও কি অদ্ভুত নয়? তোতা লিখছে! তোতা চিঠি লিখছে! পানুদাকে চিঠি লিখে জানাচ্ছে তার গান-শেখার খবর! আটবছর আগেকার এইটুকু একটি মেয়ে! তোতা বলতে তা-ই জানে দীপায়ন। তোতার নামের সঙ্গে-সঙ্গে সে-মেয়েটিই দীপায়নের চোখের উপর এসে দাঁড়িয়েছিল সকাল-বেলা। তোতা অবশ্যি জানিয়েছিল তার নাম এখন তপতী, ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে, 'সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায়' ইস্কুলে ফার্স্ট হয়েছে—এম্নি-সব তার বড়ো হবার খবর। কিন্তু খবরগুলোতে দীপায়নের ত মন ছিলনা! ছিল কি? দীপায়ন দেখছিল: একটি ফ্রক-পরা খুকী বিকেলবেলা মাঝে-মাঝে বেড়াতে আসত তার দাদার সঙ্গে, সুরজিৎ বলত: "ও কিছুতেই ছাড়বেনা, বেড়াবেই আমার

সঙ্গে।" দীপায়ন হাসত: "তুমি বুঝি স্কিপিং জানোনা?" মাথা গুঁজতে চাইত তোতা, মুখ ঢেকে যেতো থোকা-থোকা চুলের আড়ালে। দীপায়নের মনের দেয়ালে, এক কোণে, ঝুলান ছিল এইত তোতার একটি ষ্টীল-ফটোগ্রাফ। পোষ্টকার্ডটা উল্টে-পাল্টে তখন এ-ছবি ছাড়া আর কোনো ছবি দেখতে পায়নি ও।

সমস্তদিন অল্প-অল্প জ্বরের তাপ বাড়ছিল—একটু-একটু করে তোতাও হয়ত দীপায়নের মনে বড় হয়ে উঠেছিল সমস্ত দিন। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি, কুড়িয়ে পাওয়া মন, অনুভব আর লাজুক ইচ্ছা। দীপায়নের মনে পড়েছিল কি রবীন্দ্রনাথ: "ওগো পঞ্চদশী তুমি পৌঁছিলে পূর্ণিমাতে"? মনে পড়েছিল: 'Bid adieu, adieu/Bid adieu to girlish days,/Happy Love is come to woo/Thee and woo thy girlish ways—'? তপতীকে দেখতে পেয়েছিল কি দীপায়ন, তোতাব ছবি ভেঙে ফেলে কেউ তপতী হতে চেয়েছিল কি?

জ্বর হয়ত আরো বাড়ছে এখন! কপালে হাত ঠেকিয়ে দীপায়ন বুঝতে চাইল ব্যাপারটা কি! এতোক্ষণ যা-যা ও ভেবে চলছিল তা হয়ত সবই বাইরে থেকে শোনা গেছে। প্রলাপ? ভবানী নেই ত ঠিক ঘরে?

আলো জ্বালবে বলেই উঠল দীপায়ন। আলোতে খাঁ-খাঁ করে উঠল বিছানা-বাক্স, টেবিল-চেয়াব। ভবানী সত্যি পালিয়েছে! ড্রআর টেনে তোতার কার্ডটা হাতে নিল ও! আলো জ্বালবে বলেই কি উঠেছিল দীপায়ন?

"বলো ত কে তোমায় চিঠি লিখছে পানুদা? বলতে পারবে না। আর যখন দেখবে আমি—তখন অবাক হয়ে যাবে······"

হঠাৎ পানুদাকে মনে পড়ল কেন তোতার? সুরজিৎ বক্সায়—তাই? দাদা খুঁজে নেওয়া? সহরে রাষ্ট্র: পানুকেও দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে—তাই কি পানুদার মন-খারাপ ভেবে নিয়ে বোনের অস্তিত্ব আর হৃদয় ঘোষণা? কী-রকম চট্ করে মেয়েরা বোন হয়ে যেতে জানে!

"···ওরা ফার্ষ্ট করেছেন বলে আমার লজ্জা করছে! এখনো আমি গান ভালো শিখতে পারিনি। তবে তুমি যখন আসবে তখন হয়ত খানিকটা শেখা হয়ে যাবে। শিখতে আমি চেষ্টা করব।······"

এখানে কার ঘোষণা? তপতীর। তোমাকে গান শোনাবে বলেই গান

শিখছে তপতী। 'তোমাকেই গান শোনাবে বলে…' তার নিজের কণ্ঠ নয়, একটি কণ্ঠও নয়, যেন অনেকগুলো কণ্ঠ চারদিক থেকে ঢেউ-এর মতো দীপায়নকে সুরের নাগপাশে জড়িয়ে ধরল।

দীপায়ন পালাল, তার মানে, ড্রআরে চিঠি রাখল, ড্রআর বন্ধ করল আর বিছানায় এসে আবার শুয়ে পড়ল। এ কী অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে ওর আজ? এতোদিন পর ময়না-ও বা এসে হাজির হল কি করে মনে? তোতা-র সঙ্গে ময়না নামটা জুড়ি হিসেবে চলে বলেই কি ময়না উঁকি দিয়ে গেল মনের উপর? না কি ময়না ছিলই কায়েম হয়ে সেখানে—তোতার ছায়া সেখানে পড়ল বলে নিজেকে সে আজ জানিয়ে দিয়ে গেল। তা-ই। ময়নাকে বাঁচিয়ে রেখেছে কে? ভুলে গেছি জেনেও যে আবার জানতে হয় ভুলিনি, তা কার জন্যে? ভবানী!

একটা বিশ্রী স্বাদে জিভ ভরে উঠল দীপায়নের। ভবানীর নাম উচ্চারণ করতে এমন আর লাগেনি ওর কোনোদিন। মনে হল এখন যদি ভবানী ওখানে বসে থাকত তাহলে ও—কি ছুঁড়ে মারত, কী? বালিসটাই ছুঁড়ে মারত ভবানীব মুখে। ভবানী হয়ত ভাবত জ্বর-বিকার! বিকার! মনের দুর্ব্বল চেহারাটা দেখতে পাওয়াই বুঝি বিকার? আর এ-চেহারা তুমি দেখতে পাচ্ছ কই, যদি শরীর তোমার অসুস্থই না হল!

আলোটা অসহ্য লাগছিল—চোখ বুঁজল দীপায়ন, উঠতে হয় বলে নিভিয়ে দিতে পারল না। কিন্তু আলোর চাইতেও অসহ্যভাবে ভবানী এসে ঘরে ঢুকল, পা-টিপে-টিপে। তুমি যখন চোখ বুঁজে সম্পূর্ণ সজাগ তখন কেউ পা-টিপে ঘরে ঢুকলে বা ফিস্‌-ফিস্‌ করে কথা বললে কি-রকম বিশ্রী লাগে, ভেবে দ্যাখো!

দীপায়নকে পুরোপুরি তাকাবার অবসরও দিলেনা ভবানী—কাৎ হয়ে পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলতে সুরু করল: "আমি ভাবলাম ঘুমিয়ে পড়েছ—জ্বর নিয়ে রাত আনটা অবধি কে জেগে থাকে? ঘুমোও—" পকেট থেকে একটা জিনের ছোট বোতল বেরিয়ে এলো ভবানীর হাতে, হাত থেকে দীপায়নের টেবিলের উপর গেল: "ভয় নেই, ওডর-লেস্‌! হরিবাসর যখন করতে হবে, ফ্রেণ্ডটিকে সংগ্রহ করে আনলাম!"

অত্যন্ত চটে যাবার কথা দীপায়নের, না-হয় হেসে ফেলার কথা। দীপায়ন হেসে ফেলল: "তোমাকে রাত জাগতে কে বলেছে?"

"কে আবার বলবে? রাতদুপুরে ঘুম ভেঙে শুকনো গলায় 'জল, জল' করতে থাকো—তখন জলটা কে দেবে শুনি?"

তেরো

দীপায়ন আজও বলে : "রেল-ষ্টেশনে, ষ্টীমার-ঘাটে বা এয়ার-পোর্টে কাউকে 'সি-অফ্' করতে যেতে নেই। সেখানে দুজনের মনেরই এমন একটা জোর-করা ছাড়াছাড়ি হয়, যা মৃত্যুর সামিল। একজন দাঁড়িয়ে রইল—একটা ঝড় এসে আরেকজনকে উড়িয়ে নিয়ে গেল! বিশ্রী লাগে। এয়ার-পোর্টের বাতিগুলো দেখলে ত আমার শ্মশানের বাতিগুলোর কথা মনে পড়ে!"

বলে, ভবানীর একটি ঘটনা ভুলতে পারেনি বলেই। পরীক্ষার পর শেয়ালদ' ষ্টেশনের একটি আবছা সকাল এখনও দীপায়নের চোখ আর গলা আবছা করে তোলে। ভবানী তাকে গাড়িতে তুলে দিতে এসেছিল। আগের রাত্রিটা তার আবারও এক বোতল 'জিন' নিয়ে বিনিদ্র কেটেছে। দীপায়ন বুঝতে পারছিল কেন ঘুমোয়নি ভবানী। পাছে সকলটা ফাঁকি দিয়ে পালায়! বুঝতে পারছিল বলেই 'কালকের রাত্রিটাকে' মনে ঠাঁই দিতে চাচ্ছিল না—মনে ওটা ঠাঁই পেলেই গলা ভারি হয়ে উঠতে চায়।

হ্যারিসন-রোড থেকে শিয়ালদ—রিক্সার এই পথটুকুতে ভবানী একটি কথাও বলেনি—গুন্‌গুন্ করে চণ্ডীদাস গাইছিল : "জনম অবধি পীরিতি বেয়াধি অন্তরে রহিল মোর..."। তারপর যথারীতি নিরুপায়ের মতো প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে চুপচাপ। কথা ফুরিয়ে গেছে বলেই, না-হয় এতো বেশি কথা মনে পড়ছে যে কোনো কথাই বলে শেস করা যাবেনা বলে চুপচাপ। কথার একটি-দুটি ফাঁকা বুদ্বুদ উঠছিল শুধু মাঝে-মাঝে।

"দেখা ত হচ্ছেই আবার—কি বলিস্—ক'মাস বাদেই ত আসছিস আবার?" ভ্যাণ্ডার, কুলী আর ঘড়িটার দিকে পরপর তাকাচ্ছিল ভবানী।

দেবতাদের মতো বরদান করবার ব্যাকুলতা দেখা গেল দীপায়নের : "ক'মাস আবার, পুজোর ছুটির পরই!" দীপায়ন ভবানীর মুখের দিকে তাকাতে পারছিলনা—জানালার ফ্রেমে থুতনি চেপে লাইনের নুড়িগুলো দেখছিল।

যে-মাটিতে ছ'বছর থেকে গেলে সে-ও কি এ-প্রতিশ্রুতি না পেয়ে তোমাকে ছেড়ে দেবে?

ভবানী সিগারেট ধরাল। খানিকটা ধুঁয়োর সঙ্গে হাসি উড়িয়ে বলতে গেল : "বলেছিলাম কি না বলত দীপায়ন—জবরদস্তিতে কেউ খারাপ হতে পারেনা! তুইও পারলিনে।"

"খারাপ মানে?" কোনো কথাতেই দীপায়নের মন ছিলনা।

খারাপের মানে বলতে হবে? ভবানী চুপচাপ সিগারেট টেনে চলল।

দীপায়ন মুখ তুলে ভবানীর দিকে এক পলক তাকাল—জানলা থেকে দু'পা পেছনে সরে গেছে ও। ট্রেন তৈরী। ডাকের খালি ঠেলাগুলো তুমুল শব্দে ঘরমুখো চলেছে।

"চলে যা—ভবানী—"

"কেন, ট্রেন ছাড়ুক না।"

"না, এক্ষুণি।"

"বাঃ রে..."

"আমার বিশ্রী লাগছে।"

"ট্রেন ছাড়বে ত এক্ষুণি।"

"তাই বিশ্রী লাগছে—তুই ওখানে দাঁড়িয়ে আছিস আর হুদ্দাড় করে ট্রেন আমাকে নিয়ে সরে যাচ্ছে—কি-রকম লাগে বল্‌ত!"

"ছেলেমানুস!" ভবানী এগিয়ে এসে জানলা ঘেঁষে দাঁড়াল : "জানি তোর খুব কম্‌ফোর্টেবল্‌ হবে " কামরার ভেতরে চোখ বুলিয়ে আনলে ও।

অসহ্য মনে হচ্ছিল দীপায়নের। এভাবে আর এক সেকেণ্ড থাকাও অসহ্য। একটা ব্যবধান তৈরী করে—কামরার বাইরে দীপায়নের যেতে মানা, ভবানীর কামরায় আসতে মানা—ব্যবধানের এ-প্রাচীর মেনে নিয়ে মুহূর্ত্ত গোনা অসহ্য! তার চাইতে এক্ষুণি ট্রেন ছেড়ে দিক। চোখ বুঁজে আছে দীপায়ন, চোখ মেলে তাকাতে গেলে যেন ভবানীকে আর দেখতে না পায়। তখন ও নিজেকে গুছিয়ে নেবে—অন্য হাজার চিন্তায় ডুবিয়ে দেবে মন—কিন্তু এখন যে এক বিচ্ছেদ-দৃশ্যের চিন্তা ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা নেই, কী অসহ্য এ-অবস্থা।

ট্রেন দুলে উঠল, জানলা ছেড়ে দিয়ে একটু হাসতে চাইল ভবানী। দীপায়ন সরে সরে যাচ্ছে বলে এক-পা' দু' পা হাঁটল ট্রেনের পাশাপাশি। তারপর দাঁড়িয়ে রইল।

এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের উপর দিয়ে যেতে হ'ল একসময় দীপায়নকে। সম্পূর্ণ

তাকিয়ে দেখল ও দৃশ্যটা। নিখুঁতভাবে দেখল। দেখবার আগেই যা ভয়—উদ্বেগ—অস্বস্তি। দেখবার সময়ই যা একটু কঠিন হয়ে থাকা। দেখবার পর আর তার কোনোটাই নেই।

ভবানী এখন ফিরে যাচ্ছে মেসে। গেট দিয়ে হয়ত বেরিয়ে গেল বাইরে। শেড ছেড়ে রাস্তায় এখন। কলকাতার রাস্তায়। রাস্তায়, মেসে, কলকাতায়! আবার কলকাতায় গেল ভবানী! "...সহরে যেতে মানা করেছেন..." কার কথা? কোনোদিন কেউ বলেছিল দীপায়নকে! কে বলেছিল? আলি—মনে পড়েছে—আলি! ভবানীকে কেউ মানা করেনি? তুমি? তুমি-ও কি মানা করেছ? বলেছ কোনোদিন: 'পালিয়ে আয় ভবানী কলকাতা থেকে'? তুমি পালিয়ে যাচ্ছ আজ! কিন্তু সঙ্গে করে নিয়ে এলেনা ত ভবানীকে!

সেদিনকার সেই শিয়ালদ-র একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত মনে করে রেখেছে দীপায়ন।

"ভবানীকে এতো ভালোবাসতিস্?"

"ভালোবাসাই হয়ত বলে তাকে!"

"আশ্চর্য্য!"

"কিচ্ছু আশ্চর্য্য নয়। জীবনের সম্পূর্ণ একটা নূতন দিক দেখিয়েছিল আমাকে ভবানী। এতো নূতন না হলে আমি কি আমাকে ভুলে থাকতে পারতাম দু'বছর?"

কিন্তু সত্যি কি দীপায়ন তখন নিজেকে ভুলতে পেরেছিল? তা-ই যদি হবে তাহলে ত ওকে আমরা ভবানীর চেহারাতেই দেখতে পেতাম।

"ওটা ভ্রমণ—দু'দিন ঘুরে আসা—হাওয়াবদলও নয়!"

"ভ্রমণেও ফুসফুসে হাওয়া যায়।" কয়েকটা অদৃশ্য ফোঁটায় দীপায়নের চোখ থেকে হাসি ঝরে পড়ত। তারপরই হঠাৎ মুখের আবহাওয়াটা পাল্টে যেতো: "ভবানীর সঙ্গে আর দেখা হয়নি আমার। তিনবছর পর কলকাতা গেলাম আবার—কি-করে আর দেখা হয়! হ্যারিসন-রোডের মেসটাও আর নেই তেমন!"

দেখা হলেও বা কি করত দীপায়ন? ভবানীকে নিয়ে ও কি করত?

"দেখা হয়নি বলেই হয়ত আজও ওকে এতো ভালো লাগে!" নিজে থেকেই দীপায়ন বলেছিল: "ভালো-লাগার চেহারাটা নেহাৎই সাদা—খারাপ

লাগার কালো পর্দ্দা পেছনে না থাক্‌লে ওর চেহারাই খোলে না। ইচ্ছে করে তাই খারাপ-লাগার এলাকায় পা বাড়াই আমি।"

"নিজের উপরই সব পরীক্ষা?"

"নিজেকে নিয়ে পরীক্ষা না করলে কি কেউ জানতে পারে মানুষ কি জিনিষ?"

কিন্তু এ-ধরণের সব কথাই অনেকদিন পরেকার দীপায়নের—যখন সে বুদ্ধিজীবী—আবেগের ঘোলা জল পরিস্রুত হয়ে যখন ও সূক্ষ্মস্বাদপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সূক্ষ্মস্বাদপ্রিয়দের মন পরমাণু-কেন্দ্রের একটি অদ্ভুত আচরণ শিখে নেয়। সেখানে যেমন ঋণাত্মক আর ধনাত্মক বিদ্যুতে জায়গা-বদল হচ্ছে তেম্নি দীপায়নের মনেও তখন ভালোবাসা আর ঘৃণা মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে স্থান-পরিবর্ত্তন করত। এ-মুহূর্ত্তে ও যাকে ঘৃণা করছে, পরমুহূর্ত্তেই হয়ত তাকে ভালোলাগতে সুরু করল ওর, আবার ভালোলাগাটা তার পরের মুহূর্ত্তেই ভীষণ খারাপ-লাগাতে বদলে গেল।

অবশ্য এ-অবস্থাটা আকস্মিক নয়। কিশোর পানু আর তরুণ দীপায়নই ধীরে-ধীরে তৈরী করে তুলেছিল তেমন দীপায়নকে। ওদের মনেও ঠিক এম্নি পূর্ণিমা-অমাবস্যা ছিল তবে তাদের যাওয়া-আসা এতো দ্রুত নয়। আবেগের গাঢ়, ঘোলা স্রোত ভেঙে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছুতে তখন সময় লাগত—কয়েকবছর।

একবছর পর—কলকাতার জীবন ছেড়ে এসে দীপায়ন ভবানীকে মনে করতেই শিউরে উঠ্‌ত।

"তখন হয়ত ভবানীর সঙ্গে পথে দেখা হলে আমি কথাই বলতামনা—" দীপায়ন বলে: "আমি যে এমন হ'তে পারি হয়ত শেফালির, বীণাদির আর তোতার বিধাতাপুরুষ তা জানতেন।"

কিন্তু এ-বিধাতাপুরুষের খবর জীবনের হিসেব-নিকেশ নিতে না বসলে জানবার কথা নয়। বস্তুটি প্রৌঢ় মনের আবিষ্কার। কিন্তু তরুণ দীপায়ন তখন ভবানীকে ছেড়ে আসাতেই ব্যথা পেয়েছে, তোতাকে পেয়ে ভাবতে পেরেছে আবার নিজের হৃদয় ফিরে পেলো ও।

"পানু এসেছে, তোতা—"

"পানুদা?—" ঘর থেকে উঠোনে ছুটে এলো তোতা। কাকে দেখতে?

সবসময়কার পান্নুদা—তার দাদার বন্ধু—এ-সহরেরই একটি ছেলে—জানাশোনা—তাকেই দেখতে কি হাসির আলোতে এমন আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল তোতার মুখ?

প্রথম আগন্তুক দীপায়ন। তোতার জীবনে, ওর নিজেরও নূতন জীবনে।

"বাড়ি আসতে বুঝি তোমার ইচ্ছে করেনা, পান্নুদা—?"

সত্যি ইচ্ছে করেনা। কিন্তু তোতাকে তা বলে কি লাভ?

"বছরে দু'বার ত মাত্র! তা-ও আসতে ইচ্ছে করেনা!"

ইচ্ছে করে। কিন্তু দীপায়ন কি এ-মুহূর্ত্তের আগে জানত যে ইচ্ছে করে?

"তোমাকে আর চিঠি দেবনা—কোনোদিন না!"

"বারে—চিঠির উত্তর ত আমি দিয়েছি!"

"উত্তর দিয়েছ। চিঠি দাওনি।"

কী বলবে দীপায়ন? এখন কি বলা যায়—কোনো বাক্যে—কোনো গলার ভঙ্গীতে—কোনো ইঙ্গিতে—দীপায়ন যে ভালবাসতে পারে তোতাকে? কি-করে বলা যায় আর কি করেই বা জানে দীপায়ন তোতা ওকে সত্যি ভালবাসে কি না?

তারপর। ভবানী ছায়া হয়ে পেছনে সরে গেছে যখন। যখন প্রাচীন পাপের ছায়া আর নেই।

"আমাদের কলেজে তুমি মাষ্টারি নাও না, পান্নুদা—" তোতা বল্‌ছিল।

"মাষ্টারি?"

"কেন? কি হয়?"

"মাষ্টারি ধরলেই মুরুব্বি বনে যেতে হয়না?"

'ব্রতচারী'র একটা ভঙ্গী নিয়ে পারিজাত এসে বাড়িতে ঢুকল—ছোট-ভাই। ভঙ্গীতে ভঙ্গ দিয়ে তক্ষুণি সে ছুটে পালাত—কে জানে পান্নুদা চুপচাপ বারান্দায় বসে আছে?—দীপায়ন তাকে ডাকল। সঙ্কোচ—পারিজাত পালাচ্ছে বলেই দীপায়নের সঙ্কোচ। এম্নিতেই যথেষ্ট নিরিবিলি পাওয়া যায় তোতাকে—অপরের চোখে-লাগে-মতো আর নিরিবিলি তৈরী করা কেন? মা যখন আসেন—দু'চার কথার পর সেই একই অনুরোধ—তোতার জন্যে একটি ভাল ছেলে যদি পান্নু দেখে দেয়। মার অগাধ বিশ্বাস, নিশ্চয়ই

পান্নু তা করবে, ওকে গরজটা ঠিক-ঠিক বোঝাতে পারলেই হয়।—ভালো ছেলেদের নিয়ে এই ত মস্ত সুবিধে। মার নিশ্চিন্ততায় সঙ্কোচ আরো ভীড় করে আসে দীপায়নের মনে।

[যেখানে সবার ধারণা তুমি নিষ্পাপ সেখানে মনে পাপ নিয়ে তোমাকে বসে থাকতে হচ্ছে। এ-পাপ তোমার স্নায়ুকে পীড়িত করতে পারত কিন্তু রক্ষা যে যার জন্যে এ পাপ সে তোমার পাপের ভাগী হতে চায়। মার অনুরোধে তোতা হেসে গড়িয়ে পড়ত : "মা যখন এতো করে বল্‌ছেন—দাও না পান্নুদা —তোমার পরিচিত একটি ছেলে এনে—মার এই পরম রূপবতী মেয়েকে যে বিয়ে করবে!" মা চলে গেলে দীপায়ন বলত : "আমার পরিচিত ছেলে আমি ছাড়া আর কাউকে ত দেখ্‌ছিনে!"]

পরিজাত এসে দাঁড়াল, দীপায়নেরই কাছে, কিন্তু অন্যদিকে তাকিয়ে।

"তোতা কি বল্‌ছে জানো, পুরু,"—দীপায়ন খবর তৈরী করতে লেগে গেল : "আমাকে বল্‌ছে মাষ্টার হতে। রাইবেঁশে নেচে মাষ্টাররা আজকাল কেমন হয়রাণি হচ্ছে বলো ত!"

"আপনিও ওকে একটা স্বদেশী গান গাইতে বলুন—দেখবেন ওর দশা!" পরিজাত পিঠটান দিলে। পান্নুদাকে মান্য করতে হয় বলেই কি ওঁর সামনে ও পাঁচ সেকেণ্ডের বেশী দাঁড়াতে পারে না?

"তার মানে?" হাসিমাখা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল দীপায়ন তোতাকে।

"কতো সব কথা বলে ও—" তোতাকে খানিকটা রাঙা দেখাল : "স্বদেশীর সময় প্রভাতফেরী গাইতাম—তারপর দাদাকে নিয়ে হৈ-চৈ - আমাকেও কতো সব প্রশ্ন—প্রাভতফেরীতে কে যেতে বলেছিল, গান শিখিয়েছিল কে—এইসব! তারপর থেকে স্বদেশী গান আর গাইনে! ওটাই আমার একটা বড় আক্কেল দ্যাখে পুরু!"

কথা শেষ হয়ে গেল তোতার তবু যেন দীপায়ন কথা শুনতে লাগল। তোতার স্বর? না কি তার নিজের কোনো স্বর? 'আমাদের সহরের কেউ হলে চিনবনা এমন ত নয়'। তোতাকেও কি তা-ই বলতে হয়েছিল?

"তুমি প্রভাতফেরীতে যেতে?" যে-আলো মুছে গেছে তারই একটা স্মৃতি খুঁজে ফিরছিল দীপায়নের চোখ।

"অনেক মেয়েই যেতো তখন—আমিও যেতাম! ছোট ছিলাম কি না!"

"এখন বুঝি বড়ো হয়েছো ?"

"বাঃ, হইনি—কতো বড়ো হয়ে গেছি !"

দীপায়ন হাসতে চাইল। একটি খুকীর মনের ইতিহাসে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে দীপায়ন। প্রাণপনে ও বড়ো হতে চায় কেন ? কি পাবে ও বড়ো হলে ? ফ্রক ছেড়ে একটি শাড়ি। শাড়ি একটা ঘোষণাময় অস্তিত্ব। আমি তপতী হলাম ! তোতা তপতী হল—একটি নাম যার রূপ আছে আর তাই মানে আছে। আমাকে জানতে না ত কেউ, দেখেও দেখতে পেতে না, এখন দেখতে পাচ্ছো। ইচ্ছে হচ্ছে দেখতে। দেখতে পাচ্ছ না, পানুদা ?

"কী ?"—একটু থামল তোতা : "বড়ো হইনি ?"

"হয়েছ। গান শুনলে তা আরো বেশি মনে হয় !"

"তুমি মিছিমিছি আমার গান ভালো বলো।"

"যাঁরা তোমাকে রেকর্ড করতে বলেন, তাঁরাও তবে মিছিমিছিই বলেন !"

"রেকর্ড করতে পারাই কি ভালো গান শেখা ? আমি শিখতে চাই।"

"ওস্তাদরা কি বলেন জানো ত—দাঁত কাঁচা থাকতে কেউ বলতে পারে না, আমি গান শিখেছি !"

"বেশ ত তা-ই না-হয় হবে !"

"সর্ব্বনাশ ! চুল পেকে গেলেও গান গাইবে না কি ?" দীপায়নের উঁচু হাসিতে আতঙ্কের চেহারা ফুটে উঠল। সেই 'কামিনী ফুলে'র গান মনে পড়ল যেন।

তোতা অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলে, নীচু গলায় অথচ স্পষ্ট উচ্চারণে বল্‌লে : "তোমার ভালো লাগবে না ?"

হাসি থামিয়ে দীপায়ন ওর ব্যথিত মুখে ফিরে এলো—অনায়াসে ও ফিরে আসতে পারে মুখের যে-চেহারায়। তোতাও তেম্নি তাকিয়ে রইল দীপায়নের মুখে। মুখোমুখি দু'টি জলভরা মেঘ—ব্যথার বিদ্যুৎ আনাগোনা করছে। একের হৃদয় থেকে অপরের হৃদয়ে ! সমান জল-আগুন-হাওয়া-চাই। জলের কণা জমতে হবে—বৃষ্টি চাই—ঠাণ্ডা নবধারা জল—গলে যাওয়া—দুই মেঘের জল এক হয়ে যাওয়া।

মা জানতেন না কিন্তু বৌদি জানতেন এতো বড়ো তোতার খবর।

"তোতাকে বিয়ে করবে, ঠাকুরপো ?"

"কেন ?"

"কেন আবার !" বৌদি প্রায় প্রিয়ম্বদা-অনুসূয়া অভিনয় সুরু করতেন : "এতোই যখন ভালো লাগছে তোতাকে তোমার—এর চাইতে ভালো মেয়ে আর পাবে কোথায় ?"

"মার কাছে তুমি বলেছ না কি এসব ?"

"ছি—" জিভ কেটে গম্ভীর হয়ে যেতেন বৌদি : "তোমার কাছে শুনে আমারও ভালো লাগছিল—তাই বললাম !"

"কাউকে ভালো লাগলেই বিয়ে করতে হবে ?"

"মেয়েদের ত তোমার কখনো ভালোলাগত না—" আবারও চোখে-মুখে হাসির ঝিলিক দেখা যেতো বৌদির : "আমাদের কপালগুণে তবু এখন ভালো লাগছে !"

"একসময় ভালো লাগতনা বলে কি সবসময় ভালো লাগবেনা ?" ময়নাকে মনে পড়ে একটা অস্বস্তি ফুটে উঠতে চাইত দীপায়নের মুখে আর তা এড়িয়ে যেতে হবে বলে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত ও।

"না, সত্যি—আমি বলছি—তোতাকে বিয়ে কর !"

"জাত দিয়ে বিয়ে করতে বলছ ?" এবার দীপায়ন হেসে উঠ্ত।

"তুমি আবার জাত মানো না কি ?"

"তোমরা ত মানো ! ওসব কথায় তোমাদের পাপ হয়, তা জানো ?"

"পাপ ত কতোই হচ্ছে, না-হয় তোমার জন্যে আরেকটু হ'ল !"

"বেশ, হোক। কিন্তু আমাকে উদ্ধার করতে পারবেনা !"

আরেক সময় ভূমিকা-বদল হত। নিজেকে কেমন-যেন শুদ্ধ, শুভ্র মনে হত দীপায়নের—যখন অনুভব করত তপতীর একটি গাঢ় নিঃশব্দ স্রোত বয়ে চলেছে ওর ভেতর। খানিকক্ষণ চুপ করে তা বহন করে যাও, তারপর তোমার ভাষা ফুটবে। তোমাকে উপছে গড়িয়ে পড়বে তপতীর ফোঁটা-ফোঁটা জল : টুপটাপ।

"জানো বৌদি, তোতা চমৎকার মেয়ে !"

"চমৎকার নয় কে ?" মুখে আঁচল গুঁজে বৌদি হাসতে সুরু করতেন। হয়ত বীণাদিকেই তাঁর মনে পড়ত।

"সবাই কি আর ভালো হতে পারে—কতো খারাপও আছে। হয়ত উপরে-উপরে খুবই সুন্দর কিন্তু ভেতরে আর তা নয়। পুরুষ-মানুষ সরল কিনা তাই ঠকে যায়।"

"বাবা, তুমি এতো-ও ভাবতে সুরু করেছ আজকাল ?"

"তুমি কি ভাবলে আমি নূতন ভাবছি!"

"তা-ইত! তোতা-ই তোমাকে ভাবিয়ে তুলছে ভাবছিলাম আর মনে-মনে চটে যাচ্ছিলাম মেয়েটার উপর।"

"তোতাই আবার ভাবাচ্ছে হয়ত!'

"তুমি গেছ ঠাকুরপো, শীগগীর বিয়ে করে ফ্যালো!"

"চমৎকার প্রেস্‌ক্রিপশ্যন্। তোতা আমাকে বিয়ে করতে যাবে কেন বলতে পারো ?"

"তা-ত' বলিনি—বিয়ে করতে শুধু বল্‌ছি—তোতা ছাড়া কি আর মেয়ে নেই ভুভারতে ? বিয়ের কথা বললেই তোতার কথা মনে পড়ে কেন তোমার ?"

"বিয়ের ব্যাপারে তোমার বুদ্ধিটা খুব খোলে—না বৌদি ?" দীপায়ন শান্তি-প্রতিষ্ঠা করতে চাইল।

"জীবনে আর ত কিছু হয়নি, বিয়ে-ছাড়া, কি করব বলো!" তখনও হাসলেন বৌদি কিন্তু দীপায়নের মনে হল এ-হাসির পেছনে যেন একটা কান্নার ছবি এসে দাঁড়িয়েছে। একটি মেয়ের ছবি। বেহুলা। বাসর ঘরেই তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। এখন সে স্বামীর শবের পাশে রাত্রিদিন।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে দীপায়ন হয়ত এ-ধরনরেই একটা কথা বলেছিল: একটি ছেলে আর একটি মেয়ে ধরো যদি ভালোই বাস্‌ল—একদিনও যদি ভালোবাসল—তাহলে একে অপরকে ব্যথা দেয় কি করে ?

রবীন্দ্রজন্মবার্ষিকীর একটি সভায় দীপায়নের অভিভাষণ:

স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে আমরা বারবার স্মরণ করি। কিন্তু কোনোদিন কি একবারও ভেবে দেখেছি, আমরা যে কতোটুকু সৃষ্টিছাড়া ? সংযোগের শিক্ষা আমরা ভুলে গেছি, শুধু জানি বিয়োগ। আমরা আলাদাই করতে জানি—

আলাদা করে হাততালি দিয়ে বলি: ওরা বিরোধাত্মক। আলাদা চেহারার দু'টি বস্তু যদি চিরকাল আলাদা থাকতেই বাধ্য হয় তাহলে সৃষ্টি কথাটার কোনো মানে থাকেনা। ভ্রষ্টতা মানে প্রলয়। শ্রেণীদ্বন্দ্ব মানে প্রলয়—সৃষ্টি নয়।

শ্রেণীদ্বন্দ্বেরও আগে আরেকটি দ্বন্দ্বের ঘর করে দিয়েছি আমরা। একটি সনাতন দ্বন্দ্ব। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধটা আর মধুর হলনা কোনোদিন মানুষের সভ্যতায়। পুরুষ যেদিন ঘরে বাঁধা পড়তে চায়নি সেদিন নারীর কাছ থেকে অনেক ব্যথাই সে পেয়েছে—সেদিন দুপক্ষই ছিল নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তায় সজাগ। কিন্তু যেদিন তারা ঘর বাঁধল, রাজি হ'ল বন্ধনে সে-দিনটিমাত্র হয়ত মধুর ছিল কিন্তু তারপর আর তা নয়। ধীরে-ধীরে কর্তৃত্বের চাবুক হাতে নিল পুরুষ, সুরু হল নারীর ব্যথার পালা। বহু শতক এ-পালা চলেছে, আমাদের পুরোনা ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলোতে নারীর চোখের জলের দাগই দেখতে পাব। আজ—এই বিশ শতকে নারী চোখ মুছে দাঁড়িয়েছে—তার দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে মাধুর্য্য নেই, সহিষ্ণুতা নেই, শুধু বিদ্রোহ। বিদ্রোহকে অবৈধ বলছিনে আমি—আমি দেখছি আমরা সৃষ্টিছাড়া। ভাবছি, মানুষ সৃষ্টিছাড়া হয়ে বাঁচতে পারে কি না।……

১৯৪৫ ইং।

তোতাকে মনে পড়ল।

আমি দেখছি যখনই আমার মন অপরাধের গলিঘুঁজি দিয়ে চলতে সুরু করে—অপরাধের অভিজ্ঞতায় যতোই তাব প্রতিভা খুলে যায়, ততোই তা এগিয়ে আসতে থাকে একটি শুভ্রতার দিকে। মনে পড়ে যায়, শুভ্রতার শরীরের আঁকা-বাঁকা সূক্ষ্ম রেখাগুলো।

সেদিনের চৌরঙ্গীর সন্ধ্যার পর ক'দিন শুধু তোতাই কথা বলেছে আমার মনে। আশ্চর্য্য, কি করে যে এমন হয় জানিনে।

বস্তুকে নিয়েই তোমার আবেগ যাত্রা সুরু করে। কিন্তু তার রূপ এম্নি অগাধ, এম্নি বিশাল যে বস্তুর সীমায় কিছুতেই আর বদ্ধ থাকতে চায় না। নদীর মতো দুই তীরের পাহারায় শান্ত স্রোতে বয়ে যেতে চায় না চায় সমুদ্র হতে। চায় আকাশ হতে—যে আকাশ মেঘের রাজ্য ছাড়িয়ে চলে গেছে চিত্রা-বিশাখা-স্বাতী-শতভিষায়, তারপরও হাজার হাজার তরুণ নীহারিকায়—আদি অন্ধকারে।

আজ তোতা আর বস্তু নয় শুধু একটি নাম। নামের বিশালতায় অপরূপ, অরূপ। মৃত্যু তাকে ছড়িয়ে দিয়েছে মহাশূন্যে।

"তোমাকে যদি না পেতাম" একদিন বলেছিলাম তোতাকে : "আমার যে কী হতো জানিনে! হয়ত আমি নষ্ট হয়ে যেতাম।"

"তুমি নষ্ট হতে পারোনা।"

"তবু কি জান, আজ মনে হয়, তখন নষ্ট হয়ে যেতে পারতাম আমি।"

তোতার ঠোঁটে সেই অদ্ভুত রেডিঅম-রেখা ফুটে উঠল যার জন্যে ওকে আমি 'মোনালিসা' নামে ডাকতাম।—"যে ভাবতে পারে আমি খারাপ হয়ে যাব সে কি কোনোদিন খারাপ হয়।"

"যদি তুমি জানতে আমি সত্যি খারাপ, তাহলে..."

"তাহলে তোমাকে আর ভালোবাসতামনা—তা-ই কি মনে হয় তোমার ?"

"ভালোবাসতে ?" প্রশ্নটা কর্কটের আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে গুটিয়ে গেল।

কিন্তু মোনালিসা প্রশ্নের একটা সুরই কানে তুলে নিল : "খারাপ হয়ে দ্যাখো!"

"এখন ?" ব্যথিত হাসির আভায় নিষ্পাপ দেখাচ্ছিল হয়ত আমাকে।

"তোমাকে আমি কি আজই ভালোবাসি, ভাবছ ? তুমি হয়ত মাত্র কদিন আগে আমায় জানলে কিন্তু আমিও কি তা-ই জেনেছি ?"

"অনেকদিন আগে জানলেও কি আমি তা বলতে পারতাম ?"

"আমি বলতে পারতাম। দাদার সঙ্গে যখন বেড়াতে যেতাম, আমার কি মনে হত জানো ? ভাবতাম আমি যখন বড়ো হব পানুদার কাছে চলে যাব। যদি তখন আমায় জিজ্ঞেস করতে, তা-ই বলতাম আমি!"

"তা-ই এলে!" তোতার তৃপ্তি আমারই বুক ভরে তুলল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম—মনে হল, লক্ষ-লক্ষ যুগ বুঝি এম্নি তাকিয়ে আছি আমরা—বললাম : "বিদ্যাপতি গাইবে লিসা, 'লাখ লাখ যুগ' ?"

"গান এখন নয়। এখন শুধু তুমি। যখন আমরা আরো অনেকের সঙ্গে—তখন গান..." একটু থামল তোতা। ওর দেওয়া নামে আমাকে ডাকবে বলেই হয়ত থামলে : "আমার বুক ভরে তোমাকে পাবার জন্যেই তখন গান—জানো, মাইকেল ?"

"তুমি আমাকে মাইকেলই ডাক্‌বে ?"

"হু"—আদুরে গলায় বল্‌লে তোতা, তাকালেও আদুরে চোখে।

"সত্যি হয়ত আমি মাইকেলেরই মতো—বড্ড ইমোশ্যন্যাল—"

"তুমি এতো চঞ্চল—আমার ভয় হয়—"

"পূর্ণিমার সমুদ্র দেখেছে তোতা? পূর্ণিমাতেই তা ভীষণ অস্থির—আর কখনও তেম্নি নয়!"

"আমার ভয় হয় আর ইচ্ছে হয় তোমাকে—জড়িয়ে ঢেকে রাখি। আর কেউ যেন দেখতে না পায় তোমাকে—শুধু আমার বুকে ঢেউ লাগুক।"

তোতা আর কিছু বলেনি। আমি দেখছিল'ম পঞ্চতপা গৌরীর ঠোঁট কাঁপছে—চোখ মেলে তাকিয়েছেন শিব তাই। শিব তাকালেন। অস্থির হল তাঁর চোখের পাতা। ঠোঁটে স্পন্দন। হাত বাড়ালেন। গৌরী শিবের কোলে!

তোমার প্রতিজ্ঞা ত তোমাকে ভাঙতে হয়নি, তোতা—কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা? তাকে কোথায় ফেলে গেলে তুমি? আমার মনে, না, ধূলোয়? মন আমার রাখতে পারবে তাকে ঢেকে? বলো, পারবে? আমি চাই রাখতে, সত্যি বলছি, তোতা, তুমি যেম্নি জড়িয়ে ঢেকে রাখতে চেয়েছিলে আমাকে, তেম্নি চাই আমি, সত্যি চাই।

আমাকে ঢেকে রাখো! তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে—বলেছিলে। ঢেকে রাখো আমায়। আমায় জানতে দাও, তুমি আছো।

'Man's vices ..contain the proof...of his thirst for the infinite'—BAUDELAIRE.

"তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণম্"—ভাগবত।

চোদ্দ

দীপায়ন এ সময়টাতেই কবিতা লিখতে সুরু করে। আর বিখ্যাত একটি সাহিত্য-পত্রিকায় তা ছাপা হয়ে বেরয়।

তোমার চেতনা যখন নিটোল হয়ে গড়ে উঠ্‌ল, তার মানে, যখন তুমি নিজ সত্তার একটা মোটামুটি ধারণা করে নিতে পারছ্‌—নামহীন হয়ে মানুষের ভীড়ে হারিয়ে যেতে চাওনা আর—আলাদা করে নিতে পারো নিজেকে—বুঝতে পারো আলাদা করে যে নিতে পারছ্‌—তখন, সে অবস্থায়, কী নিঃসঙ্গ তুমি! নিঃসঙ্গ অথচ তোমার একটা জগৎ আছে, যা এ জগতের মতো নয়। আর তখনই তুমি কবি হতে পারো। দীপায়ন বলে এ-কথা।

দীপায়নের সে জগতে বাইরের মানুষ হিসেবে একমাত্র তপতীরই ঠাঁই ছিল। তপতী, তোতা নয়। তোতার বিশুদ্ধ কোনো সত্তা—দীপায়নের চেতনায় তৈরী। তন্বী, শ্যামা তোতা সেখানে স্বচ্ছ, শুভ্র তপতী।

"তোমার মনকে যদি গানের সুর করে নিলে, আমার মনকেও কবিতার রূপ দেব আমি"—হয়ত মনে মনে তা-ই বলেছিল দীপায়ন।

"কবিতা আমি বুঝিনে, কেন বুঝিনে পানুদা?" সূর্য্যমুখী তাকাতে চাইতে সূর্য্যের দিকে।

"বুঝবে কোনোদিন।"

"তা জানি!" বিকেলের ছায়া অন্য এক আকাশের আলোতে যেন ঝলমল করে উঠত।

"যখন তুমি আর আমি থাকব..." একটা চমৎকার ভবিষ্যতের দিকে হাত বাড়াত দীপায়ন, যেন একপাত্র আনন্দ পান করতে।

"তখন আমি সব কথাই বুঝতে পারব জানি..." তপতী সে ভবিষ্যতে ডুবে যেত।

আশ্চর্য্য, তপতীও যে পারত নিজেকে দীপায়নের সেই অদ্ভুত জগতে নিয়ে যেতে! কিন্তু দীপায়ন ভাবত কবিতার মতো তপতীকেও ও সৃষ্টি করছে—ওর এক-একটি উদ্দীপ্ত মুহূর্ত্তে তপতী একেক রঙে আলোকিত।

দীপায়নকে আসতে হয়েছিল একদিন তপতীর কাছে—সেই বিজয়িনীকে পরাজিত করতেই কি এখন চায় সে? না কি আত্মরক্ষা?

১৯৪৫ ইং

প্রেমকে অপরাধ বলে মনে কবি বলেই তাতে আমাদের এমন উল্লাস। আমি মনে করতাম তোতাকে ভালোবাসা আমার অপরাধ, তোতাও তেম্নি ভাবত। আর সে মুহূর্ত্তগুলোই ছিল আমাদের সবচেয়ে আনন্দের। একটি নিঃশঙ্ক সন্ধ্যা তৈরী করবার জন্যে একদিন মার কাছে মিথ্যে বলতে হয়েছিল তোতাব—মিথ্যের অপরাধ করতে পারল বলে খুসীতে রাঙা হয়ে উঠেছিল ওর মুখ।

"পানুদা বল্ছেন, মা, বৌদি আমায় ডেকেছেন!"

"সন্ধ্যে হয়ে গেল, এখন?"

"বাঃ, সন্ধ্যে হলেইত সিনেমা!"

"ও, ছবিতে যাবেন বৌমা? বেশত—যা—"

রাস্তায় এসে বল্লাম: "বৌদির সঙ্গে যদি মাসীমার দেখা হয়ে যায় কোনোদিন?"

"বৌদিকে এটুকু আর বলে রাখতে পারবে না?" মুক্তিতে যুক্তিতে মুখর হয়ে উঠেছিল তোতা।

মনে পড়ে ষ্টেশনের রাস্তা ধরেছিলাম আমরা। নির্জ্জন বলে নয়, ষ্টেশনের রাস্তা বলেই হয়ত। রেললাইন, ট্রেন আর আমরা দু'জন। সব মিলে কি হ'তে পারে? আমরা পালিয়ে যেতে পারি—তিন ঘণ্টায় ষাট মাইল, সহরটা পেছনে ছুঁড়ে দিয়ে ষাট মাইল দূরে! পালিয়ে গেল ওরা?—জান্তাম এমন যে হবে, আগেই জানতাম—মাসীমা বলবেন চোখ মুছতে-মুছতে। বৌদি মুচকি হাসবেন মনে-মনে। এম্নি কোনো ছবি আঁকবার জন্যেই হয়ত দুজনেই রাজি হয়েছিলাম ষ্টেশনের রাস্তায়। ইস্কুল-পালানো অপরাধের আনন্দই খুঁজে ফিরছিল সেদিন আমাদের মন।

ভীড় পেরিয়ে নির্জ্জনতায় এসে আমরাও চুপ করে গেলাম। খানিকক্ষণ চুপচাপ হেঁটে যাবার দরকার ছিল। মুক্তির মুখরতায় আমরা হারিয়ে যেতে সুরু করেছিলাম। কেউ-কাউকে দেখিনি, শুনিনি এতোক্ষণ—মাসীমা-বৌদি-সিনেমাই বলেছি, চোখের উপর তাঁদের ছবিই ধরে রেখেছি—যেন অঢেল সময় আমাদের হাতে আছে, ঘরোয়া আলাপে ডুবে থাকলেও সময় ফুরোবেনা যেন!

লেভেল-ক্রসিং ছাড়িয়ে দশ-বিশ গজ মাত্র আর সহর—শেষ ইলেক্ট্রিক পোষ্ট, ডাক বাংলোর ঝাউগাছের সারি—সামনে সীমান্তের বাতি। আলিদের গাঁ খানিকটা গেলেই।

পাশেপাশে তোতা হেঁটে আসছে—চুপচাপ—পায়ে-পায়ে শরীর হারিয়ে আসছে যেন ও—শুধু একটা গন্ধ—ওর চুলের গন্ধ—দেহের গন্ধ—আমাকে জড়িয়ে আছে তপতী—আমার কবিতার তপতী। তিলফুল নাসা।

"এখন তোমায় যেমন মনে হচ্ছে আমার—" প্রসারিত রাত্রিকেই যেন সম্বোধন করল আমার মন: "কবিতায় তোমাকে ঠিক তেম্নি পাই আমি—জানো?"

"আমাকে?" মুগ্ধ কণ্ঠ।

"তোমাকে। সত্যি তুমি কিন্তু সবসময়কার 'তুমি'র চাইতে অনেক আলাদা!"

"আমাকে নিয়ে তোমার কবিতা!"

"সে-তুমি এ-পৃথিবী ছাড়িয়ে, সময় হারিয়ে কতো জায়গায় আছো—হয়ত শকুন্তলা হয়ে, হয়ত জুলেখা, হয়ত ডিডো—এম্নি আরো কতো—হয়ত অন্য কোনো গ্রহে, যেখানকার রাত্রিতে আরো বেশি, আরো সবুজ, আরো গাঢ় জ্যোৎস্না—আমরা হেঁটে চলেছি সে জ্যোৎস্নার ভেতর—আমরা অন্যরকম—অথচ ঠিক আমরা।"

"সত্যি যদি তা ই হত?" আমার দেহে নিবিড় হয়ে এলো তোতা।

হত কিন্তু হলনা। তোতাকে অনুভব করলাম। ওর উষ্ণতাকে। নিবিড় নরম নিঃশ্বাসকে। আলাদা হয়ে রইলনা আর ও। যেন প্রবেশ-পথ খুঁজতে চাইল আমার গা ছুঁয়ে। একটি নম্রতা, একটি শুভ্রতা পাশাপাশি থাকতে পারলনা—আমি আর তোতা মিশতে গিয়ে বস্তু হয়ে গেলাম।

"আমরা পালিয়ে এসেছি তোতা—সহরের শেষ সীমায়-" তোতার মুখের দিকে তাকালাম।

"আরো ত যাওয়া যায়—ওই গাঁয়ের রাস্তায়!"

"ডাকবাংলোতে চলো—কেউ নেই ওখানে, দেখছ?" আমাকেই দেখছিল তোতা, চোখভরে দেখে নিচ্ছিল, আমিও তোতাকে দেখছিলাম—যেম্নি রাত্রিতে হঠাৎ-ওঠা চাঁদ—বর্ষার আকাশ—চৈত্রের হাওয়া মেয়েদের ত্বাখে: "রাত্রিটা আমরা ডাকবাংলোতে থাকতে পারিনে?"

"চলো।" সমর্পণ।

ডাক-বাংলোর পুকুরের ঘাটলায় বসে আছি আমরা।

"আমার স্বপ্ন এতো সত্য কি-করে হ'ল, পানুদা?"

"তুমিও বা কি করে আমার স্বপ্ন তৈরী করলে?"

"জানিনে।"

"আমি জানি। স্বপ্ন আমরা আকাশ থেকে পেড়ে আনিনে, এখানকার ধূলো-বালি দিয়েই গড়ে নিই। এখানকারই ধূলো-বালি, তবু যখন তারা স্বপ্ন হয়ে গেল তখন আর এখানকার নয়।" নিজেকে বাঁচাতে প্রাণপণ চেষ্টা চলছিল আমার। কিন্তু আমার শরীরও ত আমি! বীণাদির গন্ধে ভরে উঠল আমার নিশ্বাস বীণাদির নিশ্বাস জড়িয়ে ধরল আমায়!

"সত্যি বলো, আমায় ফেলে তুমি কোনোদিন চলে যাবেনা, বলো পানুদা—তাহলে কিন্তু কিছুই আমার আর থাকবেনা!"

তাকে নিয়ে কি করতে পারো তুমি, যে এতো অসহায়? বুকে ঢেকে রাখতে ইচ্ছে করেনা পাখীর ছানার মতো ওর নরম বুক? কিন্তু তুমি কি তা পাবো? তুমিও কি অসহায় নও ওম্নি? তুমিও কি চাওনা কেউ ঢেকে রাখুক তোমায়? সে-'কেউ' স্বপ্ন নয়, আর তা যখন নয়—কারো নরম হাত, নরম বুক, নরম চুল ঢেকে রাখুক তোমায় তা-ই কি চাওনা তুমি?

"স্বপ্নকে যদি কেউ ফেলে চলে যায়—তা হলে তারও বা কি থাকে?" লতার মতো, সাপের মতো তোতা জড়িয়ে ধরছে আমায়, বুঝতে পার'ছিলাম—আমিই দিচ্ছি জড়িয়ে ধরতে: "আমার মা হারিয়ে গেছেন—ছোট বেলায়—জানো? অবাক হচ্ছ? সত্যি হারিয়েছেন—আমি যাকে পেলামনা সে-ই ত হারাল! দাদাই পেতে পারতেন মাকে কিন্তু দাদা তা চাননি—আমি চেয়েছিলাম কিন্তু পাইনি! কিন্তু চাওয়াটা কি আমার ফুরিয়ে গেল? না। আমি চাইতে লাগলাম আর মা হারাতেই লাগলেন! ব্যথা মানুষকে নিঃসঙ্গ করে বাইরে ফেলে দেয়। ছেলেবেলা থেকেই আমি একা। একা থাকার ব্যথা বয়ে বেড়াচ্ছি। বইতে চাইনে, তবু বইতে হচ্ছে!"

কথাগুলো ছোট-ছোট টুকরোয় ছড়িয়ে পড়ছিল। আর মনে হচ্ছিল সে মুহূর্ত্তেই যেন আমি প্রথম কথা বলতে শিখলাম।

ব্যথা দিতে পারো মেয়েদের? তেম্নি কোনো ব্যথা যার ছায়া লুকিয়ে থাকে তাদের চোখের পাতায়, চোখের তারায়, চোখের নিবেদনে? যে-ব্যথা তাদেরই, তুমি শুধু হাতে তুলে মাখিয়ে দিচ্ছ তাদের হৃদয়ে। পারো দিতে তেমন ব্যথা? দেখবে অদ্ভুত হয়ে গেছে তারা তারপর। তখন তারা আর তোমার পাশে অন্য কেউ হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, দেখবে যেন তোমারই বিস্মৃত কোনো অনুভূতি, কোনো কামনা, কোনো স্বপ্ন ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে তোমার চোখের উপর। সে-মুহূর্ত্তে তোমরা এক হয়ে গেছ। সৃষ্টির মুহূর্ত্তে এসে দাঁড়িয়েছ।

হৃদপিণ্ডের স্পন্দনই ফুলের ছোঁওয়ার মতো, আবেগের মূর্ত্তিই জ্যোৎস্নার স্ফটিকের মতো সেদিন আমার ঠোঁটে গলে পড়ছিল। আমরা কি ভাবছিলাম না কোনো মৃদু আগুনে যেন গলে যাই—যেন মুছে যাই তারপর—যেন তারপর আমাদের আমি আর তুমি কেউ বেঁচে না থাকে? ভাবছিলাম!

"পানুদা—আ—আ"

"তোতা—তোতা · তোতা · ·· "কতোবার, মনে নেই।

We have lingered in the chambers of the sea

মনে নেই কখন যে তোতা বলিদ্বীপের কোনো তরুণীর মতো, ভুবনেশ্বরের দেবনটীর মূর্ত্তির মতো রাত্রির গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। আমার শরীরের ছোঁওয়ায় তোতার শরীরকে আমি পেয়েছি। তোতা আর আমি—আলাদা আলাদা দু'টো মেঘ, বিদ্যুতের ছোঁওয়ায় চকিত, স্ফুরিত। আবার দু'জন আমরা।

দু'জন—তা-ই ভালো! আমরা আলাদা, তা-ই ভালো! উল্লাসে, মুক্তির আহ্লাদে কেউ যেন চেঁচিয়ে উঠেছিল আমার ভেতর। কিন্তু তোতা বুঝি চেয়েছিল আমাদের শরীর কোনো চিহ্নে এক হয়ে যাক্!

তাকিয়ে দেখছিলাম তোতাকে, তোতার সেই চাওয়াকে।

মনে হ'ল আমার, কেউ মনে করিয়ে দিলে, যেন আমি একগাদা মাংস আগলে বসে আছি! শেষে মনে-হওয়াটা বমির মতো পাকাতে সুরু করল গলার শিরায়। শ্বাস বন্ধ হয়ে এলো।

"রাত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তোতা—" অনেক কষ্টে, দুর্ব্বল গলায় বলতে পারলাম।

"রাত?"

"সিনেমা ভাঙেনি অবশ্যি। কিন্তু পারিজাত ত জানতে পারে আমরা যে সিনেমায় যাইনি।" বেঁচে উঠলাম।

"ও।" তোতা ফিরতে চাইল। তোতা হয়ে উঠতে চাইল আবার। "তাহলে চলো।"

আমরা দাঁড়ালাম। দু'জন। আজ দশবছর পর সেদিনের আমাকে স্পষ্ট, স্বচ্ছ দেখতে পাচ্ছি। সেদিনও আমি আমাকে নিয়ে একা-ই পালিয়ে এসেছিলাম।

শেফালি যদি পানুর চোখে একদিন দীপায়নকে দেখতে পেয়ে থাকে তাহলে দীপায়নের চোখে কি তোতা তেম্নি দীপায়নকে দেখতে পায়নি? তোমার রক্তের রঙ ওদের রক্তে রঙ ফলায়। তুমি ঢাকতে পারোনা তোমার ভবিষ্যতকে—ওদের চোখ থেকে ঢেকে রাখতে পারোনা।

"আমি জানি, তুমি আমাকে চাওনা, পানুদা!" দীপায়ন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলে বলত তোতা।

দীপায়নের ইদ্ হাহাকার করে উঠত: "কেন মিছিমিছি আমায় ব্যথা দিতে চাও?"

কিন্তু ইদের নীচেও বুঝি, মনের আরো অতলে, আরেকটি ছায়া-মূর্ত্তি আছে—যা থেকে আমাদের নিখুঁত ইন্দ্রিয় জন্ম নেয়। ইদের আর্ত্তনাদে তখন সে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। হাসিটা কি দিগন্তের মেঘের ধ্বনির মতো শুনতে পায়নি দীপায়ন? একবারও কি ও ভাবেনি, সত্যি তা-ই, সত্যি তা-ই! কেন চাইব আমি তোমার এ স্থূল শরীর—কি পাব আমি এ-শরীর থেকে—সবাই যা দিতে পারে তা-ই ত দেবে তুমি?—একই রকম!—তাহলে তোমাকে কেন—তোমাকে কেন চাইলাম—তুমিও যদি আর সবারই মতো, তাহলে তুমি কেন! ভীড়ে মিশে গিয়ে তুমিও, তোতা, ভীড়ের ছোঁয়াচ এনে দিতে চাও আমাদের শুভ্র, নিঃসঙ্গতায়! কথাগুলোকে স্পষ্ট ধরতে পারেনি দীপায়ন—কিন্তু ওর চেতনা তার স্বাদ অনুভব করছিল, অন্তত কয়েক মুহূর্ত্ত।

১৯৪৫ ইং।

'Women have hitherto been treated by men like birds which losing their way, have come down among them from an elevation'—*Neitzsche*.

পথহারা আকাশের পাখী ! আজও ওদের তা-ই মনে হয় আমার। সুপর্ণাকে আরো বেশি। ঠিক সুপর্ণার মতোই কি হত তোতা ?

তা কি হয় ? দশ বছর আগে সুপর্ণাও হয়ত তোতাই হত— সুপর্ণা হতনা।

আজ আট বছর তোতা নেই। আজ তোতা সেই পাখী যে তার হারানো পথ খুঁজে পেয়েছে। আমার আকাশ থেকে মুছে গেছে তার পাখার রোদ—সে আজ শুধু একটা নাম ! আমার কবিতায় তাকে যেম্নি চেয়েছিলাম তেম্নি সে আজ ! কিন্তু আমার চাওয়া কি কবিতার চাওয়ার মতো ! কবিতাই কি আমার জীবন ?

আজ আমি আর কবিতা লিখিনে। কবি-সত্তাকে ত ভোগ করেছি—তার স্মৃতিই থাক—অভিজ্ঞতা। তার কাছে জীবন নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারে না। জীবন তার স্থূলতা হারাতে পারেনা চিরদিনের জন্যে। জীবকোষ, প্রোটোপ্লাজম, প্রোটিন বড্ড মৎস্যগন্ধ ! আদি জীবকোষের জন্ম মাটির ভাণ্ডে—মৃত-কণার স্তরে, স্তরের ছাঁচে। কবিতা মহাবিশ্বের রূপ-অরূপের ঝিলিমিলি—আর জীবন এই মাটির পৃথিবীর শিল্প !

তোতা আজ সত্যি কবিতা, কিন্তু আমি আর কবি নই।

আর তোতা যেদিন জীবন ছিল, আমি ছিলাম কবি !

সত্যি, কাউকে আমি নিতে পারিনে। তুমি কেন এলে, পানি ? দু'হাতে আমি নিজেকে জড়িয়ে আছি—আজ যেমন নিয়ে আছি শৈশব, কৈশোর যৌবনকে, তেম্নি শিশু পানু তার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার যৌবন আর প্রৌঢ়ত্বকে ! আমাকেই চেয়েছি আমি, হয়ত আমাকেই পাব। তুমি আরেকটি আমাকেই আমার হাতে তুলে দিয়ে যাবে জানি—তুমি তা জানোনা, পানি ! শেফালি জানতনা, বীণাদি জানত না তোতা তা জানতনা। হয়ত ময়না জানত। তাই সে আমার হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল এমন একটি আমাকে যাকে দেখলে আমি শিউরে উঠি। কিন্তু তোমরা তা পারো না—আমাকে সাজিয়ে দাও, সুরভিত, উজ্জ্বল করে দাও তোমরা। তোমরা আকাশ হারাও, আমি তোমাদের আকাশ পাই।

তোতার নাম শুনে আজ চমকে উঠেছিল সুপর্ণা। চেনেনা ও তোতাকে।

আর আমিও এম্নি বলেছিলাম তোতার নাম যেন তোতা বলে কাউকে কোনোদিন চিনতাম মাত্র। চেনার ভস্মাবশেষ নামের ওইটুকু ধ্বনি ! আশ্চর্য্য,

উচ্চারণ করতে পারলাম আমি তোতার নাম, একটা সহজ কথার মতো! একটু বাষ্প জমলনা কোথাও!

কিন্তু মনে কি পড়ে, দীপায়ন, সে-রাত্রির কথা?

তুমি জানতে পেরেছিলে কি-করে, সেদিনই যে তোতার শেষ রাত্রি? কেউ জানায়নি তোমায়—তিন শ' মাইল দূরে 'ক্যালকাটা হোম'-এর একটি ঘরে বসেই ত জানতে পেরেছিলে তুমি! দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে কেন কেঁদে লুটিয়ে পড়েছিলে বিছানায়? বাবার বাধার কথা মনে পড়েছিল বলে? বাধা ত তিনি দেননি! কী আর এমন বলেছিলেন তিনি!

"একটু হেঁট হতে হবে আমাকে—আমার বন্ধুবান্ধব সবই ত সেকেলে—তাছাড়া শহরটাও বা কি!"

"কিন্তু তুমি মত দাও ত?" পান্নুই কথা বল্ছিল বাবার সঙ্গে, দীপায়ন নয়।

বাবা পান্নুকেই দেখছিলেন, মুখ ফিরিয়ে নিলেন একটু; "তোতাকে ত আমি দেখিনি—তোমার মা দেখেছেন।"

"মা দেখে কি করবেন—মা ত বামুনের মেয়ে।"

সেই চমৎকার হাসি বাবার, বাবাদের মুখে যেমন হাসি থাকে: "আমিও ত বামুনের ছেলে।"

মার ভার নিয়েছিলেন বৌদি। ভার না নেন তেমন সাধ্য ছিলনা তাঁর।

"আমার পৈতে নেই, জানো বৌদি? কেন নেই, তা জানো? আমি বাঙালী, বামুন নই। বামুন হলে ঠাকুরই হতে হয় বাঙালী হওয়া চলেনা। বাঙালী আলাদা জাত—বামুন নয়। বামুন হয়ে আর্য্যামি চলে, বাঙালিয়ানা-না। নিজেকে যদি বাঙালী বলো—আর তুমি ত খাঁটি বাঙালী, নইলে এমন বড়ো চোখ আর পুরু ঠোঁট হয়না—বাঙালীই যখন তুমি, তখন আর বামুন খ্যাতিটা নিওনা।" জাতিতত্ত্বের গবেষণা শুনিয়ে বৌদিকে অভিভূত করেছিল দীপায়ন।

দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ওঠেনি কোথাও। তবুও স্বস্তি ছিলনা। সহজ, সমতল থাক দীপায়নের চারদিক—তোতার দিকও, যেন এখানে এসে বাধা না পায়। বাধা তৈরী করতে চাইবেন তোতার বাবা আর মা, কিন্তু তা যখন টিঁকবেনা—বাধা তৈরী করাতে আসবেন এখানে। তার আগে এখানকার আকাশ নির্মেঘ, নদী নিস্তরঙ্গ করা চাই।

বিশ্বাস করতে পারছিলনা দীপায়ন কিছু, বাবার হাসিকে নয়, বৌদির আন্তরিকতাকে নয়—এমন কি হয়ত তোতাকেও নয়।

"তুমি অপেক্ষা করতে পারোনা, পানুদা—আমি ত পারি, আরো অনেকদিন পারি।"

কি করে পারে তা তোতা? আমি কেন পারিনে?

কেন পারতেনা জানো, দীপায়ন,—এতো বেশি পেতে সুরু করেছিলে তুমি তোতাকে যে মাঝে-মাঝে মন রুখে দাঁড়াত তোমার। না চাওয়া-ই তোমাকে না-পাওয়ার ভয় দেখাত। সে ভয়ই তোমাকে আর অপেক্ষা করতে দেয়নি।

বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে তুমিই আবার বিশ্বাস তৈরী করতে চেয়েছিলে বিচ্ছেদের একটি দৃশ্য তৈরী করে। তাই কলকাতায় এসেছিলে। তাই। চাকরি করতে নয়। বাবা আর মা হাবাক তাঁদের পানুকে—পানুদাকে খুঁজে না পাক তোতা।—ভাবতে ভালো লাগত তোমার!

তোমায় খুঁজে ফিরছে তোতা—সে রাত্রিতে, ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ার জীবাণুর মুখে শেষ-বিন্দু রক্ত দান করতেও, তোমাকে খুঁজতেই হাত বাড়িয়েছিল সে মার হাতের উপর—মৃত্যুর ছায়ার উপর তোমার জ্বরের ছায়াই দেখতে পেয়েছিল তার চোখ। তুমি না জানলেও তোমার মন তা জানত। তাই সেদিন সন্ধ্যায় টিউশনিতে যেতে পারোনি—তাই রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে কান্নার সমুদ্র উথলে উঠেছিল তোমার বুকে—তুমি কাঁদতে পেরেছিলে।

তার পরেকার দিনগুলো, পাঁচটা বছর, তোমার আর কী ছিল, দীপায়ন? যা ছিল তাকে কি জীবন বলতে পারো, তোমার জীবন? ছিল তোমার কবিতা? ছিল কি মন? প্রতি মুহূর্ত্তে মনে কি হতনা যেন একটি শবদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছ—তোতার শব, তাই তোমারও শব! মৃত্যু-সমর্পিত! তা-ই ছিলে তুমি! অদেহী, নির্ম্মনা!

ভুলে গেছ। স্মৃতি-পূজা বিস্মৃত হয়েছ কি আজ! নিরবয়বের অনুভূতি যে তোমার শ্বাসরোধ করে দিত, রুদ্ধকণ্ঠে যে বারবার বলে উঠতে: 'তুমি মোর জীবনের মাঝে মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী'—তারপর প্রশ্ন করতে 'মাধুরী?'—'মাধুরী?'—কি করে সে ইতিহাস ভুলে গেলে, দীপায়ন! বাঁচবার জন্যে, আঁকড়ে ধরবার জন্যে বস্তু খুঁজতে তুমি, স্থূল বস্তু, স্থূলতা—স্থূল

জীবন। মৃত্যুর সৌক্ষ্ম্য থেকে পালিয়ে আসবার সে কী প্রাণপণ চেষ্টা তোমার! তা ও তোতারই স্মৃতি পুজা! যে বিরাট বাঁক নিয়ে জীবন তোমার এগিয়ে চলল তারপর তা-ও তোতারই স্মৃতি পুজা! অস্বীকার করতে পারো ?

সে জীবনের স্রোতে যেদিন বয়ে যাচ্ছিলে সেদিন হয়ত অস্বীকার করতে পারতে—সেদিন হয়ত বুঝতে পারতেনা, বলতে পারতেনা কোন্ বেগ, কোন্ আবেগ তোমাকে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত পার করে দিচ্ছে—স্থানের পর স্থান! কিন্তু আজকের এ-দীপায়ন সেদিনের সে-দীপায়নকে স্পষ্ট দেখতে পায়, সবটুকু বুঝতে পারে। নিটোল ভাবে তুমি অতীতকেই পেতে পারো, বর্ত্তমানকে নয়। বর্ত্তমান ঝড়, তার ছবি ঝাপসা।

আজ আমি ঝড়কে চিনি, সুপর্ণা, তুমি যে-ঝড় তুল্‌তে চাও তাকে চিনি।

বৌদি জিজ্ঞেস করতেন : "কবিতায় তুমি কি লেখো, ঠাকুরপো ?"

"যা আমরা পাইনে তা-ই!"

"তা কি লিখলেই পাওয়া যায় ?"

"পাওয়া গেলেই লেখা যায়!"

"বারে—" ছেলেমানষি আবিষ্কারের আনন্দে হাততালি দিতেন বৌদি : "যা পাও না বল্‌ছ তা আবার পাও কি করে ?"

"সবই কি হাতে পেতে হয়, বোকা ?"

হয়ত বোকাই ছিলেন বৌদি—নইলে দীপায়নের কথায় হাসতে চাইবেন কেন? বিষণ্ণ না হয়ে যারা হাসতে পারে তাদের আমরা বোকাই ত বলি একেকসময়। কিন্তু বৌদির হাসিটাকেও হয়ত ঠিক লক্ষ্য করেনি দীপায়ন, করলে দেখতে পেতো হাতে না পেয়েও যে পাওয়া যায় সে-কথা কবিতার চাইতে মুখের হাসিতেই ফোটে ভালো।

তবে সেদিন দেখতে না পেলেও আজ দীপায়ন দেখতে পায়, কোনোসময় নিজের মুখেই দেখতে পায় সে-হাসি। বুঝতে পারে, কবিতা না লিখলেও তোমার মুখে ফুটিয়ে তুলতে পারো কবিতা—যেমন পারতেন বৌদি, পারত তোতা।

পনেরো

সত্যি বলতে, তখন কয়েকটা বছর দীপায়ন এতো বেশি এলোমেলো যে তোতাকে ওর জীবনে বিপ্লব ছাড়া বিকল্পে আর-কিছু বলা যায়না।

বিয়েকে কিছুতেই সহ্য করতে পারতনা দীপায়ন আর মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায় বলে মেয়েদেরও আর ওর ভালো লাগতনা। শেফালি আর বীণাদিকে যদি ও সযত্নে সাজিয়েই রাখতে পারত মনে, তাহলে ময়না ওর জীবনে আসতে পারতনা। মেয়েদের কুৎসিত ভঙ্গীই মানায়—ওর বিচারের রায় ছিল ক'দিন তা-ই! এই বাঁকা বিবেকেরই সমর্থক জুটেছিল ভবানী! ভবানীর বর্ণনায় মেয়েদের যে কদর্য্যতা ফুটে উঠ্‌ত, দীপায়ন তা স্থূল বাস্তবের মতোই উপভোগ করেছে। আর এ-ধরণের উপভোগের দরুণই হয়ত সত্যিকারের উপভোগের জন্যে ও পা বাড়ায়নি। ওর কবিতা লেখার উৎসও হয়ত এখানে আবিষ্কার করেছে ভবানী।

এ অবস্থায় তোতার আবির্ভাব না হলে দীপায়নের মনের স্রোত কোথায় গড়িয়ে যেতো বলা মুস্কিল। অবশ্য খানিকটা অনুমান করা যায়। প্রতুলের খোঁজ করত হয়ত। কিন্তু তাতে কোনো সুফলের আশা ছিলনা। প্রতুল তখন পরিবার-ধর্ম্মের ঘানিতে বাধ্য পশু। মাঝে-মাঝে যখন অবাধ্য হতে চায়, তখন ঝাঁপ-ভেজানো চায়ের দোকানে রাত্রি দশটা-এগারোটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে' সৌখীন মাতালদের সঙ্গে এক-আধ গ্লাস মদ খায়। তারপর কয়েকটা আদার কুঁচি চিবোতে-চিবোতে বাধ্য ছেলের মতো বাড়ি ফিরে আসে। ময়নার মতো কারো খবর রাখবার আর মন নেই প্রতুলের। স্ত্রী-পুত্রেই সাধ্যাতীত মন খরচ হয়ে যাচ্ছে। চায়ের দোকানে যা হয় তা মনের প্রেত নিয়ে খেলা। দীপায়ন রাজি হত কি তাতে?

যাক্, যা হয়নি তার আলোচনা অনর্থক!

তোতাকে পেয়ে বাস্তবকেই পেয়েছিল দীপায়ন কিন্তু এ-বাস্তব ওর বিচারের বাস্তবের চাইতে ঢের আলাদা। কিন্তু তোমার বিচার তোমার নিয়তি হয়ে ওঠে। নিয়তি হয়ে ওলোট-পালট করে করে দেয় তোমাকে, বিন্যাস করে নূতন ধরণে,

তারপর চালিয়ে নিতে চায়। তোতাকে এতো বেশি করে পেতে চেয়ে দীপায়ন ওর বিচারেরই ফল হাতে-হাতে পেতে চেয়েছিল। মানসিক উপভোগের এলাকা ছেড়ে এসে ওর ইচ্ছা তখন শারীরিক উপভোগের ঠাঁই খুঁজতে ব্যস্ত। কিন্তু ভোক্তা মন তখন আবার উপোসী। আর উপোসে সে রাজীও নয়। তাই তোতাকে কবিতা বানিয়ে বিচারের কাছে উপস্থিত করতে হ'ল।

শারীরিক উপভোগের পথও অবশ্য খুব সরল ছিলনা দীপায়নের পক্ষে। বাস্তরের উপর ওর ঘৃণা। তার দায় থেকে মুক্তি কি এতো সহজে পাওয়া যায়? বিকৃতির জ্বর মন থেকে শরীরে গেল সত্যি, কবিতার টনিকও খেতে সুরু করল মন কিন্তু ঘৃণার দুর্ব্বলতা ত আর রাতারাতি দূর হয়না! তোতার দেহের স্পর্শে একদিন দীপায়নের মন সে-ঘৃণাই উচ্চারণ করতে চেয়েছিল! কিন্তু মনের এ-বিদ্রোহ শরীর মানতে চায়নি। শরীর নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে—প্রতিষ্ঠা করেছে। অস্বস্তির বদলে অস্তিত্ব-প্রতিষ্ঠাই শরীরের সুস্থতা! মনেব পক্ষে যা বিকৃতি, তা-ই হয়ত শরীরের প্রকৃতি!

মোটামুটি বলা যায়, তোতার আবির্ভাবে স্বাভাবিক মানুষই হয়ে উঠতে চেয়েছিল দীপায়ন - কিন্তু তোতার তিরোভাবে আবার আমরা স্বাভাবিক দীপায়নকে পেলাম। ব্যথিত দীপায়ন। নীলকণ্ঠ! শুধু কণ্ঠে নয়, সমস্ত মুখে বিষের নীল ছোপ, চলায় ক্লান্তি, কথায় অন্যমনস্কতা। প্রতুলের সঙ্গে এ-সময়ে ওর দেখা হলে প্রতুল অবাক হয়ে ভাবত, তিন মাসে একটা লোক কি-করে এমন বদলে যায়! তিন মাস আগেও যাকে সে দেখেছে খুশীতে নিটোল, সে কি এমন রাতারাতি চুপসে নীলচে হয়ে যেতে পারে? কলকাতার জলহাওয়া ত এমন সাংঘাতিক বলে কখনো শোনা যায়নি! দীপায়নের মুখে নিরুপায় একটা হাসি দেখতে পেয়ে তিনমাস আগেকার দীপায়নকে মনে পড়ত তার:

"বিয়ে করছিস না কি, পানু?"

"বাঃ, কে বললে?"

"কে বললে মনে নেই—তবে শুনছি-"

"ডোগরা সৈন্যদের ফুটবল খেলা দেখে হয়রান হয়ে গেছে সহরের মানুষ—

না রে প্রতুল—আর তাতে মজা নেই—আর একটা মজার কথা খুঁজে নিতে হয় মজলিস জমাবার জন্যে—তাই আমার বিয়ের গল্প বহন ?”

“আমি অবশ্য তোকে তেমন বোকা ভাবিনে।”

“কিন্তু সহরের লোকের কাছে আমি এমন বিশিষ্ট হয়ে উঠলাম কবে থেকে রে ? আমার খবর নিয়ে ঢি-ঢি পড়ে যাচ্ছে—পাড়াপড়শীর চোখে আর ঘুম নেই ! কাজকর্ম ছেড়ে গালগল্পে মেতেছেন !”

“তাই না কি ? নিজেকে তুই আমাদের মতো গড়পড়তা ভাবিস না কি ?”

“তাছাড়া আর-কিছু ভাববার কারণ ত নেই !”

“একটা সহরে ভালো ছেলে ক'টা থাকে, পানু ?”

লাল্‌চে হয়ে উঠেছিল দীপায়নের মুখ– প্রতুল সে-মুখে লজ্জা দেখতে পায়নি, পেয়েছিল স্বাস্থ্য !

ইচ্ছাগুলোও আমাদের আহার—ভিটামিন্—অ্যামিনো অ্যাসিড্‌স। দীপায়ন তা মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝতে পেরেছে। ও জানত, প্রতুল ওর স্বাস্থ্যের দিকেই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে—যে-স্বাস্থ্য 'ওর কোনোদিন ছিলনা।

কিন্তু আজ আর প্রতুল কলকাতা আসছেনা। দীপায়নের আর কেউ দর্শক নেই, ও নিজে ছাড়া। কাজেই অনায়াসে তখন দীপায়ন দার্শনিক হয়ে উঠতে পারত। নিজের দিকে নিবিড়ভাবে তাকাতে পারলে দার্শনিক না হয়ে আর আমাদের উপায় কি ? কিন্তু আশ্চর্য্য, সে-ফাঁড়া কাটিয়ে গেল ও।

১৯৪৩ ইং। ২রা সেপ্টেম্বর।

১৯৩৭ সন। দু'বছর বাড়ি যাইনি।

১৯৪৩ ইং। ৩রা সেপ্টেম্বর।

কাল আর লিখতে পারছিলাম না কিছুতেই। অসম্ভব ছিল মন থেকে কিছু তুলে আনা। পেছিয়ে গিয়েছিলাম দু'বছর। মেসের সে-ঘরে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে ভাবছিলাম সে-দিনগুলোর মতো। মনে হচ্ছিল আমার হাতে কলম নেই—সামনে জার্ণাল্‌স্-এর খাতাটা খোলা নয়—আমি শুয়ে আছি সে-মেসে—চোখের উপর আনাগোনা করছে মার্ক্সের একটি পংক্তি : It is not the conciousness of men which determines their existence, but on the contrary it is their social existence which determines their conci-

ousness. আমার সে-চেহারাকেই দেখেছিলাম আমি, আমার সে মনকে! আমার সে অস্তিত্বে হঠাৎ ফিরে গেলাম কাল! বেলুনের মতো তেম্নি ফাঁকা ফাঁপা মনে হ'ল নিজেকে।

আজও বারবার মনে হচ্ছে, কি হবে এসব লিখে? পেছনের দিকে তাকিয়ে কি লাভ? আর যা করে চল্‌ছি তার হিসেব-নিকেশও কি মোক্ষ? কোটি-কোটি মানুষের যে অপ্রিয়, ক্লান্তিকর ইতিহাস আমারও ত তা-ই! আমি যে কারো চাইতে মোটা দাগে আলাদা নই তা কি নিজেকে এ-জার্ণাল্‌স্‌ লিখে বোঝাতে হবে?

ভাবছি ছিঁড়ে ফেলব কি না সব।

১৯৪৩ ইং। ৪ঠা সেপ্টেম্বর!

আশ্চর্য্য, আজও ১৯৩৭ সনের সত্তা উঁকি দিচ্ছে আমার ভেতর।

১৯৪৩ ইং। ৫ই সেপ্টেম্বর।

১৯৩৭-এর দীপায়ন:

স্থূলতার পর এমন শূন্যতা। বিজয়াদশমীর পর কোনো পূজা-মণ্ডপ।

হাত বাড়িয়ে টেবিল-চেয়ার, দেয়ালের কোণ শক্ত মুঠোতে ধরতে চাইতাম —স্থূলতার স্পর্শ পাবার জন্যে। শূন্যতায় ডুবে যাচ্ছিলাম—প্রাণপনে বাঁচবার চেষ্টা এ।

বাড়ি থেকে টাকা এসেছে আর চিঠি: চলে এসো।

কোথায় যাব? এখান থেকে চলে গেলে মনে হবে যেন কি রেখে গেলাম। আমার অনেকখানি! তোতাকে?

মন মৃত্যু চায় কিন্তু দেহে বাঁচবার ব্যাকুলতা। মুমূর্ষু মনকে বহন করছে সতেজ দেহ। এ যেন অপরাধ—অপরাধ, শুনতে পাওয়া, চলতে পারা, কথা বলতে পারা। মনে হ'ত আমি অপরাধী—বেঁচে আছি বলে অপরাধী!

ট্র্যাম-বাস-লরী চলছে রাস্তায়—কেন চলছে? কোনো মানে ছিলনা যেন সহরের এ-প্রাণ-স্রোতের। কোনো বাড়ি থেকে গান ভেসে আসছে—তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে পালিয়ে যেতাম—মনে মনে বলতে হত, শুনিনি। শুনিনি? আচ্ছা!—আরেকটি অস্পষ্ট কণ্ঠ শাসিয়ে উঠত মনকে। তারপর তোতা গাইতে সুরু করত:

'শাওন সুরু আজ্জ হ'ল কি মনোময়······'

অবিকল 'জ'-এ জোর দিয়ে তোতা গাইত—আমার কানে, আমার মনে। আমার সমস্ত শরীরে যেন ওর কণ্ঠের বর্ষা ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে। গলার ভেতর একটা কান্নার পিণ্ড গড়িয়ে উঠত—চারদিকে তাকাতাম কোথাও একটু নির্জ্জন ঠাঁই আছে কিনা—মুখ লুকোবার জন্যে, চোখের জল মুছবার জন্যে।

এম্নি একদিন সুরজিতের সঙ্গে কলেজ-স্কোয়ারে দেখা—এম্নি অবস্থায় নয়, তবু যা হোক।

"পানু, তুই কলকাতায়!"

সুরজিতের দিকে তাকালাম—তাকিয়ে রইলাম—ভুলে গেলাম যে তাকিয়ে আছি।

"অনেক বদলে গেছি—তাই না—তুই ও ত ঢের······"

"তুই কবে এলি?" মনে হচ্ছিল স্বপ্নের ছবির মতো সুরজিতের ছবিও চোখের উপর বেশিক্ষণ-টি ঁকবেনা।

"বক্সা থেকে পর্শু ছুটি হয়েছে!"

বক্সা বন্দীশিবির! হঠাৎ যেন মনে পড়ল আমার। রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখে এদেরই পাঠিয়েছিলেন—তোতা বলেছিল।

"কলকাতায় এসেছিস্?" কেন ঐ প্রশ্ন করলাম জানিনে।

"বাড়ি যাব একবার তারপর আবার এখানে—ইণ্ডাষ্ট্রি করব, ছাতার কারখানা! জানিস্ নে পানু—ফ্রম্ লগ কেবিন টু হোয়াইট হাউস্—রাজবন্দীরা এখন বৌদ্ধ ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যালিষ্ট হব!"

কি সব বল্‌ছে সুরজিৎ? ও কি জানেনা—জানেনা—জানেনা? একটা প্রশ্ন হাতুড়ি পিটিয়ে চলছিল আমার কানে।

জানে! জানেনা—এ কি হতে পারে! মেসের ঘরে বিকেলের বোঁজা-বোঁজা আলোয় যখন মুখোমুখি বসেছিলাম আমরা—পানু আর সুরজিৎ, দীপায়ন আর তার রাজবন্দী বন্ধু নয়—তখন জানতে পারলাম, জানে ও সব—আমাকে আর তোতাকেও জানে।

"তুই ছিলিনে, না রে পানু?"

"কোথায়?" চমকে উঠলাম, আতঙ্কে—প্রশ্ন শুনে। না কি সুরজিতের কণ্ঠে? "তুমি যখন ছিলেনা। পানুদা···" একদিন কথাগুলো যে-ভঙ্গীতে

ফুটে উঠত, সুরজিতের গলায় কি করে এলো সে-ভঙ্গী? কেন শুনতে হচ্ছে আমাকে আবার তেমন স্বর? সুরজিৎ কি জানেনা আরেক ধরনে কথা বলতে?

"ওর ওখানে!" সুরজিৎ দেয়ালে তাকিয়ে রইল—সাদা দেয়ালে কারো মুখ, কোনো ছবি আশা করছে কি ওর চোখ?—"মরবার সময় সান্ত্বনা থাকেনা, তবু তুই থাকলে হয়ত সান্ত্বনা পেয়েছে ও খানিকটা!"

"থাক্ সুরজিৎ—" উঠে গিয়ে অনর্থক টেবিলটার কাছে দাঁড়ালাম, ভাবলাম কিছু করা যায় কি না, কিন্তু তক্ষুণি কিছু করা যায় বলে মনে হলনা, তাই আবার ফিরে এসে বসতে হল: "সে আরো সাংঘাতিক হত—ভীষণ" ঠোঁটে ঠোঁট চেপে যেন কথা বলার অক্ষমতাই চেপে গেলাম।

"চিঠি পেয়ে ভাবতে পারছিলামনা কি করে যে ঘটতে পারে—হয়ত কিছুই ভাবতে পারছিলামনা বলেই বুঝতে পারছিলামনা যে মানুষ মরে। যখন প্রথম ভাবতে পারলাম, মনে হল, ভালোই হয়েছে—যে পৃথিবী আসছে, সে-পৃথিবীতে কি ও সুখ পেতো? ওর মতো মন সে কঠিন পৃথিবীতে বাঁচতে পারত কি?"

মনে হচ্ছিল, মানুষ ত পাথরও হয়ে যায়, আমি কি হতে পারবনা? ভাবতে হচ্ছিল, হৃদয়েরই যদি মৃত্যু হয়েছে, সুরজিতের কথাগুলো কোথায় তবে আর আশ্রয় পাবে!

"তুই যে কতো ব্যথা পেতে পারিস তা আমি জানি, পানু—তোর সঙ্গে দেখা না হলে, তোর মুখ না দেখলেও জানতাম।"

তোতা নয়—জানি, তোতা আর হতে পারে না—তবু মনে হ'ল তোতাই আমার পাশে বসে আছে—কথা বলছে।

"আমার সান্ত্বনা আছে। তোর কাছে অনেক পেয়েছে ও, ওর চিঠি পেয়ে মনে হত কোথাও আর ওর এতোটুকু শূন্য পড়ে নেই। এতো বেশি ক'জন আর পায়? জীবন-ভরা ব্যথাই ত পায় মেয়েরা—যতোটুকু বা সুখশান্তিতে দাবী আছে তাদের, তা কি পায় তারা? আমরা তাদের তা-ও দিইনে। তোতা ঢের পেয়েছে— দাবীর চাইতে ঢের বেশী—আমি তা জানি!"

দেয়ালের গায়ে ছবি আঁকায় আর ছবি দেখায় হঠাৎ ছেদ পড়ল সুরজিতের। ওর মনে হ'ল ওর পাশে কে যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। এক ঝলক কান্না একটা মানুষের শরীরের মতো লুটিয়ে পড়েছে ওর কোলে। পানু?

দীপায়ন কাঁদতে পারে? কেউ বিশ্বাস করবে? আমার যুক্তি-বুদ্ধির প্রখর রোদে দাঁড়িয়ে আমিও কি আজ ভাবতে পারি, তোতার পানুদা একদিন সুরজিতের কোলে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল!

১৯৪৩ ইং। ৬ই সেপ্টেম্বর॥

হৃদয় কোথা আর কোথায় সেই নদী খরস্রোতা?
দেখবে—যতোদূর দেখতে পারো তুমি– বালুচর।
আলোতে ছায়া মেখে বিভোর হবে কে বা—সে-ভোর কোথা?
এখন শুধু রোদ এখানে ধূ ধূ রোদ থরথর!

১৯৪৩ ইং। ৭ই সেপ্টেম্বর॥

খাতা খুলে বসে আছি। উপরে কালকের লেখা চার লাইন কবিতা। ১৯৩৭-এর স্রোত বইছে আজও আমার মনের উপর। বিষের মতো ছড়িয়ে পড়েছে আমার শরীরে। অতীত আমাদের বিষ হয়ে দাঁড়ায় যখন অনুভব করি বর্ত্তমান অতীত থেকে আলাদা নয়।

অসহ্য লাগছে চারদিক—সব কিছু—নিজেকেও সইতে পারছিনে। আর কিছু নেই আমার, শুধু এই বোধ—এই বোধ যে আমি পচে যাচ্ছি, গলে যাচ্ছি। আমি শুধু অ্যামিবার মতো একটা জীব, মানুষ নই আর। নিজেকে বোঝাতে পারছি– এইটুকুই যা। ১৯৩৭ সন!

নিজেকে বুঝতে পারতাম তখন আর তাই মনে হ'ত সব ভেঙে যাক—সঙ্গে-সঙ্গে আমার এ-সত্তাও নিশ্চিহ্ন হোক—আসুক যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ মহামারী, বিপ্লব।

কার্ল-মার্ক্স নামে যে ঊনিশ-শতকে একজন জার্ম্মাণ পণ্ডিত ছিলেন এবং রুশ-বিপ্লবের পেছনে যে তিনিই দাঁড়িয়ে আছেন, আর রুশ-বিপ্লবটা যে সত্যি একটা ভালো বিপ্লব, বাচ্চা-ই-সাকোর মসনদ অধিকারের মতো গুণ্ডামি নয়, এসব কথা সুরজিতের কাছেই প্রথম শুনতে পেয়েছিল দীপায়ন। সুরজিৎ দীপায়নকে দীক্ষা দেয়নি, শুধু খবর পরিবেশন করেছিল। প্রথম খবরে দীক্ষিত হবার মতো ছেলেও অবশ্য নয় ও। তবে তখন সুরজিৎ দীপায়নের কাছে শুধুমাত্র সুরজিৎ ছিলনা, ছিল খানিকটা পীঠস্থানের মতো, অনুপেক্ষণীয়, পবিত্র। কাজেই খবরের যা সাধারণ নিয়ম—এক কানে প্রবেশ করে অপর কান দিয়ে

বেরিয়ে যাওয়া—এখানে অবিকল তা হতে পারেনি। দীপায়ন উৎসুক হয়ে উঠেছিল মার্ক্সকে জানবার জন্যে। নূতনের জন্যে ওর যে স্বাভাবিক ঔৎসুক্য একে ঠিক তা বলা যায় না। সুরজিতের মনকে অনুসরণ করতেই চাচ্ছিল ও, ভাবছিল হয়ত, ওর এ-বিনয় তোতারই স্মৃতি-তর্পণ, তোতারই সাধ-পূরণ।

শীগগীরই ফিরে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যখন বাড়ি চলে গেল সুরজিৎ তখন দীপায়নের মুখে, লক্ষ্য করলে, যে-কেউ সৃষ্টির একটা ক্ষীণ সাড়া দেখতে পেতো। নিজেকে কোনো নূতন বিন্যাসে নিয়ে যেতে হলে মানুষের চোখে-মুখে আলোছায়া মেলতে সুরু করে—বৃষ্টি ঝরাবার জন্যে জলভরা মেঘের বিদ্যুৎ চাই! সুরজিতের আবির্ভাব সে-বিদ্যুৎস্ফুরণ। 'এভারগ্রান্ ইজ্ দি ট্রি অব্ লাইফ'—বারবারই সুরজিৎ এ-কথাটা বলত। সুদকষা জানতনা সুরজিৎ কিন্তু আসল কাকে বলে তা হয়ত জানত।

ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র এবার মার্ক্সের সাহিত্য খুঁজতে বেরল বই-এর দোকানে। কিন্তু দোকানগুলো তখন তাদের অদূর ভবিষ্যৎ তৈরী করে বসে নেই, কাজেই শূন্যহাতে শূন্যমনে ফিরে আসতে হল দীপায়নকে বারবার।

"বই-এর নাম, পাব্লিশারের নাম আর অর্ডার দিয়ে যান, আনিয়ে দিতে চেষ্টা করব—যদি কাষ্টমের বাধা না থাকে।"

কিন্তু বই-এর নাম ত জানেনা দীপায়ন, তারপর পাব্লিশারের নাম—তা-ও কি জানতে হয়?

বই সংগ্রহের চেষ্টায় ভাটা পড়ে আসছিল দীপায়নের কিন্তু বই পড়ে চলছিল ও অনর্গল! বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস যখন যা হাতের কাছে পাওয়া যেতো বা পুরনো বই-এর দোকানে, তা-ই পড়তে ইচ্ছা করত ওর!

"বই-পড়াটা কেমন জানিস? অনেক মানুষের সঙ্গে একা-একা থাকার মতো। মানুষের সঙ্গ ছেড়ে একা থাকতে গেলে হয় সন্নেসি না-হয় শয়তান হ'তে হয়। এ-দু'টোর কোনোটাই যে হতে চায়না বই পড়তে সে বাধ্য। আমি সত্যি একা থাকতে চাই কিন্তু মানুষকে ছেড়ে নয়—চারপাশে মানুষ না থাকলে আমি হাঁপিয়ে উঠি যেম্নি মানুষের সঙ্গে মেশামেশি করতে গেলে হয়।"

দীপায়নের এ-কথাগুলোতে বন্ধুবান্ধবেরা খুসী হয়ে ওঠেনা—খুসী হবার মতো কথাও এগুলো নয়, তবে এতে দীপায়নের চেহারাটা একটু-বেশি পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

১৯৩৭-এ এ-চেহারাটাই তৈরি করবার সুযোগ এসেছিল ওর কিন্তু সুযোগ মানেই সাফল্য নয়। আর তা যে নয় তারও কারণ আছে। কারণ সিরাজুল।

মূর্ত্তিমান উপদ্রবের মতোই একদিন সিরাজুলের আবির্ভাব হল দীপায়নের মেসের ঘরে। কিন্তু তাঁর চেহারায় মালুম হচ্ছিল তিনি নিজেই ভীষণ উপদ্রুত। দেবুদার বন্ধু সিরাজুল মিঞা —অভ্যর্থনা জানাতে হল দীপায়নকে।

"আপনি—ভাবতেই পারিনি—" গার্হস্থ্য চাঞ্চল্য এলো দীপায়নের ভঙ্গীতে।

"কলকাতায় ত আমি ঢাকা-কন্‌ফারেন্সের পর থেকেই—" ভাঁজ-করা কয়েকটা বাসি খবরের কাগজ হাতের মুঠো আলগা করে দীপায়নের টেবিলের উপর রাখলেন সিরাজুল: "তুমি যে এ মেসে থাকো, সে খবর রাখি আমি।" খুব একটা মজা পেয়ে যেন হেসে উঠ্‌লেন তিনি।

"ঢাকায় আবার কি কন্‌ফারেন্স করে এলেন?" একটু-একটু অতীতের সিরাজুলকে মনে পড়ছিল দীপায়নের।

"কৃষক-প্রজার কন্‌ফারেন্স হলনা ঢাকায়?"

"ও, কিন্তু লক্ষ্ণৌ-কনফারেন্সে কি হাল আপনাদের! নেতাই যে বিগড়ে গেল।"

"হুঁ—" লম্বা একটা শ্বাস ফেললেন সিরাজুল: "দেবোত্তমের খবর কি বলো, এখনো ছাড়া পায়নি?"

ঘাড় নেড়েই 'না' বোঝাত দীপায়ন কিন্তু সিরাজুল গম্ভীর হয়ে গিয়ে তাঁর রুক্ষ চেহারাটাকে এমন গুরুতর করে তুললেন যে দীপায়নের মনে হল ঘাড় নাড়লে তাঁর সম্ভ্রম নষ্ট হবে - তাই ছোট করে বিনয়ী ভঙ্গীতে বললে: "না।"

"ক'দিন ওর কথাই মনে হচ্ছিল, তাই ভাবছিলাম হয়ত ছাড়া পেয়েছে, আব ছাড়া পেয়ে হয়ত বা এখানেই আছে।"

দীপায়ন ছেলেমানুষ বনে গেল: "ও, তাহলে আপনি দাদার খোঁজেই এসেছেন—আমার খোঁজে না!"

"তা নয়—" সিরাজুল হাসতে চেয়ে আবার দপ করে নিভে গেলেন: "দেবোত্তমকে পেলে ভালো হত। আমি পার্টি-ফার্টি কমিটি-সমিতি ছেড়ে দিচ্ছি —শয়তানের আস্তানা হয়ে দাঁড়ায় ওসব শেসে! দেবোত্তম বলত আমায়, ভুল করেছি ঠিকই।"

"দাদা ছিলেন সমিতির চাঁই - আর দাদাই বাধা দিতেন আপনার সভা-সমিতি করবার উৎসাহে!

"তুমি ত রাজনীতিতে নেই ভাই, সব কথা বুঝবেনা,"—বুক-পকেট বোঝাই কাগজের তাড়া থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে বললেন সিরাজুল: "সমিতির মেম্বারদের কাছে আবেদন হিসেবে এটা আমি ছেপে পাঠাতে চাই, পড়ে ত্যাখো, আন্দোলন আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে দেখতে পাবে।"

কাগজটা হাতে নিয়ে দীপায়ন সিরাজুল মিঞার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কোন মানুষকে ঠিক ধরতে পারে না--কথা শুনে ছবি পাওয়া যায়না কারো। কিন্তু চোখ চিনতে পারে, নিবিড়ভাবে যদি তাকাতে পারো তুমি কারো মুখের দিকে, দেখবে অনেকখানি অস্পষ্টতা মুছে গেছে, অনেক দেখতে পাচ্ছো তুমি, অনেক শুনতে পাচ্ছো।

"পড়ো ভাই, পড়ো!" চোখ বুঁজে মাথা নীচু করলেন সিরাজুল।

দীপায়ন পড়ল। সহজ সোজা কথা আছে—নজরুল ইসলামের দু'ছত্র কবিতা আছে—কয়েকটা ভালো শব্দ আছে আগোছাল বাক্য আছে অনেক। কিন্তু এ-সমস্ত ছাপিয়ে এমন একটা সুর জেগে উঠেছে লেখাটা থেকে,যার সঙ্গে সুরজিতের কথাবার্ত্তার যেন কোথায় মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অবাক হল দীপায়ন। বিনীত হতে ইচ্ছে করল। মনে হল, পৃথিবী যেন ওকে পেছনে ফেলে অনেকদূর এগিয়ে গেছে—সেখানে এখন মানুষগুলো যে-ভাষায় কথা বলে, তা তাদের পুরণো ভাষা নয়, দীপায়ন বুঝতে পারে তেমন ভাষা নয়।

"পড়লে?" সিরাজুল চোখ বুঁজেই হাসছিলেন: "স্বায়ত্ত শাসনের নমুনাটা ঠিক দিয়েছি ত?"

শাসনের খবর খুব বেশি জানা ছিল না দীপায়নের। মন্ত্রীসভার কাঠামোটার উপর একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে ভেবে নিয়েছিল আন্দোলনের ফল ফলেছে—প্রধান মন্ত্রী বলে কেউ যখন থাকবেন সেখানে আর তিনি যখন আমাদেরই কেউ, তখন আর একে ইংরেজ শাসন বলব কেন? মাঝে-মাঝে রাজনীতি ভাবতে গেলে দীপায়ন এ পরিবর্ত্তনে সত্যি খানিকটা খুসী হয়ে উঠত। কিন্তু আজ হঠাৎ সিরাজুল মিঞা এসে এ কি বলছেন? সবটুকুই না কি ফাঁকি। 'নামেমাত্রেই কৃষক-প্রজা, আসলে কায়েমী স্বার্থের তহবিলদার......কৃষকপ্রজার ভোট কুড়িয়ে এনে তাদের পায়ে ঠেলে দেওয়া........মসনদের কি মহিমা!'

সিরাজুলের কথাগুলো মনে-মনে উচ্চারণ করল দীপায়ন, উচ্চারণ করতে পেরে অবাক হ'ল। কি আশ্চর্য্য, মুখস্ত হয়ে গেল কি করে কথাগুলো!

এবার চোখ মেলে তাকালেন সিরাজুল: "নয়া আন্দোলন হবে এবার—রেভলিউশন—আমূল পরিবর্ত্তন। দেবোত্তমকে আমার দরকার।"

দীপায়ন আবারও হাসতে পারত, ভাবতে পারত, সিরাজুল মিঞা একরকমই রয়ে গেলেন চিরকাল। সত্যি বলতে, একরকমই হয়ত ছিলেন সিরাজুল মিঞা কিন্তু দীপায়ন আর আগেকার দীপায়ন ছিলনা তখন।

"আপনি প্রাদেশিক কৃষক সভার সভ্য, না সিরাজুল-ভাই?" দীপায়ন মনোযোগী হতে সুরু করেছিল: "আমার এক বন্ধু এ-সভার কথা বলছিল সেদিন।"

"না-না, আমি আর সভা-সমিতিতে নেই -" সিরাজুল সজোরে মাথা নেড়ে উঠ্‌লেন: "ওদের দু'একজনের সঙ্গে ফ্রেণ্ডশিপ আছে, আর কিছু নয়।"

"ওরা কি বলে?"

"ঢের বড়ো-বড়ো কথা বলে। দুনিয়ার চাষীদের কথা বলতে সুরু করে জমিদারী-উচ্ছেদের কথা বলতে গেলে। আমাকে বই গছিয়ে দিয়েছে—মোটা-মোটা কিতাব!"

"পড়েছেন আপনি বইগুলো?"

"বই পড়ে চাষীদের চিনতে হবে আমাদের?" মুখে আফ্‌শোষ্‌ ফুটে উঠ্‌ল সিরাজুল মিঞার: 'দেবোত্তম থাকলে ওকে পড়তে বলতাম, পড়ে বলত কি লিখেছে। নজরুল 'লাঙ্গল' কাগজে যা বলতেন তা ছাড়া নয়া কথা কিছু বলছে কি না দেখতাম!"

"আমাকে দিননা ক'টা বই!"

'পড়বে? বেশ ত কালই দিয়ে যাব! কিন্তু তুমি কি পড়ো ওসব বই?"

'প'ড়িনি কিন্তু পড়ব!"

চা-মামলেট, পান সিগারেট খেয়ে সিরাজুল যখন সেদিনকার মতো খাওয়ার চিন্তা চুকিয়ে বিদায় হলেন তখন বেলা একটা। দীপায়ন অবাক হয়ে ভাবছিল, কি-করে ওরও বা ক্ষিদে পায়নি এতোক্ষণ? সিরাজুল মিঞা যাকে বলেন ক্ষিদের দাওয়াই দীপায়নও কি তা-ই খেতে সুরু করেছে—চুমুক দিয়েছে পলিটিক্সের পেয়ালায়?

ষোল

আজ লিখতে বসে আমার মনে পড়ছে একবছর আগে আমি দীপায়নের কাহিনীতে প্রথম হাত দিয়েছিলাম। কেন মনে হল বুঝতে পারছি। আমার এ-লেখা সময় নিয়ে খেলা। আজ ১৯৫০ সন। যে-কাহিনী এখন আমি লিখব ভাবছি তা ১৯৩৮-এর। ১৯৩৮ বলে যে একটি সময় ছিল কাহিনীটি তারই হাতের তৈরী কিন্তু তার রূপ দিতে যাচ্ছে যে-কাহিনীকার তার দেহ-মনে এখন ১৯৫০-এর স্রোত চলছে। শুধু তা-ই নয়, এ কাহিনীর এমন সহৃদয় পাঠক'ও থাকতে পারেন যিনি ১৯৬০ সনের মানুষ। এ-তিনটি সময়ের হাতাহাতি হয়ে কাহিনীটি তার সত্যিকারের চেহারায় কতোটুকু আর বেরিয়ে আসতে পারবে? কাজেই দীপায়নের মতো আমারও আজ মনে হচ্ছে—এ রচনা অসার্থক। দীপায়নের চেহারা আঁকব বলে গোড়ায় যে দম্ভ ছিল আমার, আজ আর তাকে মনের আনাচে-কানাচে কোথাও খুঁজে পাচ্ছিনে।

যে ত্রুটির কথা উল্লেখ করলাম, দীপায়ন স্বয়ং কাহিনীকার হলেও তার ব্যতিক্রম হতনা। কি-করে বা হবে? ১৯৫০ আর ১৯৩৮ এর দীপায়ন এক ব্যক্তি নয়। আর পাঠকের সাময়িকতা ত দুজন কাহিনীকারের বেলাই সমান। জার্ণাল্‌সে দীপায়ন অতীতের যে কাহিনী বলছে তা-ও কি ওর বিশুদ্ধ অতীত? মোটেও না। সেখানে সবটুকুই বর্ত্তমান-মেশানো অতীত।

গল্প-উপন্যাসের একটা গর্ব্ব আছে—(জীবন-চরিত বা ইতিহাস ত এদিক থেকে প্রচণ্ডভাবেই গর্ব্বিত) যে মানুষের চরিত্র সেখানে চমৎকার চিত্রিত। এর চাইতে মিথ্যা গর্ব্ব আর কিছু হতে পারে না। গল্প উপন্যাসের সমালো-চকরাও (স্তুতিকার কিম্বা নিন্দুক) কাহিনীর চরিত্রগুলো ঠিক কি বেঠিক তা-ই নিয়ে গদ্‌গদ্ বা ঘর্ম্মাক্ত হয়ে ওঠেন। সে-সব মেহেরআলিদের কে বলবে যে সব ঝুটা হায়! আমাদের বিখ্যাত একটি সংস্কৃত শ্লোক একটা খাঁটি কথা বলতে গিয়েও শ্রেণীস্বার্থে পিছিয়ে গেছে: মেয়েদের চরিত্র আর পুরুষের ভাগ্য যে দেবতাদেরও অজ্ঞাত তা না বলে স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে

মানুষের চরিত্রই যে অজ্ঞেয় এ-কথাটি বল্‌লে মনে হয়, শ্লোকটি যাবৎ চন্দ্র-সূর্য্য আকাশে বিদ্যমান তাবৎকাল পরমায়ু লাভ করত। আর তার মানেই সত্যদৃষ্টি হত। কারণ, দীর্ঘজীবিতাই ত সত্য!…

কিন্তু এ-পরিচ্ছেদ সাজাতে গিয়ে সময় নিয়ে আমার এমন মাথা-ব্যথা উপস্থিত হল কেন যার ফলে শ্যেভিয়ান ভঙ্গীতে রচনাটি ভূমিকা-সর্ব্বস্ব হয়ে উঠ্‌তে যাচ্ছে? কলম থামিয়ে পায়চারি করতে হ'ল খানিকটা, মন হাতড়ে দেখতে হ'ল কোন্ বোধ সেখানে কাজ করে চলেছে! কিছু কি দেখা গেল? দেখা গেল। দীপায়নকে দেখতে গিয়েই যে আজ আমি ১৯৩৮-কে দেখতে পাচ্ছি তা নয়, স্বাধীনভাবেই আমি আজ ১৯৫০-এ ১৯৩৮-এর ছায়াকে ভেসে উঠ্‌তে দেখছি। তৃতীয় মহাযুদ্ধের মেঘলা আকাশের ছায়া এ নয়, আমার মনেরই অস্বস্তির ছায়া। একই রকম—১৯৩৮-এ যেমন ছিল, বারোবছর পর, ১৯৫০-এ-ও ঠিক তেমনি। মনে হচ্ছে, সব ভেঙে পড়ছে, জোড়াতাড়া দিয়ে কিছুই আর খাড়া রাখা যাবে না—পৃথিবী রূপান্তর চায়, সামুদ্রিক রূপান্তর! এ সমাজে আর বাঁচতে চাইনে আমরা, এ-কাঠামোতে আর খাপ খাইয়ে রাখা যায়না নিজেকে। এ দারিদ্র্যে, এ ভ্রষ্টতায়, এ সর্ব্বনাশে হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে জীবন, মনের ভেতর কে যেন কেঁদে উঠ্‌ছে বারবার, কে যেন গর্জ্জাচ্ছে: আর না, আর না— তারপর পরিশ্রান্ত মন অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে চুপচাপ। যাদুঘর।

"তুমি মধ্যবিত্ত, কি তুমি করতে পারো? কিছুই করতে পারোনা।" চারদিক থেকে আক্রমণ চলেছে আমার উপর।

"কিছুই আমার করবার নেই?"

"না। তুমি অবান্তর। কেন তুমি তৈরী হয়েছিলে বলতে পারো? কি তুমি তৈরী করতে পারো? অফিসের ফাইল, আদালতের দলিল, স্কুল-কলেজের পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর—আর খুব বেশি হলে সাহিত্য। একে কেউ জীবনের ভিত্তি বলে? এ কি অন্নবস্ত্র—বাঁচবার উপায়-উপকরণ? তুমি চাষী নও, শ্রমিক নও, কারখানার মালিক নও—তোমাকে দিয়ে কি দরকার আমাদের?"

"আমি সব-কিছু করতে রাজি—করতে পারব—করতে চাই আমি—করতে দাও আমাকে, চাণক্য!"

"আমাদের কাজ তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে আমরা বানপ্রস্থে যাব? ভারি আহ্লাদ ত! নিজের চরকায় তেল দাও এবং মর।"

"মরতেই ত বসেছি!"

"তা ই বোসো। আমাদের দেওয়া ক্ষুদকণা নিয়ে যদি পেট না ভরে তাহলে পেট চুপসে মরে যাও। তোমাদের কে চায়?"

মনে হয়, কী এক হিংস্র সমুদ্র-স্রোত যেন আমাদের পায়ের নীচে থেকে মাটি সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! অভিশপ্ত মধ্যবিত্ত বলেই!

আমরা মধ্যবিত্ত—ফতুর হয়ে যাওয়াই আমাদের ধর্ম্ম! দীপায়ন বারবারই বলত তখন এ-কথা। ভাবত সবসময়। ফুটো বেলুনের মতো চুপসে-যাওয়া মনে হত নিজেকে ওর। যে-পৃথিবীতে খানিকটা অস্তিত্ব ছিল আমাদের, তা নষ্ট হয়ে গেছে। আরেকটি পৃথিবী হয়ত জন্ম নেবে—তৈরী হও সে-পৃথিবীর জন্যে, তৈরী করো নিজেকে। দীপায়নের মুখে তখন অনেকেই শুনেছে এ-কথা। অনেকেই দেখেছে তখন ক্ষিপ্ত, দীপ্ত দীপায়নকে। অনেককে শোনাবার আর দেখাবার ভূমিকাই যেন বেছে নিয়েছিল ও তখন। আর তাই বেরিয়ে এসেছিল ওর মেসের চারটি দেয়ালের ঘের থেকে বাইরে—রাস্তায়—লেখকদের আস্তানায়—সম্পাদকদের দপ্তরে।

"আপনি দীপায়ন চৌধুরী? আপনার কবিতা পড়েছি। কয়েক বছর আগে। হু, বেশ কয়েক বছর আগে। কিন্তু কি অদ্ভুত দেখুন, ঠিক মনে আছে আমার!"

"আপনি নিজেও বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত কবি—তাছাড়া—"

"বিখ্যাত কবি—হুঃ?"

"নিশ্চয়!"

"সে যাক্—'তাছাড়া'-কি বলছিলেন?"

"তাছাড়া আমার নামটা অদ্ভুত বলেই হয়ত লেখার কথাটা-ও আপনার মনে আছে।"

"খানিকটা অবশ্যি তা-ই। কিন্তু কবিতাগুলোতেও একটা অদ্ভুত স্বাদ ছিল। মিষ্টি লিরিক।"

"আপনার ভালো লেগেছিল জেনে আমার কী যে ভালো লাগছে আজ!"

"কিন্তু আজকাল ত আর লিখছেন না আপনি। কেন বলুন ত?"

"আবার লিখতে সুরু করেছি।"

"সত্যি ? আছে দু'একটা সঙ্গে ?"

"হুঁ—" দীপায়ন একটু কাৎ হয়ে পকেট থেকে একটা কাগজ তুলে আনল।

হাত বাড়িয়ে কাগজটা লোভীর মতো যেন লুফে নিলেন পরিমলবাবু। পড়তে লাগলেন। একবার পড়া হয়ে গেলে আবার। কিন্তু লোভের রেখাগুলো তৃপ্তির রেখাতে গিয়ে পৌঁছুলনা। বরং হোঁচট-খাওয়া মতো হয়ে উঠল ভুরুর কোণগুলো।

"লিরিক নয়!" হতাশায় ক্লান্ত শোনাল পরিমলবাবুর গলা।

"না।"

"সাবজেক্টটা নূতন—কিন্তু কি জানেন—আপনার কবিতার সেই মিষ্টি সুর কই ?"

"মিষ্টান্ন ত তৈরী করিনি।"

"ঝাল ? কেমন ? কিন্তু আমার মনে হয় এর চাইতে মিষ্টান্নই যেন ভালো ছিল।"

"কিন্তু আমার আর তা ভালো লাগছেনা কি না –" মীইয়ে এলো দীপায়নের কথার সুর।

"নিশ্চয়—ভালো না লাগলে আর কি করে লিখবেন!" পরিমলবাবু সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে উঠলেন : "আমার কিন্তু ভালোই লাগছে কবিতাটি—শ্রেণীর ইতিহাস, শ্রেণীদ্বন্দ্ব, কবিতায় এর চাইতে আর কি ভালো হতে পারে ? কিন্তু তারপরই ভাবছি কবিতা কি এর ভর সয় ?"

"আমাদের যার যতোটুকু শক্তি তা দিয়েই ত এ-সত্যকে সমর্থন করতে হবে—" কবি দীপায়ন সুযোগ পেয়ে প্রচারক হয়ে উঠল।

"ধীরে ধীরে সবাই তা সমর্থন করবে। আজকাল অনেক কাগজেইত এ-ধরনের লেখা বেরয়।"

"বেরয় কিন্তু কেউ কি পড়ে ?"

"না। স্পষ্ট বলতে পারি, না। অনেকদিন পর আমাদের হুঁস হয় কি না! এগিয়ে গিয়ে আমরা কিছু ধরতে চাইনে। বুঝবার চেষ্টা না করেই আমার কবিতাকে দুর্ব্বোধ্য বলে সবাই—জানেন ত ? কিম্বদন্তী শুনে। কিম্বদন্তীতে আমাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস!"

দীপায়ন হেসে উঠ্‌ল—পরিমলবাবুর মুখের চুপচাপ হাসিটাকেই কেড়ে নিয়ে যেন ধ্বনিত করে তুলল দীপায়ন। নিজের হাসির শব্দে নিজেরই ওর ভালো লাগছিল—অনেকদিন পর নিজেকে হাসতে শুনল বলে। এ-যেন অনেকটা নিজেকে পাওয়ার মতো—বাল্যোত্তীর্ণ কিশোর-কিশোরী হঠাৎ যেমন একদিন নিজেকে দেখতে পায়, অনুভব করে।

"আপনি আসবেন মাঝে-মাঝে—" পরিমলবাবু নিবিড় চোখে তাকালেন: "কথা বলা যাবে—কথা যেমন শোনান যায়না কাউকে, কারো সঙ্গে কথা বলাও ত যায়না।"

যাঁদের সঙ্গে কথা বলতে হয় তাঁদের কেউ-কেউ বাইরে যেন এতোক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন আর পরিমলবাবুর খেদোক্তির উপযুক্ত উত্তর দেবার জন্যেই যেন এখন তাঁরা হেঁকে উঠ্‌লেন নানা ভঙ্গীতে নানা গলায়: "পরিমলদা—", "পরিমলবাবু"…

"আচ্ছা, তাহলে আজ আমি চলি—" কবিতা-লেখা কাগজটা হাতে তুলে নিল দীপায়ন: "আসব মাঝে-মাঝে আপনাকে বিরক্ত করতে।"

"তাই করবেন।" পরিমলবাবুর অসহায় মুখে একটু হাসির আভা ফুটে উঠ্‌ল।

এমনি আরেকদিন 'সংস্কৃতি' কাগজের সম্পাদনা-ঘরে।

"অ্যাদ্দিন কল্‌কাতায় আছেন, আমাদের অফিসে একবারও এলেন না!" মিষ্টি-মিষ্টি হাস্‌ছিলেন ধীরাজবাবু: "তাছাড়া লিখ্‌ছেনওত না অনেকদিন!"

"লিখছিত—'যুগবাণী'তে লিখছি কিছু-কিছু।"

"ও"—লম্বা টানে শব্দটা প্রণব-ধ্বনির মতো নাটকীয় শোনাল সম্পাদকের মুখে: "দেখেছিলাম—মনে পড়ছে! 'মে-ডে' নিয়ে একটা কবিতা—কেমন?"

"তাছাড়া আরো দু'একটা—"

"কিন্তু আগেই আপনি ভালো লিখতেন—'সংস্কৃতি'র কবিতাগুলোত চমৎকার লিখেছেন—আমার কাগজে ছাপা হয়েছিল বলে বলছিনে—কবিতা-গুলো সত্যি ভালো—রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন—ওর-ও ভালো লেগেছে বলছিলেন—"

"কবিতা ত অনেক রকমই হতে পারে—মানুষও ত বদলে যায়—"

ফাইভ-ফিফ্‌টি-ফাইভ-এর একটা টিন আর সিগারেট-লাইটারটা দীপায়নের সামনে এগিয়ে দিয়ে ধীরাজবাবু মিহি, পরিশীলিত হাসিতে ঠোঁট দুটো মোলায়েম করে আনলেন।

"সিগারেট আমি খাইনে—" সবিনয় নিবেদন জানাল দীপায়ন।

চমকে উঠ্‌লেন ধীরাজবাবু: "সে কি?"—একটু নাটকীয় ভঙ্গী: "কবিতা লিখছেন, সিগারেট খান না?"

কথাটার কঠিন উত্তর ছিল কিন্তু দীপায়ন চুপ করে রইল—উত্তর দিতে গেলে অকৃতজ্ঞ হতে হয়—কাগজে ছাপা হওয়া যদি কবিতার সম্মান হয়, তাহলে ধীরাজবাবুই প্রথমে দীপায়নের কবিতার সে-সম্মান দিয়েছিলেন।

ম্যাজিশিয়ানের সাবলীল ভঙ্গীতে ধীরাজবাবু একটা সিগারেট ঠোঁটে তুলে নিয়ে আগুন ধরালেন—আর ঠিক তার পরের মুহূর্ত্তেই জ্বলন্ত সিগারেটটাকে ঠোঁটের স্পর্শমুক্ত করে আঙ্গুলের ডগায় নিয়ে এলেন। মনে হল, ওটা খাওয়া নয়—একটা কাজ—কাজের ভঙ্গী—কাচের নল তৈরী করতে ঠোঁটের যতটুকু দরকার এ-কাজেও ঠোঁট ততটুকুই দরকারী, তার বেশি নয়।

"আপনি আসুন না আমাদের 'সংস্কৃতি'র বার্ষিক বৈঠকে—" ধীরাজবাবু বল্‌লেন অবশেষে: "তেশরা বৈঠক হচ্ছে - সুযোগ করতে পারলে রবীন্দ্রনাথও আসবেন। যদি পাওয়াই যায় রবীন্দ্রনাথকে, ওঁর সঙ্গে পরিচিত হবার একটা ভালো সুযোগও হয়ে যাবে আপনার!"

"আচ্ছা।" গলায় স্পষ্ট অনিচ্ছা ফুটে উঠল দীপায়নের।

সম্পাদকের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে-আসতে দীপায়ন 'সংস্কৃতি' কথাটাকেই ভাবছিল। কোন্ সংস্কৃতি দিতে চান এঁরা আমাদের? রবীন্দ্রনাথকে সামনে তুলে ধরে কিছু বলতে চান কি—না কি রবীন্দ্রনাথের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে কোনোরকমে নিজেদের ফাঁপা অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে চান? সাহিত্য-পরিবেশন কি শুধু ফ্যাশান? আর কিছু দায় নেই, দায়িত্ব নেই? সেদিনই প্রথম মনে হ'ল দীপায়নের, এ-দায়িত্বহীন সাহিত্য-চর্চ্চা নিজেও করেছে সে একসময়! কী আশ্চর্য্য, এই সহজ কথাটা ওর মনে ছিলনা যে সবকিছু থেকেই মানুষ তার জীবনের জন্যে কিছু পেতে চায়। শুধু আনন্দ নয়, আরো কিছু—যা ধরা-ছোঁওয়া যায় তেমন কিছু! সৌন্দর্য্যের মরীচিকা নয়, জীবনকে সুন্দর করে গড়বার উপাদান!

আর ঠিক এ-কথাগুলোই বলেছিল ও যেদিন একদল ছেলে এসে ওকে ঘিরে ধরেছিল তাদের লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হবার আমন্ত্রণ জানিয়ে।

'পরিমলবাবু পাঠিয়ে দিলেন আপনার কাছে—আপনাকে যেতেই হবে কিন্তু।''

কি-রকম একটা বিস্বাদে যেন ভরে উঠ্‌ল দীপায়নের মন, তবু হাসতে হল : ''তিনি কেন যাবেন না ?''

'তাঁর না কি জরুরী একটা কাজ আছে।''

''এ-কাজটা তেমন জরুরী মনে হলনা ?''

একটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠ বলে উঠ্‌ল : ''ওরা বড়ো-বড়ো লেখক !''

কোনো দৈনিক কাগজের ষ্টাফ-ফটোগ্রাফারের ছবি তোলবার ঝলকানি লেগে যেন চিকিয়ে উঠ্‌ল দীপায়নের মুখ—ছেলেটির প্রতি কৃতজ্ঞ, সশ্রদ্ধ দেখাল দীপায়নকে : ''বড়ো লেখক হলে মানুষের সঙ্গে আর মিশতে নেই—কেমন ?''

''তাছাড়া আর কি ?'' কঠোর মন্তব্যে চুপ করল সে-কণ্ঠ। অপর কণ্ঠে আব্দার ফুটে উঠ্‌ল আবার : ''আপনি যাবেন কিনা বলুন।''

''যাব !'' ছোট্ট একটু ধ্বনি কিন্তু এমন গাঢ় যা প্রতিশ্রুতির মূর্ত্তি গড়ে তোলে।

অধিবেশনে যা বলেছিল দীপায়ন তা নূতন শুনছে বলেই হয়ত বুঝতে পারছিলনা অনেকে—কিন্তু একটি-তুটি ছেলে যে উৎসাহিত হয়ে উঠ্‌ছে তা-ই ছিল ওর কাছে অনেকখানি। আসল কথা, দীপায়ন যে ওর নূতন মনের চেহারা ভাষায় বর্ণনা করবার সুযোগ পেয়েছে, ওর সবটুকু তৃপ্তিই তার জন্যে। নিজেকে এমন খুলে ধরতে পারেনি ও কারো কাছে—ধীরাজবাবুর কাছে ত নয়ই—পরিমলবাবুর কাছেও না। সেখানে যেন ছিল পাথরের পাহাড়—ধ্বনি প্রতিধ্বনি নিয়ে ফিরে আসে, আর এখানে সমুদ্র, ধ্বনিকে কেড়ে নিয়ে যায় হাওয়া, কতো যে দূরে কেউ জানেনা ! এখানে দীপায়ন ভবিষ্যতের ছবি নিয়ে ভবিষ্যতেরই মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল ! ছোট-ছোট ছেলেরা—সমুদ্রের হাওয়া, ভবিষ্যতের বিচিত্র রঙ আর রেখা ছাড়া তারা আর কি ?

এ-সময়টাতে আমার মনে মৃত্যু এসে উঁকি দেয়। একটা গন্ধের মতো জড়িয়ে থাকে আমাকে—কোনো হেমন্তের গভীর বিকেলের স্বাদ পাই। তোতাই কি আনে এ-মৃত্যুর ছায়া—না কি ২২শে শ্রাবণ?

২২শে শ্রাবণ এতো ঘন হয়ে উঠ ত কি, তোতার মৃত্যুর মেঘ আমার মনের দিগন্তে জমে না থাকলে? রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকে নিজের খানিকটা সত্তার মৃত্যু বলে চিনতে পারছি আজ। আশ্চর্য্য, পাঁচ বছর আগে কোথায় ছিলেন আমার মনে এ-রবীন্দ্রনাথ? জীবনের স্পর্শে আরেকটি জীবনকে সত্যিভাবে চেনা যায়না—সত্যি চিনতে হলে, তার দাম দিতে হলে, মৃত্যুর ব্যবধান চাই—মহা-বিরহ মৃত্যুর ব্যবধান।

আক্রোশ নয়, আজ বুঝতে পারছি, এক সময় অভিমানই ছিল রবীন্দ্রনাথের উপর। সব-কিছুই পেতে চাইতাম তাঁর কাছে—তাই এ অভিমান। ভাবতাম, কেন তুলে ধরছেননা রবীন্দ্রনাথ আসন্ন সভ্যতার ছবি—কেন বলছেন না ডেকে এ-সমাজ, এ-সভ্যতা, এ-শোষণ যে থাকবে না—কেন শোনাচ্ছেন না আমাদের শ্রেণীর অবসানের কথা!

রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেছি সভায়, সমিতিতে, প্রবন্ধে, কবিতায়। আজ মনে হয়, নিজেকেই আক্রমণ করতাম আমি, রবীন্দ্রনাথকে নয়।

মন হাওয়াবদল করে। তবে দীপায়নের বেলায় তার মাত্রা একটু বেশি। কিন্তু তখনকার হাওয়াবদলটার তুলনা নেই, তাকে একমাত্র ভয়ঙ্করই আখ্যা দেওয়া যায়—যেম্নি আয়তনে, তেম্নি ওজনে। মেস-বাস এ-ওজন সইতে পারত না। হয়ত তা বুঝতে পেরেই দীপায়ন আড়াই ঘরের একটি ফ্ল্যাটে পাইস্-হোটেল ভরসা করে নূতন আস্তানা তৈরী করে তুলল। বিশ শতকেই যার অরুচি এসে গেছে সে আর কি করে উনিশ-শতকীয় মেসে বসবাস করবে? চেষ্টা করলে ওখানে অবশ্য যৌথ জীবন-যাপনের একটা উদ্দেশ্য পাওয়া যায় কিন্তু দীপায়ন প্রশ্ন করল: ওটা কি জীবন? মধ্যবিত্তের জীবনে দুর্গন্ধ ছাড়া আর কি আছে? তার চাইতে হৃদয়ঠাকুরের ঘামেও ঢের ভালো গন্ধ। নিজেই রাঁধে সে ভাত, নিজেই বেচে। ঘামের দামে তৈরী তার জীবন—অনেক সুন্দর, অনেক ভালো। বলাবাহুল্য যে এ-

সৌন্দর্য্যানুভূতি হৃদয়ের ছিল কিনা, দীপায়ন তা জানতে চায়নি, নিজের মনের আবিষ্কার নিয়েই ও তখন মশগুল।

বাড়ি থেকে নিয়মিত টাকা আসত। 'না' লিখেও বন্ধ করা যায়নি। মনিঅর্ডার ফিরিয়ে দেবে কি না তা-ও একবার ভেবেছিল দীপায়ন। কিন্তু তাতে আরো হাঙ্গামা। বাড়িতে সোরগোল পড়ে যাবে, পানু নিখোঁজ, কিম্বা, কে বলবে, অসুখ হয়ে হয়ত হাসপাতালে। ছুটে আসবেন স্বয়ং বাবা। দাদা বাড়ি এসেছেন কিন্তু প্যারোলে, বাড়ি ছাড়বার হুকুম নেই। বাবাকে হয়রানি করবার অধিকার আছে বলে এখন আর দীপায়ন ভাবতে পারেনা। তাঁরা তাঁদের মনে থাকুন, দীপায়ন দীপায়নের মনে; কারো সুখদুঃখে কারো ভাগী হবার দরকার নেই। তপশ্চর্য্যা? প্রশ্ন করে দীপায়নকে ঠাট্টা করতে গেলে ও উত্তর দিত: 'তা কেন? মার্ক্সের শিক্ষা। পরিবারে ভাঙ্গন ধরে গেছে! ভাঙা ব্যবস্থায় নাক ঢুকিয়ে আর কি লাভ?'

কিন্তু বৌদির ভাবনা তাতেও নাছোড়। তিনি তপশ্চর্য্যাই ভাবতেন। সবই তোতার জন্যে—এ একরকম সন্নেসি সাজা! বৌদি প্রত্যেক চিঠিতেই তাঁর এ থিসিস বহাল রাখতেন। চিঠির জবাব দিত দীপায়ন—দুছত্রে, পোষ্টকার্ডে। জবাব না দিলে মণিঅর্ডার-ফেরতের ফলের মতোই ফল হতে পারে, আশঙ্কা ছিল ওর।

কাজেই পারিবারিক জীব নয় বলে নিজেকে সদর্পে ঘোষণা করবার আর উপায় কি? এখনও পেটি-বুর্জ্জোয়া আশঙ্কা-আতঙ্ক, ভয়-ভাবনার বেড়া ডিঙোতে পারলে না! ঢেঁকীর স্বর্গ-সুখ নেই। তোমার শ্রেণী তোমাকে শ্রেণীহীনতায় পৌঁছুতে দিলে ত। দীপায়ন মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়ত।

তাছাড়া টিউশনিও রীতিমতো বুর্জ্জোয়ার ঘরে! নিজের রুটি নিজে উপার্জ্জন করছ বলে যে গর্ব্ব করছ, তার কি মানে হয়, যদি আমি বলি, ওটা বুর্জ্জোয়ারই সেবা হচ্ছে?

টিউশনি ছেড়ে দিলে দীপায়ন। ত্যাগের পালা চলতে লাগল। ঈশোপনিষদেরই পরামর্শে ত্যাগ করে ভোগের সুখ পেতে চাচ্ছিল ও। টিউশনির পর হৃদয় ঠাকুর। দেখা গেল, হৃদয় শুধু ঘামের দামই নেয়না, ডালের সঙ্গে ভাতের ফেনের দাম নেয়, তাছাড়া এঁটো ভাতেরও। হৃদয়-পরিবর্ত্তনের ফলে ইকমিক কুকার এলো ফ্ল্যাটের আধখানা ঘরে। ঘর ঝাঁট

দিয়ে ধুলো-বালি জড় করছিল দীপায়ন ও-ঘরটাতে। এখন ওখানে স্বকীয় খাস খাবার ব্যবস্থা হ'ল।

তাতেও তেমন সুখ হচ্ছিলনা ওর। যখনই মনে পড়ত বাড়ি থেকে টাকা আসছে, অস্বস্তিতে শরীরের তাপ মালুম-হয়-মতো এক আধ ডিগ্রী যেন বেড়ে যেতো তখন। কবিতায় টাকা পাওয়া যায়না কিন্তু প্রবন্ধের হয়ত এ দুর্ভাগ্য নেই, প্রবন্ধ তৈরীর জন্যে এলোমেলো চিন্তার সূত্রগুলোকে ও গুছোতে সুরু করত। কিন্তু প্রবন্ধ তৈরী হলেও বা কি, তখন ত আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে বামপন্থী কাগজের কার্য্যালয় ছিলনা, তাছাড়া যুদ্ধের ঠিকেদারির দৌলতেও একদল সাহিত্য-সেবক গজিয়ে ওঠেনি। কুইনিনের পর্য্যায়েই সাহিত্যের ঠাঁই ছিল তখন বাজারে! তবু দু'একটি ক্ষীণপ্রাণ কাগজ খুবই সমাদর করল দীপায়নের রচনার, কিন্তু, দীপায়ন নিজেই বুঝতে পারল, রচনার অর্থ-মূল্য দিতে গেলে তাদের অবশিষ্ট প্রাণটুকু বেরিয়ে যেতে মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব হবেনা।

কাজেই সাহিত্য ছেড়ে অন্য পথ ধরবে, ভাবছিল দীপায়ন। সাহিত্যের মায়ায় ভুলে থেকে লাভ নেই। সত্যিকারের কাজ চাই—কায়িক শ্রমের কাজ। শ্রমের বিনিময়ে রুটি কিনতে হবে—বুদ্ধির বিনিময়ে নয়।

দীপায়নের জঙ্গী সাহিত্য-চর্চ্চায়ও ভাটা পড়ল। কারণ, দেখা গেল, ওর দেহ-ই এবার জঙ্গী হয়ে উঠতে চায়। পোষাকী দেহ আর নয়, ইস্পাতের আলিঙ্গনে তৈরী হোক ইস্পাতী শরীর। 'নকল সে শৌখিন মজদুরি'র কথা রবীন্দ্রনাথ আরো কিছুদিন পর বলেছিলেন, যখন দীপায়নও সত্যি-সত্যি এ-ধরনের একটা কথা মনে-মনে খুঁজতে সুরু করেছিল, কিন্তু তখন, ১৯৩৮-এ, যদি রবীন্দ্রনাথ দীপায়নের নূতন জীবনের স্বপ্ন এ-ভাবে ভেঙে দিতে চাইতেন, তাহলে হয়ত ধীরাজবাবুর সঙ্গে তৎক্ষণাৎ দেখা করে এবার সরাসরিই বল্‌তে পারত ও: "বুর্জ্জোয়া বুকনির দিন আর নেই ধীরাজবাবু—মুরুব্বিদের বলবেন।"

এ-কৃচ্ছ-সাধনের পর্ব্ব যে কোথায় গিয়ে পৌঁছত তা হয়ত (দীপায়নেরই ভাষায়) ওর জার্ম্মপ্লাজম্-ও জানতনা। তবে জার্ম্মপ্লাজমের ধর্ম্ম এই যে অস্বাভাবিক জীবন-যাপনে তা প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমরা হয়ত ভাবি বাধাটা বাইরে থেকে আসছে, ভেবে দেখিনে আমাদের স্বাভাবিক ইচ্ছা,

কামনা, আবেগ, অনুভবের মৃতদেহ জমে-জমেই যে মনে বাধার প্রবালদ্বীপ গড়ে ওঠে।

কিন্তু বাসব মনে করে, তাকে ছাড়া দীপায়নের ও-অধ্যায়টার রং-বদল হতনা। বাসবের ধারণা খোঁজখবর নিয়ে একদিন সে দীপায়নের এই অজ্ঞাত-বাসে এসে হাজির হয়েছিল বলেই নাকি দীপায়ন যা হতে পারত তা না হয়ে সুশ্রী শোভন হয়ে উঠ্‌লো! বন্দী-শিবির থেকে বাসব গ্রামোফোন বা রিষ্টওয়াচ নিয়ে আসেনি, নিয়ে এসেছিল তার চেয়ে ঢের বড়ো বিলাসিতা—মনে মনে একটা বিশ্বাস, একটা গর্ব্ব যে সে মানুষ তৈরী করতে পারে।

শিবির-ফেরতা বাসব নিজেকে সাম্যবাদী বলেই ঘোষণা করছিল।

"আশ্চর্য্য—দেবুদা কিছুতেই বুঝতে চাইতেন না আমরা যে ভুল পথে গিয়েছিলাম—" বাসব তার নিজের রং-বদলের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করছিল দীপায়নের ঘরে বসে। ভুমিশয্যা—মেঝেতে সতরঞ্চি বিছানো, গুটোনো তোষকের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বাসব একটা মহাজনী ভঙ্গী ফুটিয়ে তুলেছিল তার পাঁশুটে চেহারায়: "তবু ভালো—ভুল না ভাঙাও খানিকটা ভালো। ভুলও ভাঙল, সত্যকেও চাইলাম না, তখন পাগল না হয়ে অন্যকিছু হবার আর পথ থাকেনা। ক্যাম্পে মাথা-খারাপ হয়ে গেছে অনেকের—শুধু এজন্যে!"

দীপায়নের চোখ সশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল বাসবের সুসমাচারে। দাদা কি করছেন না-করছেন তা ওর কানে পৌঁছয়নি—কানে গুঞ্জন তুলছিল বাসবের গোড়ার দিকের একটি কথা: "সমাজ আর রাষ্ট্র বিজ্ঞানের বাঁধা সড়কেই চলে, তাকাতে শিখিনি বলেই আমরা অন্যরকম ভাবি।" তাহলে আমি ভুল করিনি —ভাবছিল দীপায়ন—বাসবের মতোই ভাবতে পেরেছি আমি। আমার মন খুঁজে নিতে পেরেছে সত্য জ্ঞান—স্বাধীনভাবে, একা-একা খুঁজে নিতে পেরেছি আমি পৃথিবীর ভবিষ্যৎকে। নিজেকেই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছিল দীপায়ন—সঙ্গে-সঙ্গে বাসবকেও খানিকটা। বাসব যে অন্যরকম ভাবছেনা—তাই। সিরাজুলের পর সুরজিৎ, তারপর বাসব। একই ছবি কিন্তু ক্রমে স্পষ্টতর। ক্রমেই দীপায়নের চিন্তার ছবির সঙ্গে তা মিলে যাচ্ছে। একটা শোভাযাত্রা—ক্রমেই এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ওকে ডেকে নেবে বলে? ডাকতে হবে! ডাক দিয়ে তৈরী করতে হবে দীপায়নকে? ও কি তৈরী হয়েই ছিলনা, পা' কি ওর তৈরী নয় শোভাযাত্রার ব্যাসে মিশে যাবার জন্যে?

"পুঁথি-পড়া পণ্ডিত বলে দেবুদা আমায় ঠাট্টা করতেন", দেবুদার ছেলে-মানষির উপর স্নেহাতুর হাসি ছিঁটিয়ে দিচ্ছিল বাসবের চোখ: "পড়াশুনো না থাকলে আজকের দিনে পোলিটিক্স চলে? লেনিন শুধু বিপ্লবীই ছিলেন না..."

"লেনিন আমি পড়েছি।" দীপায়ন ঠাণ্ডা, নরম গলায় নিবেদন করতে চাইল: "কিন্তু লেনিন মার্ক্সকে খানিকটা টুইষ্ট করেন নি কি? তোর কি মনে হয়, বাসু?"

অনুপস্থিত দেবুদাকে আর করুণা বিতরণ না করে বাসবের চোখ এবার দীপায়নের উপরই হেসে উঠল: "মার্ক্সবাদ ত গোড়ামি নয়, দেশকালপাত্র ভেদে তার চেহারা বদলায়!"

"তাহলে তাকে বিজ্ঞান বলছি কেন?"

"বিজ্ঞানের কি চেহারা-বদল হয় না?"

"তা হয়।" দীপায়নের আপত্তি জল হয়ে গেল।

মনে হচ্ছিল, বাসবের ঠোঁটে বিন্দু-বিন্দু হাসিগুলোকে যেন ধরা যায়, ছোঁওয়া যায়। এ ঠিক তেম্নি হাসি, অবোধ শিশুকে কোলে নিয়ে মা যেম্নি হাসেন অথবা ব্রহ্মজ্ঞানী মায়াচ্ছন্ন মানুষ-সাধারণের দিকে তাকিয়ে। দীপায়নের বালসুলভ চঞ্চল মনের ছবিই বাসবের মুখে হাসি মাখিয়ে দিচ্ছিল: ও ভাবছে মার্ক্সবাদে গূঢ়তত্ত্ব ওর শেখা হয়ে গেছে—কয়েকটা বই হয়ত পড়েছে, কার লেখা কে বলবে, বুর্জোয়া লেখকেরই হয়ত কিম্বা ভ্রান্ত, রোমান্টিক বিপ্লবীদের—তা পড়েই ভাবছে, জানার আর কিছু বাকি নেই! ছেলে-মানুষ! পানুটা ছেলেমানুষই রয়ে গেল চিরকাল! বাস্তব বলে কোনো বস্তুই ওর চিন্তায় নেই। সব-কিছু মানিয়ে ধীরে-ধীরে এগোতে হয়—তাকেই বলে বাস্তব। ষ্টালিন না পড়লে এ-শিক্ষা কোথায় পাবে পানু? কে ওকে বুঝিয়ে বলবে, ও যা শিখছে তা ভুল?

বাসবের হাসিতে কেমন-যেন একটু অসহায় মনে হ'ল নিজেকে দীপায়নের। মনে হল যেন ও হারিয়ে যাচ্ছে। আর তাই, হারিয়ে না যাবার জন্যে, আলোচনাটার উপর যবনিকা টেনে দিতে চাইল: "কোথায় আছিস রে বাসু"

"কোথায় আবার, কোথাও না!"

"বাঃ রে! হাওড়া-ষ্টেশনে থেকে সরাসরি এখানে এসে কিছু উঠিস্ নি তুই!"

"হাওড়া থেকে না হলেও নারায়ণগঞ্জ থেকে সরাসরিই এখানে। এক ডেটিন্যু-বন্ধুর বাড়িতে সপ্তাহখানেক নারায়ণগঞ্জে—ভাবছিলাম তোদের বাড়িও যাব—দেবুদার চিঠি পেলাম তুই এখানে। তোদের সহরে না গিয়ে মহানগরেই এলাম।"

"আমার খোঁজে নিশ্চয়ই নয়।"

"খোঁজ যদি নিতেই হয় তোরা দু'চারজন ছাড়া আর কে আছে যার খোঁজ করব?

দীপায়ন লক্ষ্য করল, বেশ শুকনো খরখরে গলা বাসবের, একটু নরম নয় অথচ কথাটা আবেগরই ভাষা, যে-ভাষা উচ্চারণ করতে গেলে দীপায়নের গলা আজও স্যাঁৎসেতে উঠবে। আবার শুনতে ইচ্ছা করল বাসবের মুখে ও-কথাটা, মন দিয়ে শুনতে ইচ্ছা করল, মনে তুলে নেবার জন্যেই শুনতে চাইল দীপায়ন।

কিন্তু বাসব এবার সহজ, স্বাভাবিক বন্ধু হয়ে উঠল: "তুই একা এই ফ্ল্যাটে আছিস্ পান্থ? খাস কোথায়—রান্নার লোক ত দেখছিনে।"

"নেই।" হাসতে চাইল দীপায়ন।

"তবে? হোটেলে খেতে সুরু করেছিস?"

"কেন? আমি কি রাঁধতে জানিনে?"

"ওঃ—খুব উন্নতি হয়েছে ত তোর! খাঁটি বামুন হয়ে উঠেছিস!"

"আর যা-খুসী বল্ বাসু—" দীপায়ন অনুনয় জানালে: "বামুন বলে গাল দিসনে।" তারপর হঠাৎ-ই যেন বাসবের খরখরে গলাটা মনে পড়ে গিয়ে অনুনয়ের কণ্ঠ কঠিন হয়ে দাঁড়াল: "আমি বামুন নই।"

বাসব কি শুনল তা বাসবই জানে কিন্তু দীপায়ন ওর কঠিন কণ্ঠেও শুনতে পেলো একটা অভিমানের সুর। কি আশ্চর্য্য—মনে-মনে ও যা বিশ্বাস করে তা-ও সহজ রূঢ়তায় বলতে পারে না!

"বেশত—না-ই বা হলি তা"—বাসব আবার স্নেহার্দ্র হাসি ফিরিয়ে আনল মুখে: "এতো হাঁক-ডাকের কি আছে তাতে?"

সত্যি, এ-ঘোষণা কেন? আর ঘোষণাই যদি, অভিমান কেন? কার উপর এ-অভিমান? আগেকার জীবনের উপর? শুধু অভিমান করেই কি দীপায়ন নূতন ধরনে জীবন-যাপন করতে এলো? তবে কি এ-জীবনে ওর বিশ্বাস

নেই ? বিশ্বাসের মেরুদণ্ডের ভরে দাঁড়িয়ে নেই দীপায়ন, দাঁড়াতে চাচ্ছে অভিমানের হাওয়ার দোলায় ! হাসতে চাইল দীপায়ন, পাথরের মূর্ত্তিতে খোদাই নিশ্চল হাসি যেমন হাসতে চায় !

"কাল থেকে আমি এখানে আসছি—" ভূমিকার উস্‌খুসি ছিলনা বাসবের : "জানিস ত ? কিন্তু ভাবিসনে দেবুদার পরামর্শে তোর নিঃসঙ্গতা ভঙ্গ করছি ! আমারও ত থাকবার একটা ঠাঁই চাই !"

"আমি বল্‌তাম তোকে···" কথাটা তাড়াতাড়ি বলেও দেরী করার অপরাধ যেন ঘোচাতে পারলনা দীপায়ন আর তাই সে-দেরীর অপরাধ বাসবের ঘাড়ে তুলে দেবার জন্যে বল্‌লে : "কি সব আজে-বাজে বকছিলি এতোক্ষণ, কাজের কথা কারো মনে থাকে ?"

"আমি আসছি এবং একজন লোক নিয়ে"—'এবং' শব্দটার বিশুদ্ধতার ভড়ং দিয়ে দৃঢ়তাই বোঝাতে চাইল বাসব, তারপর 'একজন লোক'-কে বিশেষিত করল : "রান্নার লোক।"

স্বপ্নে অনেকদিন কেঁদে উঠেছে দীপায়ন, মনে হ'ল এখনও ও ঠিক তেমি কাঁদতে পারে। কিন্তু দিনের আলোতে কি কাঁদা যায়, আরো বামপন্থা বাসবের সামনে !

সতেরো

বাংলা-সাহিত্যের আইন-কানুন মেনে নিয়ে আমি যদি উপন্যাস লিখতে সুরু করতাম, তাহলে এ-কাহিনীতে এখন বাসবই সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে উঠত। কিন্তু তা যখন করিনি তখন বাসবেরও আর নায়ক-সৌভাগ্য হলনা। দীপায়নের সামনেই আবার সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছি। তবে বাসবকে একেবারে বঞ্চিত না করে অনুরোধ করছি, তার সাঙ্গীতিক চোখে তখন দীপায়ন দেখতে কেমন ছিল, আমাদের তা জানাতে।

ধরুন, বাসব আজ গা-ঢাকা দিয়েছে, অথচ আমি জানি কোথায় তাকে নিরিবিলি পাওয়া যায় এবং আমি একজন সাংবাদিক। এড্‌গার স্নো মাও-সে-তুংএর দর্শনার্থী হয়ে যেম্নি রেড্‌-চায়নায় প্রবেশ করেছিলেন, আমিও যেন তেম্নি বাসবের গুপ্ত-আস্তানায় গিয়ে হাজির হয়েছি। উপমাটাতে আপনাদের আপত্তি আছে? কোথায় স্নো আর কোথায় ঘোষাল—কোথায় বা মাও আর কোথায় বাসব—এই ত আপত্তি? কিন্তু একটু তলিয়ে বিচার করুন ত—যারা সাধারণ মানুষ, আমার-আপনার মতো জনসাধারণ, তাদের কথাটাই ভাবুন একবার। আমরা ত বড়োদেরই নক্সায় নিজেদের সাজাতে পছন্দ করি এবং তা করে দৈবাৎ বড়ো আর প্রায়ই হাস্যাস্পদ হই। তাই না? ওই যে দৈবাৎ কেউ বড়ো হয়, ওয়ান-পারসেণ্ট চান্স যে ঝিল্‌মিল্‌ করে ওঠে চোখের উপর, তারই লোভে আমরা ইঁদুরমারা বিদ্যায় মেতে উঠি।

দেখুন, নিজেকে সাংবাদিক বলে মনে করতেই কথাগুলো আমার প্রায় এখনকার বাংলাসাহিত্যের চটুলতা ধরে উঠেছে (সাংবাদিকের রসিকতার সঙ্গে খানিকটা চোখের জলের পাঞ্চকেইত আমরা ইদানীং সাহিত্য বলে গ্রহণ করেছি)। কাজেই নিজেকে সামলে না নিলে হয়ত এই চাটিম-চাটিম বুলির শেষে একটি অশ্রুময় কাহিনী হাজির করে আমি আপনাদের বাহবা কুড়োতে চেষ্টা করব। কাজেই আমার কথা থাক্‌—বাসবকে শুনুন। মনে করুন সাংবাদিকের ভঙ্গীতে আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছি: "দীপায়ন সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?"

"খুব স্পষ্ট ধারণা। কবি, রোমান্টিক—এককোঁটাও প্র্যাকটিক্যাল নয়। বাংলাদেশের ছেলেরা যা হয়, পান্নু তা-ই।" মিহি হাসিতে সৌজন্য, আত্মপ্রসাদ এবং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বোঝাতে চাইল বাসব।

"তা শুনতে চাইনে—" ভেবে নিন, আমি সর্টহ্যাণ্ডের খাতা থেকে পেন্সিল তুলে নিয়ে আমার নীচের ঠোঁটের খুঁটি হিসেবে ওটাকে ব্যবহার করছি: "আপনি ত অনেকদিন ছিলেন দীপায়নের সঙ্গে, তখনকার ছবিটাই চাই।"

"ছবি আর কি? রোমান্টিকের ছবি সবারই ত জানা। তবে ওর রোমান্টিসিজ্‌ম্‌ সোজাসুজি বেড়ে চলতে পারেনি—তা বোধহয় আমার সঙ্গে ক'বছর ছিল বলেই।"

"মাপ করবেন। একটা কথা বল্‌ছি। ইদানীং আপনার যে দুর্দ্দান্ত মনোভাব--বিপ্লব করবার নেশায় গা'-ঢাকা দিয়ে আছেন—তা কি দীপায়নের সঙ্গে থাকার ফলেই হয়নি আপনার?"

"আপনি হয়ত আমাকে জানেন না, কাজেই প্রশ্নের উত্তরটা না-ই বা শুনলেন।"

"যাক্‌, সে-উত্তর আমার না শুন্‌লেও চলবে—যা শুনতে চাচ্ছি তা-ই বলুন।"

"পান্নুর কথা?" বাসব চোখ বুঁজে ভুরুর নীচে নাকের দু'ধার দু'আঙলে টিপে ধরল: "আচ্ছা—বলছি- শুনুন!"

বাসবের কথা

অতীতের জাবর কাটা আমি পছন্দ করিনে বর্ত্তমানই আমার সব। তবে পান্নুর কথা যখন জিজ্ঞেস করছেন তখন নিয়মভঙ্গ করতে হচ্ছে। আমাদের মতের অমিল যা-ই থাক, এক জায়গায় হয়ত আজও আমরা মিলতে পারি—কারণ আমরা বন্ধু।

শুনেছি আজকাল আর ও লিখছেনা - খ্যাতির মুখেই লেখা ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। আরেকবার এম্নি হয়েছিল ওর—তখন আমি ওর পাশে ছিলাম। কলম ছেড়ে দিয়েছিল, আমিই ওর হাতে ফের কলম গুঁজে দিয়েছিলাম। তখন ও নামজাদা কথাসাহিত্যিক নয়, ছিল কবি।

একটা-কিছু কাজ করবার জন্যে তখন ও পাগল কিন্তু আমি দেখেছিলাম ওর শরীরে ভারি কাজ সইবে না। তাছাড়া এ-কথাও যে ওর মনে কে ঢোকালে যে লেখক হওয়াটা কোনো কাজই নয়, তা ভেবেও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। রোমান্টিক মনে মার্ক্সবাদ বিষম ফল ফলায়। বলতে হল: "শোলোকভ, এলেক্সি টলষ্টয়—এঁরা রাশিয়ায় অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়।"

"রাশিয়ায় পেটিবুর্জ্জোয়ার খবরদারিতে বুর্জ্জোয়া-বিপ্লবের অধ্যায় চলেছে—" সোজাসুজি বলে বসল পানু।

"মার্ক্স সেক্সপীয়র পড়তেন—তিনি নিশ্চয়ই বুর্জ্জোয়া ছিলেন না!" হাসলাম।

শ্রমিক বিপ্লবে লেখকের দায়িত্ব সম্পর্কে কথাগুলো পানু আমার মুখেই দিনের পর দিন শুনতে পেয়েছে। বুঝতে পারছিলাম ও ভীষণ তেতে আছে—ঠাণ্ডা করে নিতে দু'চারদিন সময় লাগবে।

লেখকের মেজাজ ফিরে আসছিল ওর ধীরে ধীরে। কারণ রাত্রিতে বাতি নিভিয়ে যখন ঘুমের জন্যে দুজনেই তৈরী হয়ে উঠ্তাম—পাশাপাশি বিছানায় দুজনেই জেগে চুপচাপ থাকতে চাইতাম খানিকক্ষণ; তখন পানু হঠাৎ কথা বলে উঠ্ত। স্মৃতি-রোমন্থন চলত ওর, শরৎবাবুর না-হয় নজরুলের স্মৃতি। ওর ধারণা ছিল আমরা একদম পচে গেছি। 'তা ই যদি না হবে তাহলে শরৎবাবুব মৃত্যুর খবরে কলকাতা কি করে এমন উদাসীন থাকে? একজন শ্রেষ্ঠ লেখকের এ-অশ্রদ্ধায় পানু না কি সেদিন শরৎবাবুর শবদেহের সামনে দাঁড়িয়ে ছট্ফট করে উঠেছিল। এতো বড়ো একজন কথাশিল্পী চিরদিনের জন্যে নির্ব্বাক হয়ে গেলেন—সে ব্যথা কি কলকাতাব জীবন-প্রবাহকে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যেও বন্ধ করে দিতে পারেনা—আমরা কি অনুভব কবিতে পারিনে যেন আমরা কথা বলতে-বলতে হঠাৎ কথা হারিয়ে ফেললাম? সংখ্যায় তাঁরা পঞ্চাশটিও হবেন না, যাঁরা তা অনুভব করলেন—যাঁরা এসে শরৎবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। আশ্চর্য্য।' একটা নিঃশ্বাস ফেলে পানু চুপ করে থাকত কয়েক সেকেণ্ড, তারপর মন্তব্য করত: "এ পোড়া-দেশে কেউ লেখক হয় না কি। তুই আমায় লিখতে বলিস—তার চাইতে রিক্স-টানাও ভালো!"

"মাথা-গরম না করে ঘুমো ত এখন!" অস্পষ্ট ভারি গলায় শাসন করতাম পানুকে।

"তারপর খবরের কাগজে আর শোকসভায় ইনিয়ে বিনিয়ে কতো কান্নাই আমরা কাঁদলাম।" পান্নু কিছুতেই বাংলাদেশের ত্রুটী মার্জ্জনা করিতে পারছিলনা: "কান্নাটা আমাদের পাব্লিসিটি—কে কতো বড়ো সমঝদার তারই ঘোষণা। জানিস বাসু, ব্যথার কান্না মোটেও এ নয়।"

"মরে গেলে মানুষ কাঁদবে তার জন্যে কি কেউ লেখক হয়?" এবার আর শাসনে নয়, লজ্জায় ফেলতে চাইলাম ওকে।

"কেবল অবহেলাই পাব, মেনে নিয়েও ত কেউ লেখক হতে যায়না!"

চুপ করতে হ'ল—ওকে চুপ করাবার জন্যেই। কিন্তু ফল হল উল্টো, পান্নু ভেবে নিলে ওর শেষের কথাটায় আমার পুরোপুরি সায় আছে, কাজেই অনর্গল বকে যাবার জন্যে তৈরী হয়েই ও সুরু করলে: "গ্রামোফোনের গান শেখান, গান লেখেন আজ নজরুল ইসলাম—অনেকেই হয়ত ভাবে, তুইও নিশ্চয় ভাবিস, ব্যাপারটা কিছুই নয়। কিন্তু আমার চোখে ছবিটা সত্যি দুঃখের। আমি দেখতে পাই সমস্ত দেশের স্তূপস্তূপ অবহেলাই ওঁকে গ্রামোফোনের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে! তা-ই আমি দেখতে পাই। কারণ, নজরুলকে আমি আরেক চেহারায় দেখতে পেয়েছি। দেখেছি চারণের ভূমিকায় স্বদেশী মিটিং এ, প্রিন্স অব-ওয়েলস এসেছিলেন যখন কালো-পতাকার শোভাযাত্রা বার করে গাইতে শুনেছি তাঁকে: "জননী গো, দ।প নিভাও!"—শুনেছি 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তি করতে। আমার চোখে নজরুল ইসলাম বাংলার বিদ্রোহী সত্তা—গ্রামোফোনের ঘরের সঙ্গীত-শিক্ষক নয়।"

বড্ড বেশি কড়া-রকমের আদর্শবাদী হয়ে উঠ্‌ছিল পান্নু—ব্যাপারটা নিন্দার নয় কিন্তু অচল। ও ধরনের আদর্শবাদ মানুষকে কোণঠাসা করে দেয়—তাতেও তেমন ক্ষতি ছিলনা কিন্তু মুস্কিল যে আদর্শবাদী নিজেকে কোণঠাসা ভেবে মনে-মনে যন্ত্রণা পেতে সুরু করে। তার আব্দার থাকে—সবাই তার আদর্শটাকে লুফে নিক। ধ্রুপদ-খেয়ালের ওস্তাদ কি এমন আশা করতে পারে যে দেশশুদ্ধু মানুষ তাঁর গানের সমঝদার হয়ে উঠ্‌বে?

একজন রোমান্টিক কবিকে মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে আনবার পরিশ্রমটা বুঝুন একবার! শুধু রোমান্টিক বলেই যে বিপদ ছিল তা নয়। পান্নু ভাবত, রোমান্টিসিজমের জ্বর ওকে ছেড়ে গেছে, ওর প্রত্যেকটি রচনায় খাঁটি

বৈজ্ঞানিক জড়বাদ জলজল করতে সুরু করেছে। বুঝতেই পারেন—বাংলাদেশের কবির হাতে জড়বাদ যে-চেহারা নিয়ে দাঁড়ায় তাতে বাস্তবতা ছাড়া আর সব কিছুই থাকে—সহজ, সোজা কথা তাঁরা বলতে পারেন না—শুধু জটিলতা।

পান্নুর চার-ছ'মাস আগেকার লেখাগুলো সামনে নিয়ে জিজ্ঞেস করতাম: "এ লেখা কার জন্যে, পান্নু ?"

অম্লানবদনে বলত ও: "ভবিষ্যতের জন্যে।"

"তা বল্‌ছিনে। এখন এগুলো কে পড়বে ?"

"যারা এ-সমাজকে চায়না।"

"তারা বুঝবে ?"

"কেন ? না বুঝবার কি আছে ?"

"যারা এ-সমাজকে চায়না তাদের অনেকেই যে পণ্ডিত নয়।"

"কিন্তু পণ্ডিত ত হতে হবে তাদের।"

"পণ্ডিত করে তুলতে হবে—তা-ই বল্!" একটু থেমে পান্নুর মুখের দিকে তাকাতাম, দেখতে পেতাম সহিষ্ণুতার ছায়া নেমে আসছে ওর চোখে-মুখে: "আর তার জন্যে পণ্ডিতদের নেমে যেতে হবে তাদের কাছে—তাদের ভাষায় বোঝাতে হবে তাদের—তাদের জানতে হবে, চিনতে হবে।"

"তাদের জানতে হবে তা মানি।"

ওটুকু মানিয়েই সেদিন চুপ করে রইলাম। তারপর আরেক দিন:

"সহর আমাদের সবটুকু দেশ নয় পান্নু—আমাদের দেশের অনেকখানিই গ্রাম।"—

কৃষকসমিতির একটা বৈঠকে একটি সুন্দর বিকেল কাটিয়ে এসে রাত্রিতে তার স্নিগ্ধতা গভীর হয়ে উঠ্‌ছিল আমার মনে।

"সত্যি তা-ই।" পান্নু লুফে নিল আমার কথাটা।

"ভাবছি ক'টা দিন গাঁয়ে ঘুরে আসব।"

"কোথায় ?"

"এদিককারই কোনো গাঁয়ে। গাঁয়ে একজন কম্রেডের সঙ্গে পরিচয় হল আজ!"

"তোদের সঙ্গে আমি যেতে পারি ?"

"নিশ্চয় পারিস।" পান্নুর ব্যাকুলতায় যতোটুকু জোর ছিল আমার অনুমতিতেও ততোটুকু জোর শোনা গেল। তার মানে কি জানেন, আমার খুবই ইচ্ছা ছিল পান্নু একবার পাড়া-গাঁ ঘুরে আসুক। সহুরে সৌখীন সাহিত্যিক ত তাকালেই গণ্ডা-গণ্ডা চোখে পড়ে—যারা কথার ফানুষ উড়াতে ওস্তাদ—পান্নুও যদি তাদের দলেই গিয়ে গা মাখামাখি সুরু করে তাহলে আর কি হ'ল! তাছাড়া সৌখীন সাহিত্যের দিকে ওর ঝোঁক ত ছিলই—বরাবরই ছিল, প্রেমের কবিতায় যাদের সাহিত্য-চর্চ্চা সুরু হয়, তারা 'আর্ট ফর মাই সেক্' এর গোষ্ঠিতে ভর্ত্তি হয়! এদিক থেকে অবশ্য তখন পান্নু অন্যদিকে মোড় নিয়েছিল, তবু আশঙ্কা ছিল আমার, পাছে ও আবার আদি-পঙ্কে নেমে যায়। আমার আশঙ্কা যে বাজে নয় তার প্রমাণ দেখুন। গাঁয়ে যাবার মতি দেখিয়েও পান্নু জিজ্ঞেস করল আমায়: "আচ্ছা বাসু, তোর কি ধারণা যে পাড়া-গাঁর জীবন নিয়ে খুব ভালো সাহিত্য হয়?"

"যেখানে জীবন আছে সেখানেই সাহিত্য ফলবে—পাড়া গাঁ-তে জীবন আছে।" এ কথাগুলোও খুব জোর দিয়েই বলতে হল।

"এক সময় ছিল জীবন—" একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল পান্নু, একটু থামল, তারপর জিজ্ঞেস করল: "এখনও আছে?"

আপনি হয়ত বল্বেন দ্বিধাগ্রস্তকে দলে টানতে খুব সুবিধে বলেই পান্নুর মনে আমি সাম্যবাদের রঙ-টা পাকা করে দিতে পেরেছিলাম। যদি তা বলেন, আপত্তি জানাব না। কিন্তু এ-কথাটাও জেনে নিন যে পান্নু তা মানতে চাইবে না। সাম্যবাদ, সাহিত্য, বা গ্রাম্যজীবন নিয়ে ওর দ্বিধা ছিল বলে স্বীকার করবেনা ও কস্মিনকালেও। বরং বল্বে, 'বাসু আমাকে কতগুলো ভুল আইডিয়া মগজে ঢোকাতে বলেছিল!' পান্নু মনে করে সবই ওর নিজের আবিষ্কার। ভাবে, কখনও এমন কোনো কাজ ও করেনি গোড়া থেকে যার উপর ওর টান ছিলনা। কাজেই ওকে দ্বিধাগ্রস্ত বলাও ত বিপদ।

পাড়া-গাঁ নিয়ে আমি পান্নুকে তখন যা বলেছিলাম তার সঙ্গে ওর মনের ছবি মিল্ছিলনা—জমিদার-মহাজনের যাঁতাকলে চাষী-জীবন যে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছে আমি তারই বর্ণনা দিচ্ছিলাম কিন্তু পান্নু উস্‌খুস্ করে উঠ্ল: "পাড়া-গাঁয়ে যাদের আমি জানতান তারা ত এমন ছিলনা! তুই বানিয়ে-বানিয়ে বল্ছিস বাসু—"

"তুই যাঁদের জানতিস তাঁরা ত চাষী নন।"

"হেঁ, চাষীদেরও জানতাম। আলি—আমাদের আলি ত চাষীর ছেলেই ছিল।"

"বেশ ত, গেলেই দেখতে পাবি। সত্যিকারের জীবনকে পিষে-পিষে কতগুলো অস্বাভাবিক জীবন গজিয়ে উঠ্ছে, বুঝতে পারবি।" বিদ্রূপে খানিকটা কঠিন শোনাল আমার কথাগুলো, আর, সত্যি বলতে, বিদ্রূপটা সরাসরি পানুর উদ্দেশ্যেই ছিল।

কেন ছিল জানেন? যেমনি পানু তেমনি দেবুদা সচ্ছল মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে—নীচের তলাকার মানুষদের এ-ঘাটে ও-ঘাটে বিক্রী করাই যাদের পেশা। চাষী-মজুরের জীবনকে ওরা কি জানবে? সাম্যবাদের নামেই তেতে উঠতেন দেবুদা—আর পানুর সাম্যবাদ! ওতো ইংরেজি শেখার মতোই একটা বিদ্যার্জ্জন। অবশ্য পানুকে তখনও আমি ঠিক বুঝতে পারিনি—তা আমারই বোকামি। ভেবেছিলাম, ওর বুঝি জ।বনের মোড়ই ফিরে গেল। একা একটি ফ্ল্যাটে থাকে—চাকর নেই—নিজে হাতে রেঁধে খায়—মার্ক্সবাদের কয়েকটি পুঁথি শিয়রে রাখে—কাজেই ভেবেছিলাম বুঝিবা একজন সৈনিক পাওয়া গেল। উৎসাহের আতিশয্যেই মানুষ ভুল ভাবে। ক্যাম্পে যখন মার্ক্সবাদের দীক্ষা নিয়েছিলাম তখন ভাবতাম ক্যাম্পের বাইরে কেউ হয়ত এ-দীক্ষা পায়নি। বাইরে এসে দেখলাম পেয়েছে দু'চারজন—উৎসাহে বুক ভরে উঠল—তারপর পানুকে যখন দেখলাম তখন আর বিচার করে দেখবার কথা মনে হলনা—যে-বিচার আজ করতে পারছি।

আপনি হাসছেন। কেন হাসছেন বলব? ভুলটা স্বীকার করি বলে—কেমন? রাজনৈতিক দল মাত্রেই ভুল করে—মানুষই ভুল করে—কিন্তু মজা এই কেউ তা স্বীকার করে না। আমি করি। এ-যদি কারো হাসির খোরাক হয় তাকে আর কি বলা যায়।

যাক্, আজ আমি পানুকে য'-জানি তা ত আর আপনি শুনতে চাননা—আপনি দশ-বারো বছর আগেকার কাহিনী চান। খানিকটা সাবজেক্‌টিভ হয়ে পড়েছিলাম—ক্ষমা করবেন।

আমরা গাঁয়ে গেলাম। আমি গেলাম ঘাঁটি গড়তে আর পানু গেল গাঁয়ের মানুষ দেখতে। দু'জনের উদ্দেশ্যে তফাৎ ছিল দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু

আমার ধারণা ছিল এ-তফাৎটা নেহাৎই বাইরের। মনে আর মতে আমরা যখন এক তখন দু'টি ধারা এক হতে বাধ্য। তার মানে, আমার আশা ছিল পান্নু আমাদের লিটারারি ফ্রণ্টটা মজবুত করে তুলবে। কাজের রকম আলাদা বলে কি, ফল হবে একই।

সত্যিকারের পাড়া-গাঁ বলতে যা, এ তা-ই। একটিও পাকা-বাড়ি নেই। খড়ো ঘরগুলোও গাছ-গরানের আড়ালে এম্নি গা-ঢাকা দিয়ে আছে যে হঠাৎ নজরেই আসেনা। সন্ধানী চোখ না থাকলে ভাববেন হয়ত সোঁদরবনেই ঢুকে পড়েছেন। জমিদার-মহাজনের মহাল সন্দেহ নেই কিন্তু তাঁরা গাঁ-বাঁচিয়ে আছেন দু'তিন ক্রোশ দূরে। বছরে একবার মাত্র তাঁদের হুশ হয় যে ওখানে বাঘ শেয়াল চরছেনা, মানুষই চরে খাচ্ছে—তখন তহশীলদার আর দাদনদার বাবুদের আমদানী হয়। বাবুর নিশানা ফর্সা ধুতি আর জুতো—যা এ-গাঁয়ের কারো গায়ে-পায়ে কোনোদিন ওঠেনি।

কম্রেড সনাতনের সঙ্গে না দেখলে হয়ত আমাদেরও ওরা বাবু বলেই ধরে নিত। সনাতনের এক মাসীর বাড়ীতে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হল। সনাতনের মাসী মানে সত্যিকারের মাসী নয়—ও ধরণের মাসী-খুড়ি-জ্যাঠাইমা ওর গাঁ-ময় ছড়িয়ে ছিল। সনাতনের সঙ্গে দেখেও যাদের সন্দেহ ঘোচেনি, মাসীর বাড়িতে উঠতে দেখে তারা নিঃসন্দেহ হয়ে গেল—কারণ, সত্যি-সত্যি যদি আমরা বাবু-ই হতাম তাহলে জমিদারের কাছারী বাড়িই ত আমাদের জন্যে খোলা ছিল।

মাসীর ঘর আর মাদুরের বিছানা আমার আরামের ব্যাঘাত করেনি কিন্তু পান্নুর ঘুম আসছিলনা। প্রথম রাত্রিতেই ও আমাকে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলে: "ওকে তুই-ও মাসী ডাকছিস কি করে, বাসু?"

বিশ্রী লাগ্‌ল কিন্তু বিরক্ত না হয়ে পাল্টা জিজ্ঞেস করলাম: "ক্ষতি কি?"

"ক্ষতি নয়। কিন্তু তোর ইচ্ছে করে ডাকতে?"

"কেন ইচ্ছে করবে না?"

"যাকে-তাকে তুই যা-খুসী ডাকতে পারিস—মা-মাসী-দিদি?"

"খুব পারি!"

"কিন্তু আমি পারিনে। কিছুতেই আমার ইচ্ছে হচ্ছেনা তোদের ওই মাসীকে মাসী বলে ডাকতে।"

"ইচ্ছে না-হওয়াটা ভালো নয়।"

"ভালো নয় জানি—কিন্তু কি বিশ্রী যে লাগছে আমার ওকে দেখে! মেয়েদের চেহারা এমন হয়।"

"মেয়েরা কি সবাই দেখতে ভালো?"

"মানুষের মতো ত অন্তত। ওকে কঙ্কাল ছাড়া আর কি বলা যায়—কঙ্কাল বিছানায় শুয়ে নেই, সুস্থ মানুষের মতো চলাফেরা করছে! দেখতে কী-রকম লাগে!"

"ও তাই!" খানিকটা স্বস্তি পেলাম মনে: "মেয়ে পুরুষ সবার এখানে এ হাল—কাল সকালেই দেখতে পাবি।"

সকাল বেলা গাঁয়ের লোকদের দেখে আর তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলবার চেষ্টা করে পান্নুর যা ধারণা হল তা রাত্রির প্রশ্নের চাইতেও অদ্ভুত।

"জানিস্ বাসু, ওরা মানুষের মতো বাঁচতে শেখেনি।"

"কে শেখাবে?" হেসে উঠলাম।

"শিখবার ইচ্ছেই নেই। মানুষের কোনো দাম নেই ওদের কাছে! জন্ম-মৃত্যু যেন কোনো ঘটনাই নয় ওদের জীবনে!"

"কার অপরাধে?"

"অপরাধ যারই হোক—জ্যান্ত মানুষের ত ইচ্ছে বলে একটা জিনিষ থাকে, এ-ইচ্ছেটাও ওদের নেই—যেখানে পড়ে আছে সেখান থেকে এক-পা উপরে উঠে যাবার ইচ্ছে নেই।"

"সবই আছে কিন্তু ধুঁকছে। রোগীকে যখন চাষের পরিশ্রম করতে হয়—শুধু পথ্যের জন্যে, অষুধের জন্যেও নয়—তখন আর তার কি থাকে বল ত? বাঁচবার ইচ্ছে থাকে? থাকে জীবন-বোধ? মানুষের দাম?"

আরো হয়ত অনেক-কিছুই বলেছিলাম পান্নুকে – ঠিক মনে পড়ছে না। ছোট-খাট একটা বক্তৃতা দিয়ে বক্তৃতা দেবার ক্ষমতাটাকেও হয়ত পরখ করে নিয়েছিলাম! কিন্তু পান্নুর তাতে মন উঠলনা। মনে হ'ল, আমার এতোগুলো কথায়ও ওর প্রশ্নের কোনো জবাব মিল্‌ছেনা। তাই এবার প্রশ্নটা জানবার জন্যে প্রশ্ন করলাম: "এদের দেখে যে তোর ভালো লাগছেনা তা যেন বুঝলাম—কিন্তু কেন? খারাপ লাগছে কেন?"

পান্নু চুপ করে রইল, অতএব আমাকেই বলতে হল আবার : "বলব, কেন তোর খারাপ লাগছে ?"

"কেন ?" পান্নু হাসতে চেষ্টা করল।

"তোর মনে চাষীর যে-ছবি আছে তার সঙ্গে এরা মিলছেনা। আমি ত বলেই ছিলাম, এখানে আরেক ছবি দেখতে পাবি।" পান্নুর চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চাইলাম ঠিক জবাব ও পেয়েছে কিনা। কিন্তু না, নম্র হয়ে আসেনি ওর চোখ, তাই আবার যখন কথা বলতে সুরু করলাম—খানিকটা রূঢ়ই শোনাল আমার গলা : "এরা যাদের বাবু বলে হয়ত তাদের দেখলেই তুই খুসী হতিস।"

"মোটেই না।" হাসতে সুরু করল পান্নু : "তোর সবগুলো ধারণাই ভুল।"

"তাহলে সত্যি কথাটা কি ?"

"ভাবছি, যাদের কাছে জীবনের কোনো মানে নেই, তাদের দিয়ে কি হবে ?"

"আর-কিছু না-হোক—ভেঙে ফেলার কাজ ত হবে।"

"না, তা-ও নয়।"

"এখানে আমাদের মতের পার্থক্য থাক্।"

"বেশত—থাক্।" সশব্দে হেসে উঠল পান্নু।

কাজেই আমাদের বৈঠকে পান্নু গরহাজিরই থাকত। কমরেড সনাতন আমাকে দু'একদিন জিজ্ঞেস করেছে, "কমরেড দীপায়ন আসেন না যে বৈঠকে ?"—আমার জবাব ছিল : 'রাত্রিতে ও গাঁয়ের রাস্তায় চলতে ভয় পায়—বড্ড সাপের ভয় ওর।"

কূটনৈতিকদের মুখে সে-ধরনের হাসি দেখে সাংবাদিকরা খুসী-মাফিক মানে করে নেন, বাসব এখনে ঠিক তেম্নি একটা হাসিতে কথার স্রোতে বিরাম গ্রহণ করতে চাইল। আমার মনে হল, বিরাম কিন্তু ওটা-ও হয়ত একরকম কথাই। সিনেমেটোগ্রাফির উপমায় বলা যায়, শব্দ-শক্তি এখানে আলোক-শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর সেই আলোক-শক্তি যখন আবার শব্দে ফিরে এলো তার মানে, যখন বাসবের হাসি আবার কথা হয়ে ফুটে উঠল তখন শুনতে পেলাম ও বলছে : "কাজেই বুঝতে পারেন, পান্নুর মনটা চিরকালই বুর্জোয়া। আমি ওকে বাবু কমুনিষ্টই ভাবতাম।"

আঠারো

বাসব আজ দীপায়নকে যা-ই বলুক আমরা যখন ওদের দুজনকে হাজরা রোডের একই ঘরে বছরের পর বছর দিব্যি আরামে কাটিয়ে দিতে দেখেছি আর আজও যখন বাসবের কথায় দীপায়নের চোখে সুখের স্মৃতি ঝিলকিয়ে উঠ্‌তে দেখ্‌ছি, শুনতে পাচ্ছি ও বলছে: "বাসব? বাসবের কাছে আমি অগাধ ঋণী! দীপায়ন চৌধুরীর অনেকটাই ত বাসব!"—তখন এমন অনুমানকেই সত্য বলে মেনে নিতে হয় যে যা-কিছু গোলমাল তা ইদানীংকার বাসবের মনেই পাকিয়ে উঠেছে। জানি 'ইদানীংকার' কথাটাতে আপত্তি হতে পারে কারণ সবরকম অস্বস্তি বা অস্তিত্বেরই একটা অতীত ইতিহাস থাকে। বলতে পারেন: যে-গোলমাল আজ পাকানো দেখছি তার সুরু নিশ্চয়ই বহু যুগ আগে। তাছাড়া এ-ও বলা যায়: 'তোমার বন্ধু বলেই না দীপায়নকে তুলসী-পাতা বানিয়ে তুলছ—সব দোষ ঠেলে দিচ্ছ বাসবের দুয়ারে। দীপায়নের জার্নল্‌স্‌-এ বাসবকে নিয়ে কী ওসব লেখা? ওসব লেখায় কি বোঝা যায় বাসবের সঙ্গে কোনোদিন ওর বনিবনাও ছিল?'

গভীর প্রশ্ন, সন্দেহ নেই। হয়ত পরম সত্য কথা এই যে দীপায়ন বা বাসব কেউ কাউকে পুরোপুরি আর্য্যতায় গ্রহণ করতে পারেনি। গ্রহণ করবার একটি ভঙ্গী মাত্র দেখেছি আমরা ও ক'টা বছর—অনিচ্ছুক স্বামীস্ত্রীর একত্র বসবাসের মতোই একটা ভঙ্গী। তারপর বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেলে একপক্ষ প্রকাশ্যতই রূঢ়, অপরপক্ষ তার তিক্ত মনের চেহারাটা জার্নাল্‌স্‌-এর মারফৎ নিজেকে দেখিয়ে খানিকটা সংযত, শান্ত ও সহিষ্ণু।

"অনেকরকম নক্সায়ই ত মানুষ তৈরী হয়—" দীপায়ন আজ কথা বলতে গেলে প্রায়ই বিশেষকে ছাড়িয়ে সাধারণে চলে যায়: "নক্সাটা খুব জরুরী নয়, মানুষ ব্যাপারটাই জরুরী। আর ব্যাপার কথাটাও ব্যাপ্ততার নামান্তর। অপরকে মানুষ ভেবেই আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারি। তার নক্সার ছাপ আমার উপর পড়বেনা, সে-নক্সায় যতোটুকু সে মানুষ, যতটুকু আমার ভেতরকার মানুষটার মতোই মানুষ, পড়বে তারই ছাপ।"

হাজরা রোডের অধ্যায়ে এ-ছাপ নেবার চেষ্টাই হয়ত চলছিল দীপায়নের। তাই পল্লী-দর্শনের শেষে নিজেদের ঘরে ফিরে এসে বুর্জ্জোয়া দার্শনিক দীপায়ন প্রোলিটারিয়েট বাসবকে বলেছিল : "ধান ভরা ক্ষেতগুলো নষ্ট করে ফেলতে তুই ওদের উস্‌কে দিলি, বাসু ?"

"ক'ছটাক ধান ওরা পেতো ? সবই ত মহাজনের আর জমিদারের।"

"যা-ই পেতো। কিন্তু এখন ?"

"এখন প্রতিবাদ জানাল—না খেয়ে থাকার, সিংহের ভাগ দিয়ে দেবার প্রতিবাদ।"

দীপায়নের একমাত্র উত্তর ছিল মুখ ফিরিয়ে নেওয়া।

"তুই দুঃখিত ?" অস্ত্রোপচারের মতোই নিরাসক্ত হিংসায় ঠাণ্ডা শোনাল বাসবকে।

"হয়ত।" হাসতে চেষ্টা করল দীপায়ন : "কিন্তু দুঃখটা ঠিক আমারই কি না ভাবছি। হয়ত ওদের দুঃখটাই আমি বয়ে বেড়াচ্ছি মনে হয় এককে সময়।"

"কাদের দুঃখ ?"

"ওই চাষীদের।"

"কবিতা হচ্ছে!" বাসবের চোখে-মুখে হাসি ফেটে পড়ল।

[অক্টোবর '৪৩ ॥

ওরা এলো—এলো তোমার কাছে, আমার কাছেই, বাসব। তোমার-আমার কলকাতায়। আর তোমাকে ওদের গাঁয়ে যেতে হলনা, ওরাই এলো এবার। এসে দাঁড়াল তোমার গা-ঘেষে। দেখতে কি পাচ্ছনা, বাসব, তোমাদের সেই মাসীকে—আজ আর একটি নয়, ব্যাপ্ততায় অনেক। আমি দেখতে পাচ্ছি—আমাকেই দেখছি আমি—আমার কুৎসিত, কদর্য্য কঙ্কালকে দেখছি।

এককোঁটা ঘুমও হয়নি কাল। বিয়ের কোঁটা নিয়ে রাত্রিময় জাগরণ। পশু ? মনে পড়ছেনা ঘুম হয়েছিল কি না।

হোয়াইট্-এওএ-র বাড়ির সামনে কাল বিকেলবেলা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি। আয়নায় আমারই ছায়া থমকে দাঁড়াল। আমারি ছায়া। ছায়া। ঠিক তেম্নি ছায়া, রাত্রিতে ফুটপাতে যেম্নি দেখেছি। ওদেরই ফোটা-অফোটা ছায়ার মতো।

বাংলার চাষী—ছেলে মেয়ে—সে ত তুমিও, তুমিও দিবান। মনে পড়ে না—একদিন যে ঠিক এম্নি চোখ ছিল তোমার, ঠিক এম্নি তাকাতে আকাশের দিকে, তোমার মাটির দিকে? তোমার মাটি—ক্ষেতখামার—তোমার ধান। সেদিন কলকাতা ছিলনা, জানতেনা কলকাতা হবে। জানতেনা কোনো এক চাষীর প্রাণ-কণিকা দীপায়ন চৌধুরী হয়ে কলকাতার নাগরিক হবে; তারপর ঠিক এম্নি নিজের মৃত্যুর দিকে তাকাবে! তোমার মৃত্যু—ফুটপাথে, পার্কে—তোমার মৃত্যু কঙ্কাল মায়েদের কোলে। আমি আমার মৃত্যু দেখছি! বাসব, নীলাঞ্জন, প্রমিতা, সবাই তাদের মৃত্যু দেখছে। বাসব কি বুঝতে পারে এ-যে তারও মৃত্যু?

তুমি ওদের ভালোবাসো, বাসব?—আজও বলতে পারো ভালোবাসো? বরং বলো ওদের জন্যে তুমি কাজ করো—ওরা নীচুতে পড়ে আছে তুমি জানো, তুমি জানো তুমি অনেক উঁচুতে, তাই ওদের টেনে তুলতে ইচ্ছে হয় তোমার। নেতা হতে চাও!

সারবন্দী শৃঙ্খলায় এসে যেন ক্ষুদকণা নিয়ে যেতে পারে তা-ই করছ তুমি। কাজ করছ। ওদের বাঁচিয়ে রাখবার মাছের চাষ। বেঁচে থাকলে আবার ওরা চলে যাবে জলে—আবার ওদের সেই অভাঙা জীবনে। তুমি চাও, ওদের ভাঙা জীবনই থাক। সেই স্রোত নিয়ে তুমি তোমার ভাঙার কাজ চালাবে। তুমি ওদের শিখিয়েছ ওরা ভাঙতে জানে। কি ভাঙতে জানে, বাসব? নিজের জীবন ছাড়া কি ভাঙতে পারে ওরা? ভাঙতে পারল কি সাজানো কল্‌কাতা—তোমার আমার সাজানো জীবন? আমাদের নিয়ে মিশিয়ে দিতে পারল কি ওরা নিজেদের জীবনে? আমরা-ও কি পারলাম ওদের জীবনে নিজেদের মিশিয়ে দিতে? আমাদের রক্ত আর ওদের রক্ত মিশল কি কারো দেহে—কারো দেহে কি কোনোদিন নতুন জীবনের অঙ্কুর পাখা মেলতে পারল? নতুন মানুষের আবির্ভাব-ঘোষণার জন্যে বলতে কি পেরেছ নেতা: "মাতা, দ্বার খোলো"? কোনোদিন—ঘুম ভেঙে গেছে কি এমন স্বপ্নে যার স্বাদ তোমাকে আরেক দেহে আরেক সত্তায় পৌঁছিয়ে দেবে? সেই নতুন জন্মের ব্যাকুলতা কোথায় পাবে তুমি, বাসব? তোমার ইস্তাহার, আওয়াজ, কলা কৌশল তার খোঁজ পায়না।]

"কবিতা?" দীপায়ন ঘর থেকে বাইরে নিয়ে গেল চোখ—দেবদারু

পাতার এক ঝাঁক গাঢ় সবুজ ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর চোখে—হয়ত ভালো লাগল ওর আর তাই বল্‌লে : "হয়ত তা-ই।"

"হয়ত নয়, সত্যি। আর কবিতা-টা তোর কাছে এতো সত্যি বলেই মুস্কিল।"

"সব মানুষের কাছে যদি ওটা সত্যি হত তাহলে আর মুস্কিল ছিলনা"—বাইরেই তাকিয়ে রইল দীপায়ন।

"ও", বাসব হো-হো করে হেসে উঠল : "পাশের গাঁয়ের ইস্কুলের ছেলেদের তুই তাহলে কবিতাই শেখাতিস্ ?

"চাষীদের তুই যা শিখিয়েছিস তা না শেখালে যদি কবিতা হয় তবে তা-ই।"

"জীবনের মন্ত্র ?" একটা ধারাল ছুরী যেন কথা কয়ে উঠল।

"জীবনকে ভালোবাসবার মন্ত্র" দীপায়ন উঠে গেল - ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে নয়, বসে থাকতে পারছিলনা বলেই। কিন্তু বাসব ওকে দেখছে লক্ষ্য করছে ওর অস্থিরতা। দুঃখিত হল দীপায়ন। কিন্তু তারপরই, ক্ষুরের বাক্স থেকে একটা পুরনো ব্লেড খুলে নেবার কথা মনে হতেই, যেন ও উঠে যাবার একটা সঙ্গত কারণ আবিষ্কার করে মনে-মনে খুশী হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে নখ কাটতে বেশ ভালো লাগছিল ওর এখন : 'চাষীকে মাটির ছেলে বলে আমরা গদ্‌গদ্ হতে শিখছি কিন্তু একবারও ভেবে দেখছিনা মাটির ছেলে হতে হলে তার মন কোন্ ভঙ্গীতে গড়া থাকতে হয়। জীবনকে বিশাল সত্তায়ই যদি তারা চিনে নিতে না পারল তাহলে বিশাল প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থেকে তাদের কি লাভ ? শুধু মাটির ঢেলা হয়েই যারা রইল তাদের কাছ থেকে কি আশা করতে পারি আমরা ? মাটির ছেলে বলে তাদের উপাধি দিলেই কি তারা জীবনে তেম্নি আনন্দ খুঁজে পাবে—যে-আনন্দ প্রকৃতির, যে-আনন্দ সৃষ্টি করায়, যে আনন্দ শুধু সৃষ্টিই জানে, ভেঙে ফেলতে জানে না ?"

খবরের কাগজে চোখ রেখে মিষ্টি-মিষ্টি হাসছিল বাসব : "তোর কথাগুলো শুনতে বেশ ভালো।"

[১৯৪২ ইং ॥

"ভাঙনের নেশায় ঝুঁকে পড়ো না কম্রেড্—এ-বিপ্লব তোমার নয়—এ বিপ্লব নয়, উচ্ছৃঙ্খলতা। কারখানার চাকা ঘোরাও, লাঙ্গল চালাও—বন্ধ

করোনা কাজ। তোমার চাকার মুখে ফ্যাসিবাদ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে উড়ে যাবে। দেশকে বাঁচাও—ঝুঁটা বিপ্লবের ঝাণ্ডা যারা তুলছে সেই বিভীষণদের রুখে দাঁড়াও।"—বাসব।

বাসব, আজ তুমি বলতে পারছ এসব কথা। তোমার মতবাদের হাওয়ায় দোলাতে চাও তোমার ফানুস-পুতুলদের। আবার বলো ওদের না কি তুমি মানুষ করে তুলতে চাও! তুমি? তুমি কি চাও হয়ত তুমিই তা জানো না। আমি জানি। জানি তুমি চাও ওদের রক্তমাংস যেন না থাকে, হৃদয়-মন যেন শূন্যে মিলিয়ে যায়। একতাল বস্তু নিয়ে তুমি পুতুল বানাবে, তা-ই চাও তুমি। তুমি চাওনা ওরা মানুষ হোক—চাওনা ওদের নিজের কোনো আদর্শ থাকুক—থাকুক জীবন বোধ। ওরা স্রষ্টা হোক, ভাঙুক, গড়ুক—ওদের জীবনছন্দে দেশের আত্মা গড়ে উঠুক এ কামনা তোমার নয়। তবু তুমিই নেতা! তুমিই আজ নেতা হতে চাও!......]

দীপায়নও হাসল কিন্তু হাসিতে ওকে ক্লান্ত আর করুণই দেখাচ্ছিল। ঠিক বাংলাদেশের ঠাণ্ডা মেয়েদের মতো। ক্ষুরের বাক্সে ব্লেডটা তুলে রেখে ও বাসবের মুখের দিকে তাকাল: "আমরা বোধহয়—" কথাটা বলতে গিয়ে একটু থামল দীপায়ন: "ঠিক এক বকম নই—দুজন ঠিক এক রকম হয়ও না।"

"হয়। কারণ হওয়াটা আমাদের হাতে।" বাসব হাসতে লাগল।

দীপায়ন চুপ হয়ে গেল। নিজেকে যেন বুঁজিয়ে ফেলল ও। সব প্রশ্ন, সব দ্বন্দ্ব থামিয়ে দিয়ে থাকো না খানিকক্ষণ চুপচাপ। শোনো, শুধু শোনো কি বলে ও। ওর কথাগুলো তোমার দেহে রক্তের মতো বয়ে চলুক। তারপর দ্যাখো কি হয়। দ্যাখো তোমার মন কুড়িয়ে জড়িয়ে নিতে পারল কি না কিছু। তোমার মনের শরীক হতে পারল কি না কোনো ধ্বনি, কোনো মানবিক সুর।

চুপ করে থাকতেই শিখছিল তখন দীপায়ন, শ্রোতার ভূমিকায় নিজেকে নামিয়ে নিয়ে এসেছিল। শুধু বাসবের কথাই নয়, বাসবের কাছে আরো যারা যারা আসত তাদের সবার কথাই যেন শোনবার মতো। সবার প্রশংসা কুড়োবার জন্যেই কি এ ফন্দী? ফন্দী বলা যায় কিন্তু অন্যকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে নয়, নিজেকেই তাব ফাঁদে জড়িয়ে নেবার জন্যে। আমি ওর চেহারাতেই

যেন একটা পরিবর্ত্তন দেখতে পেতাম। আশ্চর্য্য, অনেকসময়ই তখন ওর মুখের ভঙ্গীতে আর রেখায় ওর মার মুখ ফুটে উঠত। ও নিজে হয়ত বুঝতে পারতনা, বাসব ত লক্ষ্যই করতনা। কিন্তু আমি তাকিয়ে থেকে অবাক হয়ে যেতাম!

হয়ত পুরুষোচিত কাজ করতে বাসব বাইরে বেরিয়ে গেছে—কখন ফিরবে ঠিক নেই—এসে দীপায়নকে দেখতে পেতাম ঘরের খুঁটিনাটি কাজে ব্যস্ত। হয়ত বিছানা পাট করছে, কাপড় কুঁচিয়ে রাখছে, বাসবের সেই 'রান্নার লোক' পরেশকে শুক্ত রাঁধবার ফরমূলা বাৎলে দিচ্ছে, কিম্বা বসে-বসে বাসবের ছেঁড়া খদ্দরের সার্টে রিফু চালাচ্ছে।

ঠাট্টা করতাম: "বা, বাসব ত তোফা আছে!"

"তোফা?" দীপায়নকে বিষণ্ণ দেখাত: "ও যেভাবে চলেছে তাকে তোফা বলিস, তুই?"

"ছেঁড়া জামা রিফু করবার লোক জুটে গেছে, তবু তোফা নয়!"

"ওর ধাতে শৃঙ্খলা নেই –" কথাটার উপরই যেন আদর বুলোতে চাইত দীপায়ন: "বেরিয়েছে—হয়ত ফিরে আসবে ত্ন'টোয়—এসেই মাথায় একটু জল ছোঁয়ালে কি-না, ওম্নি খেতে বসে যাওয়া—দশটাব রান্না ত্ন'টোয়, ওগুলো বাসি ছাড়া আর কি?"

"এম্নি কাজের লোক হয়ে উঠেছে বাসব?"

"সভা-সমিতি, ইউনিয়ন-তৈরী ওসবও ত কাজ।"

"বিপ্লবের কাজ?" প্রশ্ন নয়, একটা পরিচ্ছন্ন ঠাট্টাই প্রশ্নের চেহারায় গিয়ে দাঁড়াত।

"কেন, তোর কি মনে হয়না পৃথিবী একটা বিপ্লবের দিকে এগিয়ে চলেছে?"

"তোকে দেখে তা-ই মনে হচ্ছে।"

আমার শ্লেষটা নির্ব্বিবাদে হজম করে নিয়ে মেয়েলি বিষণ্ণতায় দীপায়ন আমার মুখে চোখ রাখতো: "আমাদের জন্যে যে কী এগিয়ে আসছে, হয়ত তা ভাবতে পারছিনে আজ। হয়ত অনেক ত্নঃখ, অনেক ব্যথা—তা সয়ে যাবার সাহস নেই বলেই ভাবতে পারছিনে। আমি হয়ত চাইনে এমন একটা ত্নঃসময় আসুক কিন্তু তবু মনে হয় তা আসবে। এসে জিজ্ঞেস করবে: 'তুমি কি দিয়েছ?' "

সাহস বেড়ে যেতো আমার তাই বলতাম: "তার জন্যেই বুঝি নিজেকে তৈরী করছিস তুই ?"

"আমি ?" চমকে উঠ্‌ত দীপায়ন, তারপর একটা হাল্কা হাসি ফুটে উঠ্‌ত ওর চোখে মুখে আর কথায়: "আমি কিছুর জন্যেই তৈরী না।"

আনন্দিত আত্মবিলোপের চমৎকার ছবি! দেখে দুঃখ হত। মুগ্ধ হতে পারতাম না। আর তাই, দুঃখ হওয়ার আর মুগ্ধ না হওয়ার জন্যেই হয়ত আবারও আমার নিঃশ্বাসের সঙ্গে খানিকটা বিদ্রূপের বারুদ জ্বলে উঠত: "রোগীর সেবার জন্যেও না ?"

"রোগী!" লাজুক হাসিতে যেন কোনো মহিলা তাঁর যৌবনের প্রগল্‌ভতা স্মরণ করলেন: "বাসবকে সত্যি রোগী বলতাম আমি। বলতাম, দুঃখই ওর রোগ। হয়ত দুঃখটা তখন রোগের মতোই দেখাত। কিন্তু ওটা যে জীবনের সঙ্গে মিলেমিশে এমন জীবন হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা কি আর জানতাম তখন ?

"এখন জানছিস্—তা-ই না ?"

মনে হ'ল মহিলার কানে আমার কথা পৌঁছয়নি তিনি বলে যাচ্ছেন: "তখন ভাবতাম চরিত্র বলে একটা আলাদা চেহারা জীবনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। কিন্তু জীবন যে সব-কিছুকেই জীবন করে দেয় তা কি আর ভাবতে পারতাম! তা-ই যদি না হবে, আমি যা নই তাকে আমার চাই কেন ? আমার জীবন আমার চরিত্রের বাইরে হাত বাড়াবে কেন ? একসময় ভবানীকে আমার ভালো লাগত—জানিস্ ত ?"

"তোর ভালোলাগাটা কিন্তু সাংঘাতিক।"

"কেন ?"

"কারণ দু'দিন বাদেই আর ভালোলাগেনা।"

"ও।"

হাতের কাজ তুলে রাখতে গিয়ে চুপচাপ কয়েক মিনিট কাটিয়ে দিত দীপায়ন। ওটা ছিল রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যান্তরের বিরাম। বিরামের পরেকার দৃশ্যে ও ঠিক-ঠিক দীপায়ন হয়ে আমার মুখোমুখি এসে বসত: "আর সবার খবর কি, বল!"

"আর সবার ত তেমন কোনো খবর নেই—তোর খবরটাই ত আসল!"

"আমার। পাব্লিশারের প্রুফরীডারের আর নোট-লেখকের আবার আসল খবর।"

"ওটাকে আরেক ভাবেও বলা যায়—বাসব মার্ক্স হতে চলেছে আর তুই এঙ্গেল্‌স্‌।"

"ঠাট্টার ভাণ্ডারে কতো কথাই ত থাকে।"

"কিন্তু তোকে আজ আমার ঠাট্টা করতে ইচ্ছে করছে কেন—বলতে পারিস ?"

"পারি। আমাদের সবার ভেতরই ঠাট্টা করবার মতো কিছু না-কিছু আছে—তাই।"

"হয়ত। তোর ভেতর যা আছে তা আজ স্পষ্ট দেখাচ্ছে।"

"না। আমার ভেতর যা জন্ম নেবে তা-ই হয়ত দেখ্‌তে পাচ্ছিস তুই। ওটা আমি দেখতে পাইনে। কোনোদিন ছেড়ে দেব—এ ভেবে কোনো কাজ করতে পারিনে আমি। জানি, ছেড়ে দিতে হয় তবু পারিনে।"

দরদীর ভূমিকায় না গিয়ে, সাংবাদিকের ভূমিকা নিতাম: "বাসবকে তোর খুব ভালো লাগছে আজকাল, না ?"

"ভালো ত আমার সবাইকেই লাগে।"

নির্লজ্জ স্পষ্টকথা দীপায়ন বলবেনা, জানতাম, তবু যে একটা নির্লজ্জ প্রশ্ন করেছিলাম তার জন্যে খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে হল মনে পড়ে। আর আমাকে চুপচাপ দেখেই হয়ত দীপায়ন হাসিতে আবহাওয়াটা ফসা করে তুলতে চাইল: "আমি যদি বলি বাসবকে ভালোলাগাটা আমার কর্ত্তব্যেরই মতো।"

"কথাটা আমিও বলতে পারতাম কিন্তু বলিনি।"

"কেন ?"

"আমি বললে ওটা মিথ্যে হয়ে যেত।"

"মিথ্যে ঠিক হতনা তবে ভাবনায় পড়তাম।"

"অন্তত তুই কিছুতেই স্বীকার করতিসনে।"

"করতাম।" সর্ত্তহীন আত্মসমর্পণের ছবি ফুটে উঠ্‌ত দীপায়নের মুখে। কিন্তু তা-ও ওর তখনকার নিখুঁত চেহারা নয়, কারণ আমার সঙ্গে নিরিবিলি থাকলে দীপায়ন ওর পুরানো মনের খোলস সবটুকু ছেড়ে আসতে পারেনা

জানতাম। যতোটুকু ছেড়ে এসেছিল তাতেই অবাক হবার কথা। কিন্তু আরো বিস্ময় ছিল।

সেদিন আমি আর বাসব ছিলাম ওর অপেক্ষায়। পাব্লিশারের ঘর থেকে তখনও ও ফিরে আসেনি। ওর দু'হাত-লম্বা টেবিলটার উপর দেবুদার একটা টেলিগ্রাম। কেন জানিনে আমার মনে হচ্ছিল কারো শব নিয়ে যেন আমরা কার আসার অপেক্ষা করছি। য়ুরোপের আসন্ন ঝড় নিয়ে বাসব তার অফুরন্ত থিসিস-অ্যান্টিথিসিস চালিয়ে যাচ্ছে—নিজেকে অন্যমনস্ক রাখার জন্যে ?

দীপায়ন যখন এলো তখন আমার চুপচাপ থাকার ছোঁয়াচে বাসবও চুপ করে গেছে। অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছিল দীপায়নকে, তবু একটু হেসে জিজ্ঞেস করল : "অনি - কখন এসেছিস—অনেকক্ষণ ?"

উত্তরে যদি কিছু বলেও থাকি, আমার মনে পড়ছেনা—শুধু মনে পড়ছে বাসবের সেই ঠাণ্ডা গলার অকরুণ কথাগুলো : "তোর একটা টেলিগ্রাম আছে পানু—দেবুদা করেছেন।"

জামা ছাড়েনি দীপায়ন, হাতপা ধুয়ে একটু জিরোবারও সময় পায়নি—কিন্তু বাসবের কথায় মনে হল তা যেন মোটেও ভাববার নয়। যখন যেভাবেই থাকুক দীপায়ন, ওকে যেন বাসবের কথা শুনে যেতেই হবে।

আবারও হাসতে চেষ্টা করল ও : "টেলিগ্রাম ?"

'দেবুদা তোকে যেতে লিখছেন - বাবার অসুখ।"

"ও।" খুলবার জন্যেই দীপায়ন দু'হাতে জামাটা টেনে মুখ ঢেকে ফেলল। ওর মুখে আমি তাকিয়েছিলাম।

"দেবুদা যেন কেমন হয়ে গেছেন আজকাল—" অটল আত্মবিশ্বাসে টলটল করছিল বাসবের চোখ : "একটু ভীরু।"

ব্র্যাকেটে জামা ঝুলিয়ে রাখতে গেল দীপায়ন, ফিরে আসার পথে টেবিল থেকে টেলিগ্রামটা তুলে তাড়াতাড়ি একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। হয়ত ভাবছিল ও, দাদা ভীরু হতে পারে কোনোদিন ?

কিন্তু না। কিছুই ও ভাবেনি। ঘর থেকে বেরিয়ে ও বাথরুমে ঢুকে ট্যাপ ছেড়ে মুখ ধোচ্ছে শুনলাম। আমি বারান্দার রেলিং এর উপর দেবদারু গাছের ঝাপসা ডালপালাগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমার মনে হল,

কোনো অনাত্মীয়ের বাড়ি এসে বসে আছি এম্নি অনাত্মীয় যারা ভদ্রতা দেখাতেও চায়না।

গামছাতে চোখ-মুখ মুছতে-মুছতে দীপায়ন ঘরে এলো—দেখতে ওকে ভালো লাগ্‌ছিল আমার। ভালো যে লাগছিল বাসব হয়ত তা বুঝতে পারল, তাই আবারও সৈন্যাধ্যক্ষের আওয়াজ তুলল গলায়: 'পরেশকে বল্‌ পানু কিছু খাবার নিয়ে আসুক—অনিরুদ্ধবাবু এক কাপ চা-ও খাননি!"

"আমি?" হয়ত কান্নার মতোই শোনাল আমার কথাটা: "আমি কিছুই খাবোনা—"

জামার পকেট থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল দীপায়ন। অসহ্য লাগছিল আমার। হয়ত উঠে চলে যেতাম তক্ষুণি কিন্তু বাসবের মুখে চোখ পড়তেই প্রতিবাদের উত্তেজনায় ভাটা পড়ে গেল। বাসবকে অসম্ভব গম্ভীর দেখাচ্ছিল তখন, আর চিন্তিত। দীপায়নের যাওয়া নিয়ে বাসবের সঙ্গে দু' একটা অবান্তর কথা বলতে ইচ্ছেও করছিল কিন্তু থামিয়ে দিলাম নিজেকে। থামিয়ে দিলাম পাছে বাসব তার গাম্ভীর্য্য হারিয়ে আমাকে আবার রাগিয়ে তোলে।

আমাদের পাশে এসেই বসল দীপায়ন ঢালা বিছানায় সতরঞ্চির উপর। অনেকক্ষণ পরে ওকে কাছে পেয়ে যেন ওর কানে-কানেই বলতে ইচ্ছে করল: "অসুখের কোনো খবর পেয়েছিলি পানু, চিঠিতে?"

"ব্লাড প্রেশার, দাদা লিখেছিলেন।"

"চিঠি?" দেখতে পেলাম বাসবও বিস্মিত হতে পারে: "কই, আমাকে ত কিছু বলিসনি!"

"বলবার আর কি আছে?"

আমার মনে হ'ল বাসবের মুখই আমি দেখতে পাচ্ছি দীপায়নের মুখে—বাসব যেদিন বেহারী ডাক্তারের কথা শোনাচ্ছিল দীপায়নকে বাসবের মুখ হয়ত সেদিন এম্নি ছিল আজ দীপায়নের যেম্নি।

"চিঠি পেয়েই তোর যাওয়া উচিত ছিল।" সহজ হ'তে সুরু করেছিল বাসব।

"টেলিগ্রাম পেয়েও যে যাব তা কে বল্‌লে?"

"সে কি?" মৃদু আর্ত্তনাদের মতো শোনাল আমাকে আর তার জন্যেই হয়ত বাসবও মাথা নীচু করে নিঝুম হয়ে রইল খানিকক্ষণ।

"কী হবে গিয়ে কী করবার আছে আমার ?" নিরাশার শুকনো হাওয়া বইল দীপায়নের কথার শব্দগুলো ঘিরে, তারপর ঘরে।

"তবু মানুষ যায়।" মাথা তুলে সনিঃশ্বাসে বললে বাসব।

দীপায়ন বাইরের দিকে মুখ নিয়ে গেল যেন পরেশের আসার দিকে। আর খুবই স্পষ্টভাবে বলতে চেষ্টা করলে : "বাবা নেই —আমি জানি।" আমরা চুপ করে আছি বলেই ও মুখ ফিরিয়ে দুএকটা রেখা ফুটিয়ে তুলতে চাইল ঠোঁটের দুপাশে যার নাম দেওয়া যায় হাসি। আর, আবার ও বল্‌লে : "সত্যি—আমার মনে হচ্ছে।"

বাসব অন্যমনস্ক হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মনে করা যেতে পারে পরেশের খোঁজে। কিন্তু আমার মনে হল, নিজের শিক্ষা তার নিজেরই আর সহ্য হচ্ছে না।

এবার আমি সত্যি-সত্যি দীপায়নকে পেলাম—আর চেষ্টা করলাম পানুকে পেতে। পানুই এলো কিন্তু সে আরেক পানু।

"মনে আমাদের অনেক কিছুই আসতে পারে—তারজন্যে কি ?" সুদৃঢ় মন নিয়ে দুর্গ-রক্ষীর ভঙ্গীতে বললাম।

"বাবা যদি না-ই থাকেন—কি হবে গিয়ে ? ওসব দেখতে ? মা জ্যান্ত-মরা, বৌদির চোখমুখ ফোলা – দাদা বড়ো-বড়ো চোখে তাকাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন না কিছু ! একটা ভাঙা সংসার !"

"সে ভাঙা সংসারের তুই-ও ত একজন !"

"ছিলাম। কিন্তু আমি ত এখন ওদের উপদ্রব করতে যাইনে—ওরা কেন আমায় শান্তিতে থাকতে দেয় না ?"

"সরে এলেই কি সবার সঙ্গে আলাদা হওয়া যায়, পানু ?"

"সত্যি, অনি, আমার ভালো লাগছেনা যেতে !" থমথম দেখাচ্ছিল দীপায়নের মুখ : "শেষপর্য্যন্ত হয়ত যেতেই হবে কিন্তু একটুও ভালো লাগবেনা আমার। বাসু এখানে একা থাকবে ভাবতেই খারাপ লাগছে !"

"এমন মস্ত পুরুষ-মানুষটার একা থাকা আবার ভাবতে হয় !" একটু হাল্কা হতে পারলাম বলেই হাসলাম আর বললাম ওধরণের একটা কথা।

"বাসু একা থাকতে পারেনা। ওর যে কি রকম কষ্ট হবে তুই জানিসনে।

কষ্টকে যারা কষ্ট বলে মনে করেনা তারা-ই মানুষকে দুঃখ দেয়--আমরা সত্যিকার ব্যথা পাই তাদের দেখলেই।"

"তাহলে আমিও ব্যথা পাচ্ছি তোকে দেখে—মনে রাখিস।"

"তা-ই নাকি ?" দীপায়ন হেসে মুখ বুঁজল।

কিন্তু আমি পানুকেই হাসতে দেখলাম। সেদিন, সন্ধ্যার পরও রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত, আরও ঢের কথা বললাম আমরা, চা এলো, খাবার এলো, বাসব এলো, অনাত্মীয় পুরুষ বাসব আমারও একজন সহৃদয় আত্মীয় হয়ে উঠল, আমরা হাসলাম, ঠাট্টায় হাল্কা হলাম আবার ভাগাভাগি করে দুঃখ নিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম মাঝে-মাঝে—শুধু তা-ই আজ মনে পড়ছে আমার। কিন্তু কী যে কথা হল তা আজ বলতে পারবনা কারণ কী যে হয়নি তা-ও বলতে পারিনে। ঠিক হয়েছিল কালই দীপায়ন যাবে, কথাটা বলতে গিয়ে বাসব বিষণ্ণ হতে চায়নি কিন্তু তাকে ঠিক-ঠিক বিষণ্ণই দেখাচ্ছিল।

১৯৪৩-এ (সুপর্ণার-অধ্যায়ে) দীপায়ন আমাকে যা বলেছিল আজ তা হুবহু মনে পড়ছে। বলেছিল : "আমি বোধহয় খানিকটা অদ্ভুত, অনি! দুঃখ আমায় যে ভাবে টানে প্রেমও তেম্নি নয়। সবার বেলায়ই কি তাই ? জানিনে। তবে তা-ই হওয়া উচিত। একটি মেয়েকে আমার ভালো লাগতে পারে কিন্তু সে যে আমায় টানবেই তার কোনো মানে নেই কিন্তু যাকে আমি বললাম, দুঃখী, সে আমায় টানতে সুরু করেছে।"

সেদিন সুপর্ণার পাশাপাশি দীপায়নকে সাজাতে রাজি হয়নি আমার মন, আমি দীপায়নের পাশাপাশি সেদিনও বাসবকেই দেখতে পেয়েছিলাম—চোখে ভেসে উঠেছিল হাজরা রোডের ছোট্ট একটি ফ্ল্যাট আর সেখানকার দীপায়নের ছোট্ট একটি সংসার।

উনিশ

এ-অধ্যায়ে যা বলছি তার সবটুকুই সুরজিতের মুখে শোনা। এসব ঘটনার ত্রিসীমায় আমি ছিলাম না। ছিল সুরজিৎ। তবে ঘটনা যা-ই হোক, সুরজিতের বলার ভঙ্গিতে অধ্যায়টি তৈরী নয়। এতে আমার কারিকুরিই বেশি। ভেবে নিন সুরজিতের একটা পেন্সিল-স্কেচকে আমি রীতিমত একটি পেন্টিং-এ এনে দাঁড় করিয়েছি। আর লক্ষ্য রাখলে দেখতে পাবেন, মাঝে-মাঝে আপনাদের এম্নি ফাঁকিতে ফেলেছি যে মনে করছেন, অনিরুদ্ধ ঘোষাল তখন দীপায়নের পাশে-পাশেই ছিল।

যাক সে-কথা, এখন ছবিটা দেখতে থাকুন :

অনেকক্ষণ পর-পর নিঃশ্বাস পড়ছিল দীনেশবাবুর। বিকেলবেলা। সহরের যাঁরা আসবার তাঁরা এসে দেখে গেছেন। বিফল ডাক্তারদের মুখ থেকেই খবরটা সহরে ছড়িয়ে পড়েছিল। পরিচিতরা তৈরী, পড়শীরাও—বাইরের ঘরে বীণাদির বাবা চুপচাপ ঘণ্টাখানেক দেবুদার সঙ্গে বসে গেলেন। তারপর দেবুদা উঠোনে পায়চারি করছিলেন। বৌদি সন্ধ্যে দিয়ে ঠাকুরের কাছে নাগাড়ে মাথা ঠুকছিলেন। বিশুদা হাত-পাখা নিয়ে বেহুস হয়ে মামাকে হাওয়া করছেন, বেচারীর হয়ত ধারণা হয়েছিল ওই হাওয়ার জোরেই মামার হুঁস ফিরে আসবে। মা পা জড়িয়ে আছেন—তাঁরই পা, ছেলেবেলায় যাঁকে দেবতা বলে ভাবতে শিখেছিলেন, তারপর সারাজীবন হয়ত আর তা ভাবেন নি। এখন কি সেই ভুলে থাকার অপরাধ মনে পড়ছে? পিসিমা কস্তুরী-ভৈরব তৈরী করছেন—কেউ হয়ত বলে গিয়েছিলেন, কেউ হয়ত দিয়ে গেছেন।

দীপায়ন অপলক তাকিয়ে আছে বাবার মুখের দিকে। এতো পরিচিত মুখ—চোখ বুঁজেও ত ঠিক মনে রাখা যায়—তবু ওর তাকানো ফুরোচ্ছিল না। তারপর একসময় তা ফুরোল। মার পাশে, তাঁর গা-ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল দীপায়ন, ডাকলে : "মা—"

মা চমকে উঠে মুখ তুললেন। দীপায়ন তাঁকে জড়িয়ে ধরে নিজের

দিকে টেনে আনতে চাইল। মা শক্ত হয়ে আছেন। আরেকটু জোরে টানল দীপায়ন, বললে: "চলে এসো মা—"

"কোথায়?" মা যেন চারদিকে তাকাতে গিয়ে তাকাতে পারলেন শুধু দীনেশবাবুর আবছা মুখের দিকে। দীপায়ন একটু কাৎ হয়ে মার দৃষ্টি থেকে বাবার মুখ ঢেকে দিলে। আর এবার টেনে তুলে নিয়ে এল মাকে নিজের গায়ের সঙ্গে মিশিয়ে। এনে কাঠের মতো শক্ত গলায় শুধু বলতে পারল: "চলো।"

পিশিমা কস্তুরী-ভৈরবের খলটা দাদার মুখের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু বিছানায়ই পড়ে রইল 'খল, একটা অদ্ভুত চীৎকারে দাদার বুকের উপর থুবড়ে পড়লেন তিনি।

"না-না—" মা-ও চেঁচিয়ে উঠলেন—দীপায়নের দু'হাতের বেড় থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে আবার তাঁর ভুলে-যাওয়া দেবতার পা জড়িয়ে ধরলেন।

অবশের মতো দাঁড়িয়ে রইল দীপায়ন দু'সেকেণ্ড—কিছু ভাবতে চাইল—তারপর বারান্দায় এসে আবারও ঠিক তেম্নি দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরের দিকে দৌড়ুচ্ছিলেন দেবুদা দীপায়নকে পেয়ে শিশুর মতো হাঁপিয়ে বললেন: "পানু?"

"নেই।" উঠোনের অন্ধকারে ঠাকুর-চাকরদের দিকে তাকাল দীপায়ন। এ-অন্ধকারে আর কি কোনো হাল্কা ছায়া আছে? ছায়ার মতো হলেও আছে কি কেউ?

কিন্তু এ প্রশ্ন নিয়ে ত এখন দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। কিছু করতে হবে দীপায়নকে—কোথাও যেতে হবে—কাউকে কিছু বলতে হবে—দীপায়ন ভাবল।

"তুমি ও বাড়ীর মেশোমশাইকে খবর দাও, দাদা,—সুর্য্যকে পাঠিয়ে দাও আরো যাদের খবর দিতে হবে তাদের কাছে—আমি মাকে দেখছি।" কথাগুলো স্পষ্টভাবে বলতে পেরে দীপায়নের শরীরটা হাল্কা হয়ে গেছে মনে হল। নড়ে চড়ে উঠল ও। আর দেবুদা-ও ছোট্ট ছেলের মতো পেছন ফিরে আবার দৌড়ুলেন উঠোনের অন্ধকারে।

দীপায়ন ঘরে এলো, কান্নার ঢেউ-এ। মা-পিশিমা-বিশুদা আর বৌদি। বৌদিও কাঁদতে জানেন, আর এমন? দীপায়নেরও কি কান্না পাচ্ছে?

ওঁদের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে একটু একা হতে পারলে ও-ও কি ঠিক এম্নি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবেনা? শক্ত চোখে দীপায়ন মার দিকে তাকিয়ে রইল।

মা যেন ওকে কাছে টেনে নিচ্ছেন—দীপায়ন বুঝতে পারল।

"মা"—দীপায়ন উবু হয়ে মার কোলে মাথা গুঁজে দিতে চাইল। কান্নার শব্দটা অনেক বেশি স্পষ্ট হল মার গলায়। আর তাঁর হাত জড়িয়ে ধরল পান্নুকে।

"মা, চলো।" দীপায়ন কাঁদতে পারেনা কিন্তু অনুনয়ে কাঁদ-কাঁদ হতে পারে।

"ন-ন্-না।" এ-ও কান্নাই, কথা নয়।

"কেন যাবেনা?"

"ছেড়ে দিতে পারবনা আমি।" মা কথা বললেন।

মা বললেন। অনেকদিন পর পান্নু শুনতে পেল মার কথা। কিন্তু প্রাচীনা স্ত্রীর মুখ থেকে মৃত স্বামী কি শুনতে পেলেন এ কথা? বাবার-মুখের দিকে তাকাবে ভাবলে দীপায়ন কিন্তু তাকাল না।

"ছেড়ে কি দিতে হয়নি আর কাউকে তোমার?" খানিকটা উদাস শুনাল পান্নুকে: "তোমার বাবাকে—মাকে ছেড়ে দিতে হয়নি?"

পান্নুকে জড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন মা: "চল্"—আর্ত্তের অভিশাপ মাথা পেতে নিতে চাইল দীপায়ন: "কোথায় যেতে হবে—চল্!"

মার ঘর, বৌদির ঘর পার হয়ে দীপায়নের নিজের ঘরে এ'ল ওরা। দীপায়নের বিছানায় হামড়ি খেয়ে পড়লেন মা। দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিল দীপায়ন। তারপর আলো জ্বালল।

মেঝেতে বসে দীপায়ন জাঁকাল কিছু ভাবতে চেষ্টা করল। কিন্তু তেমন কিছুই ভাবা যাচ্ছে না। এই মাত্র যে ঘটনাটা হয়ে গেল তা-ও না। বাবা নেই? কে বললে—দরজা খুলে দু'টো ঘর পার হলেই ত দেখা যাবে তাঁকে! বিছানায় শুয়ে আছেন। শুয়ে আছেন? কেন নয়? হতে কি পারে না যে শুয়েই তিনি আছেন। তা-ই যদি, মা এখানে কেন? বৌদি কি ওখানেই আছে এখনো—পিশিমা? কেউ কি আসেনি? দাদা কোথায় গেল তবে? দাদাকে কেন যেতে বললাম? কী রকম ভয় ছিল দাদার চোখে।

ভয়! কিসের ভয়? আমার ভয় করছে কি? বাবাকে ভয়। চোখ বুজে দীপায়ন মাথায় একটা ঝাঁকুনি তুলল। কী সব কথা ভাবতে হচ্ছে তাকে। একে কি ভাবনা বলে? কিন্তু এ-ঘরে ঢুকে মনে হচ্ছিল কি যেন তাকে ভাবতে হবে। মনের পেছনে যেন কি একটা শক্ত কালো জিনিষ দাঁড়িয়ে থেকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, তোমাকে এখন ভাবতে হবে। কী ভাবতে হবে, কী? ঘাড় হেলিয়ে দীপায়ন মাথাটা বিছানার ওপর নিয়ে গেল। আর তখুনি যেন প্রথম শুনতে পেল, মা কাঁদছেন। অদ্ভুত কান্না। নিঃশব্দ। তবু মনে হচ্ছে, তার মাথার ভেতরে চীৎকার করে কেঁদে উঠছে কেউ। বুকে নয়, গলায় নয়, মাথার ভেতরে। অসহ্য শব্দ—কান্নার শব্দ।

তার কি কিছু করবার আছে? কোনো কাজ? মাথা তুলে সাপের মতো তাকাল দীপায়ন। নাঃ, কি-আর কাজ! মা এখানে আছেন—আমি আছি, এইত কাজ।

মা আছেন অথচ বাবা নেই! সে কি? যিনি বাবা ছিলেন, বলতে হবে তিনি আর নেই। সত্যি নেই! আছেন এমন আর হতে পারেনা কিছুতেই। কয়েক মিনিট আগেও যেমন ছিল তেমন আর হতে পারে না! ঝাপসা হয়ে এলো দীপায়নের চোখ। বুঝতে পারলনা কেন ঝাপসা হচ্ছে, গলা বুঁজে আসছে কেন। একটা ঢোঁক গিলতে চাইল সে। কোথায় যেন আটকে রইল -- কি যেন উঠে আসছে গলার ভেতর থেকে আর তাতেই আটকে থেকে খানিকক্ষণের জন্যে তার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিতে চাইল। তারপব যা উঠে আসতে চাচ্ছিল তা উঠে এল—জল—রক্তের মতো উষ্ণ কিন্তু জল—জলে ভিজে গেল চোখ, জলে গলে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল দীপায়ন। অনেকক্ষণ। যেন জলেরই শব্দ শুনতে। 'বাবা নেই'—জলেরই শব্দ পাকিয়ে উঠছিল যেন তার শরীরময়।

কেউ দরজা ঠেলছে—অস্থির হাতে দরজা খুলে ফেলতে চাচ্ছে কেউ—দীপায়ন শুনতে পেল। এক পিণ্ড কাপড় চোখে-মুখে গুঁজে দিয়ে ভেজা মুখ শুকিয়ে নিল সে। উঠে দাঁড়াল। হয়ত বৌদি, হয়ত পিশিমা। আর না, আর সময় নেই। তার নিজের বলে' যতটুকু সময় ছিল তা ফুরিয়ে গেছে। এখন আবার কাজ—বৌদিকে দেখতে হবে, হয়ত পিশিমাকেও।

পরদিন দুপুরবেলা সুরজিতের কাছে রাত্রিটা বর্ণনা করছিল দীপায়ন। ভাবছি, সত্যি কি ও সুরজিতের কাছেই বলছিল কথাগুলো? ওর কান্নার ইতিহাস কি ও বাসবকে, আমাকে বা সুরজিৎকে জানাতে পারে? না। ওর মেয়েলি স্বভাব আমাদের জানা আছে বলেই আমাদের কাছে ও আরো বেশি পুরুষ হয়ে দাঁড়াতে চায়। সেদিন দীপায়ন তোতার কাছেই কাঁদছিল। সুরজিৎ আর সুরজিৎ ছিলনা সেদিন, সহপাঠি, বন্ধু, বাল্যসঙ্গী বলেও কোনো অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিলনা আর তার, শুধু ছিল হয়ত একটিমাত্র পরিচয় যে সে তোতার দাদা। হয়ত সুরজিতের চোখের ছায়ায়, ঠোটের ম্লান রেখায় ও তোতাকেই খুঁজতে চেয়েছিল, খুঁজে পেয়েছিল। আর সে-পাওয়া একটু-একটু করে ছড়িয়ে গিয়ে সুরজিতের ছবি মুছে তোতাকেই সামনে নিয়ে এসেছিল। তা-ই। দীপায়নের সামনে তোতাই ছিল, জীবন্ত তোতা অথচ মৃত্যুর স্মৃতি নিয়ে। মৃতরা আমাদের স্বপ্নে যেভাবে আসে ঠিক তেম্নি। তারা চোখ তুলে তাকায়, বিষণ্ণ চোখ; হয়ত কথাও বলে, একটি-দু'টি কথা—আমরা তাদের পাই কিন্তু সবসময়ই যেন জানি, ওরা মৃত। তাদের বাঁচিয়ে তুলবার ইচ্ছা মনের উপরে উঠে আসে—এসে হোঁচট খায় তাদের মৃত্যুর অনুভবের উপর।

১৯৪৫ ইং

আশ্চর্য্য, কতোদিন পর তোতার সঙ্গে দেখা! যেদিন স্বপ্ন চাইতাম, স্বপ্নে পেতে চাইতাম তোতাকে, সেদিন ত এমন হয়নি। হঠাৎ কাল রাত্রিতে কোত্থেকে এলো ও?

হঠাৎ? তা-ই কি, দীপায়ন?

তুমি কি ভাবছ, তোমার বাইরের মনটুকুই সবখানি মন? না, তা ভাবছি না। আমি কি জানিনে অন্ধকারে মন কি চেহারায় ঘোরাফেরা করে! জানি। কাল সুপর্ণা আমার ঠিক তেম্নি মন তৈরী করে তুল্‌ছিল, তোতা যেম্নি করতে পারত। কিন্তু সুপর্ণা তা জানে না, ও শুধু জানে, আমি পাষাণ-দেবতা, কিন্তু আমি ত জানি পাষাণের আড়ালে কি গভীর জল, দেবতার ভেতরে ভঙ্গুর মানুষ কতোখানি!

সুপর্ণার কণ্ঠে, চোখের আভায়, মুখের রেখায় অনেক দিনের ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিল যে-মন, তা-ই কাল তোতাকে তৈরী করে তুলেছে। হঠাৎ কেন আসবে ও! আমার মনের অলিগলি সবই জানা এ-তোতার। ও আমারই খানিকটা মন।

"ও, পানু!" মাসীমা আনাজের ঝুড়ি থেকে চোখ তুলে বল্‌লেন।

"কাল এলাম।"

মাসীমা হাসতে লাগলেন, আনাজ কুটতে সুরু করবেন মনে হ'ল।

পারিজাত ত ছিল এতোক্ষণ এখানে! কোথায় গেল? হাওয়া।

"পুরু? তোতার কাছে গেছে না কি!"

কি আশ্চর্য্য, মাসীমা কি করে জানলেন আমি পুরুকে খুঁজছি!

"কদিন থেকেই তোতার জ্বর!" আনাজ কুটতে লাগলেন মাসীমা।

ও, তাহলে সব মিছে কথা—তোতা আছে। কিন্তু কোন্ ঘরে তোতা? পড়ার ঘরে? না ত! পড়ার ঘরে কি করে হবে? এই ত, এ-ঘরে। চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

এ-ঘরে আমি কি করে এলাম?

তোতা চাদর সরিয়ে তাকাল। কেমন যেন ফ্যাকাশে মুখ! আর, কই বলল না ত—"পানুদা!"

"এইমাত্র জানলাম তোমার জ্বর।"

তোতা মাথা নেড়ে না জানাল।

তাহলে শুয়ে আছে কেন? অদ্ভুত! বাড়িটাই যেন অদ্ভুত হয়ে গেছে—আলো নেই শুধু ছায়া। সবাই কালো-কালো।

"তুমি কালো নও?"—কে বল্‌লে? তোতা? না ত। তোতা মুখ বুজে শুয়ে আছে। অথচ তোতারই গলা।

"আমি?" হাসতে চাইলাম। ভুরু কুঁচকে মৃতা তোতা মুখ ফিরিয়ে নিলে।

তারপর নাগাড়ে কয়েকদিন সুরজিতের কাছে তোতার কাহিনীই বলে গেছে দীপায়ন, বাবার কথা একটিও না। শুনতে সঙ্কোচ হতে পারত সুরজিতের

কিন্তু তা না হয়ে বরং অবাক হয়ে ভেবেছে, তোতাকে কেউ এমনও ভালোবাসতে পারে !

"কিছুই পেলোনা ও জীবনে—কোনো সুখ, কোনো শান্তি—" দীপায়ন ঠোঁট চাপতে সুরু করেছিল : "আমি ওর জীবনে শুধু ব্যথাই মাখিয়ে দিলাম !"

"কিন্তু তোর কাছে ও যা পেয়েছে—আন্তরিক ভালোবাসা—" সান্ত্বনার ছোঁওয়ায় শান্ত আর ভারি-ভারি শোনাচ্ছিল সুরজিতের গলা : "ক'টি মেয়ে তা পায় ?"

"ও কেন মরল, বলতে পারিস সুরজিৎ ?"

চোখে ভয় নিয়ে সুরজিৎ দীপায়নের দিকে তাকাল—অদ্ভুত অনেক কথাই বলছিল পানু কিন্তু এমন অদ্ভুত কোনোটাই নয়।

"আমার কেবল মনে হয়—" তীর-বেঁধা কোনো প্রাণীর যন্ত্রণা ফুটে উঠল দীপায়নের মুখে : "মনে হয়, হয়ত আমারই অপরাধ ! আমি যদি কলকাতা চলে না যেতাম, আমি যদি থাকতাম ওর কাছে, তাহলে ওর অসুখ করত না !"

স্বস্তিতে ফর্সা হয়ে উঠল সুরজিতের মুখ। নাবালক ! পানুটা চিরকালই নাবালক রয়ে গেল। আদুরে ছেলে যা হয় !

হাসির মতোই একটা-কিছু ফুটে উঠতে চাইল সুয়জিতের ঠোঁটে : "কথাটা তোর আন্‌সাইন্টিফিক।"

"হ'বে !" দীপায়ন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে ক্লান্ত দেখাল : "সায়ান্স নিয়ে আমরা কতোটুকু যেতে পারি ? কতোটুকু শক্তিই বা দিতে পারে আমাদের সায়ান্স !"

"ইমোশনকে চেপে রাখতে পারলে অনেকদুর যাওয়া যায়।"

"ইমোশন প্রাণেরই একটা বুদ্ধি।" দীপায়নকে ব্যথিত আর তাই সুন্দর দেখাল খানিকটা : "ইমোশনকে চেপে রাখা যায় কিন্তু তারপর মানুষ হিসেবে আমরা আর কতোটুকু থাকি ? আব তা-ই যদি হল—মানুষই যদি না-ই হলাম আমরা, তবে বিজ্ঞান আমাদের কি দিল, কতোদূর নিয়ে গেল তার বিচার করে কি হবে ?"

সুরজিৎ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল দীপায়নের মুখের দিকে। ওকে সুন্দর দেখাচ্ছিল বলে নয়, কথাগুলো অদ্ভুত শোনাচ্ছিল—তাই। মার্ক্সবাদীর

মুখে এ কী কথা? সুরজিতের মনে হ'ল তার অভিন্নহৃদয় কোনো আত্মীয় হঠাৎ যেন আজ অপরিচিত হয়ে রুখে দাঁড়াল।

"তুই কি সত্যি এসব ভাবিস, পানু?"

"না ভাবলে কেন বল্‌ছি।"

"বিজ্ঞান তোর কাছে মিথ্যে হয়ে গেল?"

"মিথ্যে নয়। কিন্তু সত্য জেনেছি বলে তার যে বড়াই ওটা মিথ্যে। বিজ্ঞান নিয়ে বস্তুর চলতে পারে কিন্তু বস্তুর বাইরে যে-জিনিষ, যাকে আমরা মন বলে চিনি, সে বিজ্ঞানের বাইরে।"

পানু মনকে বস্তু থেকে আলাদা করে নিয়ে ভাবছে বলে দুঃখই হ'ল সুরজিতের। তর্ক করতে ইচ্ছে হল না। আবেগের জোয়ার চলেছে এখন ওর মনের উপর, সে-মন আবেগ ছাড়া আর কোনো বস্তুকেই সত্য বলে মেনে নিতে চাইবে না। সুরজিতের তাই চুপ করে থাকাই ভালো। ভুলে যাওয়া ভালো যে পানু কোনোদিন মার্ক্সবাদী হয়েছিল। পানু পানুই—তার বন্ধু—ভালো ছেলে—কবিতা লেখে—ইচ্ছে করলে মাষ্টারি করতে পারে কোন কলেজে—তা না করেও চলে ওর, টাকার অভাব নেই। এ-পানুই থাক। তোতার জীবনকে সুন্দর করে তুলেছিল যে-পানু, তার দাম কি সুরজিতের কাছে কম? না-ই বা হ'ল সে মার্ক্সবাদী।

"তুই হয়ত অবাক হচ্ছিস, সুরজিৎ—"

"না ত।"

"হচ্ছিস। নিশ্চয়ই ভাবছিস যে আমার মতো লোক মার্ক্সবাদে ঝুঁকে পড়েছিল কি করে!"

"কিছুই আমি ভাবছিনে।"

"বাসব এখানে থাকলে হয়ত বলত, বিরিভমেণ্টে আমি বিগড়ে গেছি।"

"আমি ভাবছি, বাসবের সঙ্গে থেকেও তুই যে এধরনের কথা বলতে পারিস!"

"আমি এ-ধরনের বলেই ত বাসবের সঙ্গে আছি।"

আবার চুপচাপ হয়ে গেল সুরজিৎ। পানু এবার হেঁয়ালি ধরেছে—সুরজিতের ধাতে যা সয়না। তার যুক্তি-বুদ্ধি-ভাবনা সবই সহজ, সরল। মানুষের সঙ্গে মানুষের ঘোরালো বা প্যাঁচালো সম্পর্ক সে মানবে না কিছুতেই।

বুর্জোয়া আর্ষ্য জগতের উপর তাই সে খাপ্পা। কী সব হয়ে উঠছি আমরা দিনকে দিন। মন খুলে কেউ কারো সঙ্গে মিশতে পারি নে—বাপ ছেলের সঙ্গে নয়, মা মেয়ের সঙ্গে নয়, ভাই বোনের সঙ্গে নয়! এ-সমাজকে বাঁচিয়ে রেখে কি লাভ? সুরজিতের মনে পড়ল, মা তাকে বলেছিলেন: "তুই-ই এ সর্ব্বনাশ করলি আমাদের।" শিবির-ফেরতা সুরজিৎ মাকে আর কোনোদিন এমন ভীষণ হয়ে উঠতে দেখেছে বলে মনে করতে পারলনা। আর সর্ব্বনাশটা যে কি তা-ও আন্দাজ করতে কষ্ট হল তার। মা এবার আরেক চেহারায় বদলে গেলেন, কাঁদবার উপক্রম করে বললেন: "তোর আস্কারাতেই ত পান্নুর সঙ্গে ওর চেনা হল··।" মুখ ফিরিয়ে মার সামনে থেকে চলে এসেছিল সে। একটি ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ের ভালোবাসার সহজ সম্পর্ককে স্বীকার করে নিতে পারেনা যে-মন, মেয়ের মৃত্যুও মেয়ের ভালোবাসার অপরাধ যে-মন থেকে মুছে দিতে পারেনা, তার থেকে যতো দূরে থাকা যায় ততোই ভালো। বাড়ীর সঙ্গে সেদিনই সুরজিতের সম্পর্ক ঘুচে গেছে - তারপর থেকে সে আর বাড়ির ছেলে নয়, অতিথির মতো।

"We love others in proportion to their degree of strangeness to us—কথাটা তুই মানিসনে সুরজিৎ ?"—দীপায়ন নিজেকে বিচার করে রায় দিল।

সুরজিৎ চমকে উঠে একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল: "কি ?"

"আমার মতো মোটেই নয় এমন মানুষকেই ত আমার ভালো লাগবে।"

"ভেবে দেখিনি।"

"দেখিস্।" হাসল দীপায়ন: "পুরুষের মতো মেয়েরা নয় বলেই মেয়ে পুরুষের এমন আকর্ষণ!"

"হ'তে পারে।" চুপ করে থাকার জের টেনে চলল সুরজিৎ।

"তোদের ডায়লেক্‌টিক্সের সঙ্গে মেলেনা কথাটা, কেমন ত ?" বিদ্রূপ নয়, আবিষ্কারের সমর্থন পাবার জন্যেই দীপায়ন সুরজিতের মুখের দিকে তাকাল: "তবে আমার মনে হয়, পৃথিবীতে যা-কিছু সৃষ্টি, তা কেবল দু'টি অমিলের মিলের জন্যেই।" চুপ হল দীপায়ন।

সুরজিৎ ভাবল, পান্নু বলছে তা-ই কথাগুলো আমার ভালো লাগা উচিত। পান্নু ভুল বলবে তা যখন আগে ভাবতে শিখিনি কোনোদিন, আজ আর কেন

তা ভাবতে যাওয়া! কতোদিন, কতোদিন পর পান্নু আর আমি বসে-বসে কথা বলছি আবার, আমাদেরই ছোট সহরে বসে আছি—ছেলেবেলায় দিঘীর পাড়ে বসে যেম্নি কথা বলতাম ঠিক তেম্নি। যা-ই বলুক পান্নু, ঠিক তেম্নিইত লাগবে আমার!

দীপায়ন চুপ করেই রইল খানিকক্ষণ। সুরজিৎকে দেখছিল ও—তোতাকে দেখতে পাচ্ছিল। ঠোঁটের, চোখের, নাকের একটি-তু'টি রেখায় অবিকল তোতা। না কি এ ওর আবিষ্কার? চোখ ফিরিয়ে নিল দীপায়ন। আরেকটি মানুষের মধ্যে তোতাকে পাওয়া আর যেন ভালো লাগছিলনা ওর। এ যেন অভাবটাকে আরো বেশি করে মনে করিয়ে দেওয়া—পাওয়া নয়।

তার মানে দীপায়ন সুরজিতের সাহচর্য্যে খানিকটা আরোগ্যের পথ ধরল। ইমোশন থেকে ফিলসফির এলাকায় যাবার পথ। ওর স্বাভাবিক, সুস্থ স্থিতির এলাকা। বাসব কি বলত জানিনে, জানিনে বলত কি না 'বিরিভমেণ্টে পান্নু বিগড়ে গেছে,' তবে আমি বলব, এই দ্বিতীয় বিয়োগব্যথা দীপায়নের মনে ফিলসফির ফসল তৈরী করে তুলছিল।

কুড়ি

দীপায়নের কোনো উপন্যাসের একটি অধ্যায় থেকে :

ঘুম ভেঙে হঠাৎ জেগে ওঠে পার্থ। সেই কান্না, তার ঘুমের ভেতর ঘুরে-ফিরে গানের সুরের মতো যা এতোক্ষণ কেঁদে চলেছিল। এখন তা স্পষ্ট, স্পষ্ট কান্নার সুর। মা কাঁদছেন। পাশের ঘরে, না কি বারান্দায়? কাঁদুন, কাঁদতেই ভালোবাসেন মা—মনে-মনে বলল পার্থ। চোখ বুঁজল আবার। ঘুমোবে।

কিন্তু চোখ বুঁজলেই কি সব অন্ধকার হয়ে যায়? বোঁজা চোখেও আলোর ঝিলিমিলি দেখতে লাগল পার্থ—কথার ঝিলিমিলি। পার্থকে লুকিয়ে মা রোজ কাঁদেন কিন্তু লুকোতে পারেন না। এখন ত সে শুনতে পাচ্ছে তাঁর কান্না অথচ মা ভাবছেন পার্থ ঘুমিয়ে আছে।

ভাবছেন কি? পার্থর কথা কি মা ভাবেন কোনোসময়? না। ভাবেন শুধু তাঁর কান্নার কথা। কাঁদতে এতোও ভালো লাগে তাঁর। পার্থ উঠে বসল। আলো জ্বালবে? না, চুপচাপ ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়াই ভালো।

চুপচাপ, মার পেছনে এসে দাঁড়াল পার্থ। বারান্দার এক কোণে কান্নার মিহি সুরের মধ্যে।

"বাবা আসেননি এখনও?" ধারাল ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল পার্থ।

কান্না নিঝুম হয়ে গেল।

"আসবেন না আর আজ—ঘরে চলে এসো।"

মা উঠে দাঁড়ালেন।

পার্থ মার ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল। ভাবলে, বসবে কোথাও। কিন্তু বসবার জায়গা নেই—বাবার বিছানা, বাবার চেয়ার ছাড়া আর জায়গা নেই। দাঁড়িয়ে রইল পার্থ। মা ঘরে এলেন।

"তুই ঘুমো গে যা—" চোখ-মুখ মুছে মা পরিচ্ছন্ন হয়ে এসেছেন।

অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে মাকে—পার্থ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

"তুমি ?" অবাক হয়েই বলল পার্থ।

"আমি ত ঘুমোবই।"

"যতো ঘুমোবে জানি।"

মার চোখ লজ্জায় বুঁজে এলো। নবীন প্রৌঢ়ত্ব লজ্জার আভায় তারুণ্যে ফিরে আসতে চাইল।

"আমি ঘুমোচ্ছি, তুই যা।"

"যাচ্ছি, কিন্তু জানি তুমি জেগে থাকবে।"

"তুই ত সবই জানিস।" মা বিছানার চাদর টেনে-টেনে শোবার আয়োজন দেখাচ্ছিলেন।

"যেদিন আসবেন না—আসবেনই না—এটাকে গা-সওয়া করে নিলেই ত হয় কিন্তু তা না, তোমার কাঁদা চাই!" সবই যে জানে পার্থ তা জানিয়ে দিয়ে সে নিজের ঘরে ফিরে এলো।

ফিরে এলো জেগে থাকতে, মনে-মনে কথা বলতে, ঘুমুতে নয়। মনে-মনে কথা বলা, নিজের কাছে নিজেকে বলা ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারে সে! কলেজে একপাল সহপাঠীর কেউ তার জীবনে এসে ঢুকতে পারেনি। ইস্কুলেও ঠিক তেমনি—ওরা ছিল, হাসি-কথাবলা-ছুটোছুটি সবই ছিল, কিন্তু ছুটির ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে সবই মুছে যেতো তার মন থেকে। সে-মনকে আজ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে পার্থ—আজ আরো পরিষ্কার ছবি নিয়ে দাঁড়িয়েছে সে-মন। কী ভীষণ একা সে! কেউ নেই তার- শুধু মা। পরের জন্যে যতোটুকু জায়গা আছে তার মনে তার সবটুকুই জুড়ে আছেন একা মা। কিন্তু মা ত তা বুঝতে পারেন না। বুঝতেই যদি পারতেন, তাহলে তাঁর এ-কান্না কেন? কতো বছর হয়ে গেল, মাঝে-মাঝে রাত্রিতে বাবা বাড়ি আসেন না, কিন্তু সকালবেলা ত ঠিক আসেন—তবু মার কাঁদা চাই—এ-নিয়েই মার যতো-কিছু ভাবনা। তা-ও একদিন বলেছিল পার্থ: "চলো মা, আমরাও ক'দিনের জন্যে মামাবাবুর ওখানে চলে যাই।" মা রাজি নন। এখানে থাকবেন, আর কাঁদবেন।

কিন্তু বাবা কোথায় যান? কথার এলোমেলো হাওয়া দিতে লাগল তার মনে। যখন বাড়ি আসেন সকালবেলা, কি রকম একটা বিশ্রী হাসি থাকে তাঁর ঠোঁটের উপর! লালচে চোখ, উস্কোখুস্কো চুল—জামাকাপড় কুঁচকনো!

বিকেলবেলা যখন বেরিয়ে যান, তখন ত কেউ তারা জানে না যে আজ রাত্রিতে আর ফিরে আসবেন না তিনি। মাকে বলে যাননা ত কিছু! তাই হয়ত মার ভাবনা। কিন্তু সে ত ভাবনা—ভাবনার জন্যে কাঁদে নাকি কেউ? তিনমাস আগে যখন রেমিটেণ্ট জ্বর হ'ল পার্থর—মা ত কতো ভেবেছেন কিন্তু এক ফোঁটাও ত কাঁদেন নি।

তার মানে তবে এই যে তার দিকে মার ততো মন নেই, যতো মন তাঁর বাবার দিকেই। হাঁ, তাই। শুয়ে পড়বে ভেবেছিল পার্থ, উঠে বসল। তাকেও ঠিক বাবার মতো হতে হবে—কলেজ থেকে আর বাড়িতেই আসবেনা কোনো-কোনোদিন, তবে যদি মা তাকে ভালোবাসেন। তখন ঠিক ভালোবাসবেন মা—পার্থর সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠল আনন্দে। অথবা নিষ্ঠুরতায়।

নিষ্ঠুরতাও যে একটা শারীরিক আনন্দ সেদিনই হয়ত প্রথম অনুভব করল পার্থ।......

শরৎচন্দ্রই 'শ্রীকান্ত' কিনা এ-নিয়ে বাংলাদেশে হুলুস্থূল পড়েছিল। মনে ভাববেন না, আমিও এখানে এ ধরনের একটা বাজে আলোচনার ভূমিকা তৈরী করছি। দীপায়ন মোটেও পার্থ নয়—পার্থ একটা কাহিনীর চরিত্র আর দীপায়ন জলজ্যান্ত মানুষ। পার্থ যদি পুঁথি-কেতাবের বেড়া ডিঙিয়ে বাংলাদেশের মাটিতে মানুষ হয়ে উঠ্‌তে পারত, তেমন একটা অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হলে, হয়ত দীপায়নের সঙ্গে তার খানিকটা মিল পাওয়া যেতো। তা যখন নয়, তখন তাদের দুস্তর ব্যবধান মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

তবে, এ-অধ্যায়ে পার্থ-প্রসঙ্গ কেন উদ্ধৃত করলাম তার একটা ন্যায্য কৈফিয়ৎ আমার দেওয়া দরকার। তাই দিচ্ছি:

দীপায়ন যখন ঔপন্যাসিক, একদিন আমাকে ও বলেছিল: "আজ আমি উপন্যাস লিখ্‌ছি কিন্তু লিখব ভেবেছি অনেকদিন আগে। যখন বাবা মারা গেলেন, মা-বৌদি চলে গেলেন দেশের বাড়িতে, শুধু আমি আর দাদা—তখন। তখন আমার কি মনে হ'ত জানিস, অনি, জীবনের একটা দৃশ্য যেন শেষ হয়ে গেল—আমি সে-দৃশ্য থেকে উঠে এসে দৃশ্যটাকে তখন নিখুঁত দেখতে পেতাম।

দৃশ্যের গায়ে জড়িয়ে থেকে দৃশ্যটাকে যেমন দেখতে পেয়েছিলাম, তখন আর তেমন নয়, আরেক রকম। তার সব ভঙ্গী, সব ইঙ্গিত, সব কথা, সব মানে বুঝতে পারছি। এমন একটা অবস্থায় আসতে পারলেই, আমার মনে হয়, উপন্যাস লিখতে সত্যি ইচ্ছে করে।"

কিন্তু তখন দীপায়নকে দেখে সুরজিৎ ঘূণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি যে একজন ঔপন্যাসিকের জন্ম হচ্ছে। বরং আশঙ্কা হ'ত তার, হয়ত অকর্ম্মণ্যই হয়ে যাবে দীপায়ন।

"আমি চলে যাচ্ছি, সুরজিৎ—"

"কোথায় ?"

"কলকাতা।"

"আর ক'টা দিন থাকবিনে ? আমি ত ভাবছিলাম একটা ষ্টাডি-সার্কল্ ডাকব, তুই বলবি কিছু।"

"বলার কিছু নেই। হাঁপিয়ে উঠছি এখানে।"

দীপায়নের চোখে তাকিয়ে থেকে কথাগুলো বুঝবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল সুরজিৎ।

"এক্ষুণি তোর যাবার কি হল ?" শেষটায় প্রশ্নই করতে হল।

"কোনোসময় ত যেতে হবে।"

"যখন হবে তখন দেখা যাবে।"

"নাঃ।" কেমন-যেন তেতো হয়ে উঠ্‌ল দীপায়নের চোখ-মুখ : "কি হবে এখানে থেকে ?"

"মা তোকে যেতে দিচ্ছেন ?"

"মা কোথায় ? দলবেঁধে সবাই দেশের বাড়িতে—পিশিমা, মা, বৌদি সব।"

"কেন ?"

"ভালো লাগছিল না মার আর এখানে থাকতে।"

"বাড়িতে তুই আর দেবুদা শুধু ?"

"শুধু আমি। দাদা ত মরা মানুষ।"

"সত্যি, দেবুদা বড্ড কেমন-যেন হয়ে গেছেন।"

"পলিটিক্সের জ্বরই যখন ছেড়ে গেছে ওঁর, আর কি থাকবে।"

"ঘোরতর সংসারী হয়ে উঠেছেন, না ?"

দীপায়ন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ল : "তা-ও যদি হতেন !"

"কি বলেন ?"

"কি আর বল্‌বেন ! ওঁর প্রাণ বলে কিছু আর নেই—জীবন নেই—জীবনের একটা মুখোস পরে আছেন। মনে হয়, দাদা বন্দীশিবির থেকে বেঁচে আসতে চাননি। কেন যে মরলেন না—কেন যে ফিরে আসতে হ'ল—তা-ই ভাবেন এখন।"

"পলিটিক্সের গায়ে নূতন হাওয়া লেগেছে বলেই হয়ত ওঁর এমন হয়েছে।"

"তা নয়।" বিষণ্ণতায় দীপায়ন সত্যি দীপায়ন হয়ে উঠ্‌ল এবার : "ফাঁসীকাঠ থেকে যদি কেউ বেঁচে আসে সে কি আর জীবনকে আগেকার মতো পায় ? মৃত্যুর একটি তীক্ষ্ণ মুহূর্ত্ত জীবনে যার একবার উঁকি দিয়েছে, তার কাছে জীবন তারপর খাপছাড়া। দাদা যে ধরনের পলিটিক্স করেছেন তা থেকে বেঁচে আসবার কথা ছিলনা।"

দীপায়নের কথাগুলো সুরজিৎ ঠিক মেনে নিতে পারলনা—সে-ও ত সন্ত্রাসবাদী দলের ছেলে কিন্তু আজ কতো সহজভাবে মার্ক্সবাদী। দেবুদা মার্ক্সবাদী হতে পারতেন কিন্তু এম্নি গোঁড়ামি তাঁর, মার্ক্সবাদের একটি বই জীবনে ভুলেও হাতে তুল্‌লেন না। তাঁদের দলে এখন ভাঙন সুরু হয়েছে—সন্ত্রাসবাদে ভাটার টান এখন—আসল কথা, দেবুদা সে-শোকেই এমন মনমরা।

কিন্তু দ.পায়নের ভুল ভাঙতে চাইলনা সুরজিৎ, শুধু বল্‌লে : "দেবুদার মতো অনেকেই ত আজ পর্য্যন্তও পলিটিক্স করেছেন !"

"তাঁরা হয়ত ঠিক দাদার মতো ভাবতেন না। 'আমি মরতে যাচ্ছি'—এ-বিশ্বাস নিয়ে কি সবাই যেতে পারে ?"

পারেনা। সুরজিৎ ভেবে দেখল। মাঝে-মাঝে তার মনে হত : 'হয়ত মরতে হবে'—কিন্তু সবসময় নয়। 'আমি মরবই'—এমন ধারণা নিয়ে কি-করে কাজ করে মানুষ ? দেবুদা তাহলে সত্যি অদ্ভুত। রোমান্টিক। দু'ভাই ওরা একই রকম রোমান্টিক, শুধু পথ আলাদা।

"দাদাকে দেখলে সত্যি দুঃখ হয়।" ব্যথায় শেষ নিঃশ্বাস ফেলে দীপায়ন কথা শেষ করতে চাইল : "তাই আরো চলে যেতে চাই।"

"গিয়ে কি করবি সেখানে ?"

"যা-করতাম। পাব্লিশারের প্রুফ-রীডারের কাজ।"

"ও কি একটা কাজ! তোর মনে কতগুলো বাজে জিনিষ ঢুকে গেছে, পান্নু!"

"কেন?" দীপায়নের চোখে হাসি উঁকি দিল।

"বিশ্রীভাবে জীবন কাটানো কোনো কাজের কথা নয়।"

চুপচাপ হাসতে লাগল দীপায়ন। খানিকক্ষণ। তারপর হাসির এক-টুকরো উজ্জ্বলতাই যেন সুরজিতের চোখের সামনে তুলে ধরে বলল: "এবার গিয়ে আরেকটা কাজ করব ভাবছি।"

"তা-ই কর। তোর করবার কিছু নেই—একথা কে বিশ্বাস করবে?"

"একটা কবিতার বই বার করব—আগেকার কবিতাগুলো দিয়ে—সব ফাইল-কপি নেই—যদি পাওয়া যায় তবেই।"

"ভালো।" নিবু-নিবু গলায় বলল সুরজিৎ, তারপর হাসতে চাইল। অস্পষ্ট হাসি, তবু যেন কিসের স্নিগ্ধ আভায় সুন্দর।

বিকেল-বেলা দু'ভাই চুপচাপ বসে আছে। সেদিনই দীপায়ন চলে যাবে। রাত্রি বারোটায় গাড়ি। স্যুটকেস গুছোনো, হোল্ড-অল বাঁধা। হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়ে সুরজিতের মনে হচ্ছিল হয়ত অনেক আগে দু'একটি কথা বলে এখন এ'দুটি প্রাণী থেমে নিঝুম হয়ে গেছে। তবু দীপায়ন চায়ে চুমুক দিচ্ছিল, দেবুদা তা-ও না। নিরেট পাথর।

সুরজিতের আবির্ভাবে পাথর নড়ে উঠ্‌ল: "সুরজিৎ, এসো!" তারপর সেই পাথরের মুখে কী যে এক ব্যথা, কী আকুতি যে ফুটে উঠ্‌ল তা নাকি সুরজিৎ আজ পর্য্যন্ত চোখ থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। দেবুদা বল্‌লেন: "পান্নু আজই চলে যাচ্ছে!"

"আপনি যেতে দিচ্ছেন কেন?" একটা চেয়ার টেনে নিয়ে দীপায়নের মুখোমুখি বসল সুরজিৎ।

"আমার মানা কি ও শোনে।" দেবুদা হাসতে চেষ্টা করলেন।

"আমি কি বিলেত যাচ্ছি?" দীপায়ন আব্দেরে ভঙ্গীতে বল্‌ল: "সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছি যে দাদা বাধা দেবেন।"

আরেক পর্দ্দা অসহায় দেখালেন দেবুদা। মনে হ'ল, আর তিনি এ-ঘরে থাকতে চান না, বেরিয়ে যাবার ভূমিকা তৈরী করছেন: "তোমার জন্যে চা আনতে বলছি, সুরজিৎ।"

ওদের কথা বলাবে বলেই যেন সুরজিৎ ঘরে ঢুকে কথা বলেছিল—দেবুদা বেরিয়ে যেতেই সে-ও এখন নিঝুম হয়ে গেল।

কিন্তু দীপায়ন চুপ রইলনা। কাপটা হাত থেকে নামিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল, দাদা হয়ত সূর্য্যকে ফরমাশ করে সুরজিতের চায়ের অপেক্ষায়ই রান্নাঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। "দাদাকে অদ্ভুত দেখ্ছি—জানিস সুরজিৎ?" দীপায়ন একনিঃশ্বাসে দেবুদার কথা শেষ করে দিতে চাইল: "দুঃখ বা ব্যথা বোধ ওঁর নেই—ক্রমেই যেন জড় হয়ে যাচ্ছেন—একটি প্রাণী যখন জড়বস্তু হয়ে যাচ্ছে, তার যে একটা চেহারা হয় তা দেখতে ঠিক ব্যথিতের চেহারার মতো। দাদাকে তা ই দেখছি আমি। বাবার মৃত্যু ওঁকে ব্যথা দিতে পারেনি। মাকে-বৌদিকে দেশের বাড়িতে যেতে বলতে কোথাও বাধলনা ওঁর।"

"কিন্তু তোর যাওয়া ত উনি চাচ্ছেন না।"

"তা-ই ত বললাম অদ্ভুত!"

"তোকে ভালোবাসেন দেবুদা।"

"নাঃ। কেউ আমায় ভালোবাসেনা।" দীপায়ন মুখ ফিরিয়ে নিল।

কেমন-যেন একটু উদাস হয়ে গেল সুরজিৎ, তারপর বল্লে: "আমায় কথা দিচ্ছিস ত, পানু?"

"কি?" বোঁজা-বোঁজা আর ভেজা শোনাল দীপায়নের গলা।

"এবার কলকাতা গিয়ে ভালোভাবে থাকবি—ভালো কাজ করবি।"

"বলেছি ত অথার হব, প্রুফ্‌রীডারি আর না।"

সুরজিৎ পকেটে হাত ঢুকিয়ে ভাঁজকরা দু'টো দামী-প্যাডের কাগজ বার করে আনল, দীপায়ন তাকিয়ে থেকে ভাবছিল, চিঠি?—বাসবের কাছে চিঠি দিচ্ছে কি সুরজিৎ?

"নে"—কাগজ দু'টো দীপায়নের হাতের উপর রেখে বল্‌ল সুরজিৎ: "তোরই কবিতা। তোতাকে দিয়েছিলি—তার জন্মদিনে।"

হাত সরিয়ে নিল দীপায়ন, কোলের উপর গড়িয়ে পড়ল কাগজ দু'টো।

তোতাকে দিয়েছিলাম—তোতাকে দিয়েছিলাম ? একটা মন্ত্রের মতো কে যেন বারবার বলে উঠ্‌তে লাগল দীপায়নের গলার ভেতর। তারপর ক্ষীণ, দুর্ব্বল হতে সুরু করল সেই মন্ত্রের ধ্বনি : যা দিয়েছিলাম সবই ত ফিরিয়ে নিতে হ'ল—এ'দুটো আর নয় কেন ?

এমন যে হবে—একটা বোবা ব্যথায় যে ফ্যাকাশে হয়ে যাবে পানুর মুখ—সুরজিৎ জানত। তবু সে কবিতা দু'টো ফিরিয়ে দেবে ভেবেছে। তোতার 'গীতাঞ্জলি' বই-এর ভেতর যেদিন সে আবিষ্কার করেছিল এদের, সেদিন অবশ্য ভাবেনি, ভেবেছে পানু কবিতার বই ছাপবে শুনে। এমন সুন্দর কবিতা ওর বই-এ থাকবে না ? ফিরিয়ে দেবার সময় অবশ্য মন-খারাপ হয়ে যাবে পানুর কিন্তু ওটুকু মন-খারাপের জন্যে ত কবিতা দু'টো হারিয়ে যেতে পারেনা।

"তোর বই-এ থাকুক দু'টো কবিতা।" নম্র শোনাল সুরজিৎকে।

"থাকুক।" জোরে একটা শ্বাস ফেলল দীপায়ন। তারপর তাড়াতাড়ি কবিতা দু'টো তুলে নিয়ে স্যুটকেস খুলে তার পকেটে গুঁজে রাখল। ফিরে এসে আর বসতে পারলনা দীপায়ন, ভাবছিল উঠোনে নেমে গিয়ে খানিকক্ষণ পায়চারি করলে ভালো লাগবে।

"এক মাসেই ত বইটা বেরিয়ে যাবে ?" আরো নম্র হয়ে গেল সুরজিৎ।

"তা বেরোবে—বাবা যখন টাকা রেখে গেছেন।" কাউকে যেন আঘাত দেবার দরকার ছিল দীপায়নের, খুঁজে খুঁজে শেষটায় নিজেকেই ও বেছে নিলে।

সুরজিৎ ব্যথিত হয়ে পড়তে পারত কিন্তু ওর মন হয়ত অনেকদিন আগেই কোনোসময় ব্যথা পাবেনা বলে শপথ নিয়েছিল, তাই হাসতে পারল : "অনেকের বাবাই ত টাকা রেখে যান কিন্তু তা দিয়ে কি কবিতার বই হয় ?"

দীপায়ন যেন মন দিয়ে শুনল কথাটা, কথা শেষ হয়ে গেছে যখন তখনও যেন তার ধ্বনি কুড়িয়ে নিচ্ছিল তার কান। তারপর অসহ্য যন্ত্রণায় বুঝি ওর চোখ বুঁজে এলো। সুরজিৎ কেন বলছে ও-কথা—ও-রকমভাবে কেন বলছে ? ঠিক তোতার মতো করে কেন ও কথা বলে ? বেরিয়ে যাবে বলে দরজার দিকে এগোল দীপায়ন।

কিন্তু বেরিয়ে যাওয়া হলনা—চায়ের কাপ হাতে নিয়ে দাদা এসে আবার ঘরে ঢুকলেন।

সুপর্ণা যা চায় তা আমি দিতে পারিনে। তা দেওয়ার মতো করে সুপর্ণাকে আমি নিতেও পারিনি।

মনে পড়ে একদিন আমি শপথ করেছিলাম, আর ভালোবাসা চাইবনা—ভালোবাসব না আর।

তৃষ্ণায়ই সব দুঃখ—গৌতম বুদ্ধ ঠিক বলেছিলেন।

কিন্তু তার আগে—যেদিন শপথ করেছিলে তার আগে—তোতা যখন তৃষ্ণার আগুন জ্বেলে দিয়ে সরে গেল—তখন? তখন কি ভাবোনি কোথায় গেলে পাওয়া যায় তোতার একটু স্পর্শ, একটু ধ্বনি, একটু মন। কি-রকম ব্যাকুল ছিল, নিবিড় ছিল তোমার সে-চাওয়া। সে-চাওয়ার শক্তি কোনো দিন কি ফুরিয়ে যেতে পারে। তোমার শপথ ডিঙিয়ে, বৌদ্ধ মন ছাপিয়ে আজও তা বেঁচে আছে। তাই না সুপর্ণাকে পেলে!

ভালোবাসব না! বল্‌লেই কি সব চুকে গেল? তাহলেই কি তুমি ভালো না বেসে থাকতে পারো? পেরেছিলে কি মাকে ভালো না বেসে থাকতে? বাবা যে-বছর মারা যান, মা সব ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে গাঁয়ের বাড়িতে চলে গেলেন। তুমি কি করেছিলে তখন? কলকাতা চলে আসবে ভেবেছিলে। এসেছিলে অবশ্য কিন্তু কলকাতার টিকিট যেদিন কেটেছিল তার পরের দিন নয়, একমাস পর। ষ্টেশনে এসে টিকিট বদল করে গাঁয়ের ষ্টেশনের টিকিট নিয়েছিলে—মনে পড়ে?

মনে পড়ে, সে-রাত্রিতে ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমে তোমার নিজের ছবি? ঢ্যাখো তোমার কীর্ত্তি:

স্যুটকেস খোলা গোল টেবিলটার উপর—আমি ইজিচেয়ারে, হাতে সেই কাগজ দু'টো—আমার কবিতা—তোতার হাত থেকে আমার হাতে ফিরে এসেছে।

তোতার হাত—আঙুল—কই, ছাপ নেই ত কোথাও। একটু যদি ছাপ থাকত আমি ছুঁতে পারতাম। আমি পেতাম তোতাকে। পাওয়া যায়না, একটু দূরে সরে গেলেই আর পাওয়া যায়না, মাকে পাচ্ছিনা ত আমি—আর এ ত মৃত্যু!

তোতাকে আর নয়—যেমি বাবাকে নয়। কোথাও একটু কিছু নেই—শুধু নাম। বাবা ছিলেন—তোতা ছিল—শুধু এই। যেমি মা-ও ছিলেন, এখন আর নেই। সত্যি নেই, মৃত্যু, মৃত্যুর মতো। তোতার মতো কি মা-ও, কোথাও আর পাওয়া যাবেনা মাকে ?

আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে যিনি আছেন, কে ? হয়ত এখনো ঘুমোননি—শুয়ে আছেন—তবু ভাবছেন না—একবারও ভাবছেন না পান্নুকে। তোতা একবারও ভাবছেনা পান্নুদাকে। পান্নু যদি গিয়ে ডাকে তাঁকে স্বপ্নের তোতার মতোই ফিরে তাকাবেন তিনি, মাথা নেড়ে বলবেন : 'না'।

সবই 'না'। মুছে যাওয়া, ঘুচে যাওয়া। তোমাকে 'না' বলছে সবাই, সবাইকে তুমি 'না' বলছ। সত্যি কি তুমি তোতাকে চেয়েছিলে ? মাকে সত্যি চেয়েছিলে তুমি ? ফাঁকি—তোমারই কোথাও ফাঁক ছিল, মস্ত ফাঁক। ফাঁক থাকে, জমাট হতে পারেনা কেউ।

তুমি দীপায়ন—তুমিই একটা মস্ত ফাঁকি অথচ নিজেকে কতো শক্ত সত্যই না ভাবছ। ফাঁকা আওয়াজ তোমারই অথচ ভাবছ চারদিকে তোমার ফাঁকা আওয়াজ উঠছে। এ-শব্দগুলো, এসব কথার শব্দগুলো কি ? কবিতা ? না, ফাঁকি ? সুন্দর সাজানো কথা সব—বলতে ভালো লাগে, শুনতে ভালো লাগে কিন্তু সত্যি কি তুমি তা বলতে পারো—ভালো-মন্দ জড়িয়ে যে-তুমি তার কথা কি এই ? ফাঁকি—ফাঁকি।

জুতোর শব্দ হচ্ছিল বারান্দায়। কেউ ওয়েটিং-রুমে আসছেন, ভেবেছিলে। আর তক্ষুণি কাগজ দু'টোকে ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে ফেলেছিল তোমার হাত।

একুশ

প্রমিতার সঙ্গে বাসব বজ্‌বজ্‌ গেছে; ফিরতে রাত হয়ে যাবে অনেক, তাই ও বলেছিল শিয়ালদ' গিয়ে গাড়িটা দেখতে। এম্নিতেই আমি যেতাম—দীপায়ন আমাকেও চিঠি দিয়েছিল আসবার খবর জানিয়ে। বাসবের সঙ্গে হঠাৎ এস্‌প্ল্যানেডে দেখা, দেখা না হলেও ক্ষতি ছিলনা, হয়ে বরং ক্ষতি হ'ল। কারণ অনর্থক পনেরো মিনিট ওর সঙ্গে দাঁড়াতে হল আমাকে, শুনতে না চাইলেও শুনলাম যে দলবল নিয়ে ও আজ বজ্‌বজ্‌ যাচ্ছে, প্রমিতাও যাবে সঙ্গে –প্রমিতা, যে চমৎকার মেয়েটির সঙ্গে সম্প্রতি ওর পরিচয় হয়েছে। তবে যে-কথাটা মাঝে-মাঝে আমার মনে হত তা যে মিথ্যে নয়, জলজ্যান্ত সত্য, এ দেখা হওয়াতেই তা জেনে নেওয়া গেল। সত্যি, আজকাল বাসব হুকুম করতে আরাম পায়। তা নইলে আমার মতো আধা-পরিচিতকে ও কি করে বলতে পারল: "পানু আসছে আজ, আমি ত যেতে পারছিনে, আপনি যাবেন শিয়ালদ'?" 'এটা করুন', 'সেটা করুন', 'বেলুড়ে যান', 'কাঁচরাপাড়া ইউনিয়নের খবরটা নিয়ে আসুন—' আজকাল অনেককেই হয়ত এ-ধরনের হুকুম দেয় বাসব। তাই ওর কথার ধরনই এম্নি হয়ে গেছে।

দীপায়নের সঙ্গে ট্যাক্সিতে হাজরা রোডে আসবার সময় আমি বাসবকেই ভাবছিলাম। খানিকটা কালো আর রোগা দেখাচ্ছিল দীপায়নকে। মাথায় এখনও ভালো চুল গজায়নি বলেই যে এমন তা নয়। ও হয়ত সত্যি রোগা হয়ে চলেছে—আদরের ভাটায়, যত্নের অভাবে। এসপ্ল্যানেডের বাসবকেই মনে পড়ছিল আর ভাবনা হচ্ছিল সেই বাসবের সঙ্গেই কি না থাকতে যাচ্ছে দীপায়ন।

"কলকাতার খবর কি?" ট্যাক্সির আরামে গা ঢেলে প্রথমই জিজ্ঞেস করেছিল আমাকে দীপায়ন।

"কিছু না।"

"তার মানে?"

"দু'মাসে কি আর খবর তৈরী হবে এমন।"

"বাঃ, যুদ্ধ বেধে গেল—আর কলকাতারই খবর নেই।"

"যুদ্ধ ত পোল্যাণ্ডে।"

"তাই ভাবছে সবাই, তা-ই না ?"

"তাছাড়া আর কি ভাববার আছে! এখানে জার্ম্মাণ কোম্পানীর বড়কর্ত্তা যাঁরা ছিলেন তাঁরা না কি একদিন কেরানীবাবুদের তিনমাসের বেতন বোনাস দিয়ে পকেট-এরোপ্লেন নিয়ে অফিসের ছাদে উঠে গেলেন—সেখান থেকে বেমালুম হাওয়া—পুলিশ এসে তাঁদের নাম-গন্ধও আর পেলোনা! এসব গুজব শুনেই চা খাচ্ছে, পান চিবুচ্ছে সবাই।"

"এসব ইয়াকি করে ?"

"ইয়াকি ? বলতে যাও, আস্ত ফিরে আসবেনা।"

"কেন ?"

"এ হচ্ছে শ্রদ্ধা-নিবেদন। পকেট-এরোপ্লেন কি চাট্টিখানি কথা ? আর তিনমাসের বেতন বোনাস ? ইংরেজের সাধ্যে কুলোবে ?"

"ও।"

"আমরা ভীষণ খুসী—ইংরেজ এবার টের পাবেন।"

"হিটলার মরতে বসেনি ?" দীপায়ন নড়ে-চড়ে উঠল : "বাসু-ওরা কি বলে ?"

"বাসবের সঙ্গে আমার কথা হয়নি—দেখাই হয় না।"

জানালায় চোখ নিয়ে গেল দীপায়ন : "আমার কিন্তু অসম্ভব নূতন মনে হচ্ছে কলকাতাকে। হয়ত কয়েকদিন গাঁয়ে কাটিয়ে এলাম বলেই! ভারি নূতন, এমন আর মনে হয়নি কখনো!"

"বাসবকেও নূতন মনে হবে!"

"কেন ?" হঠাৎ যেন চমকে উঠ্‌ল দীপায়ন।

"নেতা হ'তে চলেছে বাসব।"

"খুব ভাল। নেতা হওয়াই ওর উচিত। এমন দৃঢ়তা ক'টা মানুষের আছে ?"

"তুই ওর সাকরেদ হচ্ছিস ত এবার ?"

আমার ছুরী দীপায়নকে বিঁধলনা, তবু একটা ক্ষিপ্র ব্যথাই যেন হাসির

মতো ঝিলকিয়ে তুলল ওর মুখ : "সাকরেদ হবারও ক্ষমতা নেই আমার।" দীপায়ন সীটের পিঠে মাথা এলিয়ে দিল।

রাস্তায় আমাদের আর খুব বেশি কথা হয়েছিল বলে মনে পড়েনা, ভাবছিলাম বাসবের নিন্দা দীপায়নকে আঘাত করে। অথচ বাসব সম্পর্কে দু'একটা বাঁকা কথা না বলেও আমার উপায় ছিলনা। কাজেই কথা বলার ইচ্ছা থাকলেও চুপচাপ থাকতে হচ্ছিল। চুপচাপ থাকতে গিয়েই দীপায়নকে তখন যেন ঠিক দেখতে পেলাম। রুক্ষ হয়ে গেছে খানিকটা—বাবার মৃত্যুরই ঝাপটায় হয়ত। এখন, এই রুক্ষ দীপায়নকেই বাসবের সঙ্গে মানাবে ভালো।

কিন্তু—ট্যাক্সির ভাড়া যখন চুকিয়ে দিচ্ছিল দীপায়ন, আমার সেই প্রথম মনে হল তা-ই যদি হবে, বাসবের দোসর হিসেবেই যদি তৈরী হয়ে এসে থাকবে ও, তাহলে এ-ট্যাক্সির বিলাস কেন ? বাসে-ও ত আসা যেতো। বলতে ইচ্ছা করল কিন্তু বললাম না।

সেদিনের মতো দীপায়নের সঙ্গে কথা বলাই হয়ত আমার ফুরিয়ে গিয়েছিল, কারণ ফ্ল্যাটে ঢুকতেই চাকর খবর দিলে বাসুবাবু ও-ঘরে আছেন। দীপায়নের সঙ্গে যখন আর নিরিবিলি হওয়া যাবেনা, ভাবছিলাম চলে যাই কিন্তু ভদ্রতা বলে জিনিষটা আমাদের ইচ্ছার উপর জবরদস্তি চালায় বলেই যেতে পারলাম না।

দেখা গেল 'ও-ঘরে' একা বাসুবাবুই নয়—সঙ্গে একটি মেয়েও আছেন। প্রমিতা ? আমার মনের প্রশ্নটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠ্‌তে-না-উঠ্‌তেই বাসবের মুখে তার জবাব পাওয়া গেল :

"এই যে পানু—প্রমিতা তোর জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে—গাড়ি লেট্ বুঝি আজ ?"

গাড়ি যদি লেট্ই না হয় তাহলে তোমরা দুজন এখানে অনেকক্ষণ কি করে থাকবে ? দীপায়নকে বললাম : "আমি যাচ্ছি, কাল একবার আসতে চেষ্টা করব।"

দীপায়ন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল—বর্ত্তমান মুহূর্ত্তগুলোকে ঠিক-ঠিক কায়দায় আনতে একটু সময় লাগছিল ওর।

আমি চলে এলাম কিন্তু প্রমিতার চেহারাটা আমার চোখের সামনে সামনেই চলতে সুরু করল। দেখতে হয়ত ও ভালো, চোখ দুটো একটু তফাতে

বসানো বলে হয়ত ওকে একটু অসহায়ও দেখায়, কিন্তু বাসবের সঙ্গে জড়িত হয়ে ওর যে-চেহারাটা আমার মনের উপর উঠে এলো, (হয়ত আমার মনের খানিকটা অশ্রদ্ধার সঙ্গে মিশেই এমন হল ওর) তা সুন্দরও নয়, শোভনও নয়। ইচ্ছে হচ্ছিল কোনো রেষ্টুরেণ্টে ঢুকে এক-কাপ চা খাই কিম্বা কোনো সিনেমা-হাউসে অনেক মানুষের ভীড়ে মিশে যাই—কিন্তু তার চাইতে বোধহয় হাঁটাই ভালো—মনে পড়ল তাতেই শীগগীর মেজাজ জুড়োয়।

পরে একদিন দীপায়ন বলেছিল সে-রাত্রিতে ওরও না কি হাঁটতে খুব ইচ্ছে করছিল।

"সারাদিন ট্রেন-ষ্টীমারে বসে থেকে মাটিতে পা দিলে হাঁটতে ইচ্ছে করে না? তাছাড়া কলকাতার এমন সুন্দর রাত্রি আর রাস্তা—গাঁ থেকে হঠাৎ এসে আরো সুন্দর লাগে চোখে—হাঁটতে হাতছানি দেয়।" দীপায়নের কবিতা শুনে হাসতে সুরু করেছিলাম। কবিতার ভাষায় নিজেকে চমৎকার আড়াল করা যায়।

"গাঁয়ে একমাস তুই ছিলি কি করে?" গাঁয়ের কথা পেড়ে আমিও নিজেকে আড়াল করতে চাইলাম।

"বেশ ছিলাম। প্রথম কয়েকটা দিন অবশ্য ভালো লাগেনি। মনে হত যেন একটা কবর দেখতে এসেছি। বাবার সেই ফুলের বাগান নেই—বিশুদা চুপচাপ বাড়ি বসে থাকেন—ওঁকে বিয়েও করালেন না পিশিমা। বলতেই পিশিমা হাস্‌লেন। সব জায়গায়, সবার জীবনে বিয়ে জিনিষটা তেতো হয়ে গেছে, অনি।"

"শেফালিও ছিলনা নিশ্চয় গাঁয়ে।"

"না। থাকলেও বা কি? সে পান্নুও বা কই আর?"

"কি করতিস সারাদিন ওখানে?"

"বিস্তর লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়, গল্প-গুজব।"

"ভালো লাগত?"

"ভালো আর যখন লাগলনা তখনই ত চলে এলাম।"

কথাটা শেষ হয়নি দীপায়নের, মনে হ'ল আরো কি-যেন বলবে ও, তাই চুপচাপ তাকিয়ে রইলাম ওর মুখে। শেষটায় সত্যি বল্‌লে ও: "আমরা

নষ্ট হয়ে গেছি বলেই গাঁয়ে থাকতে ভালো লাগেনা আমাদের! সহর আমাদের কি দেয়? কি পাই আমরা সহরে? শুধু নিজেকে বিলিয়ে দিই—পাইনে ত কিছু। গাঁয়ের মানুষরা পেতো, কি চমৎকারভাবে নিজেদের পেতো। এখন অবশ্যি সবই গেছে কিন্তু পাওয়ার ভাঙাচোরা চেহারাটা তবু খুঁজে বার করা যায়। কুমোরকে হাঁড়ি কলস তৈরী করতে দেখেছিস, অনি? দেখে-দেখে আমি ভাবছিলাম, কি অদ্ভুত আবিষ্কার আর কি চমৎকার কৌশল। গাঁয়ের লোকরাই সৃষ্টি করতে পারত—এখনো পারে—জীবনের মানে ওরাই বুঝতে শিখেছিল, জীবনকে পেয়েছিল! গাঁ ছেড়ে এসে গাড়ির চাকায় আমরা পেলামনা কিছুই—সবই হারালাম।"

দীপায়নের চেহারাতেই মালুম হচ্ছিল, ও গাঁয়ের গন্ধে বোঝাই হয়ে এসেছে। কলের জলে আর বিজলী আলোতে গায়ের ময়লাটা কেটে গেলে যদি ওর মন সাফ হয়! কিন্তু মুস্কিল যে কোনো অভিজ্ঞতাকেই ও সহজে ভুলতে পারে না। হয়ত পাওয়ার বাতিক থেকেই ওম্নি মন তৈরী হয়। ভাবছিলাম।

দীপায়নের এতোগুলো কথার পর চুপচাপ ভাবতে থাকা বেমানান বলেই বল্‌লাম: "হঠাৎ তোর গাঁয়ে যাবার ইচ্ছে হ'ল যে বড়ো?"

"মা ওখানেই আছেন!"

"সে কি! তোদের সহরের বাসা ভেঙে দিয়েছিস্ না কি?"

"সে ত কবেই!" দীপায়ন হাস্‌ল: "ভাঙা-বাসাতেই ত বাবা মারা গেলেন!"

"দেবুদা? দেবুদাও গাঁয়ে চলে

"ভাঙা মানুষ ছাড়া ভাঙা বাসা আগলাবে কে?"

"দেবুদা আছেন অথচ মা চলে গেলেন!'

"হারানো দিনগুলোকে খুঁজতে গেছেন মা—সুন্দর দিনগুলো, পুকুরের ঘাটে, ধবধবে সাদা মাটির উঠোনে, বাগানের ধারে, ঘরের আনাচে-কানাচে একটি নূতন বৌকে খুঁজতে গেছেন।"—দীপায়ন হাসতে লাগল। কিন্তু সে-হাসির যেন কোনো রঙ নেই, চেহারা নেই, মানে নেই।

ভালো লাগলনা। মনে হ'ল আমরা দু'জন—আমি আর দীপায়নও যেন একটা অবাস্তবতার জগতে ঢুকতে সুরু করেছি। আমরা যেন আর কলকাতায়

বসে নেই—এখানকার জীবনে নেই—এখান থেকে নিজেদের তুলে নিয়ে গাঁয়ের পথে হেঁটে চলেছি। দীপায়নের শেষ কথাগুলোই হয়ত মন্ত্রের মতো এমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার তৈরী করে তুলল।

চেষ্টা করে তা-ই বলতে হ'ল: "তোকে গেঁয়ো-গেঁয়ো দেখে বাসব খুব খুসী, নারে পানু?"

"বাসবের কাছে গ্রাম একটা ইডিওলজি আর আমি সত্যি গেঁয়ো।"

"কথাটা শুনলে কি বাসবের ভালো লাগবে?" খুসী হয়ে উঠেছিলাম।

"ভালো লেগেছে কিনা জানিনে তবে শুনেছে। হয়ত গায়ে মাখায়নি। আর্‌বান ওয়ার্কারস্‌ নিয়েই ও এখন মত্ত।"

"আর দলের নূতন-নূতন মানুষদের নিয়ে?"

"প্রমিতার কথা বলছিস্‌?" একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল দীপায়ন: "খুব উজ্জ্বল, বেশ সাহসী মেয়েটি!"

"হয়ত বড়োলোকের মেয়ে! কম্যুনিজম্‌ করতে ওরাই ত দু'চারজন এগিয়ে আসে প্রথম।"

"তা জানিনে। ফিফ্‌থ্‌ ইয়ারে ইকনমিক্স পড়ে—চট্‌পটে।"

"তোর সঙ্গে নিশ্চয়ই খুব চেনাশোনা হয়ে গেছে।"

"না। আলাপ হয়েছে মাত্র।"

"অদ্ভুত ত!"

খোঁচাটা এড়িয়ে গেল দীপায়ন: "এসে অবধি গাঁয়ের মেয়েদের কথাই ভাবছি আমি—অনি! একজনকে কিছুতেই আমি ভুলতে পারছিনে। একটি বিধবা মহিলা, মারই বয়সী। এক পরিচিত বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল, সেখানেই দেখলাম ওঁকে প্রথম। বললেন, আমার না কি কাকিমা হন তিনি, রক্তের সম্পর্কে নিশ্চয়ই নয়, গাঁয়ের সম্পর্কেই হয়ত। আমাকে পরিবেশন করছিলেন। দেখলাম এক অদ্ভুত মন! মা-ও তাঁর ছেলেকে এতো আদর মেখে ভাত খাওয়ান না! একটি অপরিচিত ছেলেকে কি করে যে ওঁরা এতো আপন করে নেন আজও তা ভাবতে গেলে আমি অবাক হয়ে যাই। এ-জাতের মেয়ে আর নেই এখন, অনি! আমার মা-ই ত এ-জাতের নয়!"

"প্রমিতার পাশাপাশি ওঁর চেহারাটাই বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, তা-ই না?"

"ওঁর কথায় প্রমিতা আসবে কেন?"

"দু'টি আলাদা ধরনের মেয়ে একসঙ্গে মনে পড়েনা আমাদের ?"

"পড়ে। কিন্তু প্রমিতাকে ত আমি ভালো চিনিনে—ওর ধরন কি করে জানব ?"

"বাসবও বলেনি কিছু ?"

"বলতে চেয়েছিল কিন্তু আমার শুনতে মন ছিলনা।"

হো-হো করে হেসে উঠলাম: "বাসবের কথায় তুই অমনোযোগী হতে শিখছিস্ পানু—এমন ত দেখিনি আগে।"

১৯৪৩ ইং।

"পুরুষের ধর্ম্মই ফ্যাসিষ্ট হওয়া"—প্রমিতা।

কী বিশ্রী শোনাল প্রমিতার মুখে কথাগুলো, আর কী বিশ্রী দেখাতে লাগল ওকে! বাসব হয়ত প্রমিতাকে অপরূপ দেখছিল, চোখ ভরে সৌন্দর্য্যপান করছিল বাসব। মাথা নীচু করে চুপচাপ বসেছিল নীলাঞ্জন।

আমি প্রমিতাকে দেখলাম—বিধাতা-পুরুষের দৃষ্টি নিয়ে দেখতে পেলাম ওকে। ওর অতীত-ভবিষ্যৎ আমার চোখের উপর এসে একসঙ্গে দাঁড়াল।

আমি মনে করতে পারলাম, ওর সঙ্গে প্রথম যখন আমার দেখা সেই মুহূর্ত্তগুলোকে। মনে পড়ল আমাকে।

"বাসবদা ত খুব প্রশংসা করেন আপনার—আপনি না কি ভালো কবিতা লেখেন ?"—হাই উঠছিল প্রমিতার।

"লিখতাম।" আশঙ্কা হচ্ছিল, প্রমিতা কি বাড়ি যাবে না আজ—এখানেই থাকবে ?

"এখন আর লেখেন না ? যাক্ বাঁচা গেছে।"

আমার কবিতা লেখার উপর কি ওর বাঁচা আর মরা এমনই নির্ভর করছিল ? কিন্তু বললাম: "ভূত ছেড়ে গেছে বলে আমিও নিশ্চিন্ত।"

"লেখবার কতো জিনিষই ত আছে—কবিতা কেন ? কী যে এক বাতিক পুরুষদের!" মহাপুরুষের ভঙ্গী এলো প্রমিতার চোখে-মুখে-গলায়।

মেয়ের ব্যাপারে অনুগত পিতার আপত্তি থাকলে আপত্তিটাকে যেমন হাসির

মোড়কে উপস্থিত করেন তিনি, বাসবও ঠিক তা-ই করল : "তুমিও ত কবিতা পড়ো—মাঝে-মাঝে।"

"কবিতাটা যে কিছুই নয় তা জানবার জন্যেই পড়তে হয়।"

"তা জানতে কি আর মাঝে-মাঝে পড়তে হয় ? একদিন পড়েই ত জানা যায়!" কঠোর গন্তই শোনাতে হল প্রমিতাকে।

প্রমিতা চুপ। বাসব চুপ। আমি উঠে গেলাম রান্নার দেরি হচ্ছে কেন দেখতে।

তারপর আরেক দিন। সবচেয়ে স্মরণীয় দিন।

সেদিন বাসব ছিলনা। বাসবকে ওর দরকারও ছিলনা হয়ত, দরকার ছিল আমাকে। ঢালা বিছানার একপাশে বসে প্রমিতা বল্‌লে : "বাসবদা কোথায় ?"

"বেরিয়েছে। বেরনোইত ওর কাজ, ঘরে থাকা নয় ত!" শোবার ভঙ্গী ভেঙে উঠে বসলাম।

"আপনাকে বিরক্ত করলাম, ঘুমুচ্ছিলেন আপনি ?"

"বিরক্ত করবে কেন ? শুয়ে থাকা মানে ত কাজ নেই বলে নিজের উপর বিরক্ত লাগা—"

"কলেজ ছুটি হয়ে গেল আজ, হষ্টেলে আর গেলামনা—চলে এলাম।"

"বেশত।" বলেই, কেন জানিনে, চমকে উঠলাম আমি।

কিন্তু আজ আমি জানি, কেন চমকে উঠেছিলাম। নির্জ্জন-দুপুরে হঠাৎ একটি মেয়ের কণ্ঠ শুন্‌তে পেয়েছিলাম : 'চলে এলাম'। সে যে কে তা যেন মনে ছিলনা আমার। অনেক স্মৃতি নিয়ে—কবিতা হয়ে কথাটা আমার কানে এলো : 'চলে এলাম'। কবিতার মতোই ভালো লাগল শুনতে—কথাগুলো তাদের মানে ছাড়িয়ে মনের ইসারায় ঢেউ-এর মতো আমাকে ছুঁয়ে গেল। কিন্তু একটি মুহূর্ত্ত। তারপরই আমার মাথার ভেতর কে যেন চেঁচিয়ে উঠ্‌ল : "প্রমিতা! দেখ্‌ছনা ? এ প্রমিতা!" সত্যি, এ প্রমিতা—আমি চমকে উঠলাম।

"দীপায়নদা, তুমি বড্ড একা থাকতে ভালোবাসো, না ?"—যেন আরেক প্রমিতা কথার আরেক ভঙ্গীতে বিছানার উপর আর-একটু এগিয়ে এলো।

কিন্তু চমকে উঠেছি একবার, আর আমার ভয় ছিলনা।

প্রমিতা হাসছিল, যে-হাসির সব রকম মানেই হয়, তেমন।

"অবাক হয়ে গেছ—তোমাকে 'দীপায়নদা' বলছি বলে—না?"

"না।"

বারবার নিজের দিকেই তাকাচ্ছিল প্রমিতা: "বাসবদা বলেন অবিশ্যি, তুমি আমাদের একজন--কিন্তু আমার মনে হয়না। তুমি এমন নিরিবিলি থাক।"

"আমার কুঅভ্যাস।"

"কেন?" ক্রমেই সুন্দর দেখাতে লাগল প্রমিতার রূঢ় সৌন্দর্য্য। মানুষীর সৌন্দর্য্যে নেমে আসতে সুরু করল ওর মুখ।

ওকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়না আবার প্রতিমায়?—ভাবছিলাম। ওর এম্নি মুখ হয়ত বাসবও দেখেছে কোনোদিন—হয়ত বাসব বাঁচাতে পারেনি নিজেকে—বলতে পারেনি, তুমি ফিরে যাও পাষাণের রেখায়। একমুহূর্ত্তের জন্যে কঠোর বাসব হয়ত দুর্ব্বল মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছি। আর প্রমিতা তখনই ফিরে গিয়েছিল পাষাণ-প্রতিমায়—কোনো কথা বলেনি ও, বাসবকে নুইয়ে দিতে বলেনি: "ছিঃ বাসবদা, তুমি এমন!" নিজে থেকেই বাসব নুয়ে গেছে, প্রমিতা খুসী হয়েছে। তা-ই। প্রমিতার পাশাপাশি বাসবকে দেখলে তা-ই কি মনে হয়না? এই গোপন ইতিহাসের অন্ধকারই ঘিরে আছে দুজনকে—মনে হয়। হঠাৎ সে ইতিহাসের কথাগুলো আলোর অক্ষর নিয়ে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ল। ইন্দ্রিয়ের মতোই আমার অন্তঃকরণ হয়ত সজাগ হয়ে উঠেছিল তখন।

"কথা বল্‌ছ না যে—" প্রমিতার চোখের নীলচে আভা আমার চোখে এসে পড়ল।

"কথা?" অন্যমনস্কের মতো প্রশ্ন করলাম।

"আমার সঙ্গে কথা বল্‌তে তোমার খারাপ লাগে জানি।"

ময়নাও কি ঠিক এম্নি জানতনা—প্রমিতা আজ যেম্নি জান্‌ছে? কিন্তু ময়না হয়ত সত্যি জান্‌ত—প্রমিতার জানা শুধু অভিনয়। ময়নাতে নেমে আসছে প্রমিতা, পরের মুহূর্ত্তেই উপরে উঠে যাবে বলে—শিকারী পাখীর মতো ওর এ-অবতরণ। ময়না ভাবত, ও নীচুতে আছে, উপরে উঠবার জন্যে তাই হাত বাড়িয়েছিল—দেখাতে চেয়েছিল প্রতুলকে, আমি উপরে উঠ্‌তে জানি। প্রমিতা দেখাতে চায়—ওর সঙ্গে নীচুতে নামিয়ে দেখাতে চায়—দ্যাখো, তুমি কতো নীচুতে--উঁচু মানুষ বলে বড়াই করোনা আর।

"কেন খারাপ লাগে, দীপায়নদা ?"

"খারাপ লাগেনা ত !"

প্রমিতা ওর ডানহাতটা নিজের চোখের উপর তুলে ধরে দেখতে লাগল—হয়ত দেখাতে চাইল আমাকে। ও কি জানে আমি যে ওকে দেখে নিয়েছি ? ওর আর্ত্ত চোখ, ব্যথিত ঠোঁট, ক্ষুধিত বুক, শিহরিত দেহ, রক্তের উত্তাপ, রক্তাক্ত কামনা—সব—সবই যে দেখতে পেয়েছি তা কি জানে ও ? জানে কি, আমি যে বাসবের চাইতেও কঠোর হতে পারি—পারি যে পাথরের চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকতে ?

জানেনা, দীপায়নের ইতিহাস জেনে কেউ ভাবতে পারেনা দীপায়ন যে এমনও হতে পারে।

হাত গুটিয়ে নিয়ে আমার দিকে তাকাল প্রমিতা, হাসতে চাইল একটু—দুঃখীর হাসি। লালচে মুখ ওর শুকিয়ে উঠছিল। উঠে দাঁড়াল হঠাৎ। বারান্দায় গেল। রেলিং ধরে চুপচাপ রাস্তায় তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর ফিরে এলো ঘরে।

"বাসবদা কোথায় গেছেন—জানেন ?" প্রমিতা প্রমিতার মতোই জিজ্ঞেস করল।

"বাসব কি আমায় বলে কোথাও যায় ?" স্বস্তিতে আমি হেসে উঠলাম।

এ-প্রমিতাকেই আজ দেখতে পাচ্ছি আমি। কিন্তু ভয়ঙ্কর ভাবছিনে ওকে। মেয়েদের উপর পুরুষের যে-অবহেলা, উৎপীড়ন চলেছে এতোকাল, ও হয়ত তারই একটা জবাব দিতে চায়। চায় পুরুষদের হাতের মুঠোয় এনে তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিতে ! কিন্তু এই কি জবাবের পথ ? তুমি কি নিজেকে নষ্ট করতে পারো পরকে শাস্তি দেবার জন্যে ?

ভাবছি প্রমিতাকে আমি আরেক চেহারায় ফিরিয়ে আনতে পারতাম কি না। সেদিনকার দুপুরের ইতিহাস যদি অন্যরকম হত—যদি প্রমিতায় আমি বীণাদিকে খুঁজতে চাইতাম—তাহলে কি ও ফিরে আসত, ফিরে আসতে পারত ওর ঘৃণা-ক্ষোভ-আক্রোশের বেড়া ডিঙিয়ে ? যদি নির্ভয়ে ভাবতে

পারতাম আমায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ও খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠবেনা তাহলে হয়ত ফিরিয়ে আনা যেতো। আমি প্রমিতার নিয়তিরই দাসত্ব করে গেছি, সেই ক্রুর নিয়তিরই অভিশাপ আজ উচ্চারিত: "পুরুষের ধর্ম্মই ফ্যাসিষ্ট হওয়া।"

'The fitful alternations of the rain'

শেলী,

আর জয়দেব:

'মেঘৈঃ মে দুরম্বরম্‌'—কোন্‌টা ভালো?

বাইশ

দীপায়নের সঙ্গে আমার দেখাশোনায় ক্রমেই ভাটা পড়ে আসছিল। সময়ে-অসময়ে ওর ফ্ল্যাটে গিয়ে উপস্থিত হতে আর ইচ্ছা করতনা আমার। হয়ত বাসবের জন্যেই মনের এই বাঁকামো। হয়ত ভাবছিলাম বাসরের সঙ্গে অল্প-পরিচয়ের বেশি ব্যবধান রাখাটাই ভালো। সোজা কথায়, বাসবকে আমি গ্রহণ করতে পারিনি। দীপায়ন যে কি করে গ্রহণ করল ভেবে অবাক হতাম। তবে সবসময়ই আমার মনে হত দীপায়নের এ-গ্রহণ একটা অভিনয় মাত্র। মনে হত কিন্তু মুখ ফুটে তা দীপায়নকে বলিনি। প্রায়ই দেখাশোনা হলে পাছে কোনো এক সময়ে তা বলতে হয় তারি জন্যে নিজেকে সরিয়ে সরিয়ে রাখতে চাচ্ছিলাম।

তাছাড়া আরো একটা কুৎসিত সন্দেহ আমার মনে উঁকি দিচ্ছিল এ-সময়ে। ভাবতাম প্রমিতার আমদানিটা বাসবেরই কারসাজি। একটি চুম্বকের টানে দীপায়নকে দলের ফাঁদে টেনে আনবার কারসাজি। আমার সন্দেহ হয়ত অমূলক কিন্তু সন্দেহ বস্তুটির এম্নি ঘ্রাণশক্তি, আর এম্নি তা আচ্ছন্ন করবার ক্ষমতা রাখে যে আমরা ভাবতে যাইনে তার মূল আছে কিনা। আমার আশঙ্কা হত কোনোদিন দীপায়নের ফ্ল্যাটে হঠাৎ গিয়ে হাজির হলে হয়ত দেখা যাবে ও প্রমিতার সঙ্গে বসে গল্প করছে। দৃশ্যটা কল্পনা করেই বিস্বাদে মুখ ভরে উঠত আমার। আর সে-বিস্বাদ ক্রমেই গাঢ় হতে থাকত আরো দূর-দূর কল্পনা করে: দীপায়ন হয়ত এখন বাসবের দলে বেমালুম ভিড়ে গেছে; প্যাম্পলেট লিখছে, ইউনিয়নের আসরে গিয়ে বক্তৃতা দেবারও চেষ্টা করছে আর প্রমিতার তারিফ কুড়িয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছে।

কিন্তু নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলাম বলেই যে পুরোপুরি নিরাপদ হয়ে গেলাম তা ত নয়। কলকাতার রাস্তা বলেও একটা স্থান আছে আর তা এজমালি। আমার মতোই দীপায়নেরও রাস্তায় হাঁটবার অধিকার ছিল, অধিকার ছিল রেস্তোরাঁতে যাবার, বই-এর দোকানের সামনে দাঁড়াবার, একটু থেমে মেট্রো বা লাইহাউসের ছবির অভিনেতাদের নামের উপর চোখ বুলোবার।

এম্নি এক অধিকার উপভোগের সময়ই দীপায়নকে একদিন দেখতে পেলাম। দেখেও পালিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু ও-ত আর আমার কাবলী পাওনাদার নয়, কিম্বা আমার কোনো পাকা ধানেও মই চালিয়ে আসেনি—কাজেই পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

"অনি।" খুসীতে রাঙা হয়ে উঠল দীপায়নের মুখ।

"অনেকদিন যাব-যাব ভাবছি কিন্তু হয়ে উঠছেনা।" মিথ্যে কথা বললাম।

"অনেকদিন আমারও কারো সঙ্গে দেখা নেই।"

"ব্যস্ত আছিস, না?"

"ব্যস্ত? আলসেমিতে মরে যাচ্ছি।"

"বাসব একাই দু'জনের কাজ করছে তাই?"

"বাসব কি করছে না করছে জানিনে, বুঝতে পারছি আমাকে কিছু করতে হবে—এভাবে আর দিন কাটানো যায়না!"

"কফি-হাউসে চল—তোর দিন কাটানোর খবরটা শোনা যাবে—রাস্তায় দাঁড়িয়ে হবেনা।"

"পাব্লিক প্রলাপাগারে?" আতঙ্ক ফুটিয়ে তুলল দীপায়নের চোখ; "মানুষের জিভ যেখানে যুদ্ধের দামামা বাজাচ্ছে! কান আস্ত রেখে ফিরে আসতে পারবি?"

"কান কাটার ভয়?"

"তা ত নিশ্চয়ই—হিটলার হেরে যাবে বললে আর রক্ষে আছে? ঠিকই বলেছিলি তুই।"

কাজেই গেঁয়ো ছেলের মতো, অথবা বলতে পারেন, নতুন-প্রেমে পড়া দুটি ছেলে-মেয়ের মতো গঙ্গার ধারেই আমরা নিরিবিলি খুঁজতে গেলাম। আর পথে, কথায়-কথায় দীপায়ন আমাকে জানতে দিল, ওর এ-আলসেমি আর একা-একা থাকা বাসব আর প্রমিতার সঙ্গে কয়েকদিন কথা-কাটাকাটিরই ফল। উৎসাহিত হয়ে এবং বাইরে তার একটু আভাসও ফুটিয়ে না তুলে ঘটনাটা জানতে চেয়েছিলাম আমি। দীপায়ন রাজি হতে ইতস্তত করেনি। রাস্তায়ই তা ও বলতে পারত—কিন্তু আমি ওভাবে শুনতে রাজি ছিলামনা।

আমার মনে হচ্ছিল একটা অঢেল বসবার জায়গা না পেলে কথাগুলো প্রাণভরে শোনা যাবে না।

দীপায়নের মুখে শোনা কাহিনীই এখানে আপনাদের শোনাচ্ছি :

ভূমিকা

"নদী আমার বেশ ভালো লাগে জানিস, অনি। আমাদের শহরের ছোট পাহাড়ী নদীটাকে মনে পড়ে তোর? আমার এখন মনে পড়ছে। ছেলেবেলায় দু'একজন সাথী জুটিয়ে অনেকদিন চলে গেছি ও নদীতে। খেয়া ঘাটে গিয়ে এপার-ওপার করেছি কতো—কী মজা যে পেতাম। কিন্তু একদিন নদীর ধারে গিয়ে আরেকরকম অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলাম—তারপর আর সেখানে যাইনি। আমাদের ও নদীর ধারে সুজা-বাদশাহের একটি মসজিদ আছে, জানিস ত? পুরনো আমলের থাম আর গম্বুজওয়ালা একটা দালান—পাড় থেকে একটু নীচুতে ছায়া-ছায়া, গাছের ছায়ায়—ভেতরের অন্ধকারের ছায়ায় ভীষণ চুপচাপ! দু'একজন লোক ভেতরে যাচ্ছে, চুপচাপ; ভেতর থেকে বাইরে আসছে, চুপচাপ! গম্বুজের পেছনে আকাশ, থামগুলোর পেছনে নদী—সব চুপচাপ! কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল আমার। এতো চেনাশোনা যে নদী তা-ও যেন ভীষণ অচেনা মনে হ'ল সেদিন।

আজ আমি সে-অভিজ্ঞতার মানে খুঁজে পাচ্ছি। নদী সত্যি অচেনা আর অদ্ভুত আমার কাছে! তাই নদীকে এতো ভালো লাগে আমার—আমি নদীর মতো নই বলেই নদীকে ভালোবাসতে পারি। যে অদ্ভুত তাকেই ভালোবাসা যায়।"

গল্পারম্ভ

"প্রমিতাকে ভালোবাসতে পারতাম আমি, যদি ও আমার মতো না হ'ত। কিন্তু ও হুবহু আমার মতো। আমি যদি মেয়ে হতাম তাহলে আমাতে তোরা প্রমিতাকেই দেখতে পেতিস। আশ্চর্য, ওর এক-একটা কথা শুনে মনে হয় যেন আমিই ওসব কথা কবে কোথায় বলেছি। না বললেও হয়ত বলতে পারতাম।

আমি, বাসব আর প্রমিতা।

আমি ॥ তুই-ও কি মনে করিস বাসু, ফ্যাসিষ্টরা ইংরেজ-ফরাসীর চাইতে বেশি কুলীন ?

বাসব ॥ ওদের তুলনায় হিটলার শিশু নয় ?

প্রমিতা ॥ বাসবদা দিন-দিন মেয়েলি হয়ে যাচ্ছেন। অত্যাচারী স্বামীকে অনেক মেয়ে শিশু ভেবে খুসী থাকেন ত।

বাসব ॥ (ভীত হাসিতে) পলিটিক্সে গার্হস্থ্য সম্পর্কের উপমা কি চলে ?

আমি ॥ মানুষের বড়ো-বড়ো পরিবার নিয়েই ত পলিটিক্স—গার্হস্থ্য উপমায় কি ক্ষতি ?

বাসব ॥ সে যা-ই হোক, আমার মেয়েলি মন নয়।

প্রমিতা ॥ তোমার অবশ্যি ধারণা যে তুমি কড়া-রকমের পুরুষ।

বাসব চুপচাপ হাসতে লাগল। কিন্তু আমি ওর হাসিতে মন দিতে পারিনি। ভাবছিলাম, প্রমিতার এ-কথাটা আমিও ভেবেছি অনেকদিন কিন্তু মুখে কথাটা ফুটিয়ে তুলেছি আরেক চেহারায়, বাসবের ধারণাটাকে আমার নিজের বিশ্বাস বলেই জাহির করেছি আমি, বলেছি : "বাসব সত্যিকারের পুরুষ।" পুরুষরা হয়ত চিনতে পারেনা সত্যিকারের পুরুষ কে—মেয়েরাই তা চিনতে পারে।

পলিটিক্সের খোয়াড় ডিঙিয়ে খোলা ময়দানে আসবার চেষ্টা করল বাসব।

"জানো প্রমিতা, পানু কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছে।"

"কেন ?" উজ্জ্বল চোখে প্রমিতা আমার মুখে তাকালো : "সত্যি ?"

"আমার মনে হয় পৃথিবী থেকে কবিতা লেখার দিন চলে গেছে।"

"তা কি যায়।"

বাসব ওর থিয়োরী উপস্থিত করল : "প্যাটার্ণ হয়ত বদলেছে। আজকের দিনে কবিদের কাজ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি নাড়িয়ে দেওয়া—কিপলিং-এর উল্টো সুর গাওয়া।"

"কবিদের কাজ বাৎলে দেবার লোক এতো বেশি আর এতো বিচিত্র আজকাল যে ও-কাজে হাত দেওয়াই বোকামি।" বাসবের কথাগুলো হজম করে নেওয়া মুস্কিল ছিল আমার পক্ষে।

"আপনি হয়ত ভাবেন—" খানিকটা ভিজে-ভিজে দেখাল প্রমিতাকে : "কবিতা পড়তে আমার ভালো লাগেনা, সত্যি না ?"

"তা কেন ভাব্‌ব ?"

বাসব মধ্যস্থতা করল : "জানিস পানু, তোরা দুজনেই কবিতা ভালোবাসিস। আর দু'জনেই এখন কবিতার উপর ক্ষেপে গেছিস !"

গল্প

"আমি সত্যি ভাবতে সুরু করেছিলাম, অনেকদিন আমি ভেবেছি—হয়ত প্রমিতার আর আমার মনের ধাঁচ একই রকম। হয়ত একই নমুনায় আমাদের দুজনের মন তৈরী হয়েছে।

মেয়েদের উপর পুরুষের আসক্তি খুব বেশি হবার কারণ ত শুধু দৈহিক নয়—সামাজিক একটা বিধানও তার কারণ। ছেলেবেলার পর মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে আর চলতে পারে না—ছেলেরা ছেলের দল খুঁজে নেয়, মেয়েরা মেয়ে-সঙ্গী। তারপর যখন দেহের দাবী একদিন ওদের মনে উঁকি দিতে সুরু করে—সেদিন এই ব্যবধান সে-দাবীকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে চতুর্গুণ করে তোলে।

এ অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম, আজ মনে পড়ে। আমি শেফালি আর বীণাদির কাছে কৃতজ্ঞ। বাবার কাছেও কৃতজ্ঞ। বাবা হয়ত জানতেন এ-কথাটা, তাই শেফালির সঙ্গে আমার মেলামেশায় তাঁর অগাধ সম্মতি ছিল।

কিন্তু এ-অভিশাপ-মুক্তিরও একটা অভিশাপ আছে, অনি—মনের বাঁধন আলগা হয়ে যায়। তুমি নিবিড় হতে পারনা মেয়ের সঙ্গে। মন গভীর হতে রাজি হয় না। ময়নার কথা মনে হলে সে নারাজ মনের ছবিকেই আমি দেখতে পাই।

এখন দেখতে পাই, কিন্তু তখন দেখতে পেতাম না। তোতার বেলাইত মনে হতো, সবাই যেমন একদিন একটি মেয়েকে নিজের মতো ভালোবাসে আমিও তোতাকে ঠিক তেম্নি ভালোবাসছি। কিন্তু সত্যি কি তা-ই ? আমার মন নিজেকে আড়াল না করে বলতে পারবে : হ্যাঁ, তা-ই ? অনেক সময়ই হাঁপিয়ে উঠেছে আমার মন—আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।

তার মানে কি জানিস অনি ? আমি কোনো মেয়েকে ভালোবাসতে পারিনে। সে-ভাবে আমার মন তৈরী নয়।

প্রমিতারও হয়ত এম্নি হয়েছে। ও-ও কোনো পুরুষকে ভালোবাসতে

পারে না মনপ্রাণে। ভালোবাসার হয়ত ভঙ্গী দেখায়—দেহের ক্ষুধারই একটা ভঙ্গী—পরক্ষণেই হয়ত ওর মন ছি-ছি করে উঠে।"

[দীপায়ন এখানে যা আমাকে বলেছিল তা হয়ত আসল ঘটনা নয়—আসল ঘটনারই একটা ছায়া। আসল ঘটনাটা হয়ত ওর জার্ণাল্‌সে আছে, আগেকার অধ্যায়ে তা আমি তুলে দেখিয়েছি - অনিরুদ্ধ ঘোষাল]

"একদিন ফ্ল্যাটে ফিরে এসে দেখি প্রমিতা একা বসে আছে—ওসময়ে যে বাসব থাকেনা তা ও জানে—জেনেই এসেছে। আমার অপেক্ষাতেই ছিল ও।

ঘরে ঢুকে দেখতে পেয়েছিলাম ওর হাতে ফাউণ্টেন-পেন আর আমার টেবিলের ছোট আয়নাটা। আমার জন্যে একটি চিঠি রেখে যাবে বলেই যেন ফাউণ্টেন-পেনটা কিন্তু আয়না কেন? চিঠি লিখতে মুখটা কেমন ভঙ্গী নেয় তাই দেখতে?

হেসে অভ্যর্থনা জানালাম: "অনেকক্ষণ বসে আছো?"

"না। কিন্তু আপনি বাড়ি থেকে বেরোন, তা-ত জানতাম না!"

"আমাকে খাঁটি বর্ম্মী পুরুষ বলে ধরে নিয়েছ না কি?"

"শুনতে পাই নিজেকে ছাড়া আর কারোকে না কি দরকার নেই আপনার!"

"দেখছি মনের রোগী হিসেবে বিখ্যাত হয়ে পড়েছি আমি।"

"আপনিও একে রোগ ভাবেন?"

"ফ্রয়েড ভাবেন, তোমরা ভাবো—আমার না ভেবে আর উপায় কি?"

"সাইকোলজির অনেকগুলো বই দেখছি সাইকোলজি পড়ছেন, না?"

"বুর্জ্জোয়া সাইকোলজি পড়ে দেখছি আমি বুর্জ্জোয়া কি না!"

"কি দেখলেন?"

"দেখলাম আমি 'মিস্‌ফিট'। যে-আবহাওয়ায় বাঁচতে পারতাম, পৃথিবীতে তা আর নেই।"

দপ করে নিভে গেল প্রমিতা। মনে হল প্রমিতা যেন প্রমিতা নয়। ও যেন ডাকতে পারে, টানতে পারে আমাকে ঠিক তোতার মতো। যেন বলে উঠতে পারে: "এসো আমরা ঘুমিয়ে থাকি।"

সে-অবস্থায় ওকে আরো গভীরভাবে পাবার জন্যেই বলতে চাইলাম: "আমাকে দেখে, জেনেশুনে কি তা-ই মনে হয়না তোমার?" কিন্তু কথাগুলো কেমন যেন রূঢ় আত্ম-পরিচয়ের মতো শোনাল।

"কি জানি!" আবছা হাসিতে খানিকটা ফর্সা হয়ে উঠতে চাইল প্রমিতা, উঠে দাঁড়াল। যে মুহূর্ত্ত তৈরী হতে পারত তা আর হলনা। বলতে পারবনা, আমিই তা তৈরী করতে চেয়েছি, না কি প্রমিতা! হয়ত দুজনেই।

তারপর বল্‌লাম অবশ্যি: "বোসো"—প্রমিতাও বসল আবার। আমরা কথা বল্‌লাম, হাসলাম, কিন্তু সবসময়ই মনে হচ্ছিল আমার, কি যেন হারিয়ে গেল! যা হারাতে চায়না আমার মন তেমন-কিছু হাত থেকে পড়ে ধূলোয় মিশে গেল। হয়ত প্রমিতাও তা-ই ভাবছিল। ওর আবেগের কয়েকটি ক্ষুধিত মুহূর্ত্তের কথা—যখন তুমি, যে-ই হও, তাকে নিয়ে পুতুলের মতো খেলা করতে পার—যখন তার সবকিছুই তোমার জন্যে, তার দেহ, তার মন।

কথা বলতে-বলতে শেষটায় ভুলে গেল প্রমিতা কেন যে ও এখানে এসেছিল—আমিও আর ভাবতে পারলাম না আমার কাছেই যে এসেছিল ও। বাসব না থাকলেও মনে হচ্ছিল বাসব আমাদেব সঙ্গেই চুপচাপ বসে আছে। যুদ্ধ, পার্টি, পলিটিক্স, বিদ্রূপ—সব মিলে আমাদের দু'জনকে আর দু'জন থাকতে দিলে না।"

গল্প শেষ

"ফাউণ্টেন-পেনটা প্রমিতা ক্যাপ-বন্দী করে যায়নি—ঘরে একা হয়ে প্রথম সে-কাজটুকুই সেরে নিচ্ছিলাম। আয়নার পেছনে বোর্ডটার উপর চোখ পড়ল—লেখা—কবিতার কয়েকটা পংক্তি, প্রমিতার হাতের লেখা। পড়লাম:

ভস্ম-অপমান-শয্যা ছাড়ো পুষ্পধনু
রুদ্র বহ্নি হতে লহ জ্বলদর্চ্চি তনু।

প্রমিতার হাতের লেখা তবু মনে হ'ল যেন আমারি লেখা—পড়তে-পড়তে মনে হ'ল যেন আবৃত্তির সুরে কথাগুলো প্রমিতাকে শোনাচ্ছি। যেন আমারি শোনান উচিত ছিল ওকে। আর যে-আমি শিথিল স্থূলতা চাইনে—খুলে দেখানো উচিত ছিল তার সে আমার মনকে। আমি তা পারলামনা, প্রমিতা পারল। প্রমিতারই জিত হ'ল আমার উপর। দু'জনেই আমরা স্থূলতাকে হারিয়ে বসে ছিলাম কিন্তু প্রমিতাই প্রথম বেরিয়ে গেল মুক্তির নিঃশ্বাস নিয়ে।"

[প্রমিতাকে নিয়ে সেদিন একটি গল্প তৈরী করল দীপায়ন কিন্তু আমি সেদিন ওটাকে গল্প বলে ভাবতে পারিনি, ভাবিনি আসল ঘটনা যে অন্যরকম। ওরা এক ধরণের মানুষ, তা-ই ওদের ভালোবাসায় চিরদিনই ব্যাঘাত আসবে—

এ-তথ্য নিয়ে দীপায়ন যে একটি গল্প ফেঁদে বসবে তা আর সেদিন কি করে ভাবা যায় ? ও যে তখন কথা-সাহিত্যিক হতে চলেছে, এ খবরও আমার জানা ছিলনা।—অনিরুদ্ধ ঘোষাল।]

গঙ্গার ঘোলা স্রোতের দিকে তাকিয়ে দীপায়ন চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। বেশ লাগছিল আমার। অনেকদিন পর যেন আবার আমি পানু – কলকাতার ধুলো-বালি, শব্দ-স্রোত কোথায় যেন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিরিবিলি এসে আবার আমাদের পুরনো পৃথিবীর ধারে বসে আছি।

বললাম : "পঞ্চশরকে দগ্ধ করলে একটি মেয়ে ও-কথা বলবেইত—তুই তার যা মানেই করিস পানু, আমার ধারণা তা-ই।"

"তোর ভুল ধারণা।"

"প্রমিতা তোকে ভালোবাসত না ?"

"আমি ওকে যতটুকু ভালোবেসেছিলাম—যদি ভালোই বেসে থাকি—তার বেশি না।"

"তুই হেঁয়ালি তৈরী করছিস. পানু !"

"দু'টি ছেলে-মেয়ের পরিচয়ে অনেকখানিই হেঁয়ালি থেকে যায়।"

"থাক। কিন্তু তুই এখন কোথায় দাঁড়িয়ে আছিস, বল্।"

"বাইরে !" মিষ্টি-মিষ্টি হাসতে লাগল দীপায়ন।

"ভেতরে প্রমিতার সঙ্গে বাসবই রইল তাহলে ?"

"প্রমিতাকে বাসবের দরকার। একটা জায়গায় ও এমন অসহায়—নিজের উপর এমন তাচ্ছিল্য ওর যে ওকে দেখবার জন্যে কারো দরকার ছিল ! আমি ফিরে এসে প্রমিতার সঙ্গে ওকে দেখে সত্যি খুসী হয়ে উঠেছিলাম - মন আমার হাল্কা হয়ে গিয়েছিল অনেকখানি। ভেবেছি, আমার কাজে ছুটি মিলল এবার।"

"তাহলে এতোদিন তুই প্রক্সি দিচ্ছিলি ?"

"বাসবের জন্যে ভাববে এমন কেউ জুটল যখন আর আমারও মন হাল্কা হয়ে গেল তখন প্রক্সিই দিচ্ছিলাম ভাবা যায়।" খুব বেশি খুসী মনে হলনা দীপায়নকে।

তবু ওকে খোঁচাবার জন্যে জিভ লিক্‌লিক্ করছিল আমার : "বাসবের কেউ জুটে গেল বলেই বুঝি তুই প্রমিতার পাশ থেকে সরে দাঁড়ালি ?"

"হতেও পারে!"

"সরে দাঁড়াবার কি দরকার ছিল? বীণাদির মতোই একটা কাহিনী না হয় আবার তৈরী হত!"

নদীর আর বিকেলের ছায়াতেই কিনা জানিনে, দীপায়নকে হঠাৎ মনে হল ধ্যানস্থ কোনো পুরুষের মতো, অবিচল, নিরুদ্বেল, নির্লিপ্ত। কথাগুলোও ওর শোনাল ধ্বনির মতো—যার সুর আছে, গভীরতা আছে, আছে গভীরে প্রবেশ করবার ক্ষমতা।

"আমার মনে হয় অনি, একটি মেয়ে হয়ত দু'জন পুরুষকে ঠিক একই রকম ভালোবাসতে পারে কিন্তু দু'জন পুরুষ একটি মেয়েকে একই রকম ভালোবাসতে পারেনা!"

"মেয়েরা কি পারে না-পারে আমি তা কি করে জানব?" একটু নম্র হয়ে এলো আমার কণ্ঠ।

"আমারও জানবার কথা নয়। তবে মনে হয়।"

"প্রমিতাকে দেখে?"

"প্রমিতাকে দেখে ঠিক নয়। তবে প্রমিতাকে দেখে আমি মেয়েদের নিয়ে ভাবতে শিখছি। আগে আমি মেয়েদের যা ভাবতাম এখন আর তা ভাবিনে।"

"শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে?"

"ছবিটা বড়ো হয়ে গেছে। মেয়ে বল্‌তে যে সুন্দর, স্পষ্ট, ছোটখাট একটা ছবি মনে তৈরী করে রেখেছিলাম, এখন আর তা নেই। ছবিটা এখন ছড়িয়ে অস্পষ্ট হয়ে গেছে।"

"যাক্ প্রমিতা তাহলে তোর অনেক উপকারই করেছে! আমি ত প্রথমে তোর কথা শুনে ভেবেছিলাম প্রমিতা আর বাসবকে নিয়ে তুই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিস।"

"আমি ক্লান্ত। দাঁড়িয়ে থেকে-থেকে মানুষ ক্লান্ত হয়না?"

"তাহলে ক্লান্তি দূর করবার একটা ব্যবস্থা কর!"

"কোথাও চলে যাব ভাবছি।"

"কোথায়?"

"কতো জায়গাই ত আছে ভারতবর্ষে।"

"প্রায় সন্নেসির মন তৈরী করে ফেলেছিস্ !"

"সন্নেসির মন !" একটা অদ্ভুত হাসিতে হেসে উঠল দীপায়ন, যাকে হাসি না বলে আত্মপীড়নের কান্নাও বলা যায়।

নদীকে ছেড়ে উঠে এলাম আমরা। মনে হ'ল পাড় ভেঙে দিয়েছে নদী—সেই ভাঙা পাড়ের বিষণ্নতা আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে ছায়ার মতো উঠে এল। দীপায়নের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলিনি—বলতে পারিনি। আমার যেন কেবলই মনে হচ্ছিল, সবার কাছ থেকে ও নিজেকে তুলে নিতে সুরু করেছে, মুছে ফেলতে চাচ্ছে ওর নাম, রূপ. চিহ্ন। ওকে দেখে, ওর কথাগুলো শুনে তখন এ-ছাড়া আর কিছু ভাবার ছিলনা।

কিন্তু আবার যখন কথা বলল দীপায়ন আমাব সব ভাবনা-চিন্তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। অদ্ভুত মনে হচ্ছিল ওকে—ও-ও যে এতো দ্রুত পট-পরিবর্ত্তন করতে পারে তাইতেই হয়ত এমন অদ্ভুত লাগতে সুরু করল।

"চাঙওয়ায় যাবি, অনি ?"

"রেষ্টুরেণ্টে ? কেন ?"

"বাঙালীরা ওটাকে ছেড়ে দিচ্ছে বলেই—যুদ্ধের খবর নেই, খবর নিয়ে মাতলামি নেই। মাতলামি করো কিন্তু খাঁটি মদ খেয়ে—তা-ও তোমার কামরায় বসে। বেশ ভালো !"

"তুই গেছিস কোনোদিন ?" আতঙ্ক জড়িয়ে গিয়ে প্রশ্নটা কেমন-যেন নিস্তেজ শোনাল।

"প্রায়ই যাচ্ছি—এদিকে এলেই !"

"চাউ খেতে ?"

"কারো সঙ্গে দেখা হলে তা-ই বলি।"

মরা অন্ধকারে ভেজা কার্জ্জন-পার্কের ফুটপাথ। তা-ই কি আমার গা ছমছম করছিল ? না কি ভূতুড়ে দীপায়নের ভূতুড়ে কথায় ? ভাবতে পারছিলামনা দীপায়নের সঙ্গে হেঁটে চলেছি আমি—যেন অন্য কেউ—নদীর ধারেই যেন বসে আছে দীপায়ন—আমি একটা ছায়াকে দীপায়ন ভেবে তার সঙ্গে উঠে এসেছি !

হয়ত ভীষণভাবে আমি চুপ করে গিয়েছিলাম, তাই দীপায়ন ওর আগেকার

ভঙ্গীতে খানিকটা ফিরে এলো : "যারা মদ খায়না তারা মাতালকে ঠিক চিনতে পারেনা, জানিস ত?"

"মাতালকে চিনতেই হবে, কারো কাছে কি এমন খৎ দিয়ে এসেছি।"

"এসেছি। আমার মনে হয়, এসেছি।"

"তাহলে ত আরো কতোরকম খৎ-ই হতে পারে।" বেশ কঠিন শোনাল আমাকে।

"পারেই ত।"

"মানে?" শাসকের ভঙ্গীতে ঘাড় ফেরালাম আমি।

"সব ঋণই আমাদের শোধ করা দরকার। চারপাশে যাদের দেখছি, বিশুদ্ধ দর্শকের মতো তাদের দেখা উচিত নয়। তাতে জীবনকে ফাঁকি দেওয়া হয়।"

আবারও চুপচাপ হেঁটে চললাম। চৌরঙ্গীর মোড়। মোড়ে এসে আমিই প্রথম কথা বললাম এবার : "ভবানীর সঙ্গে দেখা হচ্ছে বুঝি তোর আজকাল?"

"হুঁ"—দীপায়ন হেসে উঠল।

"কি করছে ও—" তেতো গলায় বললাম আর ভীড়ের দিকে চোখ নিয়ে দীপায়নকে বোঝাতে চাইলাম, ওর দিকে আমার মন নেই।

"ভীষণ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে আমার! যতো খারাপ ওকে ভাবতাম, এখন আর তা মনে হয়না।"

"কাজেই।"

"কাউকে কি চেনা যায় নিজের মনে তার মনের স্বাদ না পেলে?" দীপায়ন হাসতে থাকল।

"ও, ধ্যানযোগে ভবানীর সঙ্গে দেখা হচ্ছে তোর আজকাল!"

"জ্ঞানযোগে।"

"ভালো।" দীপায়নের সঙ্গ ত্যাগ করবার জন্যে উসখুস করছিল আমার পা।

"যাক, তাহলে তুই যাচ্ছিস নে!"

"কোথায়?" সমস্ত পৃথিবীর বিদ্রূপভরা দৃষ্টি নিয়ে বিঁধতে চাইলাম দীপায়নকে।

"চাঙওয়ায়।" নির্ব্বিকার দীপায়ন।

দ্বিরুক্তি না করে কেটে পড়াই যে ঘৃণার সংযম আর তাই তুমুল ঘৃণা, দীপায়নকে আমি সেদিন তা ই বোঝাতে চেয়েছিলাম। বুঝতে পারিনি যে আমার এ লৌকিক ঘৃণা আমাকেই দূরে সরিয়ে দিতে পারে, দীপায়নকে কুয়াশায় কালো করে তুলবে না। জানতামনা, ওর মনে এবার অন্ধকার থেকে সূর্য্যের কণা কুড়োবার পালা চলেছে--অয়দাহ—রাগবিরাগয়োর্যোগঃ—স্বষ্টির মৌসুম।

তেইশ

[বাইশ অধ্যায়ের পর মনে হচ্ছিলনা কয়েক বছরের ছেদ না ফেলে আমি আর দীপায়নের কাহিনী লিখে যেতে পারব। কারণ সেদিনকার চৌরঙ্গীর মোড়ের ওর সঙ্গে আমার সত্যিকারের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। বছর-দু'বছর ওর সম্পর্কে কোনো উৎসাহই আর ছিলনা আমার। দৈনিক কাগজের খবরগুলোর মতো শুধু কয়েকটা বাধ্যতামূলক খবর আমার অনিচ্ছুক কানে এসে পৌঁছুত। জানতাম দীপায়ন এখন কথা-সাহিত্যিক; গল্প লেখে, সাহিত্য-সভায় সভাপতিও হয়। ঝাঁজালো গল্প, তরুণদের ক্ষীণায়ু মাসিকেই তাদের স্থান। কুলীন কাগজগুলোতে বা দৈনিকের বাৎসরিক সাহিত্য-উৎসবে তাদের ঠাঁই নেই। এ-খবরটুকুতে শত অধ্যবসায় থাকলেও অধ্যায় সাজানো যায়না—ঔপন্যাসিকের বাচলতা আয়ত্তে থাকলেও না। কাজেই হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। হালে ফের হাত না পড়লে যে বাংলা-সাহিত্যের একটা পরম ক্ষতি হয়ে যেতো, তা নয় বরং আমার ভাবী পাঠকরা হয়ত হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন। এমন সন্দেহও এখন আমার হচ্ছে যে তাঁরা এই বাইশ অধ্যায় পর্য্যন্তও হয়ত এগোবেননা।

হয়ত তাঁদেরই দুর্ভাগ্য, ঠিক এমন সময় দীপায়ন এসে আমার ঘরে একদিন হাজির। ভাবলাম ওর জার্ণাল্‌স বুঝি ফিরিয়ে নিতে এসেছে। কিন্তু না। জানতে এসেছে আমি ওকে নিয়ে এতোদিনে কতোদুর এগোলাম। দিস্তা কয়েক লেখা কাগজ ওর হাতে তুলে দিতেই পড়তে সুরু করে দিল ও। যেন কোনো সীনিয়র উকীল জুনিয়রের তৈরী মুসাবিদা পর্য্যবেক্ষণ করতে লেগে গেলেন। আমার তাতে খানিকটা অপ্রতিভ হবার কথা, তাই দীপায়নের জন্যে চা-খাবারের ব্যবস্থায় ছুটোছুটি করে গার্হস্থ্য প্রতিভায় চাঙ্গা দেখাতে চাইলাম। সবটুকু-পড়বার উৎসাহ দীপায়নেরও দেখা গেলনা। সামনের কয়েকটা পৃষ্ঠার পর, উপন্যাসের পাঠিকাদের ধরণে, শেষের কয়েকটা পৃষ্টায় ও চোখ বুলোতে সুরু করল। হাসতে লাগল। তারপর চোখ তুলল আমার মুখের উপর।

"কথা-সাহিত্যিকরা শয়তানের চেলা—জানিস্ অনি?" মনে হল, প্রাক্তন কথা-সাহিত্যিক দীপায়ন চৌধুরী ওর অতীতকে ভৎর্সনা করতে চাচ্ছে।

"সবসময় জানতাম না!"

"অবশ্য কথাটার সদর্থও করা যায়। ঈশ্বরের সৃষ্টিকে নিয়ে নিজের সপিলতায় সৃষ্টি করে তুলেছিল ত শয়তান! কথাসাহিত্যিকরাও বাস্তব একটা মানুষকে গল্প-উপন্যাসে তাঁদের হাতের তৈরী মানুষ করে তোলেন!"

'এখানে যে দীপায়ন সে দীপায়ন-চৌধুরী নয়, বল্‌তে চাস?"

"আমি কথা-সাহিত্যিকদের কথা বল্‌ছি—তুই কতোটুকু কথা-সাহিত্যিক তা নয়।" দীপায়নের গলায় প্রৌঢ় প্রজ্ঞার সুর শোনা যাচ্ছিল: "মানুষ তৈরী করতে হলে মানুষের সবরকম গতিবিধিতে দীক্ষা চাই—ভালোমন্দ সবরকম। পুণ্যাত্মা হতে চাও যদি কথাসাহিত্যিক হওয়া আর তবে চল্‌বেনা তারজন্যেও শয়তানের চেলা কথাটা ওঁদের সম্পর্কে বেশ ব্যবহার করা যায়।"

চুপ করে রইলাম। কথা বলতে গিয়ে তখন দীপায়নের কথা বলার মেজাজ আর মৌজটুকু বিগড়ে দিলে আমারই ক্ষতি। মনে হল, ওর সাহিত্যিক জীবনের যে ঘটনাগুলো লোকচক্ষুর অগোচরে ঘটেছে—নিজে থেকেই ও তা বলবে এখন—জোর করে টেনে আনতে হবেনা। আর হলও তা-ই। চা আর খাবারের আওতায় ওর মুখে জমে উঠ্‌ল ওর নিজেরই কাহিনা—সে কাহিনী ও না জানালে আমার সাধ্য ছিলনা কারো কাছ থেকে বা ওর জার্ণাল্‌স্‌-এর পৃষ্ঠা থেকে তা উদ্ধার করতে পারি।

কাজেই তেইশ-চব্বিশ অধ্যায় দুটো লেখা হল। অধ্যায়গুলোকে দীপায়নের রচনা বলে ধরে নিতে পারেন। এখানে দেখতে পাবেন, অনিরুদ্ধ ঘোষাল দীপায়নের মনের আনাচে-কানাচে ঘোরাঘুরি করছে, যা লেখকের পক্ষে অসম্ভব বলেই তার রীতি নয়। তবে আপনারা এ-পদ্ধতির রচনায় খুবই অভ্যস্ত। লেখকমাত্রেই ত চরিত্রগুলোর ভাগ্যবিধাতা! লেখকের সর্ব্বত্রগামিতায় কোনোদিনই আপনাদের মনে প্রশ্ন ওঠেনি। আমার মনে প্রশ্নটা আছে—তাই এই জবাবদিহি—অধ্যায়ের ইতিহাস বর্ণনা। বিরক্ত হতে পারেন, কিন্তু কি করব বলুন, ন্যায়শাস্ত্র শুনতে গেলে কার না বিরক্তি আসে?]

"বলো ত, সত্য আর মিথ্যা, ভালো আর মন্দ এগুলো কি? মদ খেয়ে মগজটাই খেলে—ভাবতে শিখলে না। ওরা জীবনের বাইরের আর ভেতরের

দু'টো বিষয়—বুঝেছ? মাথাই নাড়ছ শুধু—কিচ্ছু বোঝনি। শোনো—" গ্লাসের কানায় কপাল ঠুকবার মতলবেই যেন দীপায়ন গ্লাসটার উপর ঝুঁকে পড়ল: "আমি যাদের জীবনের বেড়ার মধ্যে ডেকে নিলাম তারাই সত্য, তারাই ভালো আর বেড়ার ওদিকে যারা দাঁড়িয়ে রইল তারা সবাই মিথ্যে, মেকি, মন্দ, ঝুটা?" মাথা তুলে হাসল দীপায়ন, নিজেরই ভারি জিভের জড়ানো আওয়াজে মজা পেয়ে: "কিন্তু মুস্কিল কি জানো—চিরদিন এমন থাকে না। জীবনও ত একটা জীবন্ত জিনিস—অ্যামিবা—বেড়ার ওদিকেও ছড়িয়ে পড়ে" বাক্যটা শেষ করতে পেরেই যেন খুশীতে লালচে হয়ে উঠল দীপায়ন: "তখন ব্যাপারখানা কি? যাদের জানতাম মিথ্যে আর মন্দ, তারা সব নতুন সত্য, নতুন ভালো হয়ে যায়।"

সশ্রদ্ধ হয়ে শুনত কাঞ্চন—মদ খেয়ে মগজ নষ্ট করলেও দীপায়নের ফিলসফির বয়েৎ শুনে সে তেড়ে আসত না। চাওয়ার কেবিনে দুজনকে দেখলে যে-কেউ-ই বলত, ওরা অতিশয় পুরণো বন্ধু। অথচ কাঞ্চন ওর চাওয়ারই বন্ধু। ওর সঙ্গে তার এখানেই চেনা। খ্রীষ্টান। বেহালা বাজিয়ে উপার্জ্জন—যেন মদ খাওয়ারই জন্যে। দীপায়ন তাকে ফিলসফি শেখাত কিন্তু সে-ও পেছনে পড়ে নেই, দীপায়নকে আগেই একটি বিদ্যা শিখিয়ে নিয়েছে—শিখিয়েছে মাতাল হতে। নিরীহ এক পেগ ইতালীয় ভারমুথ্ খেতেই আসত দীপায়ন—এখানে যে মদের এমন একজন মস্ত সমঝদার জুটে যাবে ভাবেনি—তা-ও আবার বাঙালীর ছেলে—ফরাসী বা হেমিংওয়ের নায়কের জাত নয়।

দীপায়নের ফিলসফির স্রোতে হাবুডুবু খেয়ে কাঞ্চনও হয়ত ফিলসফির আধ-আধ বুলি শিখতে সুরু করেছিল। দীপায়নের কথা ফুরোলে মদের বিস্বাদেই যেন ঠোঁট উল্টে দিয়ে বলত কাঞ্চন: "ফাঁকি—সব ফাঁকি!"

"বুঝতে পারছনা।—বলিনি?"—দীপায়ন—"ফাঁকিই শেষটায় আসল হয়ে দাঁড়ায়।"

"উঁহু।"

"দাঁড়ায় না?" দীপায়নের চোখে জেদ।

"আমাকে খ্রীষ্টান বলে জানো ত—বিদেশী বলে?" আঙুল দিয়ে বুক

খুঁচিয়ে বলত কাঞ্চন: "বিদেশে আমি গেছি কখনও, না চার্চে যাই? তবু ত বলবে আমায় খ্রীষ্টান! আর কিচ্ছু বলবেনা!"

"আমি তা-ই বললাম না কি?" এবার আর খুব জোর দেখা গেলনা কথাটায়। এতোক্ষণ কি-কি যে ও বলেছে তা যেন মনে করতে পারতনা দীপায়ন।

শেষটায় দেখা যেতো, দু'জন দু রাস্তা ধরে কথা বল্‌তে-বল্‌তে কেবিন থেকে বেরিয়ে আসছে—আর রাস্তায় নেমেও দু'রাস্তাই ধরেছে ওরা। অবশ্য মিনিট-খানেক বিদায় সম্ভাষণ চলত ওদের। রাস্তার পানের দোকানে লোকগুলো মিনিটখানেক একটা হাসির দৃশ্য উপভোগ করত।

একটানা অনেকদিন একই রকম। প্রথম যেদিন অন্যরকম, সেদিন কাঞ্চনের ফ্ল্যাটে বিকেলবেলা দীপায়নের নিমন্ত্রণ ছিল। বেহালা শুনবার নিমন্ত্রণ। মদ? না, ভিজে সন্ধ্যাগুলোতে অন্তত একটা দিনের ছেদ পড়ুক। এই আশ্চর্য্য সংযমের অবশ্য কারণ ছিল। কারণ, সবিতা মুখার্জিও আসছে সেদিন নিমন্ত্রিত হয়ে। 'সবিতা'—কায়মনপ্রাণ ঢেলে নামটা উচ্চারণ করেছিল কাঞ্চন: "তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়—তোমাকে দেখবার জন্যে খুব উৎসুক—বিখ্যাত হয়ে পড়ছ কি না!" কাঞ্চনের পরিচিত একটি মেয়ে—দীপায়নের গল্পের পাঠিকা—উত্তেজনার আরামে দীপায়ন একটি বিকেলের মদের আরামকে অনায়াসেই ভুলতে পারল। প্রমিতার মতো পাঠিকা নয় এ নিশ্চয়—আরেক ধাঁচের—আরেক নক্সার মেয়ে! "সবিতা বলে তোমার কেউ আছে, জানতামনা ত!"—লেখকের গম্ভীর ধরন ধরে উঠ্‌ছিল দীপায়নের গলা। "নেই—তবে ছিল একসময়।"—শিল্পীমনের ডায়লেক্‌টিক্‌সে ঝরঝরে শোনাল কাঞ্চনের গলা।

কাজেই বেহালার নিমন্ত্রণ অবহেলা করবার আর উপায় ছিলনা দীপায়নের। আর সেদিন সকাল বেলা থেকেই সুরু হ'ল অসহ্য মুহূর্ত্ত যাপন। দু'হাতে ঠেলে দিলেও হাঁটতে চায়না সময়—ঘড়ির কাঁটা ঘুরে এসে পাঁচটায় দাঁড়াতে কেবলই অনেকগুলো ঘর বাকি পড়ে থাকে। বাসবের সঙ্গে দু'পাঁচ মিনিট কথা বলে মনে হয় এক ঘণ্টা হয়ত কেটে গেল। কিন্তু ঘড়ি নির্ভুলভাবে বলে দেয় তা নয়। প্যাডের কাগজ টেনে নেয়—প্রেমের মুহূর্ত্ত আর লেখার মুহূর্ত্ত চৌগুণে

চলে বলেই লিখতে মনে পড়ে যায় ওর। মনস্তত্ত্বের অধ্যায়ের শেষে নৃতত্ত্বের অধ্যায় সুরু হচ্ছিল তখন দীপায়নের গল্পে। তাই লিখতে বসেই মনে হল আরো-খানিকটা পড়া দরকার। আর পড়তে গিয়ে দেখল বই-এর হরফগুলোতে চোখ বুলিয়ে এক বর্ণও পড়া হচ্ছেনা, অনর্গল ভেবে চলেছে ছেলেবেলাকার কথা। পাদ্রীর ইস্কুল রবিবার সকাল আট-টা—বাইবেল পড়তে যেত দীপায়ন, শুনেছিল পড়ার শেষে ছবি পাওয়া যায়, তাই। পোষ্টকার্ডের ওপিঠে ছবি-আঁকা—বিলিতি ঘর-বাড়ির, নদী-পুল-পাহাড়ের রঙীন ছবি। কিন্তু পড়তে গিয়ে ছবির চাইতে ভালো লেগেছিল তার পাদ্রীসাহেবকে। ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি—ঠিক বাবার মতো। সোনার ফ্রেমের চশমা—কড়ির মতো সাদা ঝকঝকে কলার আর কি সুন্দর পালিশ-করা জুতো! তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করত দীপায়নের—তারপর আরো ভালো লাগল যখন সাহেবের গান শুনল ও, স্পষ্ট বাংলা গান: "যষ্টি হাতে দ্রুতবেগে কোথায় যাও হে যাত্রীগণ!" ভালো লাগত আর ভাবতে সুরু করত, এঁর সঙ্গে কি ওয়কিং-ষ্টিক-হাতে বাবার চেনা নেই? দেখতে ত প্রায় একই রকম ছু'জন, আর পোষাকেও—নিশ্চয় আছে—জিজ্ঞেস করবে বাবাকে সে আজই!...দীপায়ন থেমে গেল, থামিয়ে দিল মনে-মনে কথা বলা, মনের ভেতর ছবি-দেখা। ছেলেবেলা ভাবতে হঠাৎ আজ সব ছেড়ে পাদ্রীসাহেব কেন? ছি-ছি, কাঞ্চন খ্রীষ্টান বলে আর তার বেহালা শুনতে যাবে বলেই না সব ছাপিয়ে পাদ্রী সাহেবের গানটা তার মনের উপর উঠে আসছে! খ্রীষ্টান বলে কাঞ্চনের একটা আলাদা পরিচয় কি ভাবে তার মন তৈরী করে নিল! দীপায়ন দুঃখিত হয়ে চোখ বুঁজল। ভেতরে আমাদের এতো অন্ধকার বাইরের আলো নিয়ে কি করব? প্রশ্ন। কতোটুকু জায়গা আর তা দিয়ে ফর্সা করে তোলা যায়? সে-অন্ধকার থেকে হয়ত কোনো সময় প্রশ্ন এসেছে—সবিতা মুখার্জি খ্রীষ্টান কি না—খ্রীষ্টান কাঞ্চনের পরিচিতা একটি মেয়ে কি খ্রীষ্টান নয়? আমি হয়ত খেয়াল করিনি, উত্তর আদায় করবার জন্যেই মনের এ-কৌশল, পাদ্রীসাহেবকে চোখের উপর তুলে ধরা! দীপায়ন ঘর ছেড়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। এতোক্ষণ কি ভুলই না করছিল ও। কলকাতার রাস্তার ছায়া-চিত্র থাকতে সময় কাটাবার জন্যে কাউকে আবার ভাবতে হয় নাকি!

যাক্, এক সময় সত্যি বিকেল হল। আর কি আশ্চর্য্য, এ-যেন আরেক রকম বিকেল। এই এক বছরের বিকেলের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই—

সেই আমেজ নেই, চৌরঙ্গীর হাতছানি নেই, আলো আর কাচে চাওয়ার ঝলমল ছবিটাও কেমন আবছা মনে হচ্ছে! এমন কি কাঞ্চনের প্রিন্সেপ-ষ্ট্রীটের ফ্ল্যাটেও যেন আর উত্তেজনা পাবার কিছু নেই। একটানা তিনশ' পঁয়ষট্টিটি বিকেল থেকে হঠাৎ ছুটি নিয়ে নিজেকে আরেক চেহারায় দেখতে পেল দীপায়ন। দেখে মনে হলনা এর নাম কোনোদিন দীপায়ন ছিল।

"বাবা—" মনে-মনে বলল দীপায়ন। ভাবতে লাগল বাবাকে। সব কথা ঠেলে, সব ছবি মুছে দিয়ে এমন আর কোনোদিন আসেন নি তিনি। আজই প্রথম—বহুদিন পর আজই প্রথম, এলেন।

কাপড়-জামা হাতে নিয়েও যেন কার অপেক্ষায়, কিসের অপেক্ষায় চুপচাপ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল দীপায়নকে। যেন শুনতে চাইল দীপায়ন বাবা ঠিক তেমি দুঃখিত হাসিতে দরজায় এসে দাঁড়াবেন, বলবেন: "না গেলে কি হয়না?"

না-গেলেও ত হত। কলকাতায় না এলে কি হত দীপায়নের? হয়ত আরেক রকম! বাসব থাকতনা, প্রমিতা থাকতনা, কাঞ্চন না, আজকের সবিতা বলে মেয়েটিও না। হয়ত তোতা থাকত—আর—আর বাবাও থাকতেন হয়ত। মা আরেক রকম! আরেকটা ছবি তৈরী হত। ভালো? এর চাইতে এমন কি খারাপ? এখানে এসে তুমি কি পেলে, কাকে পেলে, দীপায়ন, নিজেকে ছাড়া? নিজেরও বা কি ছবি এ?

কি ছবি? টেবিলের আয়নাটা হাতে তুলে নিল দীপায়ন, হয়ত চুল ব্রাশ করবে বলেই। কিন্তু তাকিয়ে রইল নিজের মুখের দিকে। আর হঠাৎ মনে হল যেন বাবাই এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন। এম্নি কপালই ছিল না কি বাবার—এম্নি ভুরু আর চোখ? কে বলে দীপায়ন দেখতে ওর মার মতো? অবিকল বাবা! তা-ই ঠিক! আয়নাটা টেবিলের উপর রেখে চোখ থেকে নিজের ছবি মুছে দিতে চাইল। কিন্তু ছবি নিয়ে ততক্ষণে মন কথা বলতে সুরু করেছে: ঠিক তা-ই। যে-বাবা মাকে ভালোবাসতেন না তাঁরই মতো। কাউকেই হয়ত সত্যি ভালোবাসতে পারতেন না তিনি, তোমারই মতো। তুমি কি দীপায়ন? নিজের বলে তোমার কিছু আছে নাকি! যা তিনি পারেন নি কিন্তু হতে পারতেন তা-ই ত তুমি? আর কিছু না। কিছু আর হতে পারোনা। পেরেছ কি? ভালোবাসতে পেরেছ শেফালিকে, তোতাকে,

প্রমিতাকে ? একটু আগে বাবাকে ভালোবেসেছিলে—সে-ত, প্রৌঢ়, তোমার নিজেকেই ভালোবাসা।

বিরক্ত হয়ে উঠল দীপায়ন। একা থাকা কি বিশ্রী। কোনো কারণ নেই এসব কথা ভাববার—অথচ ভাবতে হচ্ছে। কতোগুলো ছায়া তৈরী করে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হচ্ছে। আশ্চর্য্য!

হাসতে চেষ্টা করল দীপায়ন। ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, সিঁড়ি দিয়ে নামল ঠোঁটের উপর হাসি ধরে রাখবার চেষ্টা করে। কিন্তু রাস্তায় এসে শুনতে পেলো ওর গলার ভেতরেই আরেকটি গলা যেন স্পষ্ট বলতে চেষ্টা করছে: "না গেলে কি হয়না ?"

কাঞ্চনের ছোট ঘরটিতে আর কিছু না থাক পরিচ্ছন্নতা ছিল। তাইতেই যেন তন্দ্রার মতো একটা গাঢ় আরাম নিশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিচ্ছিল দীপায়ন। ছোট একটা বিছানা ত্রিবান্দ্রমের কভারে ঢাকা। সেগুন-বার্নিশের জলচৌকির উপর ফ্যাস্‌নার-লাগানো স্যুটকেস—আর তার উপর ভায়োলিন-কেস্‌টা খোলা। দুপাশে গদী-আঁটা দুটো চেয়ার নিয়ে একটা টেবিলও আছে ওতে আয়না-ব্রাশ-পাউডার থাকত কিনা বলা যায়না—এখন ত মনে হচ্ছে ধবধবে টেবিল-ক্লথের উপর শ্রীনিকেতনের ফুলদানী একগুচ্ছ রজনীগন্ধায় রোজই ওখানে এমন একটা কবিতা তৈরী করে রাখে। আসবাব আছে ঘরটায়—হরিণ-দেহ চেয়ার হলেও ত আসবাবই—তবু দেয়ালের সঙ্গে এম্নি ওরা মনে-প্রাণে মিশে আছে যে ঘরটাকে ফাঁকা ভাবতে হয়। তা-ই ভাবছিল দীপায়ন একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে বসে। ঘরময় পায়চারি করে বেহালায় ছড়ি টেনে চলেছে কাঞ্চন—সুরটমল্লারের আলাপ। সবিতা তখনও আসেনি। খাবার নিয়ে চাওআর বয়ও এসে পৌঁছয়নি। বেহালা কিন্তু চলেছে দীপায়ন পৌঁছবার আগে থেকেই। মুখের একটু মিষ্টি হাসি, ভুরুর একটা মিহি সঙ্কেত আর মল্লারের সুর দিয়েই কাঞ্চন খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে দীপায়নকে অভ্যর্থনা করেছে—কথা বলেনি।

অনেকদিন পর অনেকখানি ভালো লাগছিল দীপায়নের। বাজাতেও হয়ত ভাল লাগছিল কাঞ্চনের। অভ্যর্থনার হাসিটুকু আর ভুলতে পারছেনা

তার ঠোঁট। সুরটমল্লার। সেই অদ্ভুত রাগিণী যা শুনলে মনে হয় বুকের খানিকটা জায়গা ফাঁকা হয়ে গেল বুঝি—ফাঁকা হয়ে গেল আবার কানায়-কানায় ভরে উঠবারই জন্যে। কী দিয়ে ভরে ওঠে? স্মৃতির ব্যথায়, ব্যথার স্মৃতিতে। ব্যথা অনুভব করতেই দীপায়নের ভালো লাগছিল। নামহীন, ইতিহাসহীন একটা ব্যথা।

সবিতা এসে দরজায় দাঁড়াল। আর একটু দেরি করে এলে কি হতনা? ওর হাসি-হাসি মুখের দিকে একপলক তাকাতেই যেন দীপায়ন সুরের জগৎ থেকে ঘরের ঘেরে নির্ব্বাসিত হ'ল। কাঞ্চনের হাতেও তখন ছড়ি থেমে গেছে।

"এসো —" এগিয়ে গেল কাঞ্চন।

"তোমার কাজে বাধা দিলাম —" ফুটফুটে গলায় কথাটা বলে সবিতা ঘরে এলো—এসে কাঞ্চনের ছোট বিছানাটায় ছোট হয়ে বসল।

সবিতাকে পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছে দীপায়ন—একটি অপরিচিত মেয়েকে প্রথম দেখতে পাচ্ছে—যে-মেয়ে ওর সঙ্গে পরিচিত হতে চায়। তার মুখে তাকিয়ে আছে দীপায়ন তবু যেন ওর চোখে খুসী নেই, খুসীর অভিনয়ও নেই।

সবিতা ক্ষুণ্ণ হতে পারত আর কাঞ্চনও পরিচয় করিয়ে দেবার মামুলি গৎ মুখে নিয়ে ওদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে বলতে পারত......কিন্তু তা আর হলনা, দীপায়ন কথা বলে উঠ্‌ল: "সুরটমল্লার ভালো—কিন্তু ভেবেছিলাম তোমার কাছে খানিকটা বিলিতি সঙ্গীত শোনা যাবে!"

"ব্লু ডেনিয়ুব?" কাঞ্চনের নীলচে চোখে বিদায়ী সুরের নেশা মধুর হাসির মতো দেখাল।

"খানিকটা শ্যুবার্ট-ও বা মন্দ কি?"

"তারপর ব্রাহ্‌ম্‌স্‌, শর্পাঁ, বিঠোফেন্‌ আমি কি তেম্নি ওস্তাদ?"

হয়ত তখনই মনে হল দীপায়নের, সবিতা চুপচাপ বসে থেকে ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠ্‌তে পারে। তার সঙ্গে কথা বলা উচিত। তাই ও বললে: "য়ুরোপের মিউজিক আপনার কেমন লাগে? ভালো লাগেনা?"

কথাটা শুনবার আগেই যেন তার উত্তর তৈরী ছিল সবিতার, একটুও আড়ম্বর না করে বললে: "আমার? হাড়ে মিউজিকই নেই।"

রুক্ষ কথা কিন্তু বলার ভঙ্গীতে রুক্ষতা ছিলনা বলেই দীপায়ন বলতে পারল: "সত্যি নয়।"

"সত্যি।" ভায়োলিন-কেসে বেহালাটাকে বন্দী করছিল কাঞ্চন: "সবিতা মনে করে সত্যি কথা বলাটা বড্ড সেকেলে!"

"কে না মনে করে বলো!" একটুও অপ্রস্তুত হলনা সবিতা।

খালি চেয়ারটার শিং ধরে কাঞ্চন ঘাড় হেলিয়ে বললে: "আমি ত করিই। কিন্তু বলো ত, বসতেও বা মিছিমিছি তুমি ওখানে গেলে কেন? দীপায়ন ত দিব্যি তার চেয়ারে গিয়ে বসেছে—তুমি এসো এ-চেয়ারে।"

কথার সঙ্গে-সঙ্গেই অস্থির পায়ে উঠে দাঁড়াল সবিতা কিন্তু বলতে ছাড়লনা: "আজ চেয়ারও এগিয়ে দিচ্ছ?"

মনোযোগ দিয়ে দীপায়ন ওদের কথা শুনে যাচ্ছে।

"দিচ্ছি।" সুরহীন আর তাই অর্থহীন শোনাল কাঞ্চনের কথাটা, দু'আঙুলে দু'কোণ ধরে টেবিলক্লথটাকে একটু টান করতে চাইল কাঞ্চন, তারপর হয়ত কাজটাকে নিরর্থক ভেবেই বিছানায় গিয়ে বস্‌ল।

চেয়ারে অনেক ভালো, বেশ ছড়ানো দেখাচ্ছিল সবিতাকে। নিখুঁত, স্পষ্ট। ওর অরগ্যাণ্ডির ব্লাউজের নীচে সেমিজের লেশটা পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছিল দীপায়ন। হাতের সরু চুড়িটার কাজও যেন। পাউডারের পাতলা ছোপের ওপারে চামড়ার ছোট-ছোট ভাঁজগুলোও। চোখের পালিশ, চুলের হাওয়া-পনা, ঠোঁটের উপর ঘামের মিহি বিন্দু—সব।

দীপায়ন ওকে দেখছে বুঝতে পারছিল সবিতা, তাই যেন ভাবছিল, দীপায়নকে অন্যমনস্ক করে দেওয়া দরকার।

"কাঞ্চনের কাছে নিশ্চয়ই শুনেছেন—" হঠাৎ থেমে গিয়ে অল্প হেসে উঠল সবিতা: "আপনার গল্পগুলো আমি পড়েছি।"

"গল্প!" গভীর নৈরাশ্যে বল্‌ল দীপায়ন।

"মনে হচ্ছে তোমরা এখন গল্প করতে পারবে—" কাঞ্চন উঠে দাঁড়াল: "আমি চাওয়ার বালকটির খোঁজ করছি। খাবার-ছাড়া মেজাজ শরিফ হওয়া মুস্কিল—নার্ভগুলোকে কাবু করতে খাবারের মতো আর দ্বিতীয় অমৃত বস্তু নেই।"

"বলো, নিজের চিকিৎসারই ব্যবস্থা করতে চলেছ—" একটা সুন্দর জন্তুর মতো উজ্জ্বল চোখে তাকাল সবিতা।

"ধরে নাও আমারি।" কাঞ্চন আর দাঁড়ালনা।

শরীরের কিছুটা আন্দোলন আর ঠোঁটের খানিকটা হাসি দিয়ে কাঞ্চনের উপস্থিতিটা হজম করে তার অনুপস্থিতির আবহাওয়ার জন্যে নিজেকে তৈরী করে নিলে সবিতা। কিন্তু দীপায়নকে তখন অনেকটা ভীতই দেখাল যেন।

"আপনার একটা গল্প নিয়ে ঝগড়া করব"- হাসতে লাগল সবিতা।

সবিতার গলা শুনে দীপায়ন ভাবতে পারলনা, মাত্র দশ মিনিট আগে এ-মেয়েটির সঙ্গে ওর প্রথম দেখা হয়েছে।

"কোন্ গল্প ?" খাঁটি লেখকের ঔদাসীন্যই পছন্দ করতে পারল দীপায়নের গলা।

"আপনি যেখানে দেখাতে চাচ্ছেন মেয়েরা দু'বার ভালোবাসতে পারেনা।"

"মেয়েরা ? তা ত নয়। একটি-দুটি মেয়ে তেমন হতে পারে!"

'রাহু'-গল্পের চরিত্রগুলো এসে দীপায়নকে ঘিরে দাঁড়াল। আশ্চর্য্য, সেখানেও মেয়েটির নাম সবিতা-ই ছিল। প্রদোষকে ভালোবাসত সবিতা। সবিতার দেহ-মনের প্রথম ভোক্তা প্রদোষ। তাদের বিয়ে হয়নি! নিখিলের সঙ্গে বিয়ে হল সবিতার। প্রথম রাত্রিতে নিখিল সবিতার দেহ স্পর্শ করতে যাচ্ছে। অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে সবিতা—আর অভিমানে—অপমানে কাঁপছে তার শরীর। দ্বিতীয়ের আবির্ভাব কিছুতেই সহ্য করতে পারছেনা তার মন। হাত তুলল সবিতা, নিখিলের গালে একটা চড় বসিয়ে দিলে।...সেই সবিতাকে দেখতে পেল দীপায়ন। আগুনের হলকা! কিন্তু তারপর কি হয়েছিল? গল্পের উপর যবনিকা টেনে দিয়েছিল লেখক কিন্তু তাতেই কি সবিতা-মেয়েটির তীব্র জীবনের উপর যবনিকা পড়ে গেল ? হয়ত না। আগুনের হল্কা হয়ত পরের মুহূর্ত্তেই ছাই হয়ে গিয়েছিল তারপর একদিন সে ছাই-এর চিহ্নটুকুও আর রইলনা। পরিচ্ছন্ন। দীপায়ন সে-কথা বলেনি। ও কি জানত যে এমনও হতে পারে?

"কেন হবে ?" এবার সবিতাই দীপায়নকে দেখছিল।

"হতে কি পারে না ?"

"মেয়েদের আপনারা চেনেন না।" রহস্যময় হয়ে উঠল সবিতার চোখের ভঙ্গী, ঠোঁটের রেখা।

"কয়েকজনকে ত চিনতাম, জানি!"

"তা-ও চিনতেন না।" মনে হচ্ছিল কি-একটা কথা যেন গলার ভেতর লুকিয়ে ফেলছে সবিতা: "কি-করে বা চিনবেন। আপনি ত মেয়ে নন!"

দীপায়ন থেমে গেল—আপত্তি শোনাতে আর ইচ্ছে করলনা ওর। তাই মুখের রেখা অসঙ্কোচে পরাজিতের হাসি ফুটিয়ে তুলল: "আপনি ঝগড়া করতে চান বুঝলাম। কিন্তু আমি ত ঝগড়া করবনা।"

"আমারও ঝগড়া ফুরিয়ে গেছে—" সবিতা মুচকি হাসির মসলিনে নিজেকে মুড়ে যেন খানিকটা আড়াল তৈরী করে নিলে: "লম্বা ঝগড়া ভালো লাগেনা আমার। কিন্তু কাঞ্চন ওটা খুব পারে!"

"কাঞ্চনের সঙ্গে আপনার বুঝি ঝগড়ার সম্বন্ধ?"

ভেবে নিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল সবিতা কিন্তু চাওওআর বয়ের সঙ্গে কাঞ্চন তখন ঘরে এসে গেছে। বয়ের হাতে ঝাড়ন-বন্দী ডিশ-বোঝাই ট্রে, দীপায়ন ভাবতে চাইল খাদ্য আমদানী করতেই এতক্ষণ তবে ব্যস্ত ছিল কাঞ্চন। কিন্তু এতো সহজ ভাবনায় ওর মন রাজি হলে ত! তাই মনে-মনে সময়ের হিসেব করে বুঝতে চাইল বয়কে আনতে কাঞ্চনকে চাওয়ার দোকান পর্য্যন্ত যেতে হয়েছিল কি না। না, এটুকু সময়ে যাতায়াত অসম্ভব। হয়ত রাস্তায় নেমে বয়ের অপেক্ষা করছিল কাঞ্চন, যে-অপেক্ষা সে এখানে বসেও করতে পারত। তবু এখানে সে রইলনা। এ কি দীপায়নকে সবিতার সঙ্গে পরিচিত হবার মামুলি সুযোগ দেওয়া? কিন্তু কেন? "সবিতা বলে তোমার কেউ আছে জানতামনা ত।" "নেই, তবে ছিল একসময়।" "কাঞ্চনের সঙ্গে আপনার বুঝি ঝগড়ার সম্বন্ধ?'—কথার টুকরোগুলি চিবিয়ে দীপায়ন কাঞ্চনের মুখের দিকে তাকাল, তারপর সবিতার মুখের দিকে।

বয় একপাশের চিলতে ঘরটুকুতে ঢুকে গেল—সম্ভবত কদাচিৎ-ব্যবহৃত রান্নাঘর। গেরস্তালি থেকে ছুটির মুখেই কাঞ্চনকে কথায় জড়িয়ে ধরল সবিতা: "দীপায়নবাবু কি বলছেন জানো কাঞ্চন, তোমার সঙ্গে আমার নাকি ঝগড়ার সম্বন্ধ।"

'দীপায়নবাবু'—কথাটা দীপায়নের কানে বিশ্রী শোনাল। আর কি কোনো উপায় ছিলনা সবিতার দীপায়নকে উল্লেখ করবার? মন-খাখাপ হয়ে উঠল দীপায়নের।

"ওটা ও ত একটা সম্বন্ধ!" কাঞ্চন রায় দিয়ে নিজের জায়গায় এসে বসল।

"আর তোমার খুব পছন্দসই, না ?" কাঞ্চনকে আঘাত দিতে চাইল সবিতা কিন্তু বোঝা গেল সে নিজেই আহত।

কথাটা কোনো শ্রোতার ভালো লাগবার কথা নয়, কিন্তু দীপায়নের ভালো লাগল। ভালো লাগল সবিতার পেছনে ম্লানমুখে প্রমিতা এসে দাঁড়াল বলেই। তোমাকে নীচুতে নামাতে চেষ্টা করবেনা সবিতা, সে চাইবে তোমার পাশে সমান উঁচু হয়ে দাঁড়াতে। তা না পারলেই তার দুঃখ। ব্যথা। ব্যথিত হতে জানে সবিতা, খাঁটি ব্যথায় ব্যথিত। ব্যথার বিকার বিদ্রূপ হয়ে ফুটে ওঠেনা তার মুখে।

''আমার যে কি পছন্দসই তা নিজেও কি আমি জানি ?" তুমুল হাসির সঙ্গে কথাটাকে উড়িয়ে দিতে চাইল কাঞ্চন।

"জানো হে।" কথা বলতে ইচ্ছে হ'ল দীপায়নের : "মিউজিক পছন্দসই না হ'লে ওরকম কেউ বাজাতে পারে ?"

"ওর জীবনের সবটুকু মিউজিক বেহালাতে গিয়েই জড় হয়েছে—আর কোথাও তার একফোঁটা পড়ে নেই, জানেন ?" একটা বিষণ্ণ অতীতের উপর চোখ বুলোতে গিয়ে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল সবিতা।

সমস্ত শরীরে নড়েচড়ে উঠল কাঞ্চন : "এম্নিভাবে হোষ্টের নিন্দা-মন্দ বলতে স্থুরু করে না কি কেউ ?—ছিঃ।"

"নিন্দা ত নয়—সমালোচনা—" দীপায়ন মজা পেতে লাগ্‌ল : "একা-একা থাকো—সমালোচনা করবার ত কেউ নেই। ইনি করছেন, শুনে নিজেকে জানো।"

"নিজেকে জানতে গেলে ঢের মুস্কিল"—ছটফট করে উঠে দাঁড়াল কাঞ্চন।

এবার সে সত্যি-সত্যি খাবারের আয়োজন করতেই নড়েচড়ে উঠল। বয় এলো, টেবিলটাকে ঘরের মধ্যিখানে আনা হল—ফুলদানীর চারপাশ জুড়ে চাউ আর প্রন্‌-কাটলেটের ডিশ সেজে উঠতে স্থুরু করল।

দীপায়নের চোখ বারবার টেবিল ছাড়িয়ে সবিতার মুখের উপর গিয়ে পড়ছিল। অন্যমনস্কতায় মেয়েরা যেমন সব-সময় থেকে বেশি সুন্দর দেখায় তেম্নি দেখাচ্ছিল সবিতাকে। দীপায়ন ভাবল, চায়ের আয়োজনে বয়ের সঙ্গে কাঞ্চন এখন রান্নাঘরে চলে গেলেও ত পারত!

চোখের একটু ইঙ্গিত, ঠোঁটের একটু হাসি, দেহের একটু স্পন্দন দিয়েই

সুরু হ'ল খাওয়া—কথা নয়। কারো মুখেই কথা ছিলনা আর। কেমন-যেন থিঁতিয়ে গিয়েছিল কাঞ্চন, আর সবিতা অন্ধের মতো নিশ্চেষ্ট। অথচ কথা বলবার জন্যে ছটফট করে উঠছিল দীপায়ন। কেউ যখন কথায় নেই, তখন কি-ভাবে কথা বলা যায়—মনে-মনে সে-বিচার করে নিতেই যা-একটু সময় লাগল ওর, তারপর প্রফেসরীয় ঝিমুনো-গলায় বলতে থাকল :

"মড়া নিয়ে টানা-হেঁচড়া করতেই আমাদের আনন্দ—জ্যান্ত জিনিষের দিকে আমাদের নজর নেই ! ভারতীয় সঙ্গীত। ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিণীর বাইরে যে সঙ্গীতের কিছু থাকতে পারে আজ পর্য্যন্ত তা ভাবতে শিখলনা কেউ। পাশ্চাত্য সঙ্গীত শুনলে বুঝতে পারি ওটা ধ্বনি-শিল্প, ধ্বনিতে ছবি আঁকে—ধ্বনির অভিজ্ঞতা ফুটিয়ে তোলে ! কোথাও তার ইতি নেই—চলবে চলবে—চিরদিন নূতন হতে থাকবে। কিন্তু আমাদের সঙ্গীত রেকাবির নৈবেদ্য। মিঞা তানসেন যা বাজিয়ে গেছেন আজ কাঞ্চন মজুমদারও তা-ই বাজাবেন !"

একটু থামল দীপায়ন—ওরা কেউ কিছু বলে কি না শুনতে। কিন্তু আবারও একটি বোবা মেয়ে আর একটি লাজুক ছেলেকে পাঠ শেখাবার জন্যে মুখ খুলতে হ'ল ওকে :

"বলছিনে যে আমাদের রাগ রাগিণীগুলো উপভোগে খারাপ। খুবই চমৎকার গঠন ওদের। কোনার্ক মন্দির। কিন্তু আজও কি আমরা কোনার্ক মন্দিরই গড়ব ?"

এ প্রশ্নেরও কোনো উত্তর এলোনা। সবিতা চুপচাপ। দীপায়ন হাল ছেড়ে খাওয়াতে ঢুকে পড়ল। কিন্তু ফর্সা কভার, ন্যাপকিন, ফুলদানী, চিনে-মাটির আর কাচের বাসন-কোসন, খাবার—সব মিলে দীপায়নের মনে আবারও কথার ঢেউ ফুলে উঠল—এই বিলিতি-বিলিতি আবহাওয়ায় খাদ্যের সঙ্গে প্রচুর কথা না গিললে চলবে কেন ? কাজেই রসনা খুলে দিল দীপায়ন :

"মানুষের বেলায়ও তা ই, জানেন ?" দীপায়ন সবিতাকে জাগাতে চাইল : "একটা জায়গায় ঘুরপাক খেতে সুরু করলে সব শেষ হয়ে গেল !"

কিন্তু কথাটা এতো বেশি উদোম শোনাল যে কয়েক সেকেণ্ড বোকার মতো না তাকিয়ে থাকবার উপায় রইলনা দীপায়নের। সবিতা মিহি মিষ্টি হাসিতে যে কি বোঝাতে চাচ্ছে, খানিকক্ষণ দীপায়ন তা-ই ভেবে চলল। কাঞ্চনের মুখের উপর চোখ তুলতে কেমন যেন ভয় করছিল ওর।

"আপনি বিশ্বাস করেন, ওকথা ?"

ওটুকুতেই যেন সবিতার মুখে অনেকখানি কথা শুনতে পেল দীপায়ন! অনেকক্ষণ পর সবিতা কথা বলছে বলে' ? না কি কথা দিয়ে সবিতা ওর কথার নগ্নতা ঢেকে দিচ্ছে বলে' ? দ৷পায়নের বোকা মুখ ঝক্‌ঝকে হয়ে উঠল আবার।

"ও নাম্বার ওয়ান ড্রিফটার !" কাঞ্চনও হুড়মুড় করে কথায় ঢুকে পড়ল।

"লেখকদের তা-ই হতে হয় !"—খুসী-খুসী সবিতা।

ড্রিফটার ! দীপায়নের সামনে একটা আয়নার সারি এসে দাঁড়াল ! অনেক রকম চেহারা—তবু সবগুলোতেই একটি-কেউ যেন আছে ! আমি ড্রিফটার ? বিষণ্ণ হতে গিয়ে হেসে উঠল দীপা৸ন : ''শুধু লেখক কেন ? যারা বাঁচতে চায় তারা সবাই !"

"যারা বাঁচতে চায়, কোনোসময় একটা মুরিং-এরও দরকার পড়ে তাদের !"

দীপায়ন পুরোপুরি কাঞ্চনের দিকে তাকাল। দেখতে পেল সত্যিকারের কাঞ্চনকে—চাঙওআর কাঞ্চনকে নয়, কাঞ্চনের মুখে আরো যতো কথা শুনতে পেয়েছে দীপায়ন সেই কথায় তৈরী কোনো কাঞ্চনকেও নয়—পেলো একটি কাঞ্চনকে যার কোনো নড়চড় নেই।

"কিন্তু তোমার ত পড়েনা !"—সবিতা নির্লিপ্ত, নির্লোভ।

কী কী অবলম্বন করে বাঁচতে চায় কাঞ্চন ? সবিতাকে ? "...ছিল একসময়"। তবে কাকে ? ঠোঁটের মিথ্যে হাসিটাকে চায়ের কাপে মাখাতে সুরু করল দীপায়ন।

"যাক্—" ছত্রভঙ্গ হল কাঞ্চন : ''য়ুরোপীয় খানিকটা শুনবে ? মুন-লাইট সোনাটার ছিঁটে-ফোঁটা ?"

শুনবে দীপায়ন ? এখন আর ইচ্ছে করছিলন , তবু বলতে হ'ল : "বাঃ—নিশ্চয় !"

চব্বিশ

সবিতাকে ভুলে যেতে পারত দীপায়ন কিন্তু ভুললনা! বেহালা-পার্টির পর থেকে কেবলই ওর মনে হতে লাগল সবিতার সঙ্গে যেন খানিকটা পথ যেতে হবে। খানিকটা বা কেন, হয়ত সবটুকু পথই। অন্ধকারের উত্তেজনায় আর আরামে তৈরী সে-পথ। তার একটা খসড়া-ছবিও গড়ে উঠ্‌ল দীপায়নের মনে। কালো ছায়ায় নিয়তির মূর্ত্তি নির্ম্মিত হল।

চাঙওআয় যাওয়া প্রায় বন্ধই বলা যেতে পারে—সপ্তাহে মাত্র দু'এক বেলা। তা-ও শুধু কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা করতে, মাতাল হতে নয়! কাঞ্চনের কাছে সবিতার খুঁটি-নাটি খবর নিতেই তখন ব্যস্ত দীপায়ন। দেখা যেতো, কাঞ্চনের দু'-তিন পেগের পরও ওর গ্লাসটা অস্পৃশ্যের মতো টেবিলের একপাশে দাঁড়িয়ে সোডার বুড়বুড় তুলে শেষটায় নিঝুম হয়ে পড়েছে।

"সবিতাকে নিয়ে গল্প লিখ্‌বে না কি?" মদের মুখেও হঠাৎ হুঁসিয়ার হয়ে উঠ্‌ত কাঞ্চন: "তাহলে আর টুঁ শব্দটি করছিনে!"

"ভাবছি গল্প লেখা-ই ছেড়ে দেব—লোকের সঙ্গে মিশতে গেলে যা বিপদ—" দীপায়ন কাঞ্চনের শপথে ঘাবড়াতনা।

"উঁহু—তারজন্যে নয়।" মনে হত, কাঞ্চনের কাছে বুঝিবা দীপায়নের সব ফন্দীফিকির ধরা পড়ে গেছে: "তোমার গল্প পড়তে গেলে ঘিলু বেরিয়ে আসতে চায়—তাই। অ্যাদ্দিনে বুঝতে পেরেছ ত? ওই সবিতার মতো দু'একটি তেরছা মেয়েই তোমার গল্প পড়ে।"

দীপায়ন উচ্চহাস্যের অভিনয় করত: "তোমার আর সবিতার মধ্যে ব্যাপারটা যে কি বোঝা যাচ্ছে না!"

"মোটেও কঠিন নয়। বনল না।"

"কেন? ও বিধবা বলে?"

দীপায়নের বাঁকা হাসিটা হয়ত লক্ষ্য করেছিল কাঞ্চন। তা-ই নেশা থেকে এক মুহূর্ত্তের ছুটি নিয়ে বলতে পারল: "হুঁ—হিন্দু বিধবা!"

জবাবটা তেতো লাগল দীপায়নের আর তাই ও চেয়ারের পিঠে মাথা ঢেলে

দিয়ে উদার ভঙ্গীতে বলতে চাইল: "তুমি নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে ভাবতে চাও সবাই তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখছে! তা ত সত্যি না-ও হতে পারে!"

কাঞ্চন তখন সত্যিকারের মাতালের মতো হেসে উঠ্‌ত: "সব ঝুটমুট—সব। কেউ কারো কাছে আসতে চায়না! উঁহু, আসতে পারেই না!"

তারপর যখন ক্রমেই গভীরভাবে মাতাল হ'তে সুরু করত কাঞ্চন, তখন তার অনর্গল মুখে শুধু সবিতা। আর দীপায়নের হাত তখন অস্পৃশ্য, ঠাণ্ডা গ্লাসটাকে মোলায়েম ভাবে টেনে নিয়ে একটু একটু করে ঠোঁটের আদর বুলোতে থাকত। দেখে মনে হ'ত, ও একটু-একটু করে সবিতাকেই পান করছে।

আর তারই নেশা—সবিতার উগ্র নেশা—সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে চড়ে যেতো দীপায়নের মনে। অপরাধের বিচিত্র নক্সা এঁকে ও মনকে পুরোপুরি অপরাধী করে তুলতে চাচ্ছিল। অপরাধের সে এক আশ্চর্য্য সাধনা! যতো কালো হয়ে উঠ্‌ছে মন, ততোই ওর উল্লাস। প্রেম নয়—প্রেমের অপরাধ-অপরাধ স্বাদও আর নয়—নির্জ্জলা অপরাধ! অপরাধ করে চল্‌ছে দীপায়ন আর সবিতা—কদর্য্যতায় মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে দু'জন—কল্পনা করে অসহ্য উত্তেজনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা পায়চারি করতে থাকত একেকদিন ও। ভবানীর দিনের চাইতেও অভাবনীয় ব্যাপার!

এ যেন অনেকটা মনের স্ফটিককে ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো করে ফেলা। হাওয়ায় মিশিয়ে দেওয়া—আর হাওয়া থেকে ধরে আনা হাওয়াই খেলনা। এম্নি মন নিয়েই হয়ত প্রগাঢ় কবি হওয়া যায় অথবা ভক্তিবাদের নায়ক আর স্বয়ং শয়তান।

মাঝে-মাঝে ভাবত দীপায়ন, এ বুঝি প্রমিতারই অভিশাপ। বেশ তা-ই। অভিশাপ ফলতে গেলেও অভিশপ্তের মনের সায় থাকতে হয়। তোমাকে ফিরিয়ে দিতে চায়নি আমার হৃদয় কিন্তু মন ফিরিয়ে দিয়েছে। তাই সে মনকে ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো করে ফেললাম আমি। তুমি তা-ই চেয়েছিলে হয়ত কিন্তু আমিও কি তা তোমার চাইতে এক ফোঁটা কম চেয়েছি? এ ত আমারই কীর্ত্তি। প্রতিহিংসা! তুমি যদি একে তোমার অভিশাপ বলতে চাও বলো-বলে সুখী হও:

আজ আর আমার মন নেই—সবিতাকে নিয়ে ভুল করবারও সুযোগ নেই তাই!

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের মাঠে পায়চারি করছিল দীপায়ন, ঘরে যেম্নি করে ঠিক তেম্নি। তবে ঘরে ওর শরীরে বয়ে যায় শুধু অপরাধের নেশা, এখন সে-নেশার উপর জৌলুষ এনে দিয়েছে ফারপোর ফরাসী শ্যাম্পেনের গভীর আরাম। সবিতা আসবে কি? দীপায়নের চিঠি পেয়ে একটি পোষ্টকার্ডে ছোট্ট করে জানিয়েছে আসবে। কিন্তু না-ও ত আসতে পারে। আজ হয়ত অফিস থেকে ফিরতে দেরী হয়ে গেল কিম্বা অফিসের যে ভদ্রলোক তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন (কেউ নিশ্চয়ই ঘনিষ্ঠ হয়েছেন এ-দু'বছরে) তিনি হয়ত তাকে নিয়ে গেলেন মার্কেটে, সিনেমায়, বা গাড়ির মালিক হলে, যশোর রোডের নির্জ্জনতায়! এমন কতো বাধাই ত আসতে পারে! তবু ভালো লাগছিল দীপায়নের, এই উত্তেজিত অপেক্ষা, সমস্ত চিন্তাগুলোকে অপরাধের অন্ধকার গলিতে ছেড়ে দিয়ে এই পায়চারি, বেশ লাগছিল ওর।

সবিতা এলো—কোনো বাধাই নেই তার আসতে, একটু দ্রুত, একটু চকিত হাঁটার ভঙ্গী থেকে ভেবে নিচ্ছিল দীপায়ন। তখন ও বাইরের ছোটো দেয়ালের গায়ে কনুই-র ভর রেখে ঘুম-ঘুম চোখে ট্রাম-রাস্তার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। শরীরে আর উত্তেজনার ঝাঁজ নেই—বিকেলের হাওয়ার মতো শুধু একটা ঝিরঝিরে খোলামেলা আরাম। কি বল্‌বে ও সবিতাকে—সন্ধ্যার এই মাঠে তাকে ডেকে এনে প্রথম কি বললে মোলায়েম হয়ে উঠ্‌বে সবটুকু ঘটনা, তা-ও দীপায়ন ভাবতে পারল না। সবিতা এলো—এখানেই যেন সব শেষ—আর যেন কিছুই করবার নেই ওর, কোনো অভিসন্ধি নেই, কাজ নেই!

দীপায়নকে দেখতে পেয়ে হাসি ফুটেছে সবিতার মুখে—হাসি-ছোপানো একটি মুখ এগিয়ে আসছে। না এলেও ত পারত সবিতা, না-ই যদি আসত, খুব কি দুঃখিত হ'ত দীপায়ন?—দীপায়ন ভাবল। কিন্তু পরের মুহূর্ত্তেই ও হেসে উঠ্‌ল—সৌজন্যে মোড়া অপরাধের নির্লজ্জ হাসি। তারপর দেয়াল থেকে আলগা হয়ে একটি আলতো লাফে রাস্তায় উঠে এলো।

"আসবেন কি না ভাবছিলাম—" নিজেকে খানিকটা তফাতে রেখে বলল দীপায়ন।

কিছুই যেন শুনলনা, বুঝলনা যেন কিছুই—এমন ভাবে তাকাল সবিতা—মুখের হাসি মুছে গিয়ে শুকনো ঠোঁটে তাকে ভীষণ অসহায় দেখাচ্ছিল।

"আমার ঠিকানা?"—যেন জোর করে সবিতা ঠোঁটদুটো আলগা করল: "কাঞ্চন দিয়েছে আপনাকে?" আবার হাসতে চাইল সে।

"নইলে কোথায় আর পাব?" দীপায়ন একটুও লজ্জিত হল না।

"অবিশ্যি আমিও ভাবছিলাম একদিন আপনার সঙ্গে দেখা করব—সেদিন ত আর তেমন কথাবার্ত্তা হলনা!"

দীপায়নের মনে সঙ্কোচের যে পাহারাটুকু ছিল তা-ও উঠে গেল—মনে-মনে ফর্সা হয়ে উঠে চারদিকে একবার তাকাল ও: "এখানেই বসব?—না ট্যাক্সি নেবে একটা? খোলা হাওয়ায় বেশ খানিকটা বেড়িয়ে আসা হবে!"

"কেন—মাঠের ঘাস আপনার ভালো লাগেনা?" ঠোঁটে হাসি টিপল সবিতা।

"ভালো লাগলেও কি বলা যায়?" ঝরঝরে হাসির ইশারায় সবিতার লুকোনো হাসিটা বাইরে টেনে আনতে চাইল দীপায়ন।

তারপর ঘাসের বিছানায়ই ওরা মুখোমুখি হয়ে বসল দু'জন। বসতে গিয়ে দীপায়ন খুসী হয়ে ভাবছিল, শ্যাম্পেনের মিহি গন্ধটা শুঁকে নিয়েও সবিতা বসতে যাচ্ছে! বসতে যাচ্ছে বসে-বসে ওর সঙ্গে গল্প করবার জন্যে! রাস্তায় দাঁড়িয়ে দু'একটা কথা বলে ও চলে গেলনা ত।

"সাহিত্যিকদের সম্পর্কে তোমার—" দীপায়ন থেমে গেল, তারপর নূতনকরে বলতে চাইল আবার: "সাহিত্যিকদের সম্পর্কে আপনার ধারণা নিশ্চয়ই ভালো নয়!"

"আমাকে 'তুমি' বলছিলেন —তা-ই বলুন—"

"বেশ ত বলব কিন্তু বলো আমাদের উপর তোমার ধারণা খুব বিশ্রী, না?"

"বিশ্রী হবে কেন?" খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে গেল সবিতা, মুখ তুলে মেমোরিয়্যালের একটা চূড়ার দিকে, তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

দীপায়ন ভাবতে থাকল, নিজের একটা অন্ধকার চেহারার বর্ণনা কি-ভাবে সুরু করা যায়। বিষের হাঁড়ি সরাসরি খুলে দেবে, না কি তাতে পয়োমুখ জুড়ে দেবে!

কিন্তু ততক্ষণে সবিতাই কথা বলল আবার: "শিল্পীরা ত আমাদের মতো নন—তাঁরা কি সাধারণ মানুষ হতে পারেন?"

"নিরঙ্কুশ।" হা-হা একটা হাসির মতোই শোনাল দীপায়নের কথাটা।

"হ্যাঁ, ওদের সব-কিছুই ক্ষমা করা যায়।"

যায়? দীপায়নের মনে হল ওর হাতের মুঠোয় একটি নরম হাত নিজেকে পিষতে দিচ্ছে— ওর উষ্ণ গালে কারো গালের মসৃণ, ঠাণ্ডা স্পর্শ। ঘাসের উপর একটা অবসন্ন হাত মেলে ধরল দীপায়ন। ক্লান্তি এলো ওর গলায়: "কেউ-কেউ ক্ষমা করে। তুমি ক্ষমা করতে পারো, জানি।"

"জানেন!" সবিতাও ঠিক তেম্নি ক্লান্ত শোনাল: "ও, কাঞ্চনকে দেখেছেন—তাই।"

"আমাকেও ত দেখলাম।" একটা ঘাসের ডগা ছিঁড়ে নিতে ব্যস্ত হল দীপায়নের হাত।

শ্বাসরোধ করে দীপায়নের মুখে অপলক তাকিয়ে থাকবে বলেই যেন সবিতা ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

মুখ নিচু করলনা দীপায়ন, চোখ নামালনা। ভাবল, একটা নিশ্চলতা তৈরী হচ্ছে হোক। দাঁড়িয়ে থাক সন্ধ্যা—দাঁড়িয়ে থেকে গভীর হতে থাক। নিবিড় হতে থাক সময়, আকাশ, গাছপালা, মাঠ, ওদের বসার ভঙ্গী। গাঢ় হই আমরা – তুমি সবিতা, ভাখো আমাকে, আমিও দেখছি তোমাকে,—আমরা দেখছি—আমাদের দেখার নিশ্চল মূত্তি তৈরী করুক সন্ধ্যা, তারপর তাকে ফেলে রেখে যাক আমাদের মন—চিরকাল—চিরজীবন।

"আগুন নিয়ে খেলতেই ভালোবাসি আমরা—মেয়েরা আগুন— উপনিষদ বলেছে পঞ্চমাগ্নি—জানো সবিতা?"

নির্ব্বাক, নিশ্চল আসন থেকে জেগে উঠল যেন কোনো তান্ত্রিক কিন্তু সবিতা শুনতে পেল শিল্পীর কণ্ঠ, তার কানে, মনে, স্মৃতির ধূসরতায়। কোনো বিস্মৃত হাসিকেই যেন স্মরণ করে নিতে চাইল তার ঠোঁট। তার হাত খুঁজতে লাগল মাঠের অন্ধকারে অন্ধকারের শরীর।

আর ঘাস নয়, একগুচ্ছ কচি অশোকপাতা। ছুঁয়ে গেল, ছুঁয়ে রইল দীপায়নের হাত। সবিতার আঙুল! দীপায়নের বুকের এক ঝলক রক্ত হাততালি দিয়ে উঠল!

তৈরী করতে পেরেছ তোমার নিয়তি—অন্ধকারের সিংহদরজা খুলে গেছে—এক মুহূর্ত্তের জন্যে—তারপর আর তাকে খুঁজে পাবে না—নিয়তির মূর্ত্তি ভেঙে

চুরমার হয়ে যাবে—আর দেরি নয়. এখুনি যা করতে হয় করো. সময়ের এই নিথর বিন্দুতে তোমার ভবিষ্যতের ভ্রূণ দুলছে। চেঁচিয়ে উঠ্‌ছিল কেউ। শব্দের তুফানে দীপায়নের কান ভরে উঠেছে। নড়ে-চড়ে এগিয়ে আসতে চাইল দীপায়ন—সবিতার কাছে—সবিতার গা-ঘেঁষে।

কিন্তু হঠাৎ সব চুপচাপ। থেমে গেল দীপায়নের শরীর, ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

সবিতা কাঁদছে। বুকের উপর নুয়ে পড়েছে ওর মুখ, পিঠে ঢেউ উঠ্‌ছে কান্নার। কয়েকটা মরা আঙুল মুঠোয় নিয়ে ভেজা-ভেজা নিঃশ্বাসের শব্দ কান পেতে শুনতে লাগল দীপায়ন। যে নিশ্চলতা ভেঙে দিয়েছিল ও খানিকক্ষণ আগে, আবার তা তৈরী হতে সুরু করল।

কান্নার ঠাণ্ডা জলে চুমুক দিয়ে চলেছে দীপায়ন—কতোক্ষণ যে বলতে পারবে না। চৌরঙ্গীর ঝিলিমিলির দিকে যে কতোক্ষণ তাকিয়েছিল মনে নেই। শুধু মনে পড়ে, অনেকক্ষণ ধরে সেই কান্নার ছবি তুলে নিচ্ছিল ওর মন—কোনোদিন কোথাও বলবে বলেই তুলে নিচ্ছিল।

হয়ত সেই মুহূর্ত্তেই একজন তান্ত্রিকের মৃত্যু হ'ল—মৃত্যু হ'ল একটি শিল্পীর পুনর্জ্জন্ম হবে বলে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দৃশ্যের পর যখন আবার পর্দ্দা উঠ্‌ল, উত্তর কলকাতার একটা ছোট গলির ছোট ঘরে সবিতা আর দীপায়নকে আমরা বসে থাক্‌তে দেখ্‌ছি। সবিতারই ঘর—একটা পুরো বাড়ির একচতুর্থাংশ জায়গা—ঘরের বারান্দায় বাথরুম আর রান্নাঘর তৈরী করে নিতে হয়েছে—কলে-চৌবাচ্চায় পুরো-বাড়িরই মালিকানা। ঠিক এম্নি বা সামান্য ছোট-বড় আর তিনটি ঘরে তিন পরিবারের আস্তানা কোনো পরিবার স্বামী-স্ত্রী পুত্র-কন্যায় চৌকস, কোনোটি নির্জ্জলা স্বামী-স্ত্রীতে টাটকা আটকা। সবিতার উপর এককালে অনেক চোরা হাসি, বাঁকা চোখ, কান-পাতা পিছলে গেছে—এখন সে অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সীতা—তিন ঘরে এখন তার তিন বৌদি।

সবিতা জানত দীপায়নের এ-আবির্ভাবের পর বৌদিরা হয়ত আবার তাঁদের পুরোনো ভূমিকায় ফিরে যাবেন, তবু সে দীপায়নকে না বলতে পারল না।

"তোমার বাড়িতে যদি যাই একদিন ?"

"কি হবে গিয়ে।"

"লেকে-মাঠে, রেষ্টুরেণ্টে-সিনেমায় বসে থাকার চাইতে ত ভালো লাগবে—একটু নিরিবিলি —"

"যাবেন।" হাসতে ইচ্ছে করছিলনা, তবু হাসছিল সবিতা।

তারপর হয়ত ভেবেছিল, এর জন্য যা-কিছু কৈফিয়ৎ তা ত একা-একা নিজেকেই দিয়ে যেতে হবে সবিতার—দীপায়ন তা শুনতে আসবেনা—তবে আর কি ? তাছাড়া এমন ঘটনা ত নূতন নয়। লক্ষ্ণৌ থেকে তার দেওরও ত একবার এসেছিলেন তাঁর দাদার আঁকা ছবিগুলো নিয়ে যেতে—ছিলেন একদিন— কী ক্লান্ত দিন—ছবিগুলো না পাওয়ার আক্রোশে ভারি হয়ে উঠেছিল তাঁর মুখ—তারপর দিনের শেষে বৌদি-দের খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা। সবিতা সব জিজ্ঞাসার জবাব হাসিমুখেই ত দিতে পেরেছিল। তার আগে তার দাদা এসেছিলেন সবিতাকে নিয়ে যেতে বিধবা বোনের উপর তাঁর কর্ত্তব্য পালন করতে এসেছিলেন- তখনও ঠিক এম্নি। এমন কি, দীপ্তি এলেও তা-ই। বৌদিরা থামতে চাইতেন না। দীপ্তি—তার কলেজের সহপাঠিনী—এখন টীচার।

আর দীপায়ন ভাবছিল—কাঞ্চন কি কোনোদিন আসেনি সবিতার বাড়িতে ? "কেউ কারো কাছে আসতে চায়না"– ভাবনার উপর তক্ষুণি একটা গভীর দাগ কেটে দিয়েছিল কাঞ্চনের কথাগুলো। আলগা হয়ে গিয়েছিল দীপায়নের ভাবনা।

হাতে চুড়ি ছিল, গলায় হার, কাপড়ে পাড় · তবু সবিতাকে এখন কেমন-যেন সাদা ধবধবে দেখাচ্ছিল। এ ঘরে সবিতা বিধবা ছাড়া আর কিছু নয়, নিরুৎসাহিত হয়েও ভাবছিল দীপায়ন। অথচ কৌতুহলী চোখে ঘরটাকে তন্নতন্ন করে দেখেও চলছিল। তিন দেয়ালের তিনটি ছবিতে বারবার চোখ আটকে যাচ্ছে আর বারবারই ভাবছে হিমাংশুবাবুর নামটা উচ্চারণ করবে কিনা।

কিন্তু সত্যি বলতে, সবিতাকে অনেক ভরা-ভরা, স্নিগ্ধ, তৃপ্ত দেখাচ্ছিল তখন। চোখ থেকে সবিতার অতীতটুকু মুছে ফেলতে পারলে দীপায়নও দেখতে পারত, ঘরের ছায়ায় সবিতা আজ যেমন নিটোল বাইরের আলোতে কখনো, কোনদিন তেমন নয়।

শেষটায় তৈরী হল দীপায়ন, তৈরী হতে গিয়ে মনে-মনে বলে নিল—হিমাংশুবাবুর নাম নয়, ছবিগুলোর গুণপনা নিয়েই সুরু করা যাক। আর সত্যি বলতে, আমি ত রঙের উৎসবই দেখতে পাচ্ছি। এতো বিচিত্র রঙও যে পৃথিবীতে আছে শিল্পীরা না দেখালে দেখতে পারি কখনো? হয়ত দেখি, কোনোদিন কোনো ফুলে, কোনো মেঘে, কোনো আকাশে বা জলে নিজেরাই দেখি আমরা, কিন্তু ভুলে যাই, ধরে রাখতে ভুলে যায় চোখ—তারপর একদিন শিল্পী যখন নিয়ে আসেন সে-রঙ আমাদের চোখের সামনে, আমরা ফিরে পাই সেই ভুলে যাওয়া অনুভব—ফিরে আসে আমাদের ভুলে-যাওয়া দেখা! নিজেকে শিল্পের পাঠ শিখিয়ে নিয়ে দীপায়ন ছবিগুলোর স্তুতি করবে বলেই বললে—"ছবিগুলো—"

"আমার স্বামীর আঁকা -" সবিতা যেন অনেকক্ষণ ধরেই দীপায়নের মুখে কথাটা শুনবার অপেক্ষা করছিল, তাই কথা বলতে একটুও দেরি হলনা তার, একটুও ইতস্তত করলনা সে।

"হিমাংশুবাবুর—বুঝতে পেরেছি—"

"নামটাও আপনাকে বলেছে কাঞ্চন?"

কাঞ্চনের মুখের সলজ্জতা দীপায়নের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ল: "একদিন কি কথায়-কথায় বলেছিল!"

দেখা গেল সবিতা দুঃখিত হয়েছে কিন্তু কেন যে, ঠিক-ঠিক ধরতে পারলনা দীপায়ন। দুঃখিত থেকেই সবিতা বলল: "ছবিগুলো ভালো লাগছে আপনার?"

"চমৎকার! মাতিসকে মনে পড়ছে।"

"আপনারা সবাই মানুষের মতো দেখতে কিন্তু কোথায় যেন ঠিক মানুষ নন।" খানিকটা ব্যথাকেই যেন কথার চেহারায় ফুটিয়ে চলল সবিতা।

। দীপায়ন অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে বলল: "আমরা—"

"সবাই। উনি—" চোখের উঁচু দৃষ্টিতে একটা ছবি নির্দ্দেশ করে বললে সবিতা: "কাঞ্চনও, সবাই আপনারা।"

"আমি! গল্প লিখি বলে কি ওদের মতো বড়ো শিল্পী আমি!" হঠাৎ যেন দীপায়ন স্বচ্ছ দৃষ্টি ফিরে পেলো, যা মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, যার সামনে সব কথার মানে, সব রহস্যের সমাধান স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সবিতা হয়ত শুনলনা কথাটা, কিম্বা শুনল শুধু ঠোঁটে একটু হাসি মাখাবার জন্যেই। নিজের কথার মন্থন স্রোতেই ভেসে চলল সে: "মেয়েরা ঐশ্বর্য্যের কাঙাল—সবাই—কেউ কম, কেউ বেশি।"

আবার ঝাপসা হয়ে গেল দীপায়নের চোখ। সবিতার হাত ত্ব'টো নম্রতায় নরম হয়ে আছে কোলের উপর। ঝাপসা চোখে দেখল, ও হাতে ত্ব'গাছি সরু চুড়ি—রিষ্টওয়াচটা নেই। রিষ্টওয়াচ নেই বলেই হয়ত সে হাত এমন অদ্ভুত নম্র দেখাচ্ছে—ভাবল দীপায়ন। আর কিছু ভাবতে পারলনা।

"কিন্তু নিজেদের ঐশ্বর্য্যে নিজেরাই মুগ্ধ আপনারা—তার দিকেই তাকিয়ে আছেন সবসময়—" অনীপ্সিত হাসিতে এবার খানিকটা রোগাই দেখাল সবিতাকে।

"আমি? আমি নয়।" ছি-ছির মতো করে বলে উঠ্‌ল দীপায়ন, তারপর আর কিছু বলতে না পেরে আবারও ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে শিল্পীর ঐশ্বর্য্য-সন্ধানে ব্যস্ত হল। কিন্তু শুনতে চাইল, সবিতার মুখেই মুখেই শুনতে চাইল ওর নিশ্চিত, নির্ভুল পরিচয় · একটি ছোট কথা: "আপনিও।"

সবিতা তা বললনা কিন্তু হাসল—এবার সে-হাসি স্বাভাবিক আর স্বাস্থ্যকর, আর তা-ই যেন হঠাৎ তার চোখে-মুখে, শরীরে স্বাস্থ্য ফিরে এলো।

"দেখ্‌লেন, বসে-বসে শুধু বাজে কথাই বলছি আপনার সঙ্গে—এক কাপ চা-ও দিতে পারছিনে। তাই ত বলছিলাম, কি হবে এখানে এসে?"

"আহারের নিমন্ত্রণ ত আমি চাইনি!"—চুপচাপ হাসতে লাগল দীপায়ন।

"কথা-বলার নিমন্ত্রণ—না?" আরোগ্য হয়ে গেছে সবিতা: "কিন্তু তা-ও বা কি। কি-সব আজে-বাজে বকছি বলুন ত!"

"অত্যন্ত জরুরী কথা বল্‌ব একটা সামরিক বৈঠক বস্‌বে—এমন ত কথা ছিলনা!"

"না—তবু।" খানিকক্ষণ আগেকার কথাগুলো যেন তাড়া করে ফিরছিল সবিতাকে।

"মাঝারি-গোছের কথাটা কি? কাঞ্চনের কথা?" দীপায়নের চোখে কৌতুক ফুটে উঠ্‌ল: "তোমার আর আমার মাঝখানে ত কাঞ্চনকেই দেখা যায়।"

"বেশ ত বলুন!"

"তার মানে আমি গল্প বলব, তুমি শুনবে ?"

"আমি ত খারাপ শ্রোতা নই।"

"তা জানি।" উজ্জ্বল হয়ে উঠল দীপায়ন—উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল বলেই যেন গলা বুঁজে গেল, কথার স্রোত থেমে গেল এক মুহূর্ত্তে।

সবিতাও কথা বলে মুহূর্ত্তটাকে পেছনে ফেলে আসতে চাইলনা। আর দীপায়ন শুনতে পেল সবিতার কথা—যে কথাটা শুনবে ভেবেছিল, শুনতে পেল এখন, শুনল যেন : "আপনিও।"

কাঞ্চনের কাছে একটা চিঠি দিয়েছিল দীপায়ন—চিঠি না দিয়ে দেখাও করতে পারত, কিন্তু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলা যাবেনা, ভেবে দেখেছে ও। বলতে যদি যায়ও তার আগে ওকে মাতাল হতে হবে। অথচ কথাগুলো মাতালের নয় আর মাতালকেও শোনাবার নয়।

চিঠিতে সবিতার কথাই ছিল। আর সবিতার কাছে শোনা কতকগুলো কথা।

কাঞ্চন যা-ই বলুক, সবিতা কাঞ্চনকে ভালোবাসে। দীপ্তিদের ইস্কুলের ফাঙ্‌শানে যেদিন বাজাতে গিয়েছিল কাঞ্চন আর ফাঙ্‌শানের শেষে চা খেতে বসে পরিচিত হয়েছিল সবিতার সঙ্গে, সেদিনই সবিতা জানত, কাঞ্চনকে ও ভালোবাসবে। "তুমি কি জানো, কোনোদিন ভেবে দেখেছ, সবিতার এ-ভালোবাসা যে স্বামীকেই ভালোবাসা ?"

হয়ত ভেবে দেখেনি কাঞ্চন। সবিতাকে সে মনে একটুও ঠাঁই দেয়নি, পেতে চেয়েছে দেহের সিংহাসনে। তাই সে ওকে পায়নি। "তোমার মনের সবটুকু জায়গা জুড়ে সঙ্গীতই আসন পেতে রইল, একটি মেয়েকে একটু ঠাঁই করে দিলেনা ! দিলে দেখতে পেতে সবিতাকে তুমি ভালোবাসতে পারো।"

কাঞ্চন আজ ভালোবাসেনা সবিতাকে কিন্তু আজও সবিতা কাঞ্চনকে ভালোবাসে। "স্বামীকে সে চিরদিন ভালোবাসবে, তাই তোমাকেও।"

সবিতার কথা শেষ করে দীপায়ন নিজের কথাও খানিকটা লিখেছিল কাঞ্চনকে। "তোমাদের মুনলাইট সোনাটায় আছে, চাঁদ ম্লান হয়ে যাচ্ছে, দেখছে রাত্রির ছায়ায় শয়তান লালফুলের ছদ্মবেশ নিয়ে দাঁড়ায়—আর বর্ণলোভী

শুভ্র প্রজাপতি এসে শয়তানের খর্পরে পড়ে। কিন্তু এ কি ভাবতে পারো কাঞ্চন, তোমাদের বীঠোফেনও কি ভাবতে পেরেছিলেন যে শুভ্রতার ছায়ায় একদিন হয়ত শয়তানেরও স্বর্গের কথা মনে পড়ে যায়?"

কাঞ্চন চিঠির উত্তর দেয়নি। দশ-বারো দিন অপেক্ষায় ছিল দীপায়ন। তারপর গিয়ে উপস্থিত হতে হল কাঞ্চনের ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাটে নূতন ভাড়াটে। পাশের ফ্ল্যাটের একজন অ্যাংলোইণ্ডিয়ান মহিলা খবর দিলেন, কবেই ত সে বোম্বে চলে গেছে—ফিল্ম-কোম্পানীতে ভালো চান্স পেয়ে।

[মনে হচ্ছিল সবিতা ওখানেই শেষ নয় কিন্তু ওখানেই দীপায়ন সবিতাকে শেষ করে দিতে চাইল। জেরার পঁ্যাচ কষে ওর মুখ থেকে আরো কিছু বার করে আনব ভাবছিলাম কিন্তু তা আর হ'লনা। সবিতার উপাখ্যান শেষ করেই দীপায়ন যেন কোনো কল্পিত শত্রুর উপর মারমুখ হয়ে উঠ্‌ল: "জানি, আজও—যখন আমরা স্বাধীন হয়েছি, গান্ধীজীর মতো নেতা এসে গেলেন, তখনও আমরা ঠিক আগেকার মতোই রয়ে গেলাম। ওদের আমরা ডেকে নিলাম না বাঙালী খ্রীষ্টান ছেলেমেয়েদের। কিছুতেই ওদের আপন ভাবতে পারলাম না! আজও কাঞ্চনকে মনে পড়ে আমার। মনে পড়ে নিজের অপরাধ। সত্যি বল্‌তে কাঞ্চনকে আমিও আপন ভাবতে পারিনি—মেলামেশা হয়েছে ঢের কিন্তু তবু যেন একটা পর্দ্দার দু'পাশেই দুজন থেকে গেছি! কী ভীষণ আমাদের সংস্কার—একেকসময় শিক্ষা-দীক্ষা বুদ্ধি-বিচার সব তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়!"

আমিও মরিয়া হয়েই জিজ্ঞেস করলাম: "সবিতার মনেও তাহলে কাঞ্চন সম্বন্ধে খ্রীষ্টান-সংস্কারই ছিল। ঠিকই ধরেছিল কাঞ্চন।"

"সব শুনেও তোর তা-ই মনে হ'ল না কি?" দীপায়ন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ল, একটু ব্যথিতও। পাশের মানুষটি ও-রকম হয়ে গেলে অপরাধীর মতো চুপ করে যেতে হয়। মাথা হেঁট করে খাতার পাতা উল্টোতে লাগলাম আমি, শুনতে চাইলাম দীপায়ন আরো কি বলে।

মিনিট কয়েক পর দীপায়ন সত্যি আবার বলতে সুরু করল: "আমরা

ভাবি, দু'টি পুরুষ কখনও এক-রকম হয় না কিন্তু সব মেয়েই এক। কতগুলো ব্যাপারে সব মেয়ে অবশ্যি একই রকম কিন্তু বলতে পারিস কেন এমন হয়? মেয়েদের আমরা একই ধরনের কাজে মেতে থাকতে হাজার-হাজার বছর শলা দিয়ে এসেছি—একই কাজের ছাঁচে পুরে একই রকম নক্সা তৈরী করেছি। তোমাদের শরৎবাবু সব মেয়েতে সেবা-ধর্ম্মের জয়জয়কার গেয়ে গেছেন। তোমরা পড়ে গদ্‌গদ্ হয়ে যাও। নিজের অশিক্ষিত স্ত্রী নিয়ে মহা আনন্দে থাকো—ভাবো, সব মেয়েই ত এক! মেয়েদের কাজে—জীবিকায়—জীবনে বৈচিত্র্য এনে দিয়ে কি এ-ভাবনা ভাবতে পারবে কোনোদিন? পারবে না। আজ মেয়েরা অনেক রকম কাজে নেমে আসছে—দেখতে পাবে মেয়েরাও তোমাদের মতো বিচিত্র।"

হঠাৎ দীপায়ন এমন মেয়েদের গান কেন গাইতে সুরু করল বুঝতে পারলাম না। ওকে ঠিক ধরা যাচ্ছিলনা। কি যে ওর মনে আছে—সবিতা, প্রমিতা না কি শেষ অধ্যায়ের সুপর্ণা, বুঝতে মুস্কিল হচ্ছিল। কিন্তু আমি সবিতাকেই খুঁচিয়ে তুলতে চাইলাম।

"সবিতার কথা যা শুনলাম তাতে মনে হয় সত্যি ও এক আশ্চর্য্য মেয়ে।"

কথাটা যেন দীপায়ন কানে তুলে নিলেনা কিন্তু একটা মিহি হাসিতে অমায়িক হয়ে উঠল ওর মুখ। আমার মুখে তাকিয়ে ও যেন মজার কিছু দেখতে পেলো আর তাই খুসী-খুসী গলায় বলতে সুরু করলে: "একদিন ভারি একটা অদ্ভুত ঘটনা হয়েছিল, অনি। হাজরা রোডের ফ্ল্যাটেই। ঘরে ঢুকে দেখি, আমার টেবিলটা সুন্দর গুছানো - চাকরের হাতে যা কস্মিনকালেও হয়না। আমার লেখার ফাইলগুলো, প্যাড-পেন, কুইঙ্কের দোয়াত, ঘড়ি—যে'টা যেখানে থাকবার যেন ঠিক সেখানেই থাকতে পেলো এই প্রথম। আর টেবিলের মাঝখানে সবিতার লেখা কার্ডটা, যা সকালের ডাকে এসেছিল। মনে পড়ল, ওটা প্যাডের পাতায় গুঁজে রেখেছিলাম। যে-হাত টেবিল গুছিয়েছে, তা-ই ওটাকে সাদরে টেনে এনেছে বুঝতে পারলাম। কিন্তু কার সেই হাত? বাসব ত হতেই পারেনা—একবার ভাবলাম, তুই, হয়ত তুই এসেছিলি—এ'ক'বছরে তোর গোসা নরম হয়ে এসেছে। চাকরকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার টেবিল কে ধরেছে রে? ও বললে, সে কি বাবু, আমি কেন ধরতে যাব? তোর কথা বলছিনে, কে এসেছিল—বললাম। হাঁপ ছেড়ে ও

বললে : দিদিমনিকে ত দেখলাম ও ঘরে। বাসুবাবু ছিলেন না, খানিক বসেছিলেন। প্রমিতা! -- মনে-মনে হেসে উঠ্‌লাম।"

"তখনও প্রমিতা উঁকিঝুঁকি দিতে চাচ্ছিল?"

"উঁকিঝুঁকি!" দীপায়ন নিবু-নিবু হাসিতে মুখ ফিরিয়ে নিলে: "হয়ত তা-ই ওকে বলা যায়। চিঠিতে সবিতা আমাকে দেখা করতে লিখেছিল। প্রমিতা বোধহয় সে-ই প্রথম জানলে যে সবিতা নামে একটি মেয়ে আমার পরিচিত আর সে আমাকে দেখা করতে অনুরোধ জানায়। টেবিল সাজানোটা যৌন-ঈর্ষারই একটা চেহারা, সবিতার উপর নিজেকে জাহির করা—বুঝতে দেরি হলনা আমার।"

"ঠিক জানিনা, তবে আজ আমার কি মনে হয় জানিস, পানু?" বেশ খোলামেলা ভঙ্গীতে বলতে চাইলাম: "প্রমিতার উপর তুই সুবিচার করিসনি। সবিতার উপরও—"

"প্রমিতা খুবই একটি সাধারণ মেয়ে সেদিন জানলাম—" দীপায়ন আমাকে কেটে দিলে: "পুরুষকে ও ফ্যাসিষ্টই বলুক আর বাসবের সঙ্গে কম্যুনিজ্‌ম্‌ই করুক্—অত্যন্ত সাধারণ, আটপৌরে ও। কম্যুনিজ্‌ম্‌টা ওর চুলের ফ্যাশন—একটা প্রসাধন। সাধারণ হওয়ার অপরাধ কি জানিস অনি, ওরা বাঁচাতে জানেনা, নিজেরাও বাঁচেনা। ওদের ধর্ম্ম নেই - এমন কোনো প্রগাঢ় ইচ্ছা, কামনা, বিশ্বাস জীবনে থাকেনা যাকে আশ্রয় করে জীবন সুন্দর হয়ে ওঠে। ধর্ম্ম বলতে আমি আধ্যাত্মিকতাকেই বোঝাচ্ছিনে—প্রেমও ধর্ম্ম হতে পারে। কাজও ধর্ম্ম হয়ে ওঠে কারো-কারো জীবনে। স্বাধীনতা অর্জ্জন যেমন ছিল গান্ধীজির ধর্ম্ম।"

দীপায়নের চোখে-চোখে তাকিয়ে হাসতে লাগলাম আমি। জানি, প্রেমই ওর ধর্ম্ম। যাকে ও পেতে পারেনা, সমাজের উঁচু দেয়াল বাধা দিয়ে দাঁড়ায় — তাকেই পেতে চায় ও। এই চাওয়া আর পাওয়াইত প্রেম। ওর চোখে-মুখে তারই আভা দেখতে পেলাম যেন। আর দেখতে পেলাম সবিতাকে। আর কিছু জিজ্ঞাসার ছিলনা, জানবার ছিলনা। দেখছিলাম, সে এমন একটি অসাধারণ মেয়ে যে দীপায়নকে উঁচুতে তুলে এনেছে, যার কাছ থেকে দীপায়ন অনেক-কিছু পেয়েছে যা ওকে কেউ দিতে পারেনি, এমন কি তোতাও না।]

পঁচিশ

যুদ্ধের বাজারে পানিফলের গুঁড়োতে তেতো মিশিয়ে যারা কুইনিন তৈরী করছিল তাদের দলে মিশে গিয়ে রাতারাতি বড়লোক হওয়া যায় কি না ভাবছিলাম, এমন এক স্বপ্নের দিনে কলেজ ষ্ট্রীটে দীপায়নকে দেখতে পেলাম। বগলে এক তাড়া কাগজ—পুরনো বই-এর দোকানে দাঁড়িয়ে বই ঘাঁটছে। প্রথমটায় মনে হ'ল কেটে পড়ি, কারণ, কে জানে আমার চোখে-মুখে ধনার্জ্জনের কালো তৃষ্ণার ছাপ লেগে নেই—দীপায়নের উজ্জ্বল চোখে তা নির্ঘাত ধরা পড়বে। চৌরঙ্গীর মোড়ে আমার মনে একদিন যে বিতৃষ্ণা দেখা দিয়েছিল আজ হয়ত দীপায়ন তার প্রতিশোধ নেবে। কাজেই কাজ নেই ওর মুখোমুখি হওয়ার। পা দু'টো ত-ই বলছিল।

কিন্তু দেখলাম, ও সাক্ষাৎ অজগর। আমার সাধ্যি ছিলনা ওর নিশ্বাসকে এড়িয়ে যাই। গিয়ে দাঁড়াতে হল সামনে।

"অনি!"—যেন রোজই আমাদের দেখা হয় এম্নি সহজ গলায় সম্ভাষণ জানালে ও।

"বই দেখছিস্? কি বই?" আমিও যথাসাধ্য সহজ হতে চাইলাম।

"কি বই ছাপা হয় তা-ই দেখ্‌ছি।" খানিকটা রোদের মতো একটা হাসি ছড়িয়ে দিলে ও।

"এতো সব গল্প ছাপিয়েও জানিসনে কি ছাপা হয়?"

"না। পাব্লিশারদের কাছে গিয়েছিলাম—এই উপন্যাসটা নিয়ে।" বগলের এক তাড়া কাগজ হাতে তুলে আনল দীপায়ন: "কেউ রাজি হলনা ছাপতে। পয়সা চাইনে বললাম, তবু মাথা নাড়তে লাগলেন ওঁরা। বলে, 'চল্লিশ টাকা রীম কাগজ কিনে বই ছাপানো যায়, মশাই? নতুন পাব্লিকেশনে যাচ্ছিনে আমরা। তার চাইতে এই ভালো, পুরণো যা মাল ছিল তা-ই হু-হু করে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। টক উজোর হোক ত আগে—কাগজের বাজারও ঢিলে হোক, তারপর ভাবব নতুন বই-এর কথা। তাছাড়া আপনি ত একদম আনকোরা

লেখক !' যাহোক তবু বসিয়ে রেখে বললেন এতগুলো কথা— দুর-দুর করে তাড়িয়েও ত দিতে পারতেন।"

দোকানী বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে হাসছিলেন। দেখে আমার অসহ্য লাগল। তাড়াহুড়ো করে বললাম : "চল পানু—হাঁটতে-হাঁটতে কথা হবে।"

চলতে কোনোরকম আপত্তিই ছিলনা দীপায়নের, দেখতে পেলাম। দ্বিরুক্তি না করে ও আমার সঙ্গে হাঁটতে সুরু করলে। ওয়েলিংটনের দিক ধরেছিলাম— আমার আস্তানার পথ।

"এখনো হাজরা রোডেই আছিস, তা-ই না ?"

"না, উত্তর কলকাতায়।"

"সে কি ?"

"বাসবও নেই, কাজেই হাজরা রোডও নেই। অবশ্য বাসবের সঙ্গে মাঝে-মাঝে দেখা হয়।"

"কোথায় গেল বাসব ?"

"কম্যুনিজ্‌মে।" একটা ধারালো হাসি ফুটে উঠ্‌ল দাপায়নের ঠোঁটের দু'পাশে।

"সে ত আগেই গিয়েছিল—নতুন যাওয়া আবার কি হল।"

"এমন যাওয়া আর যায়নি ও কোনোদিন। ও বলে, গান্ধীজি কুইট্‌-ইণ্ডিয়া বলেন নি, আমরা না কি তৈরী করে নিয়েছি ও-কথা। আমাকে বলে, কংগ্রেস-সোশ্যালিষ্ট, ফ্যাসিষ্ট।"

"ভালো, তোর চোখ খুল্‌ল এতোদিনে !"

"চোখ আমার খোলাই ছিল কিন্তু তা বলে বাসবকে কোনোদিন কি আমি বলতে পারি স্বাধীনতার শত্রু। যাকে ভালো লেগেছে একদিন, তাকে আমার কোনোদিনই খারাপ লাগবেনা। আমাকে ছেড়ে বাসবই চলে গেছে, আমি ওকে ছেড়ে যাব ভাবিনি কোনোদিন—যেদিন ও আমাকে ফ্যাসিষ্ট বলল সেদিনও না।"

আমি দীপায়নের মুখে তাকালাম—সেখানে, আশ্চর্য্য, কতোদিন পর, আবার দেখতে পেলাম ছেলেবেলার পানুকে। মনে হল, ও মায়াবী। অদ্ভুত এক জাদু জানা আছে ওর। সময়কে ও মুছে ফেলতে জানে—সবাইকে টেনে নিতে জানে ফেলে-আসা দিনগুলোতে।

ইচ্ছে হচ্ছিল ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলি : "আমাকে ক্ষমা কর পান্নু ! আমি জানতামনা যে ময়্যালিটি সাধারণ মানুষের জন্যে—অসাধারণের জন্যে নয়।—" কিন্তু রাস্তায় যা ইচ্ছে হয় তা করা যায়না, বলাও যায়না সব কথা। কাজেই চুপচাপ ওর গা ঘেঁষে হাঁটতে লাগলাম।

কিন্তু দীপায়ন সব জায়গাতেই সব কথা বলতে পারে দেখলাম। বে-আইনী পলিটিক্সেও ওর একটু ইতস্তত নেই। ও বলতে সুরু করল : "এ-যুদ্ধের শেষে পৃথিবীর চেহারা পাল্টে যাবে, আমি জানি। আর এ-ও ঠিক এ-আন্দোলনই আমাদের স্বাধীনতার শেষ আন্দোলন। অথচ আমরা নিজেদের জিজ্ঞেস করছিনে—স্বাধীনতাকে আমরা কি দিতে পারলাম। জীবন দিতে না-ই পারি, ইচ্ছা, কামনা, আন্তরিকতাকেও ত ঢেলে দেওয়া যায় ! এর বিরোধিতা করতে পারিনে। অথচ বাসব বলে, এ-আন্দোলন আমাদের নয় ! কী অদ্ভুত বাঁকা মন ! দাদাকে বুঝতে পারি—মন ওঁর পঙ্গু হয়ে গেছে—কোনো সাড়াই আর ওঁর নেই কিন্তু বাসবকে বুঝতে পারলাম না। আজ সমস্ত ভারতবর্ষের মনে যে আশ্চর্য্য সাড়া—তা যেন কিছুই নয়, অন্য এক সাড়া তুলতে ও ব্যস্ত—জনযুদ্ধের সাড়া—ইংরেজের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করতে হবে নাকি জাপানীদের তাড়াতে !"

মিলিটারি রাজত্বে বসবাস করে বে-আইনী পলিটিক্সে আমার রুচি ছিলনা কিন্তু দীপায়ন বলছে বলেই শুনতে হ'ল কথাগুলো। তবে চেষ্টা করলাম যেখানে এসে ও থামল সেখানেই প্রসঙ্গটা শেষ করতে :

"তুই কিন্তু বললিনে পান্নু, ঠিক কোথায় আছিস।"

"বললাম ত উত্তর কলকাতায়- এক বন্ধুর বাড়িতে।"

"কে—সুরজিৎ ?"

"আমার বন্ধু কি বাসব আর সুরজিৎ ছাড়া আর কেউ নেই ?"

"নিশ্চয় আছে—অনিরুদ্ধ ঘোষাল আছে।" ঝরঝর হেসে উঠলাম।

দীপায়ন হাসিতে মন দিলেনা, বললে : "একটি মেয়ে। তুই চিনবিনে।"

"তাহলে ত ভালোই আছিস।"

"না। ওর অসুখ। সানাটোরিঅমে পাঠাতে হবে।"

"ও"—একটু সমবেদনার সুর টেনে চুপ করে গেলাম। বুঝতে পারছিলাম এ-দিকটা দীপায়ন খুলে ধরতে চায়না। থাক্, দরকার নেই খুঁচিয়ে।

এবার দীপায়ন নিজে থেকেই আটপৌরে আলাপে এসে গেল : "তারপর তুই ? তুই কি করছিস ? সেই মাষ্টারি ?"

"করছি, তবে এবার ছেড়ে দেব। যুদ্ধের বাজার পেয়ে সবাই বড়লোক হয়ে গেল—পকেট থেকে তাড়া-তাড়া নোট বার করে দেখায়—আমি কেন মুখে ফেনা তুলে দেড়শ' তঙ্কায় খুসী থাকতে যাই ?"

"থাকিস নে। একটা লেদ মেসিন কিনে সমরোপকরণ গড়তে সুরু কর।" আমার কোমর জড়িয়ে ধরে হাসতে সুরু করল দীপায়ন।

"মন্দ হবেনা—লেদ-মেসিনের আড্ডা ধরমতলায়ই ত আমার আস্তানা।"

"ও" দীপায়নের যেন চমক ভাঙল : "আমরা তাহলে সেখানেই যাচ্ছি ?"

"আপত্তি থাকলে অন্য কোথাও চল কোনো রেস্তোরাঁয় —"

"না-না রেস্তোরাঁ-বার-এর অধ্যায় আমার শেষ হয়ে গেছে—পিকাসো যেমন নীল-লাল অধ্যায় শেষ করেছেন তেমনি। তোর আস্তানাই ভালো। একটি স্ত্রী জুটিয়ে নিতে পেরেছিস ত—আর তার সঙ্গে ছেলেমেয়ে ?"

''স্ত্রী-ভাগ্য আমার নেই। দেড়শ' টাকায় মেয়েরা ভর্সা পায়না।"

"তাহলে একদম একা ?"

"না, কুকার ষ্টোভ এসব আছে।"

"এ কৃচ্ছ্রসাধন কেন ?"

"পুঁজি বাড়াচ্ছি—ঝোপ বুঝে কোপ লাগাব।"

"পারবি।'' একটা ঠাণ্ডা হাসি ফুটে উঠল দীপায়নের মুখে।

সেদিন কলেজ ষ্ট্রীটের কথাবার্ত্তায় আমার মনে হয়েছিল দীপায়নের বান্ধবার ব্যাপারটা হয়ত সত্যি নয়—আর তাই আমিও সরাসরি একটা মিথ্যে তৈরী করে নিয়েছিলাম। কলেজের মাষ্টারি ছেড়ে যে আমি ব্যবসায়ী হবার ফিকিরে আছি আস্তানায় এসে এ-কথাটা কিন্তু আর দীপায়নের কাছে লুকোতে পারলাম না। লুকোলে হয়ত ক্ষতিই হত। মাষ্টারি ছেড়ে আমি পাব্লিশার হব আর দীপায়নের উপন্যাসটি নিয়েই আমার ব্যবসা সুরু করবার মতলব—এমন প্রস্তাবে ও কিছুতেই রাজি হতনা।

প্রস্তাবে পৌঁছুবার আগে ভনিতা সুরু করলাম : "কি বলিস পানু, বেকার থাকার চাইতে এমন-কিছু করা-ও ত ভালো যাতে অর্থক্ষতি হয়।''

চোখে তারিফ নিয়েই যেন আমার ঘরটাকে দেখছিল দীপায়ন। মুখে সিগারেট, তার ফিকে নেশায় মাঝে-মাঝে ঢুলেও আসছিল চোখ। বললে: "তা-ই কর। কিন্তু আমি ভাবছি তুই ব্যাচেলর থাকবার উপযুক্ত।"

"ঘরটা একটু গুছনো বলে? আমার সমস্ত দিনে আর কাজ কি বল!"

"গুছনো অভ্যাস আমারও ছিল কিন্তু এখন কেমন যেন অগোছাল হয়ে গেছি।"

"ওটা বাইরে, মনে নয়।"

"কেন?"

"অগোছাল মন নিয়ে কেউ উপন্যাস লিখতে পারে না।"—ওর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা আমার হাতেই ছিল—মাঝে-মাঝে পাতা উল্টিয়ে চোখ বুলোচ্ছিলাম।

"জীবনের নিবিড়তার সঙ্গে চেনা হয়ে গেলেই উপন্যাস লেখা যায়।—আমি এমন একটি জীবন দেখতে পেয়েছি, যা নিষ্কম্প দীপশিখা। একজন অখ্যাত মানুষ সে, বিখ্যাত কেউ নন। ওরা অনেক ছিল, এখনও কিছু-কিছু আছে—ওদের খুঁজে নিতে হয়।" ভরা আর ভারি শোনাল দীপায়নের গলা, চকচক করে উঠ্‌ল চোখ।

ওর মুখ থেকে চোখ নামিয়ে বললাম: "তোকে একটা অনুরোধ করব পানু বল্ না বলবিনে! তোর উপন্যাসটা আমি ছাপব।"

যেন থমকে গেল দীপায়ন, তারপর বললে: "যাঃ—"

মিছে কথা বলতে হল: "সত্যি বলছি তোকে। ক'দিন থেকেই আমি বই-এর ব্যবসার কথা ভাবছি। আজও কলেজ ষ্ট্রীটে ঘুরছিলাম খোঁজখবর নেবার জন্যেই।"

"আমার বই ছেপে ব্যবসা হবে ভাবছিস্?"

"নাহোক শ'পাঁচেক ক্ষতি হবে। কিন্তু ক্ষতিও বা হবে কেন, নতুন বই যখন বেরোচ্ছে না।"—

দীপায়নের কাছে শোনা-কথাটাই আমার নিজের খবর বলে জাহির করলাম।

চেয়ারের পিঠে মাথা এলিয়ে দিয়ে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে রইল দীপায়ন,

তারপর ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে বললে : "সবার কাছ থেকে শুধু পেলামই, দিতে পারলাম না কাউকে কিছু।"

চায়ের উদ্যোগে ষ্টোভে হাত দিয়ে বললাম : "মিছিমিছি কেউ কি কিছু পায় ?"

আজ একগাদা প্রুফ নিয়ে বসে আছি—তিনটেয় দীপায়নের আসবার কথা। ঠিক তিনটেয় ও আসবেনা জানতাম কিন্তু পাঁচটায়ও যে ওর পাত্তা মিলবেনা ভাবিনি। অভ্যাসটা ওর সত্যি অগোছাল হয়ে গেছে। কিন্তু মুখের দিকে তাকালে ত তা মনে হয়না, চোখ আনন্দে ঝলমল, ঠোঁটে একটা যেন শপথের দৃঢ়তা। চৌরঙ্গীর মোড়ের সেই দীপায়নের একবিন্দু চিহ্নও আর এ-মুখে খুঁজে পাওয়া যায়না। এ-শান্ত উজ্জ্বলতা কোত্থেকে পেলে ও- এ কি প্রৌঢ়ত্বেরই দান ?

উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি আমি পড়িনি, আমার হাতে আসার পরদিনই ওটা ছাপাখানায় গেছে। ছাপা বই-ই পড়ব ভেবেছিলাম। এখন, প্রতীক্ষার মুহূর্ত্তগুলোকে ভুলে থাকবার জন্যে প্রুফটা পড়তে সুরু করেছি। বত্রিশ গ্যালি প্রুফ নিঃসাড়ে পড়ে অবাক হয়ে ভাবছিলাম এ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য, এমন তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা দীপায়নের হাতে কি করে ফুটে উঠল! যে মিষ্টি মিষ্টি কবিতা লিখত, এমন জ্বালা সে কি করে ধরিয়ে দেয় মনে ? দীপায়ন সামনে থাকলে হয়ত ওকে জড়িয়ে ধরতাম—রক্ষা, ও এখনো এসে পৌঁছয়নি।

এলো ও ছটা বাজতে পাঁচ মিনিট থাকতে। শুকনো মুখে একটা জবরদস্তির হাসি—কেমন ভোলা ভোলা, কান পেতে যেন অন্য কারো কথা শুনেছ—এখানে মন নেই।

ধড়মড় করে উঠে ত আমি বললাম : "বেশ তুই !" কিন্তু সে-কথা কে শুনতে পেলো। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই একটা সিগারেট ধরাল, আমাকে সাধল একটা, তারপর স্থির হয়ে চেয়ারে বসল।

"বন্ধুদের ভালোবাসার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌লাম—জানিস অনি!" বোঁজা বোঁজা চোখে বললে দীপায়ন।

একটু হেঁট হয়ে যেতে হল, তবু জিজ্ঞেস করলাম : "বন্ধুদের না বান্ধবীর ?"

পরপর তিনটে সিগারেটের অনির্ব্বাণ আগুন মুখে নিয়ে ও যা বললে সংক্ষেপে তা এই :

বিখ্যাত লর্ড সিংহ রোড থেকে আমন্ত্রণ এসেছিল আজ ওর। শুধু পত্র পাঠিয়ে ত্রুটী মার্জ্জনা চাননি তাঁরা, লোকও পাঠিয়েছিলেন। ইদানীং উনি সাইক্লোষ্টাইলে যে সব জঙ্গী বুলেটিন ছেপে বিলি করছেন তাতে না কি তাঁরা রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। এমন একজন ফ্যাসিষ্ট কলকাতা সহরে নির্ব্বিবাদে বিচরণ করবে তা কি হয়? কাজেই আমন্ত্রণ। সানন্দে এই আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিল দীপায়ন।

কিন্তু গেলে কি হবে! ওর জবানবন্দী নিতে হাজির হ'ল সত্যেন। সেই সত্যেন—কলেজে একটানা চারবছর যে ছিল অন্তরঙ্গ সহপাঠী। সত্যেন এখানে চাকরি করছে, আর ঠিক এ-সময়েই উপস্থিত থাকবে, কে জানত!

"দীপায়ন চৌধুরী নাম শুনেই আমি ছুটে এসেছি।" বললে সত্যেন: "ব্যাপার কি? তুমি আবার কি করতে গেলে!"

"তেমন কিচ্ছু নয়—যুদ্ধটুদ্ধ কিছু নয়। ছেলেরা যখন ডেকে নিয়ে যায় ওদের 'ডু অর্ ডাই' কথাটা বুঝিয়ে দিই আর বলি হয়ত গান্ধীজির এই শেষ ডাক।" দীপায়ন বলছিল।

"থাক্ থাক্"—ব্যস্ত হয়ে উঠে গিয়েছিল সত্যেন: "একটু বোসো এখানে, আমি আসছি।"

আধঘণ্টা পরে সত্যেন ফিরে এসে বললে: "চলো তোমায় ট্রাম ধরিয়ে দিই।"

রাস্তায় এসে দীপায়ন জানতে চেয়েছিল অপরাধটা যথেষ্ট হলনা কেন? সত্যেন উত্তরে বলেছে: "আমার বন্ধু আমার কাছে অপরাধী হতে পারে? আমি কি বলতে পারি তাকে অপরাধী?"

সত্যেনের শেষ কথাটা বলতে গিয়ে কেমন যেন বুঁজে এলো দীপায়নের গলা। হাসি-হাসি মুখে চোখ বুঁজে রইল ও খানিকক্ষণ—কান পেতে রইল। যেন এখনও শুনতে পাচ্ছে ও সত্যেনকে—শুনতে ভালো লাগছে।

আমার বুক ঢিব-ঢিব করছিল—অপরাধটা আজকের দিনে সত্যি গুরুতর। এমন বেপরোয়া হয়ে কেন উঠছে দীপায়ন? বাসবকেই কি জবাব দিচ্ছে ও? না কি দেবুদার আঁকা পথ ওকে হাতছানি দিচ্ছে! বুঝতে পারছিলামনা। মানুষের মনোভঙ্গীর কোনো সহজ, সরল ব্যাখ্যা নেই—হয়ত মনের বহু-বিচিত্র ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার যোগবিয়োগে এক-একটি মনোভঙ্গী স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায়।

ষ্টোভের খা-খা আওয়াজেই হয়ত ঘরের পরিবেশে ফিরে এলো দীপায়ন, চোখ মেলে তাকাল।

সুযোগ পেয়ে বললাম: ''জেলে যেতেই হবে এমন কি কারো মাথার দিব্যি আছে?"

"আমার ভাগ্যে সমুদ্র-স্নান নেই—" হাসতে লাগল দীপায়ন: "দু'বারেই তীরে-তীরে ঘুরে এলাম!"

"তা-ই ত বলছি—সমুদ্র-স্নানের আরোগ্য কি চাই-ই?"

"ভাবি—কী দিলাম!" ঝিমিয়ে এলো ওর গলা।

ওর ঝিমুনিকে পাত্তা দিতে চাইলামনা: "আপাতত প্রুফটা দেখে দে—তাহলেই হবে।"

এতোক্ষণে যেন দীপায়নের মনে পড়ল কেন ও এখানে এসেছে। টেবিলের উপর খোলা কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে নিস্পৃহ গলায় বলল: ''ওগুলো নিয়ে যাব।"

"নিয়ে যেতে হবে কেন, ঘণ্টাখানেকের ত ব্যাপার!"

"ওখানে বেশ নিরিবিলি। নিরিবিলি আছে বলেই ত উপন্যাসটা লেখা হল!''

"তোর বান্ধবীকে আমার নমস্কার জানাস, পান্নু।"

"কেন?''

"উনি যে আবহাওয়া তৈরী করেছেন তাতেই তুই উপন্যাস লিখতে পারলি।"

"হয়ত তা-ই।" জানালায় চোখ নিয়ে গেল দীপায়ন: "কবিতা লিখতে যখন সুরু করি—এ-ধরনেরই একটা আবহাওয়া ছিল—তবে এমন শান্ত নয়।"

অনেকদিন পর তোতাতে মনে পড়ল ওর। আমি চুপচাপ চা তৈরী করতে লাগলাম।

"তুই বলতে পারবিনে অনি,'' রাস্তায় ট্র্যামের তারের উপর দীপায়নের চোখ: "কখন কার কাছ থেকে কি নিচ্ছিস। কিন্তু নিতে হয়, তুই জানিস আর না-ই জানিস, তোর মন শিকড়ের মতো টেনে নেবেই নিজেকে তৈরী করবার উপাদান। শুধু বাবা-মা-ই আমাদের তৈরী করেন না, আমাদের চেনা প্রত্যেকটি মানুষ দিনের পর দিন আমাদের তৈরী তুলছে।"

"মেয়েরা যতোটা তৈরী করতে পারে ততোটা আর কেউ নয়, কি বলিস ?"

"তা কেন ?"

আপত্তিটা জোরাল নয় বলে ভর্সা পেয়ে বললাম : "তা-ই ত দেখছি।"

হাসির আভায় ফর্সা হয়ে গেল দীপায়নের মুখ : "তোর চা হ'ল ?"

"হে।"

দু'কাপ চা আর এক প্লেট বিস্কুট টেবিলের উপর এনে রাখলাম। চায়ে চুমুক দিয়ে দীপায়ন ঝিলকিয়ে উঠল : "বাঃ, চার্মিং! এতো ভালো চা করতে কোথায় শিখলি, অনি ?"

"ভালো হয়েছে ?"

"এই চা-র জন্যেই তোর এখানে চলে আসব ভাবছি!"

"আসবি ? পাশের ঘরটা খালি হয়ে যাচ্ছে। সানাটোরিঅমের ব্যাপার চুকে গেলে আয় না!" আমি যেন হাতে চাঁদ পেলাম।

"আমি চলে এলে হয়ত সানাটোরিঅমের দরকার হবেনা। অনেকদিন থেকে ভাবছি—অন্য একটা অস্তানা পাওয়া যায় কি না।"

"কি হয়েছে ওঁর ?"

"হয়নি। মনে হয় হবে। বন্ধুর সঙ্গে এক ঘরে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়—বান্ধবীর সঙ্গে একমাসও এক ঘরে থাকা যায়না। মেয়েরা বন্ধু হতে পারে। কিন্তু একসঙ্গে থেকে নয়।"

"হুঁ।"

"আমি চলেই আসব, তোর পাশের ঘরটা পাওয়া যাবে ত ঠিক ?"

"যাবে।" আর কিছু যেন বলতে না হয় তার জন্যে ঘন-ঘন চায়ে চুমুক দিতে লাগলাম—মাথায় তখন আমার অন্য কথা ঘোরাফেরা করছিল! ভাবছিলাম দীপায়নের বান্ধবী-ব্যাপারটা গিছে কথা। ও যা বলছে—সব বানিয়ে বানিয়ে। হয়ত কোনো বোর্ডিং-এ আছে ও—নিঃসঙ্গ, একা।—কোনো মেয়ের সঙ্গে যদি ও থাকবেই, তাহলে কিছুতেই তাকে ও ছেড়ে আসতে পারে না। এই ওর মনের নিয়ম – নিয়তি।

চা শেষ করে একটা সিগারেট মুখে নিয়ে দীপায়ন বললে : "তাহলে কবে আসব, বল!"

"কাল-পশু' যেদিন খুসী।"

"বেশ।" প্রুফের কাগজগুলো মুড়ে নিয়ে দীপায়ন উঠে দাঁড়াল।

আমিও দাঁড়ালাম, বললাম: "তুই আসবিনে, আমি জানি।"

"কি বলিস?"

"একটি মেয়েকে ফেলে তুই চলে আসবি, আমি বিশ্বাস করিনে।"

"ওর ভালোর জন্যেই আসতে হবে, হয়ত আমার ভালোর জন্যেও!" দীপায়ন আর দাঁড়ালনা।

১৯৪৩ ইং॥

"নবো নবো ভবসি জায়মানঃ"—অথর্ব্ববেদ।

আবার বাসা-বদল। বাস-বদলও এবার।

চাই আমি নব-কলেবর। হয়তো পাবো। আমার মন বলে উঠছে পাবো। আমি অনুভব করছি নিজেকে—আরেক দীপায়নকে। এ যেন অনেক দূরে ফেলে দিয়ে এসেছে এর স্থূল, জীর্ণ বাস! অনেক স্থূলতার শেষে একটি অমূর্ত্ত শুভ্রতাকে পেয়েছি—পেয়েছি আমার সত্তাকে।

এ-অস্তিত্বের স্পর্শ তুমিই আমাকে দিয়েছিলে কিন্তু নিজে তুমি আজ ভুলে যাচ্ছ তার পবিত্রতা। তোমার দেহের অভিশাপ—প্রকৃতির অভিশাপ! তোমার উজ্জ্বল মনকে কুয়াশায় আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে দেহের এই ষড়যন্ত্র। তুমি যুদ্ধ করছ—জানি আমি। এ-যুদ্ধে হয়ত একদিন মুমূর্ষু হয়ে যাবে তোমার হৃদপিণ্ড, নয়ত তুমি পাগল হয়ে যাবে। তুমিও তা জানো; তাই বিদায়।

জানিনে তোমার দুর্ব্বলতাটুকু জয় করে তোমার মতো আর কোনো মেয়ে জন্ম নেবে কি না—আমি কিন্তু তার আশায় থাকব।

[আমি জানতাম না সেদিনকার দীপায়নের বান্ধবীর কাহিনী আর জার্ণাল্‌স-এর এ-কথাগুলো যে সবিতারই ইতিহাস।]

ছাব্বিশ

শত প্রার্থনাই করুক দীপায়ন আর যতোই মনের চর্চা করুক আমি জানি ওসব কিছুই ওর বৈরাগ্যের ভূমিকা নয়। একদিন ও নীচে নেমে যেতে চেয়েছিল কিন্তু তা পারেনি। ও পুরোপুরি মানুষ—কোনো দিক ভারি করে তুলতে পারেনা—ও সত্যি ভারতীয়। কাছে থেকে দীপায়নকে আজ আমি দেখছি—দেখছি, জীবন যেমি মৃত্যুর সাধনা তেম্নি আবার অমৃতেরও কামনা। বুঝতে পারতাম মৃত্যুর সঙ্গে এখন অমৃত মেশাতে সুরু করেছে দীপায়ন।

পাশাপাশি ঘরে আছি কিন্তু খুব কম কথা হত আমাদের। দিনে দু'এক ঘণ্টার বেশি নয়। ঘরে থাকলেই জার্ণাল্‌স্‌-এ ঝুঁকে পড়ছে ও, দেখতে পেতাম। বলত: "মনের বোঝা নামিয়ে দিচ্ছি জার্ণালস্‌ লিখে। বাইরে আনতে পারিনি যাদের, ভেতরে রেখে মন কালো করে তুলেছি—একে একে তাদের বিদায় করছি। তাছাড়া অতীতের একটা খসড়া ছবিও এঁকে দেখতে চাই—কি ছিলাম।"

"ভালো। কিন্তু আরেকটা উপন্যাসে হাত দিচ্ছিস কবে?" ওর উপন্যাসটা ভালো কাটিছে বলে আমি ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছিলাম।

"মনটা সাফ করে নিই ত আগে।"

"তাহলে যে ওখানে ব্রহ্মের ছায়া পড়বে!"

"ভর্সা দিচ্ছি সে ভয় নেই।"

"না-হয় গল্পগুলো গুছিয়ে নে—আর যদি দরকার হয় দু'একটা গল্প লিখে দে—একটা বই করে ফেলি।"

"গল্প?" দপ করে জ্বলে উঠল দীপায়ন: "আরো লিখব গল্প? বাংলা গল্পের জাত গেছে। আমাদের সাহিত্যিকরা মিলে 'ন্যাশন্যাল ওআর ফ্রণ্টের' গল্প লিখছেন—ফ্যাসিষ্ট তাড়াবার গল্প! ইংরেজের যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ হল আজ! অনি, সাহিত্যিকদের জাত নেই—এই দুঃখ।"

"চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাবি না কি?"

"আমি চাইনে গল্প-লেখক হিসেবে কেউ আমার নাম ওদের সঙ্গে উচ্চারণ করুক।"

"তাহলে আমার ব্যবসা মাটি করবার মতলব তোর?"

"আমার কি মতলবের ঠিক আছে—উনপঞ্চাশ বায়ুর দোলায় দুলছে আমার মতলব।"—

জুড়িয়ে আসছিল ওর মেজাজ। আর তখনকার মতো আমার সঙ্গে কথাও যেন ফুরিয়ে এসেছিল। একমাথা উস্কোখুস্কো চুলে তখন দু'তিনবার থাবা চালিয়ে নিয়ে জার্ণালস্-এর খোলা পৃষ্ঠায় চোখ নিয়ে গেল দীপায়ন।

তবে যেদিন নীলাঞ্জন আসত—বাসবের দল ভেঙে সম্প্রতি পানুমামাকে গুরু ধরেছিল যে ছেলেটি—সেদিন হয়ত ঘণ্টা দু'ঘণ্টা আলাপ চলত আমার ঘরে। পুরোনো গুরুতে যে নীলাঞ্জনের খুব বেশি অভক্তি এসেছিল তা নয়, তাই ও বলত: "জানেন, অনিমামা, কী মুস্কিল আমাদের? বাসবদার কথা শুনলে মনে হয় ঠিকই তিনি বলছেন—আর পানুমামা যখন বিপরীত বলতে সুরু করেন তখন ভাবি এর একবর্ণও মিথ্যে নয়! কি আমরা করব, বলুন ত!"

"দেশের ছেলে হতে চেষ্টা করবে—" আমার সালিসীতে বিশ্বাস ছিলনা দীপায়নের: "ভেবে দেখবে, মার্ক্স যতোগুলো সত্যকথা বলেছেন গান্ধীজি তার চাইতে কম সত্যকথা বলেন নি।"

"এ দু'জনকে কি মেশানো যায়?" নীলাঞ্জন অনুগত ছাত্রের জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকাত।

"মানুষের বাস্তব জীবনের কথা শুনবে মার্ক্স থেকে—মানুষের মনের কথা, হৃদয়ের কথা শুনবে গান্ধীজির কাছ থেকে। দু'টো দিক নিয়েই ত মানুষ—একদিকে ঝুঁকে গেলে মানুষ শয়তান না-হয় দেবতা হয়ে যায়।"

এ-ধরনের তত্ত্বের জগৎ থেকে ওদের মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে আনবার জন্যে আমি একদিন বললাম: "কলকাতার রাস্তার কিছু দেখতে পাচ্ছ, নীলু?"

আমার কথাটা দু'জনের কানেই হেঁয়ালির মতো শোনাল।

"রাস্তায়?" প্রতিধ্বনির মতো বললে নীলাঞ্জন।

দীপায়ন কান পেতে আছে আমার দ্বিতীয় কথা শুনবার জন্যে।

"কারা আসছে দলে-দলে? ফুটপাথে মরছে কা'রা?"

"কার কথা বলছিস অনি?" দীপায়ন চমকে উঠল।

নীলাঞ্জনকেই বললাম আমি : "একমুঠো চাল নেই গাঁয়ে—গাঁ-ভেঙে চাষীরা আজ তোমাদের কাছে এসে হাত পাতছে !"

"দুর্ভিক্ষ হবে আপনি ভাবছেন, অনিমামা ?"

নীলাঞ্জনের কথার পেছনে, বাসবকেই যেন শুনতে পেলাম আর তাই মুখে রাশ টানতে পারলামনা : "তোমাদের পরম সুহৃদ ইংরেজ-রাজ এক কণা ক্ষুদও রাখেনি কারো ঘরে পাছে তা জাপানীদের হাতে পড়ে। তবু ভাবতে হবে, দুর্ভিক্ষ হবে কি না ?"

"আমি ত রাস্তায় কিছু লক্ষ্য করিনি !" অপরাধীর মতো বললে দীপায়ন।

"দেখিস লক্ষ্য করে কিন্তু দুদিনবাদে তা-ও আর করতে হবে না—চোখ বুঁজে থাকলেও কঙ্কালের সার দেখতে পাবি।" একটা বিশ্রী উত্তেজনায় ভেসে চলেছিলাম আমি।

"বাসবদাও অবশ্য বলেন, দুর্ভিক্ষ আসছে !" যেন মনে-মনেই বলতে চাইল নীলাঞ্জন।

"বলেন !" লকলক করতে লাগল আমার জিভ : "এ-নিয়ে গল্প করেন, বৈঠক জমান, না ? আর হয়ত সাহিত্যিকদের পিঠ চাপড়ে বলেন, দুর্ভিক্ষ তাড়াও গল্প লিখে।"

"বাসবদা যা-ই করুন আমরা কি করব তা-ই বলুন।" নীলাঞ্জন হাসতে লাগল।

সত্যি, আমরাও বা কি করতে পারি ? কথা বলা ছাড়া আর কিছু কি করবার শক্তি আছে আমাদের ? নীলাঞ্জনেব হাসিতে আমার যেন খানিকটা সুস্থতা ফিরে এলো।

কিন্তু দীপায়ন ছটফট করে উঠল, রাস্তার উপর ঝুঁকে পড়া আমাদের সরু বারান্দাটায় গিয়ে দাঁড়াল। হয়ত কঙ্কাল আগন্তুকদেরই খুজতে গেল রাস্তায় আর ফুটপাথে।

মাথা নীচু করে নীলাঞ্জন বলছে : "দুর্ভিক্ষ এলে আমরা কি করব জানেন, অনিমামা ? বসে বসে দেখব। সহানুভূতি দেখাতে সভায় বা কাগজে-পত্রে কান্নাকাটিও করতে পারি কিন্তু রুখে দাঁড়াব না।..."

দীপায়ন ফিরে এলো—তখনও নীলাঞ্জন কথার বুদবুদ তুলছে—কিন্তু তাব এক কণাও আমার কানে এসে পৌছলনা। দীপায়নকেই দেখছিলাম আমি—

চোখের সাদাটা অস্বাভাবিক নীল, মুখের রঙ হলদেটে—যেন এইমাত্র একটা কঠিন রোগ থেকে উঠে এলো ও। মনে হলনা এ-মুখ কোনোদিন হাসতে জানে। নিস্পৃহ চোখে আমাদের দিকে এক নজর তাকাল দীপায়ন—তারপর চুপচাপ নিজের ঘরে চলে গেল।

তেতাল্লিশের অক্টোবর। লক্ষ লক্ষ মানুষ-বলিতে দুর্গোৎসব সেবার। দেখছিলাম নীলাঞ্জনের কথা অক্ষরে-অক্ষরে মিলে গেছে। পুজোসংখ্যা কাগজগুলো সাহিত্যিকদের কান্নায় ভরতি।

কয়েক রাত্রি দীপায়ন ঘুমোয়নি। জেগে পাথরের মতো বসে থাকে। বলি : "শরীর নষ্ট করে কি লাভ, বলতো পানু!"

"ঘুমোতে পারিনে, অনি। ও-কান্নায় ঘুমনো যায়না!" অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকে দীপায়ন।

"তা জানি।" ঘুমুই বলে মাথা হেঁট হয়ে যায় আমার।

"সারা বাংলাদেশের কান্না—কোনোদিন ত শুনিনি—তাই শুনি। শুনি, যদি কোনো শপথ জন্ম নেয় মনে।"

"তারজন্যে কি রাত জেগে থাকতে হয়?"

"হাঁ—চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিতে হয়—তারপর সে-জ্বালা চোখের জলে ধুয়ে দিতে হয়।" দীপায়নের ক্লান্ত গলায় একটা বিষণ্ণ রাগিণীর আভাস : "কথার কান্না শিখে আমরা চোখের কান্না ভুলে গেছি, অনি!"

চুপচাপ বসে থাকি। হাতের মুঠোয় আমার একশো টাকার একটা নোট—দীপায়নের উপন্যাসের রয়েলটি। ওর হাতে তুলে দেবার উৎসাহ নেই। এ-তুচ্ছতায় কি ভরে উঠবে ওর মন?

"তোরা যা-ই বলিস, অনি" গাঢ় হয়ে ওঠে দীপায়নের গলা, কথাগুলো স্পষ্ট : "আমার মনে হয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর মন্বন্তর চলেই আসছে বাংলাদেশে। চোখের আড়ালে তা রয়ে গেছে বলে আমরা নিশ্চিন্ত মনে আজও গেয়ে চলেছি : সুজলা সুফলা বাংলা দেশ। ধান নিয়ে যায় বলে আমরা যতোটা উপোসী, ধান হয়না বলেও ঠিক ততোটাই উপোসী। বাংলার দেহের দিকে

তাকাইনে আমরা কতো জমি যে খোয়াই হয়ে গেলো, জলা, পতিত হয়ে রইল যে কতো হাজার হাজার বিঘে, কেউ তার খবর রাখিনে। আমরা মন্ত্রী হয়েছি, রাজকোষ পেয়েছি কিন্তু খুইয়ে ফেলেছি হৃদয়-মন। দেশকে আমরা চিনতে পারিনি, বুঝতে পারিনি! আর হয়ত তা চাইওনে।"

"রাস্তায় ঘাটে আর ক্যান্টিনে তবু শীর্ণ কঙ্কালের প্রাণের দিকে আজ তাকাচ্ছি—" এমন একটা কথা বলে চুপচাপ বসে রইলাম আমি। দীপায়ন যেন ক্ষেপে উঠল। বল্‌লে: "হেঁ তাকাচ্ছি, ছাব্বিশ লাখ টাকার বদলে দিল্লীশ্বর শাহ-আলম, নিজামউদ্দৌল্লা, দেবীসিংহ আর নয়া-দেওয়ান ইংরেজ যেম্নি তাকিয়েছিল বাঙালী গরু-মোষের দিকে, তেম্নি তাকাচ্ছি!"

আমি দীপায়নের রাঙা মুখে যেন ওর ছেলেবেলাকার রাঙা রোদ দেখতে পেলাম। তাই বল্‌লাম: "জানিস পানু—ইয়াঙ্কী সৈন্যরা কিন্তু খানিকটা সিমপ্যাথেটিক!"

"হুঁ। স্যর জন শোর যেম্নি ছিলেন! দেশে ফিরে গিয়ে কবিতা লিখবেন—যেম্নি পুজো সংখ্যা কাগজগুলো আমরা এই নরবলি দেখে দেখে চোখের জলে ভিজিয়ে দিচ্ছি!" দীপায়নের মনে কী যেন একটা আলোর ইশারা বিদ্যুতের মতো জ্বলে-জ্বলে আবার মেঘের ওপিঠে মিলিয়ে যাচ্ছিল। ওর এ-ধরনের মুহূর্ত্তগুলো ভয়ানক. যখন তারা বাংলাদেশের সমস্ত অতীত কাঁধে শববহন সুরু করে। আমার মতো প্রগলভ ব্যক্তি-ও ওর এই তন্ত্রাসনকে নীরবে মেনে নেয় তখন। অপেক্ষা করতে সুরু করে কখন ধারাবর্ষণ সুরু হবে—বাংলার পরিচিত বর্ষা কখন দেখা যাবে, যা গম্ভীর হলেও গায়ে মাখতে ইচ্ছে যায়।

অপেক্ষার ফল ফলে। দীপায়ন প্রসন্ন হয়ে ওঠে। এখন বললে: "বঙ্কিমচন্দ্র কী ভাগ্যবান ছিলেন, অনি!"

কথাটা তদ-নগদ লুফে নেবার মতো নয়। ভেবে দেখতে হ'ল কি ভাবে পুজোসংখ্যার অশ্রুময় কাব্যের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র এসে দাঁড়াতে পারেন তাঁর সন্ন্যাসীদল নিয়ে। কিন্তু অমূলক ভাবনা। তা থেকেও দীপায়নই আমায় মুক্তি দিলে।

"ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে সিং-জিদের কলঙ্কের ইজারা থেকে বঙ্কিম একটা

ভবানী পাঠক খুঁজে পেয়েছিলেন, হয়ত দেবীরানী তাঁর আশেপাশে সেদিন ছিলেন। ভাগ্যবান নন, বঙ্কিমচন্দ্র ?"

আমি আশ্বস্ত হয়ে পরিহাস খুঁজে বললাম: "তোর একটা দেবীরাণী দরকার জানি—কিন্তু কেন, তা ভাবতে পারছিনে।"

পরিহাসে যোগ দিলে দীপায়ন :

"ন' দাদুর যেম্নি কপাল, আমারও তেম্নি। আমার বঙ্কিমচন্দ্র হবারই সখ ছিল- যদি তেম্নি কেউ দেবীরানী বেঁচে থাকত।"

আমি অবাক হলাম পানুর এই তরল, স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন গলায়। তোতাকে সে আজ এতো সহজে স্মরণ করতে পারে! একটু ভারি হয়ে ওঠেনা তার গলা!

সত্যি—মনে হল। সত্যি, এ মন্বন্তর আমাদের মন থেকে অন্তরালের সম্পদ মুছে-মুছে দিয়ে যাচ্ছে! দীপায়নই যদি তোতাকে এনে কথার ঢেউ-এ ভাসিয়ে দিতে পারল, তাহলে কবি বেচারীরা কি করবে! যারা পথে-ঘাটে মরছিল তাদের কেউ ত কোনো কবির তোতার মতো ছিলনা।

দুপুরে কোথায় বেরিয়েছিল দীপায়ন—বিকেলবেলা খোশ-মেজাজে ফিরে এলো। সঙ্গে সুপর্ণা। হয়ত সুপর্ণাদের বাড়িতেই কাটিয়ে এলো কয়েক ঘণ্টা। ভালো। লক্ষ্য করেছি, সুপর্ণা ওর মনের অসুধ। সুপর্ণাকে জিজ্ঞেস করলাম: "কোথায় গিয়েছিলে—সিনেমায় ?"

"তা-ই। দেখলাম সিনেমার ছবির কাণ্ডই করে এলেন মিতা—"সুপর্ণার চোখে হাসি চিকিয়ে উঠল: "এতোক্ষণ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে একশো টাকার শেষ পয়সাটি অবধি ওদের বিলি করে এলেন। আপনিই ত নাকি ওকে টাকা-টা দিয়েছেন!"

বললাম: "বেশ করেছে। রাত্তিরে ঘুম হবে ওর এখন। ক'রাত্তির—"

[অনিরুদ্ধ ঘোষালের মন্তব্য]

ক্ষমা করবেন; এখানেই অধ্যায়টি শেষ করতে হ'ল--মানে অসমাপ্ত রাখতে হল। দীপায়ন আবার এসে হাজির। কোনো ভূমিকা নেই, আমার খাবা

থেকে পাণ্ডুলিপি তুলে নিয়ে চুপচাপ বসে গেল পড়তে। নিবিষ্ট হয়ে পঁচিশ, ছাব্বিশ অধ্যায়ের লেখাগুলো পড়তে লাগল। তারপর উল্টে-পাল্টে এখানে-সেখানে চোখ বুলিয়ে চলল। কলম ক্যাপবন্দী করে হাতের আঙুল মটকাতে লাগলাম আমি। জানতাম এখন আর লেখা হবেনা কিন্তু এ-কথা ভাবিনি, এখানেই যে আমার লেখা শেষ।

পড়া শেস করে খাতাটা কোলের উপর রাখল দীপায়ন। মন্তব্যের অপেক্ষায় ওর মুখে তাকিয়ে হাসতে সুরু করলাম আমি। কিন্তু ওর চোখ দেখে মনে হলনা কোনো মন্তব্যের জন্যে ও তৈরী। মনে হল দূর অতীত ওর চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

অতীতের উপর চোখ রেখেই বলল দীপায়ন: "আমার কথা আমিও হয়ত এর চাইতে ভালো বলতে পারতাম না—হয়ত ঠিক এম্নি বলতাম। নিজের বাইরে গিয়ে নিজের দিকে ঠিক তোর চোখ নিয়েই তাকাতাম। তুই আমার লেখক-সত্তা, অনি!"

"তোর উপন্যাসের প্রথম প্রকাশকই ত শুধু ছিলামনা আমি মুগ্ধ পাঠকও ছিলাম। হয়ত তোর লেখার ধরনটা আমার রক্তে চলে এসেছে।"

"কিন্তু সুপর্ণার কথা কি তুই লিখতে পারবি? তোর বাবা মারা গেলেন—তুই ঢাকা চলে গেলি। তুই ত সব কথা জানিস নে। জার্ণাল্‌স্‌ এ যা আছে, তা ত আমার মনের লুকনো কথা। সুপর্ণার সঙ্গে আমার একটা বাইরের জীবন আছে—সে জীবনকে শুধু আমিই দেখেছি, অনুভব করেছি। সবিতার কথা তোকে আমি বলেছি কিন্তু সুপর্ণার কথা মুখে-মুখে শোনান যায়না। এ অভিজ্ঞতাকে ভালো-মন্দের মোটা রেখায় আঁকা অসম্ভব।"

"তাহলে—?" আমার গলা শুকিয়ে এলো।

"আমিই লিখে দিচ্ছি—নইলে ত কাহিনী শেষ হবেনা।"

খুসীতে ফেটে পড়লাম: "ছাখ, আবার তোকে লেখক বানিয়ে তুললাম আমি।"

"লেখক!" ঠোঁটের ভাঁজে হাসির কয়েকটা রেখা ফুটিয়ে তুলল দীপায়ন—সেই ব্যথিত, বিষণ্ণ হাসি যাতে ওকে দীপায়ন বলে চেনা যায়: "ও আমার একটা অতীত। আজ যা লিখব তা তোরই লেখা ভেবে নিস—আমার লেখা নয়। আমি যা লিখেছি একসময়, তার ছকে জীবনকে তৈরী করে নিয়ে

গেছি। লেখা ছিল আমার নিয়তির মতো। আমার উপন্যাসে সুপর্ণার আভাস আগেই ছিল—জীবনে এলো ও অনেক পরে। যা আমি চেয়েছি—এক মুহূর্তের জন্যেও মনে যে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে—তা-ই পূর্ণ হয়েছে। কি আর পেলাম—এ-খেদ আমার নেই।"

কিন্তু আমি না-লেখার শোকে আর লেখার ঝোঁকেই ছিলাম, তাই বললাম: "আমি না-হয় ভেবে নিলাম শেষের অধ্যায়গুলো আমিই লিখেছি কিন্তু তোর পাঠকরা?"

"আমার পাঠকরা ত বইটাই আমার লেখা বলে ভুল করবে!"

"আমি যখন লেখক নই, এ-ভুলে আমার লোকসান নেই।"

"ভালো।"

দীপায়নের সঙ্গে আমার এই সংলাপের খবর এখানে না বসিয়ে সুপর্ণার সঙ্গে আমার সেদিনকার কথাবার্তাগুলো দিয়ে আমি অনায়াসেই এ-অধ্যায় শেষ করতে পারতাম। কিন্তু করলাম না। আমার সততাটা লক্ষ্য করবেন। লক্ষ্য করলে আগেও তা দেখতে পেয়েছেন। সাহিত্যে সততার খুবই অভাব। তাই আমি তার একটা উদাহরণ রেখে যেতে চাই। আমার মনে পড়ল, 'হিমালয়' বইটির রচনা নিয়ে জলরবাবুতে আর দীনেনবাবুতে কী বিশ্রী কথা-কাটাকাটি হয়েছিল! অবশ্য দীপায়নের সঙ্গে আমার তেমন-কিছু হবার সম্ভাবনা নেই, তবু আমি সততার খাতিরেই এই মন্তব্যটি উপন্যাসের কলেবরে গেঁথে দিলাম।

আপনাদের মনে হতে পারে অক্ষমতাকেই আমি সততার বুলি কপচে ঢেকে দিতে চাই। কিন্তু পঁচিশটি অধ্যায় পড়েও কি আপনারা সত্যি আমায় অক্ষম ভাবেন? আমার ত মনে হয় আমি একটি উপন্যাস রচনা করে ফেলেছি, রীতিমতো আধুনিক উপন্যাস। অধুনা যা লেখা হচ্ছে তাকেই যে আধুনিক উপন্যাস বলে তা ত নয়। আধুনিক উপন্যাস ফাঁদ পেতে একটা মানুষের জীবনকে ধরতে চায়—সে-মানুষ রাম-শ্যাম-যদু-মধুই হোক আর দীপায়ন চৌধুরীই হোক। আমার কথা বিশ্বাস না করলে য়ুরোপ ঘুরে এসে যাঁরা গল্প শোনাচ্ছেন, তাঁদের জিজ্ঞেস করবেন।

আমার বিনয়ের অভাবে আপনাদের তাক লেগে যাচ্ছে, কেমন ত? একটু তাক লাগুক। এমন কিছু ঘটনা ত ফাঁদতে পারিনি যাতে আপনাদের তাক

লাগানো যায় সিনেমার-গল্পে হাত পাকাইনি, তার মানে যুক্তি-বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিইনি—কাজেই দুর্বিনীত হয়েই আপনাদের চমৎকৃত করছি। অনেকটা বার্ণার্ড শ'র মতো। এখন অবশ্য অনেকেই নিজের ঢোল নিজে পিটোচ্ছেন কিন্তু শ'ই সম্ভবত রেওয়াজটা পত্তন করেন।

তবে গোড়ায় আপনাদের অবগতির জন্যে যে জানিয়েছিলাম, দীপায়ন চৌধুরীর সবটুকু সত্তা আমি ফুটিয়ে তুলব—দীপায়নের এই হস্তক্ষেপে তা একটু খাটো হয়ে গেল। এখন আপনারা বিচার করে দেখুন ও নিজে নিজেকে কতোটুকু ফোটায়। ওর জীবনে লজিক নেই, আছে ডায়লেকটিক্‌স্—ও জীবনকে নিষ্কম্প দীপশিখার মতো দেখে। যতোই বাহবা দিক, নিজে ও একটি ভাঙা-গড়ার আস্ত মেসিন। আজকের দিনের জীবনের তা-ই ধর্ম্ম। তবে এ-ভাঙা-গড়ায় খানিকটা পলি পড়েছে ওর মনে—ও ভালোবাসতে জানে—ভালোবাসার দ্বীপে ওর ভাঙাগড়া নেই।

যাক্ আর বাড়াবনা। কথা লিখে-লিখে এমনই অভ্যাস হয়েছে যে কিছুতেই আর থামতে ইচ্ছে করে না- এবার থামছি। এর পর দীপায়নকে পড়ুন। দেখুন প্রদীপের পথ সম্পূর্ণ হয়ে উঠল কি না।

সাতাশ

সুপর্ণা হাসল। আমার মনে হ'ল, ওর চোখের সাতাশ তারায়, সুডৌল ঠোঁটে, গালের টোলে বুঝিবা হাসি প্রথম জন্ম নিচ্ছে। আমি নবজাতক হাসিকে দেখলাম। বল্‌লে: "দেখলেন, প্রথম দেখাতেই বাবা কি রকম কান-ঝালাপালা করে তুললেন আপনার!"

"কই, না ত!"

"না? পুরো আধঘণ্টা বক্‌বক্‌ করলেন। আমি ঘড়ি দেখছিলাম।"

"ভারি সুন্দর কথা বলেন উনি। তোমাদের কতো খবর শুনলাম।"

"শুনলেন ত আমি আর দাদা যে শান্তিনিকেতনে যেতে চাইনে—কলকাতার কলেজে পড়তে চাই।"

"শুনলাম।" কিন্তু আমি শুনছিলাম বীণাদিকে: 'এখানকার কলেজ ত আর মেয়েরা পড়তে পারবে না—কলকাতা যেতে হয়।' মৃত দিনরাত্রির অনেক আলো-অন্ধকার পেরিয়ে একটি কণ্ঠ এসে পৌঁছুল আমার কানে। অস্পষ্ট। কিন্তু স্পষ্ট হয়ে উঠল তা আরেকটি কথায়: "কলকাতার কলেজে পড়তে চাই।"

সুপর্ণা ওর বেণীটা বুকের উপর টেনে নিয়ে ডগার চুলগুলো খুঁটতে লাগল: "আমাদের উপর আপনার খুব খারাপ ধারণা হ'ল, না?"

"কেন?"

"বাবার কথা শুনছিনে বলে।"

"উনি ত বললেন তোমাদের যা ইচ্ছে তা হওয়াই ভালো।"

"জানেন, বাবা ঠিক ওম্নি। প্রথমটায় বেঁকে যাবেন—তারপর বলবেন তোমাদের যা ইচ্ছে করো।" অবোধ-গলায় বললে সুপর্ণা।

"সায়ান্সে ভর্তি হয়েছ, না?"

"ভালো করিনি?"

"ভালো।"

ওর দিকে তাকিয়েছিলাম। আশ্চর্য্য জীবন্ততা গোল হয়ে উঠেছে ওর শরীরে—গালে, গলায়, বুকে, বাহুতে, আঙুলে। আমি অনুভব করছিলাম, আমার শরীর থেকেও যেন বয়েসের ধুলো ঝরঝর করে পড়ে যাচ্ছে। আমি আবার সেই পান্নু। অনেক বছর পর আবার বীণাদির সঙ্গে পান্নুর দেখা। একটি নূতন মেয়ে সে এখন। নূতন, তবু বীণাদি। দীপায়ন যৌবনোত্তর—তবু সে পান্নু।

"আচ্ছা পান্নুমামা, আমি আপনাকে 'তুমি বলতে পারিনে? বাবাকেও ত 'তুমি' বলি আমি।" সুপর্ণার চোখে অপরাধ হাসির মতো ঝিলমিল করছে।

"বোলো।"

"আর—। না, থাক্।"

"থাকবে কেন? বলো।"

"ভাবছি, তুমি আমাকে পান্নু ডাকবে ত!"

"তা-ই চাও?"

"হাঁ।"

"তাহলে দু'জনেই আমরা পান্নু?'

"তা কেন? আমি যদি তোমাকে মিতা বলি!"

"সুন্দর। কিন্তু শুনে নালু কি বল্‌বে, আর বাবা?"

"বলবে আমার বুদ্ধি আছে।"

"তোমার বুদ্ধি নেই, কেউ বলে নাকি!"

"উঃ, বলেনা আবার! সায়ান্স নিয়েছি বলে' লীলামাসী ত হেসেই খুন!"

'সায়ান্সের পর তুমি মেডিসিন পড়ছ ত?"

"বাঃ, তুমি কি করে আমার প্ল্যান জানলে?" বীণাদি তাকাল পান্নুর মুখে!

"ওটা তোমারও প্ল্যান? কিন্তু আমার ইচ্ছাই আমি বলেছি।"

"না তুমি শুনেছ দাদার কাছে।"

"কারো কাছে শুনিনি, আমি নিজে থেকেই বলছি।" পান্নু মুছে গেল, হঠাৎ দীপায়ন ফিরে এলো: 'হাসপাতালে গেছ তুমি কোনোদিন, পান্নু? আমি গেছি, আমার এক বন্ধুর অপারেশনে দু'দিন দু'রাত্রি ছিলাম সেখানে। সে যেন একটা আলাদা জায়গা—কলকাতা নয়। ব্যথার কান্না আর মৃত্যুই

সেখানকার জীবন। মানুষের যে কতো ব্যথা, কতো দুঃখ আমি দেখে এসেছি সেখানে।..."

মনে-প্রাণে শুনছিল সুপর্ণা। পানু যেমি শুনত বীণাদির কথা। ওর উজ্জ্বল চোখে, পাণ্ডুর ঠোঁটে সেদিন হয়ত দীপায়ন দেখতে পেয়েছিল তার নিজেরই আশা-নিরাশার, হাসি-কান্নার একটি নবীন ছবিকে। যেন নিজেকেই দেখছিল সে, নিজের বাইরে এসে তাকাতে পারছিল নিজের মেয়েলি উজ্জ্বলতার দিকে। আর বুঝি মনে-মনে বলতেও চেয়েছিল: আমাকে পেলাম!

আরেকদিন।

অনি ঘরে ছিল না। কয়েকটা কাগজে আমার উপন্যাসের রিভিয়ু বেরিয়েছে—তাই দেখছিলাম। ছোট দু'একটা মাসিকপত্র প্রশংসায় পঞ্চমুখ। হয়ত কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন! কাগজগুলোতে গল্প দিয়েছি, পারিশ্রমিক নিইনি, তাই। একটা বাজে দৈনিকের এক কোলাম-ব্যাপী গালাগালে বেশ তৃপ্তি পাচ্ছি। গালাগাল বইটাকে নয়, আমাকে। মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে কেন আমি ঘাঁটাঘাঁটি করছি - চাষী জীবনের উপর আমার মোটেই দরদ নেই! সাংঘাতিক অপরাধ! বোঝা গেল আজকের দিনে সাহিত্যিক হতে হলে কথার বোমা ছুঁড়তে হবে জাপানের দিকে—বলতে হবে ওখানকার মেয়েরা সব অসতী, গীসা গার্ল, নয়ত দেখাতে হবে চাষীরা দেবতার বাচ্চা, মজুররা এক একটি মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্! যাক্, তৃপ্তি পাচ্ছি এই ভেবে যে ওরকম এককোলাম মূর্খামি প্রকাশ করে যদি একটা কাগজের সাহিত্য-সচিব হওয়া যায় তাহলে হয়ত সাহিত্য তৈরী করা মোটেই অসাধারণ কাজ নয়।

হাসতে ইচ্ছা করছিল আর হয়ত হাসতেও সুরু করেছিলাম—সুপর্ণাকে সামনে দেখতে পেলাম। নীলুকে আশা করছিলাম পেছনে। কিন্তু নালু নেই। ও একাই এসেছে। হৃদপিণ্ড কাজ করছে না, মনে হল। কয়েক সেকেণ্ড। একটা আবছা অভিসন্ধিতে জমে যাচ্ছে বুঝি বুকের রক্ত।

কাঁদকাঁদ আর তাই কী সুন্দরই না দেখাচ্ছিল ওকে!

"খানিকটা দুধ পাওয়া যাবে, মিতা, তোমার এখানে?" কেঁদেই ফেল্‌লে যেন সুপর্ণা।

"দুধ?" মুখ থেকে শব্দটা আলগাভাবে খসে পড়ল আমার।

"হেঁ—ভাখো এসে।"

ও আমাকে টেনে বারান্দায় নিয়ে গেল। নীচে ফুটপাথে তাকিয়ে বললে: "ভাখো।"

যা দেখে চলেছি তা-ই। একটি কঙ্কালী মা শুয়ে আছে, বুকে একটি শিশুর কঙ্কাল নিয়ে।

"মরে যাচ্ছে বাচ্চাটা—দুধ চাইছে মা—দাও, যদি থাকে।" যন্ত্রণায় কালো হয়ে উঠেছে সুপর্ণার মুখ।

আমার মুখেও ফুটিয়ে তুলল ও সে-যন্ত্রণা। রান্নাঘরে ঢুকে দুধের সস্-প্ল্যানটা ওর হাতে এনে তুলে দিতে পাঁচ সেকেণ্ডও হয়ত লাগল না।

"তুলো—না হয একটু ফর্সা ন্যাকরা দাও।"

স্যুটকেস খুলে একটা রুমাল দিতে হল। ভাবছিলাম, রুমাল পাওয়া না গেলে জামা ছিঁড়তে হবে!

স্বপ্নের মতো আমার চোখের উপর থেকে মিলিয়ে গেল সুপর্ণা। বারান্দায় যাবার আগে কয়েক মুহূর্ত্ত ঘরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম স্বপ্নই দেখলাম নাকি!

দুধে ভেজা রুমালের একটা কোণ বাচ্চাটার মুখে চুসতে দিচ্ছে সুপর্ণা। খেতে চায় না, মুখ নাড়বার শক্তি নেই—মুখের ঢিলে চামড়াগুলো অনিচ্ছায় কুঁকড়ে যায়। ওর মুখ ছুঁয়ে মুখ রাখছে সুপর্ণা হয়ত দেখছে শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল কি না। না বেঁচে আছে। আবার দুধে রুমাল ভেজালো ও।

মা উঠে বসল। শিয়র থেকে নারকেলের মালাটা হাতে নিয়ে বললে: "আমায় দাও মা।"

যেন ভয় পেয়ে গেল সুপর্ণা। প্যান থেকে দুধটুকু ঢেলে দিল মালায়!

এক চুমুকে দুধটুকু খেয়ে একটা ঢেঁকুর তুললে মা।

সুপর্ণা: "এ কি! তুমি খেয়ে ফেললে!"

যেন দৃষ্টি নেই এমন চোখ নিয়ে তাকাল মা সুপর্ণার মুখে। বাচ্চাটাকে বুকে নিলে। উঠে দাঁড়াল। স্তনের স্মৃতি-চিহ্ন বুকের খানিকটা চামড়ার ভাঁজ তুলে দিল বাচ্চাটার মুখে।

চুপচাপ সুপর্ণা ওর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ, বুঝতে পারলনা হয়ত মুমূর্ষু মাতৃত্বকে।

সুপর্ণার অপেক্ষায় ঘরে ফিরে এলাম আমি।

"দেখলে, মিতা ?" এসে আমার বিছানায় গা এলিয়ে দিলে সুপর্ণা।

ওর চোখের ব্যথা অনুকরণ করে নিল আমার চোখ। ইচ্ছে হল ওর পাশে গিয়ে বসি, মায়ের মতো ওর মুখে মুখ ছুঁইয়ে বলি: "দেখলাম।" কিন্তু দীপায়ন বল্‌লে: "ও ভাবছে, দুধ খেয়ে ওর বুকে দুধ আসবে।"

"আসবে ?" চোখের কুয়াশা কেটে গেল সুপর্ণার।

"থাক্, কী হবে আর ও ভেবে ?"

"বড্ড খারাপ লাগছে।"

"চা করে দিতে বলব নন্দকে ? র টি কিন্তু—খাবে ?"

"বলো।"

•

বিকেল। অনেকদিন পর আজ মনে হ'ল বিকেল বলে একটা আশ্চর্য্য সময় আছে। চা খাওয়ার শেষে আমরা পাশাপাশি বসেছি বারান্দায়। ডাক-বাংলোর পুকুরের ঘাট মনে পড়লো—মনে পড়ল তোতাকে। আমার পাশে তোতা—কে যেন ফিস-ফিস করে বলছে। আমিই বলছি।

"এদের নিয়ে তুমি লিখবে না, মিতা ?"

দীপায়নকে বলছে সুপর্ণা! কিন্তু পানু শুনছিল, তোতা বল্‌ছে: "তুমি আমাকে চাওনা জানি, পানুদা।" "কাকে চাই তবে ?" "ওকে।" পানু সুপর্ণার দিকে তাকাল। ছি-ছি করে উঠল দীপায়ন। তারপর সুপর্ণাকে বললে: "এদের নিয়ে ? না।"

"কেন ? সবাই ত লিখছে।"

"যারা মনের উপর এতো বেশি স্পষ্ট, তাদের নিয়ে কি লেখা যায় ?"

"গল্প না হলো, কবিতা—।"

"কবিতা ত আরো না।"

"কবিতা পড়তে বেশ লাগে আমার। তুমি কবিতা লিখছ না কেন আজকাল ?"

পানু শুনল সুপর্ণাকে। হাতে সুপর্ণার হাত তুলে নিলে। পাঁচটি চাঁপা ফুলে জড়িয়ে গেল আঙুল। পানু ভাবছিল তোতা আজ ফুল হয়ে গেছে—আর একগাদা মাংস নয়। সে আর আজ বলে না: "কবিতা আমি বুঝিনে, কেন বুঝিনে পানুদা ?"

"কবিতা বলো না মিতা—তোমার পুরনো কবিতা।" চেয়ারে মাথা এলিয়ে দিলে সুপর্ণা।

পানু বললে: দিনের রৌদ্রের পাখী ফিরে আসে রাত্রির ক্ষুধায়,
আকাশের মরুভূমি পার হয়ে পৃথিবীর সমুদ্রের তীর
বুকে তার, চোখে তার মুঠো-মুঠো সন্ধ্যার আবীর;
"তুমি কি আমার রাত?" কানে-কানে তোমারে সুধায়।

"আমায় লিখে দেবে?"

"তোমার জন্যেই ত লেখা।"

"আমার জন্যে? না, মিছে কথা।"

দীপায়ন বলতে চাইল: "মিছে কথা।" কিন্তু পানু বললে: "সত্যি, তোমাকে লেখা।"

সুপর্ণার একটা চিঠি: পোষ্টকার্ড: "দাদার অসুখ। বাবা বাড়ী নেই, বোম্বে চলে গেছেন। একা-একা আমার ভয় করছে। তুমি এসো।"

গেলাম। নিলু বিছানায় বসে-বসে বেদানার দানা চিবুচ্ছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা—আজ জ্বর নেই।

"পানি আপনাকে চিঠি দিয়েছে, না পানুমামা? দেখুন কী ভীতু মেয়ে।" নীলু বললে। ওর গলায়-ও যে খুব সাহস ছিল তা নয়। তিনদিনের জ্বর ওকে বেজায় কাবু করে ফেলেছে।

"তোমার বাবা কবে আসছেন?"

"কি জানি। একটা মেসিন দেখতে গেছেন বোম্বে। অফিসের কাজ।"

"উনি এখানে এসেও আবার অফিসে ঢুকেছেন?"

"একটা এঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের এডভাইসার। বসে জিরোবার ধাত নেই বাবার।"

তা-ই দেখলাম। কাজকে যাঁরা আপন করে নেন তাঁদের এই-ই দশা। স্ত্রী-বিয়োগে অবসর নিলেন, কিন্তু অবসরে স্বস্তি নেই দেখা গেল। তাই ওদিন আমায় বলছিলেন: "আমি ত এদিক-উদিক চলে যাই—বাড়ীতে ওরা থাকে ঠাকুর-চাকরের জিম্মায়। দিদিও এসে বছরে একমাস-দু'মাসের বেশি থাকতে পারেন না। তুমি মাঝে-মাঝে এসে ওদের একটু দেখাশুনো করো।"

কথাগুলো মনে পড়তেই বললাম : "কে দেখছেন ? ডাক্তার ?"

"ডাক্তারের দরকার ছিল না। আমি জানি ইনফ্লুয়েঞ্জা। পানি তবু জবরদস্তি করলে !"

"তোমার চাইতে পানু বেশি মডার্ণ।"

"আপনি ওকে চিনেছেন খুব ! ওর অভ্যাসই একটুতে হৈ-চৈ করা।"

"জ্বর একটা রোগের লক্ষণ। রোগটা ডাক্তার ছাড়া কেউ বলতে পারেন না।"

"আপনিই ওকে তবে আস্কারা দিচ্ছেন—তবেই হয়েছে !"

কোনো কথা খুঁজে পেলাম না। আমার মন হয়ত জানতে পারল, তার উপর অপরাধের কালো ছায়া পড়ছে। অবশেষে একটা কথা পাওয়া গেল যা না পেলেও চলত : "তোমার পাল্‌সটা দেখি—শরীরটা ভালো লাগছে ত আজ ?"

"পাল্‌স দেখতেও জানেন আপনি ?" নীলু হাত বাড়াল।

"বুড়ো মানুষের সবই জানতে হয়।"

"বুড়ো-মানুষ !" হো-হো করে হেসে উঠল নীলু।

সুপর্ণা এলো। নীলুর হাসি চড়ে গেল আর এক পর্দ্দা : "জানিস পানি, পানুমামা বল্‌ছেন উনি বুড়োমানুষ।"

"বলবেনই ত। বাবা যখন ওঁকে আমাদের অভিভাবক করেছেন।" একটু উদাস শোনাল সুপর্ণাকে—খুসী চেপে গেলে যেমি হয়।

নীলুর হাত ছেড়ে দিয়ে বললাম : "ও-কে। এখন পলিটিক্স বকতে পারো।"

খুসী-খুসী চোখে টান-টান হয়ে বসল নীলু : "আমরা আজকাল সত্যি বেদম পলিটিক্স করছি !"

"তোমরা ?"

"আমরা ছাত্ররা।"

"উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছ আমাদের কাছ থেকে।"

নীলু কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই সুপর্ণা : "বারে—তুমি এখন পলিটিক্স করতে বসলে না কি ? তোমার চা জুড়িয়ে গেল ও-ঘরে।"

"আমার চা ?" আকাশ থেকে পড়ার ভান করলাম।

"নিমন্ত্রণ চিঠি দিয়েছি, চা দেব না ? এমন অভিভাবকই ত তুমি ! নিমন্ত্রণ করে আনতে হয় !"

"চা খেয়ে আসুন পানুমামা—আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে।" নীলুর গলা আর তেমন সতেজ শোনাল না।

'ও ঘরে' মানে কি আমাকে একা পাওয়া ? খুসী ছিটিয়ে দিল সুপর্ণার চোখ। যেন আমাকে ম্যাজিক দেখাচ্ছে এম্নিভাবে টেবিলের উপর খাবারের ঢাকনিটা তুলে নিলে। রীতিমতো ফিষ্ট। পটে চা আর প্লেট ভরতি খাবার। দোকানের মিষ্টি ছাড়াও ঘরে তৈরী লুচি আর শুঁটির ডালনা।

"এ কী ?" ম্যাজিকই দেখলাম আমি।

"খাবে।" টুপ করে কথাটুকু বলে ঠোঁট বুজিয়ে হাসতে লাগল ও।

"এতো সব কি খাবো ? আমি পারব না।"

"আমার তৈরী লুচি ডালনা খাবে না তুমি ? আর ঐটুকু ত মিষ্টি !"

"ভাগাভাগি করি এসো। লক্ষ্মীটি—"

"না। সব তোমাকে খেতে হবে।" ভারি হয়ে এলো সুপর্ণার গলা : "একটি শুঁটি যদি পড়ে থাকে—আজ আমি কিচ্ছু খাব না। কাল এসে খবর নিও, খেয়েছি কি না !"

শুনে ভালো লাগ্‌ল। দীপায়নের ভালো লাগল না। পানুর ভালো লাগল না। ভালো লাগল আমার—একটি পুরুষের। একটি পুরুষ একটি নারীকে দেখতে পাচ্ছে। নারীব দেহকে নয় –তার সত্তাকে—তার প্রেমকে। কিন্তু কয়েক নিমেষের এই স্বচ্ছতা। কয়েকটি স্থির মুহূর্ত্ত—একটি নিশ্চল বিন্দু, আমি। তারপর তাতে দীপায়নের ছায়া পড়ল। আমি দীপায়ন। বললাম : "তুমি বড্ড সেকেলে।"

"বেশ, তা-ই।"

খাবারে হাত দিতে হল।

"ফ্যান্‌টা ছেড়ে দিই—না, তোমার চা জুড়িয়ে যাবে। দাঁড়াও, আমি পাখা করছি।"

"কী পাগলামি করছ—বোসো এখানে চুপ করে।" বীণাদিকে শুনছিল পানু আর কথা বললে দীপায়ন।

আবার আমি আমাকে দেখছিলাম যে-আমি আকাশ—ঘটনার আলো, জল, ধুলোবালি পড়ে গোলাপী, ফিরোজা, নীল।

একটি ছোট খুকী হয়ে সুপর্ণা চুপচাপ আমার পাশে কুশন-চৌকিতে বসে পড়ল। শান্ত।

"আচ্ছা মিতা, পলিটিক্স তোমার খুব ভালো লাগে?" হঠাৎ প্রশ্ন।

"লাগে। পলিটিক্সের আবহাওয়াতেই আমি মানুষ।"

"দাদারও ভালো লাগে। কি করে যে ভালো লাগে জানিনে। সকাল-বেলাটা যায় খবরের হৈ-চৈ-এ মুখ গুঁজে।"

"খবরের কাগজে খবরই পড়ে সবাই।"

"খুসী হবার মতো কোনো খবর থাকে ওতে?"

"খুসী হবার মতো কী আছে আমাদের বলো!" মুখে সন্দেশটা যেন তেতো হয়ে উঠল আমার: "আমাদের মনে কখনো আগুন জ্বলে উঠেছিল—এখন সব ছাই। যাঁরা জেলে তাঁরা হয়ত আর ফিরে আসবেন না—একে-একে ওখানেই মরবেন ওঁরা। আমরা ইয়াঙ্কী সৈন্যদের সঙ্গে গলাগলি করব, যুদ্ধের রসদ যোগাব, তাদের প্রসাদ পাব।"

সুপর্ণার চোখ আনমনা কি যেন খুঁজে বেড়াতে লাগল ঘরের দেয়ালে, জানালায়, সিলিং-এ, ইলেকট্রিক বাল্‌বে। যেন আমার কথায় মন নেই কিন্তু তারপরই হঠাৎ আমার চোখে চোখ রেখে বললে: "আমি জানি, কি তুমি বলতে চাও। ক্লাশের মেয়েদের কাছে শুনেছি আমি।"

"কী আর শুনেছ তুমি—জানো, কোথায় আমরা নেমে গেছি—" দীপায়ন ভুলে গেল সুপর্ণাকে—বাংলার ঘুমন্ত আত্মার মুখোমুখি এসে যেন দাঁড়াল সে—যেন তাকে জাগাতে হবে— সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে নিবেদন করতে হবে ব্যথার কথা। "আমি সে-পাতালের অন্ধকার দেখেছি। ভাবো: ওয়েলিংটন স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম কোণে রাত্রির অন্ধকারে একটা মিলিটারি ট্রাক এসে দাঁড়াল। খালি ট্রাক—একটি মাত্র ইয়াঙ্কী ড্রাইভার। একটা লোক এগিয়ে আসছে—কোলে একটি শিশু, সঙ্গে বোরখা-টানা একটি মেয়ে। ইয়াঙ্কীর সামনে এসেই মেয়েটির মুখের পর্দ্দা সরিয়ে দিলে লোকটা—ইয়াঙ্কীর হাতের টর্চ্চের আলো পড়ল মেয়েটির মুখে। সুন্দর কচি মুখ—মনে হল এই বুঝি প্রথম বাইরের নির্দ্দয় আলো এসে ওর মুখ ঝলসে দিল। 'বহুৎ আচ্ছা'—লালার মত জিভ থেকে কথা গড়িয়ে পড়ল ইয়াঙ্কীর—লোকটাকে একপাশে টেনে নিয়ে সে ট্রাউজারের পকেটে হাত দিলে। নোটের জন্যে লোকটা হাত বাড়াল, হাত

গুটলো, দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই শিশুটা ছটফট করে উঠল ওর কোলে। মেয়েটিকে পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে পাশের সীটে বসিয়ে দিলে ইয়াঙ্কী। ফূরত্তির শীস্ শুনলাম আর গাড়ীতে ষ্টার্ট। বাংলার একটি মেয়ে ডলারের কাদায় ডুবে গেল—আমাদের একটি মা হারিয়ে গেল যুদ্ধের রাত্রির অন্ধকারে।"

প্লেটের উপর একটা আঙুলের ডগা চ্যাপটা হয়ে লেপটে আছে—ঝলমল চোখ সুপর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে—কিন্তু সুপর্ণাকে দেখতে পাচ্ছে না সে-চোখ। চোখে এখানকার ছবি মুছে গেছে একটি কালরাত্রির অন্ধকারে। তারপর একসময় দেখতে পেলাম সুপর্ণা আস্তে উঠে এলো চৌকি থেকে। আমার গা-ঘেঁষে পট থেকে কাপে চা ঢালতে লাগল।

"মিতা, তোমার মা নেই, না? আমার মতো।" যেন নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলছে সুপর্ণা।

"মা?" চোখ বুঁজে এল আমার: "এ-যুদ্ধে কতো মা-কেই ত আমরা হারিয়ে ফেললাম।"

সুপর্ণা চুপ। বৌদির সত্তার ধ্বনি শুনছিলাম: "ব্যথা পা'ক—ব্যথা পা'ক সুপর্ণা। নইলে কি করে ও আমার কাছে আসবে?"

কাপ ভরে উঠ্‌ল চায়ে। "আমাকে দাও একটা সন্দেশ, দু'টো তুমি খাও—" মনে হ'ল অনেক কান্নার শেষে সুপর্ণা এই প্রথম কথা বলছে। চোখ মেলে চাইলাম ওর মুখে। সত্যি কাঁদছে সুপর্ণা—জলে ঝাপসা হয়ে গেছে চোখ। ওর কাঁধে হাত তুলে দিয়ে দীপায়ন বললে: "একি—ছিঃ।" দীপায়নের হাতে চোখ ঘষতে লাগল সুপর্ণা—চোখের জলে ভিজে গেল হাত।

এ-হাতে অনেক চোখের জল শুকিয়ে গেছে—ভেবেছিল সেদিন দীপায়ন—অনেক চোখের জল পেয়েছ তুমি—কার, কার চোখে বেশি জল ছিল?—ময়নার। ছোট্ট মেয়ে শেফালির? সে-ওত কাঁদত। যখন ও বলত, তোমার কাছে চলে এলাম, আর পানুদা বলত: 'আর এসোনা, কোনদিন না।' সে-জল শুকিয়ে গেছে। এ-জল—এ-জলও কি যাবে? না—শপথের মতো উচ্চারণ করল দীপায়ন। পানু শুধু নিয়েছে—দেয়নি কিছু। এবার তোমার দেবার পালা, দীপায়ন। দেখেছ তুমি, কি করে দিতে হয়—সবিতাকে দেখেছ। দাও, দাও এবার তোমাকে।

"পানু—" মা-হারা মেয়েটিকে ডাকলাম আমি। ডাকল দীপায়ন।

মুখ তুলল সুপর্ণা—আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে ঝাপসা হেসে বল্লে: "কই, দাও আমার সন্দেশ।"

১৯৪৪

[জার্নালস্ থেকে]

সুপর্ণা বলছিল: "ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের ময়দানে চলো, বেশ নিরিবিলি ওখানে, না?"

"না।" অপরাধের স্মৃতি বিদ্যুতের মতো ছুঁয়ে গেল আমাকে। দেখতে পেলাম, ওখানে দেয়ালের গায়ে লেখা আছে দীপায়নের অপরাধের কাহিনী। অতীতের একটা কালো পৃষ্ঠা। অপরাধকে আজ সত্যি অপরাধ বলে মনে হ'ল আমার। মনে হ'ল, সুপর্ণার কাছে আমি অপরাধী হতে পারিনে।

"তাহলে কোথায়? আজ কিন্তু রাত্রি হয়ে গেলেও বেড়াব।"

"পড়াশুনো করছ না বুঝি আজকাল?"

"বারে, একদিন বেড়ালে কি হয়!"

"মনে থাকে যেন, শুধু আজ। পরীক্ষার আগে আর একদিনও না।"

হাওড়ার নতুন পুলে এসেছিলাম আমরা।

"জেলে-ডিঙিগুলো কিন্তু বেশ। কী সুন্দর দোল খায়। ডিঙিগুলো দেখলেই মনে হয় নদীতে এলাম!"—সুপর্ণা আমার মুখে তাকাল।

আমি: "পুলটা দেখে নদীকে মনে পড়ে না তোমার? মনে হয় না, একটা বন্য স্রোতকে ডিঙিয়ে গেছি আমরা।"

"নৌকো দেখতেই ভালো লাগে আমার—দেখতে কি সুন্দর!"

"আর জাহাজগুলো!"

"মনে হয় অনেক বড়ো—নদীকে ঢেকে ফ্যালে।"

"যে-মানুষ ঢেকে ফেলছে—সব কিছু ঢেকে ফেলছে—বন, পাহাড়, নদী, সমুদ্র, আকাশ—তাকে তুমি দেখতে পাওনা জাহাজের আর পুলের ছবিতে?" দীপায়ন পাঠ দিচ্ছিল সুপর্ণাকে: "কতো বড়ো যে সে-মানুষ, ভাবতে ভালো লাগেনা? তার ভেতর আগুন জ্বলছে—সেই আগুন, যা ভারতবর্ষে ভরতবংশের মানুষরা এনে দিয়েছিল, য়ুরোপে এনেছিল প্রমথিয়ুস।"

পাঠ নিচ্ছিল সুপর্ণা—কিন্তু ওর চোখে বর্ষার বনের গাঢ়তা।

"সে-আগুনের তাপেই তোমার বাবা ছুটোছুটি করেন। গড়ে তোলবার ব্যাকুলতা স্থির থাকতে দেয় না মানুষকে। এ-ব্যাকুলতাই তৈরী করে ইতিহাস, সভ্যতা।

আমার গা-ঘেঁষে সুপর্ণা, আমার দেহের তাপে।

"মানুষের হৃদয়-মনকে ভরে তুলবার জন্যে অনেক কাব্য আর দর্শন আমরা তৈরী করেছি। কিন্তু তা-ই সব নয়। জীবনে অনেক রূঢ়তা আছে, তার সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করতে পারিনি। হয়ত চলেছিলাম সে পথে, নইলে আয়ুর্ব্বেদের জন্ম হতনা, অশোকস্তম্ভের ও-রকম পাথর তৈরী হত না—কিন্তু কখন যেন থেমে গেলাম আমরা। এ-পথে যারা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, তারা পথের শ্রী বজায় রাখতে পারেনি। আমরা তা পারব—আমরা হৃদয়-মন হারিয়ে ফেলিনি—আমরা যদি চলতে সুরু করি ফুল ফুটে উঠবে পথের দু'পাশে। আমি বিশ্বাস করি এ আমাদেরই কাজ।"

সুপর্ণা এবার নদীর ঘোলা জলে তাকিয়ে আছে। ঠোঁট কেঁপে উঠছে ওর। কান্নায় নয়, কান্নারই মতো একটা কথায়: ''জানি, জানি, তুমি আমায় বিশ্বাস কর না, মিতা।''

ঘোলাটে হয়ে উঠল আমার মন, বললাম: "তোমাকে করি কিন্তু নিজেকে করতে পারিনি কোনোদিন।"

আটাশ

অনি নেই—ঘরের ছেলে ঘরে গেছে—এখন এ দু'ঘর জুড়ে শুধু আমি। ভৃত্যটি এমন আত্মবিলোপী যে রান্নার শব্দটাও বাইরে বেরতে দেয়না। এমন লোককেই হয়ত কথা বলাতে সাত চড় দিতে হয়।

মূক ভৃত্য শ্রীমান নন্দ অনিরই দান, আর একজন বাচাল প্রকাশক। পরেশবাবু। আগে নাকি ফুটপাথে বসে পঞ্জিকা বিক্রি করতেন, এখন জাঁদরেল-ব্যবসাদার। বই-এর ভালো দাম দেন ভদ্রলোক, আর যদি পঞ্চাশবার-শোনা ওঁর আত্মকাহিনী একপঞ্চাশবার শুনতে রাজি হই তাহলে ত আমি এ-যুগের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকই বনে গেলাম। শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের উপন্যাসগুলো পরেশবাবু অকাতরে ছেপে যাচ্ছিলেন, আর আমিও ওঁর ফুটপাথের কাহিনী অক্লান্তভাবে শুনে চল্‌ছিলাম।

সত্যেন আসত মাঝে মাঝে। কখনও সিনেমার দু'টো পাশ নিয়ে, কখনো বা আমার নূতন বই উপহার পেতে। অনর্গল পলিটিক্স বকত সত্যেন—হয়ত বন্ধুকৃত্য—বেচারি বুঝতে পারতনা, আমার যে পলিটিক্সের নেশা ছুটে গেছে। উপন্যাসের নেশায় বুঁদ হয়ে আছি আমি তখন। কী যে ভালো লাগছে লিখতে! লিখতে ভালো লাগা-হয়ত কোনো মেয়েকে ভালোবাসারই মতো। মন ছুটি নিতে চায়না।

না-থাক্ তোমার অলিতে-গলিতে, ট্র্যামে-রেস্তরাঁয়, কলেজে-কফিহাউসে অজস্র, অগণিত পাঠক—যদি তুমি জানো একটি মেয়ে তোমার লেখা পড়ে খুসীতে ঝলমল্ করে ওঠে, তাহলেই লিখতে ভালো লাগবে তোমার। আমার লেখা আর প্রেম আলাদা নয়—আমার জীবনে এদু'টো এক হয়ে গেছে। প্রেম ত একটা উজ্জ্বল মন—আনন্দে উজ্জ্বল – সে-আনন্দ, যা থেকে সৃষ্টির বন্যা ছুটে আসে।

আমাকে চুপচাপ দেখে মাঝে-মাঝে সত্যেনের পলিটিক্সে ভাটা পড়ত। ওর মনে পলিটিক্সের কুয়াশা ধুয়ে মুছে সাফ করে দেবার জন্যেই অবশেষে বলতাম:

"জানিস সত্যেন, পলিটিক্স করে কোনো আদর্শকে পাওয়া যায়না—তারজন্মেই ওটা ছেড়ে দিলাম—তোদের ভয়ে নয়!"

"আমাদের সম্বন্ধে তোর বড় সেকেলে ধারণা—" ভাঙা আসর জমাতে চাইত সত্যেন: "আমাদের মতো পলিটিক্সবাজ এখন ভূভারতে আর হু'টি নেই। বিষ এখন অমৃত হতে চলেছে।"

"পলিটিক্স যখন পসিব্‌ল্‌ এর সাধনা—তা হবেই!"

কথাটা হয়ত সত্যেন ঠিক বুঝতে পারতনা তবে এটুকু বুঝত, সেদিন আর পলিটিক্স চলবেনা। মনে হত আড়মোড়া ভেঙে ও উঠ্‌বে। কিন্তু তা নয়। নিরর্থক হাসিতে মুখের ভোল পাল্টে নিয়ে ঠিক পরেশবাবুর মতোই ও মুরুব্বি হয়ে বসত: "এবার একটা বে-থা কর, দীপায়ন।"

"এবার?" ওকে মুশকিলে ফেলবার জন্যে ওই অর্থহীন কথাটায় প্রশ্নের সুর জুড়ে দিতাম।

"মানে এখন।"

"কোনো আত্মীয়াকে নিয়ে বিপন্ন নাকি তুই?"

"বিপন্ন ত বটেই। স্ত্রীকে নিয়ে আজকের দিনে তেমন-তেমন মহাপুরুষও বিপন্ন। বিপদ থেকে তুমি বাপু তফাতে থাকবে এ কি আমাদের প্রাণে সয়?"

"আমি তোদের চাইতে একটু বুদ্ধিমান, কি বলিস সত্যেন?"

"তোর উপন্যাসে ত বিয়ের ওকালতি বিস্তর। আর নিজের বেলায় বুঝি বুদ্ধিমান! আচ্ছা ধাপ্পাবাজ কিন্তু তোরা!"

"ওকালতিটা উপন্যাসেই চলে—জীবনে নয়।"

সেদিন হয়ত এ পর্য্যন্তই। কিন্তু আরেকদিন আবার ঠিক এম্নি সুর ভাঁজতে সুরু করত সত্যেন: "একটা বিয়ে করে ফ্যাল, দীপায়ন।"

"অনেকগুলো বিয়ে করা তুই কিরকম মনে করিস?"

"না সত্যি বল্‌ছি—তোকে বড্ড দুঃখী দেখায়।"

"কেন দেখায় জানিস?" হেসে উড়িয়ে দিতে চাইতাম সত্যেনকে: "বিয়ের চাইতে ভালো কিছু আমার আশা ছিল। কিন্তু আশা মিটলনা।"

"বিয়ের চাইতে ভালো কিছু?" আতঙ্ক ফুটে উঠ্‌ত সামাজিক জীবের গলায়।

"হয়না ভালো কিছু? যাতে সুখী হওয়া যায়। বিয়েতে আর সুখ কোথায়?"

"ওসব কথা তুই উপন্যাসে লিখিস দীপায়ন—" সত্যেন আমার মুদ্রাই আমাকে ফিরিয়ে দিত : "জীবনে ওসব খাটেনা, খাটাতে যাসনে। রক্তমাংসের মানুষ পুঁথি-কেতাবের ছিমছাম মানুষ হতে পারেনা।"

"পারে।" একটা পাথর দিয়ে যেন চেপে দিতে চাইতাম সত্যেনকে। চুপচাপ খানিকক্ষণ আমার মুখে তাকিয়ে থাকত সত্যেন। আমার মুখে ছিল তখন এক নবীন আদর্শবাদের উজ্জ্বলতা মন ছিল বহ্নিমান—ছিল সেই পাবকের স্পর্শ যার ধ্বনি মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হয় : "তুমি রক্তমাংসের মানুষ নও তুমি আকাশ. তুমি এক সূর্য্য, তুমি এক পবিত্র শুভ্রতা!"

"আমি মুখ ফিরিয়ে নিতাম আরো কিছু বলব বলেই। কিন্তু সত্যেনই তখন আবার কথা বলত : "আমি আমাদের মতো ছোটখাটো মানুষের কথাই বলছি।"

"ছোটখাট অনেকগুলো মানুষের চিত্র নিয়েই সমাজের চরিত্র—" সত্যেনের কথারই জবাব দিতে হত, নিজের কথা তখন আর বলা হত না : "পুথিকেতাব ছোটখাট মানুষের জন্যেই, বড়োমানুষের জন্যে নয়।"

"হতে পারে।"

"রামায়ণ সমস্ত ভারতবর্ষের চরিত্র তৈরী করেছে একদিন—তা জানিস ত? বাজরাজড়াদের কথা বলছিনে—বড়ো মানুসের জন্যে মর‍্যালটি নেই সাধারণ মানুস রামায়ণের চরিত্রগুলোর পথেই হেঁটে যেতে শিখেছে। ওই একটি বই যার জন্যে 'ভারতীয় সমাজ' বস্তুটি এদেশে কায়েম হ'ল। কতোগুলো নৈতিক বোধ দানা বেঁধে উঠ্‌ল সমাজের মনে। রক্তমাংস আমাদের বাঁচিয়ে তোলে সত্যি, কিন্তু মানুষ করে তোলে এমন কিছু যা রক্তমাংসের নয়। আমার মনুষ্যত্বে যে কতো হাজার-হাজার মানুষের দান তার হিসেব আমি জানিনে—যাদের কথা শুনেছি, যাদের সঙ্গে মিশেছি, তারা সবাই আমাকে তৈরী করেছে। তেম্নি তোকেও। ভেবে দেখিস।"

সত্যেন অতো কিছু ভেবে দেখতে রাজি ছিল না। এ-ধরনের বক্তৃতাগুলো চুপচাপ হজম করে আবার ও আমাব বিয়ের ভাবনাই ভাবতে সুরু করত। এক সপ্তাহ পরে যখন রুটিন-মাফিক আবার এসে হাজির হত ও, তখনও মুখে ওর সেই মামুলি বুলি : "অনেক ভেবে দেখলাম, তোর বিয়ে করাই উচিত, দীপায়ন।"

সত্যেন হয়ত আমার বিয়ের লক্ষ কথা পুরণ করে তুলছিল, নইলে আমিও বা সময়ের গায়ে বিয়ের কথার খানিকটা বিলি কেটে চলব কেন? তোতাকে মনে পড়ত আমার—খুব বেশি মনে পড়ত। সুরজিতের সঙ্গে চিঠিপত্র চলছিল বলেই হয়ত মনে পড়ছে, একেকবার ভাবতাম। কিন্তু না। স্ত্রী-হিসেবেই মনে পড়ত ওকে। আজ যদি ও থাকত—এখানে, এ-ঘরে, আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করে এক সময় টেবিলে উঁকি দিয়ে কি বলতনা: "কতোটা লেখা হ'ল আজ, দেখি!" তারপর সত্যেন এলে চায়ের কাপ হাতে ঘরে ঢুকে হয়ত বলত: "দেখছেন ত আমি চায়ে নির্ভুল।" ওর খুশী, ওর হাসি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ত ঘরের দেয়ালে, মেঝেয়, আমার মুখে—সত্যেনের মুখে, পরেশবাবুর মুখে। সুপর্ণার মুখে? তা আর কি-করে হয়—সুপর্ণা কি থাকত তখন? বাসব থাকত না, নীলাঞ্জন থাকত না, সুপর্ণাও থাকত না। প্রমিতা, কাঞ্চন, সবিতা কেউ না। শুধু তো'তা—হয়ত এখানেই নয়, অন্য কোথাও। হয়ত দীপায়ন তখন প্রফেসর, উপন্যাস লেখার কথা স্বপ্নেও ভাবছে না। খাবার সময় পাখা হাতে এসে বসে তোতা, বলে: "তোমার ছেলে আজ কি বলছিল জানো—?" শুনতে চাইনে। তবু বলতে থাকে তোতা। গলায় ক্লান্তি, শরীরে ক্লান্তি। তোতা ক্লান্ত, আমি ক্লান্ত। তোমার কবিতার তোতা আর নেই দীপায়ন, এ-তোতা নেহাৎই স্থূল, নেহাৎ বাস্তব। এমন কি সেই স্পন্দনটুকুও আর নেই—যাকে তুমি প্রেম বলতে—এমনই জড় এখন তোমার স্ত্রী——তোতা। তুমিও জড়—কয়েকটা নিয়মে বাঁধা পুতুল। চাকরী, খাওয়া, তোতার দেহ, ঘুম। একে জীবন বলবে তুমি? এই জড়তার জন্যে কি তৈরী ছিলে, তৈরী করেছিলে নিজেকে? কতো মানুষকে হারিয়ে তুমি তোতাকে পেতে—ভাবছ? কতোটা কারুকার্য্য হারিয়ে ফেলত তোমার মন—কতোখানি উত্তাপ তোমার রক্ত! রক্তমাংসের মানুষ হতে গিয়ে নিরুত্তাপ, নীরক্ত একটা মাংসের ঢেলা হয়ে বেঁচে থাকা! বেঁচে থাকছে ত লক্ষ লক্ষ মানুষ—এ কুৎসিৎ বাঁচাই বেঁচে থাকছে। তুমি পালিয়ে যাও। একা?—হ্যাঁ একাই পালিয়ে যাও—অস্বীকার করো এ জীবন। প্রেম অনেক সুন্দর, মানুষ অনেক সুন্দর, জীবন অনেক সুন্দর—একাই বলো এ-কথা, বলতে থাকো, শুনবে, কেউ শুনবে, কোনোদিন—বাঁচাতে চাইবে প্রেমকে, বাঁচাতে চাইবে নিজেদের। সেদিন নারী এসে বলবে তার পুরুষকে: "তোমাকে ভালো

লাগে তাই ভালো লাগে আমার মানুষকে, পৃথিবীকে, মানুষের সভ্যতাকে, পৃথিবীর জল-বায়ু-আকাশকে।" মনিকা কি মানিককে বলে এ-কথা ?

কোনোদিন কি তোতা বলতে পারতো এ-কথা ? তোমার বিবাহিতা স্ত্রী তোতা কি চোখে এমন বিশাল স্বপ্ন নিয়ে দাঁড়াতে পারত কোনোদিন ? বিয়ের বিষে বুঁজে আসত ওর চোখ যে-বিষ তিল-তিল করে জমিয়ে তুলছে মনে, আমাদের পরিবার, সমাজ, সংস্কার। স্ত্রী-পুরুষের মিলনের মতো এতো বড়ো সত্য-শিব-সুন্দরকে নষ্ট ভ্রষ্ট করে দিয়ে আমরা খুশী করতে পারতাম সমাজকে ! আমাদের জড়তায় ! মৃত্যুতে আনন্দিত হতে পারত হাজার হাজার মৃত মানুষ ! মৃত সমাজকে আমরা উপঢৌকন দিয়ে যেতাম কতগুলো মৃত সন্তান !

তুমিও, তুমিও তেম্নি এক মৃত সন্তান, দীপায়ন ! কিন্তু জীবনকে তুমি আহরণ করতে পেরেছ। গায়ত্রী মন্ত্রে যেমন আহরণ করতে পার ত্রিলোককে—তেম্নি প্রাণকে আহরণ করেছ তুমি মানুষের ইতিহাস থেকে। মানুষের ইতিহাসে প্রাণ আছে যদিও আজকের মানুষ প্রাণহীন। প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে রাখো মৃত্যুর অন্ধকারে—একদিন দেয়ালি জ্বলে উঠ্‌বে।

একা-একা ভাবতাম—বলতাম এ-সব কথা। মনে-মনে কৃতজ্ঞ হয়ে উঠ্‌তাম তোতার প্রতি—তোতা আজ নেই বলে।

অনেকদিন পর সেদিন নিরুপদ্রব ছিলাম—বাইরে যেমন, মনেও ঠিক তেম্নি। সত্যেন আসেনি, নীলাঞ্জনও অনুপস্থিত, পরেশবাবুর আসার তারিখ দু'দিন পর। বলে গিয়েছিলেন, তিন-চার ফর্ম্মার পাণ্ডুলিপি তাঁর চাই। মনে হচ্ছিল আজই তা হয়ে যাবে। তৈরী হয়ে এসেছে মর্জ্জি আর মেজাজ—হাতে কলম নিতে ইচ্ছে করছে বারবার। কিন্তু দুপুর হয়ে গেল, খাওয়াদাওয়াও চুকল, এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তবু বসতে পারলাম না লিখতে। কিছু ভাবছিলাম ? না, কারো কথাই ত ভাবিনি। তবে হাঁ, উপন্যাসের চরিত্রগুলো আনাগোনা করতে সুরু করেছিল মনে। ওদের সঙ্গে কথা বলে আর ওদের কথাবার্ত্তা শুনে চার-পাঁচটা ঘণ্টা ওম্নি কেটে গেল ! আরো খানিকক্ষণ যেতো যদি নন্দর উপর চোখ না পড়ত আমার। কতক্ষণ যে ও দাঁড়িয়ে আছে তা-ও বলতে পারব না।

"কি রে ?" আলস্য ভেঙে বিছানা ছেড়ে উঠ্‌লাম।

"একটু কালিঘাট যেতে হবে, বাবু।"

"বেশ ত যা—"

"রাত্তিরে আর আসব না—দেশ থেকে পিশেমশাই এসেছেন!"

"তার মানে উপোস রাখবি ?"

"ঝোল-তরকারী রেঁধে রেখে গেলাম—উনুনে গুঁড়ো কয়লার আঁচে। আর একটা পাঁউরুটি এনে রেখেছি।"

"তবে আর কি! ছুটি ত তোর তৈরী।"

ব্যস্, যা-ও একটা প্রাণী ছিল সে আজ আর আসবে না। আমি নির্জ্জলা একা। চরিত্রগুলোকে চারপাশে দাঁড় করিয়ে এখন ওদের সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বললেও আর ক্ষতি নেই।

লিখছিলাম। আমি যেন এক প্রেতপুরীতে—ছায়ার রাজ্যে চলে গেছি। এ-যেন স্বপ্নে মৃতদের নিয়ে খেলা। তারা হাসে, কথা বলে, কাঁদে—জীবনের সব ভঙ্গীই আছে তাদের দেহে-মনে—কিন্তু তুমি জানো তারা স্পর্শের বাইরে—ফাঁকা, ফাঁকি। কলম তুলে নাও দেখবে উপন্যাসের চরিত্রগুলোও অবাস্তব, মৃত মানুষ। কিন্তু কলমে ঝুঁকে আছো যতোক্ষণ, ততক্ষণ তুমি সেই আশ্চর্য্য জগতে—তুমি নিজেও আশ্চর্য্য জগতের। তুমি তাদের সৃষ্টি করছ, আর, তারাও তোমায় সৃষ্টি করছে।

"এখনো লিখছ ?"

মনে হ'ল কেউ বলছে পেছন থেকে। কে ? তোতা ? তোতাই কি এলো দুই জগতের ব্যবধান ভেঙে দিয়ে ? পেছন ফিরে তাকালাম। সুপর্ণা হাসছে।

"সন্ধ্যা হয়ে গেল—আলো জ্বালা নেই—মুখ গুঁজে লিখেই চলেছে—এ কি ?"

"এসো।" অবাক হইনি, তোতা যে সুপর্ণা হয়ে গেল।

"এসেছি ত কখন—" আলো জ্বালল সুপর্ণা: "আর তুমি এখন বলছ 'এসো'।"

"অনেকক্ষণ এসেছ, সত্যি ?" লেখায় মনোযোগের জন্য লজ্জিত হলাম।

"অনেকক্ষণ। খাট সেকেণ্ড।" বিছানায় এসে বসল ও।

'তোতা-ও হয় ত এম্নি সময়ে এম্নি কথায় এম্নি এসে বসত বিছানায়।'—হাল্কা মেঘের মতো মনের উপর দেখতে পেলাম কথাগুলো। ভালো লাগল। হাসি ফুটে উঠ্ল ঠোঁটে—তোতার জন্যে নয়, স্বপর্ণার জন্যে নয়, আমারই ভালো লাগার জন্যে।

"কদ্দিন যাওনি, বলো ত!"

"অনেক দিন?"

"প্রায় দশ দিন। ভাবনা হচ্ছিল, তোমার অসুখ।"

"অসুখই ত। একা-একা থাকাটা কি মস্ত অসুখ নয়?"

"ঘর থেকেই বেরোও না তুমি, না?' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল স্বপর্ণা—মনে হল অভিমানে—যেন বলতে চায়: "বাইরে ত বেরোও, শুধু আমাদের ওখানেই যাওয়া হয় না!" কিন্তু না। অভিমান নয়! পরেকার কথাটায় স্বপর্ণা স্পষ্ট হয়ে উঠল: "রাস্তায় কি হয়েছে আজ জানো না?"

"নাঃ, কি হয়েছে?"

"ছাত্রদের মিছিলে গুলি করেছে—শোননি কিছু?"

"না-ত! কোথায়?"

"ওই ত ওখানে। একটি ছেলে না কি মারাও গেছে—বলছে কেউ কেউ। শুনে আমি বাড়ী থেকে ছুটে এলাম—আর, তোমার ঘরের সামনে ঘটনা, তুমিই জানো না!"

"নীলু কোথায়? মিছিলে ছিল নাকি?"

"ছিল। তা-ই ত গুলির খবর শুনে বিশ্রী লাগছিল।".

"এখন কোথায় ও?"

"মোড়ে। ওয়েলিংটনের মোড়ে। সারারাত না কি থাকবে ওরা ওখানে। আমিও ভাবছিলাম থাকব।"

"পলিটিক্স ভালো লাগছে?" খাতাপত্র গুটিয়ে ফেললাম। অন্যমনস্ক মনে হল হয়ত আমাকে।

"মোটেও না। দাদা আছে তাই। কিন্তু ও কিছুতেই রাজি নয়, বললে বাড়ি চলে যেতে। কেমন দ্যাখো! ওকে রাস্তায় রেখে বাড়ি গিয়ে ঘুমোনো যায়?"

"কি আর করবে? চল্লিশ-কোটির চোখের জল মুছে দিতে ত সবাই

পলিটিক্স করে না—সবাই গান্ধীজি নন। পরকে দুঃখ দিয়েই পলিটিক্স করে সবাই।" দাদাকে ভাবছিলাম।

"সত্যি যদি কেউ মারা গিয়ে থাকে, তার বাপ-মা, ভাই-বোনের কি অবস্থা, বলো ত!"

"চা খাবে?" সুপর্ণার কথাটা থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল।

"না, এক্ষুণি বাড়ি চলে যাচ্ছি—বাবা হয় ত ভাবছেন।"

"চায়ের তাড়া খেয়ে বাড়ী যাবার কথা মনে পড়ল?"

"বা-রে, খেয়ে-দেয়ে আবার আসতে হবে না?"

"ও" একটু আলগা করে নিলাম নিজেকে: "তোমারও আজ কোজাগরী?"

"হুঁ তোমার এখানে। থাকতে দেবে ত?"

নিবু-নিবু মুখ জ্বলে উঠল আবার। হাসলাম। কিন্তু কেন জানিনে।

বিশ্বাস হল না তোমার? সত্যি আমি আসছি। শেষনীয় দাদা এই সর্তে রাজি, যদি তোমার এখানে থাকি।"

"বেশ ত থাকবে।" বিশ্বাস হচ্ছিল না আমার।

"তাহলে তোমারও যে কোজাগরী হবে, জানো ত?"

"চোখ তাতে অভ্যস্ত। ম্যাকবেথের মতো ঘুমকে মেরে ফেলেছি আমি।"

খোঁপা খুলে আবার খোঁপা তৈরীতে মন দিলে সুপর্ণা—অপলক আমার দিকে তাকিয়ে—যেন অদ্ভুত কিছু দেখছে—নূতন কোনো সৌন্দর্য্য। এ ঠিক চোখের দেখা নয়, নখের দর্পণে দেখা। আঙুলের মুদ্রায়ই যেন ও দেখতে পাচ্ছিল এমন কিছু, যাতে চোখ খুশী-খুশী দেখায়।

দেখা শেষ হল ওর একসময়, কিন্তু তখনও আমি ওকে দেখে যাচ্ছি। কোনো রহস্যকে দেখছিনে—দেখছি একটি মেয়েকে। আর তখুনি আমার মনে হ'ল, ও তোতা। কয়েক মুহূর্ত্ত। কয়েকমুহূর্ত্ত তোতা এসে বসল আমার মুখোমুখি। তোতাকে ছোঁব বলেই আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম।

উঠে এসে আমার হাতে আঙুল ছোঁওয়াল সুপর্ণা: "তুমি আর পলিটিক্স করবে না ত, মিতা!"

"না।"

কথাটায় সুর ছিল আমার—সুপর্ণার কথাগুলোরই যেন রেশ এই 'না'—ওরই কথার সুরভি—ওর কথার সুরেই ভরতি।

"সত্যি, কী ভয় যে করে আমার !"

"নীলুকে নিয়ে ?" বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যেতে ভালো লাগছিল।

"নীলুকে নিয়ে ! আর তোমাকে নিয়ে নয় বুঝি ?"

হেসে উঠতে পারতাম কিন্তু ইচ্ছে করল না। আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোনো প্রবল স্রোত---সেখানে আমার ইচ্ছা বলে কিছু নেই। ইচ্ছা নেই, চেতনাও এলোমেলো। যেন আমাকে দিয়ে কন্যা সুপর্ণা যা-খুশী বলাতে পারে, সব কিছুই করাতে পারে।

সরে গেল সুপর্ণা—আনন্দের মিহি একটা তাপ ছেড়ে গেল আমাকে—বল্‌লে : "আমি যাচ্ছি। কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছে না কেন, বলো ত !"

"আবার আসতে হবে বলে !" এবার হাসতে পারলাম : "চলো, তোমায় এগিয়ে দিচ্ছি—নীলুকেও দেখে আসা যাবে !"

"তোমার মন ওখানেই পড়ে আছে, জানি।"

"জানাজানিভাবে তোমার মনও ত ওখানেই পড়ে থাকবে আজ !"

আমার বিছানায় শুয়ে কপালের চুলগুলো দু' আঙুলে টেনে টেনে বল্‌ছিল সুপর্ণা : "ছেলেদের তুমি এক ঝুড়ি সন্দেশ কিনে দিলে, আবার বলো পলিটিক্স থেকে হাত তুলে নিয়েছো।"

মন ছিল না ওর কথায়। ও যতোক্ষণ ছিল না, শুধু দাদার কথাই মনে পড়ছিল। অনেক কথা—মানে আছে বা নেই—নেশার মতো রক্তের ভেতর ছুটোছুটি করছিল। এখন খোঁয়ারি চলছে—নেশাটাকে বুঝতে পারছি এখন, অনেক কথা থেকে একটা কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে মনে। দাদা স্পষ্ট হয়ে উঠেছেন। এতোদিন যেন কুয়াশার আড়ালে ছিলেন, আজ দপ করে জ্বলে [illegible]

[illegible] আজ পলিটিক্স করছে—পলিটিক্সের মন হারিয়ে ফেলেছি আমি—[illegible] দিকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। আশ্চর্য্য হয়ে ভেবেছি একদিন '৪২-এর আন্দোলনের দিকে দাদা কি করে নিঃসাড় নিঃস্পন্দ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। বুঝতে পারিনি, একবার মৃত্যুর কাছে জীবনকে সঁপে দিয়ে যদি বেঁচে আসে কেউ, পুরোণো জীবনকে আর সে খুঁজে পায় না। পুরোণো জীবনের সব

ভঙ্গী বালুর মতো তার হাত গড়িয়ে পড়ে যায়—ধরতে পারে না তাদের—ভারু মনে বসে থাকে মৃত্যুতে তৈরী, মৃত্যুমুখর একটা জীবন নিয়ে! সুপর্ণা আসবার আগে তেম্নি একটা জীবনেই যেন বসেছিলাম আমি। অনুভব করছিলাম সে-জীবনকে—দাদাকে পেয়েছিলাম তাঁর সত্যিকারের চেহারায়।

সেই অদ্ভুত অনুভূতি এখনো মাথায় ঘোরাফেরা করছে। সুপর্ণা কথা বলছে—কিন্তু কথাগুলো যেন আমার জন্যে নয়, মনে হচ্ছিল।

রাত্রির দিকে তাকিয়ে আছি ভাবছি, সত্যি এ রাত্রি কি না।

"রাগ করলে?"

সুপর্ণা বলছে। আমাকে বলছে কি?

"বারে, তুমি চুপচাপ বসে থাকবে আর আমি বকবক করে যাব?"

"করনা! শুনতে বেশ ত ভালো লাগছে আমার!"

সুপর্ণাকেই কি বল্লাম এ-কথা? আর কি কথা ছিলনা? বলতেও ত পারতাম: 'চুপচাপ বসে থাকাইত ভালো।' বিছানায় ওর পাশে গিয়ে বসতে পারতাম। কিম্বা চেয়ারটা টেনে ওর মুখোমুখি হয়ে বলতে পারতাম: 'কি শুনবে, বলো।'

"ঈস্ আমি কথা বলব আর উনি মজা করে শুন্বেন! আর যদি একটা কথাও বলি—" বালিশে মুখ গুঁজে রইল সুপর্ণা।

"বেশ, আমিই কথা বল্ছি—" বললাম কিন্তু তারপর কি বলব হঠাৎ খুঁজে পেলামনা। তাই উঠে দাঁড়াতে হল। বারান্দায় গিয়ে রাস্তায় অনর্থক উঁকি দিয়ে আসতে হল। ভাবতে হল এক গ্লাস জল খাব কিনা। সবই নিজেকে ফিরে পাবার জন্যে।

নিজেকে ফিরে পেলাম, মুখ গুঁজে রেখেই যখন সুপর্ণা বললে: "আমার কাছে এসে না বসলে কিচ্ছু শুনবনা আমি।"

ওর পাশে বিছানায় বসে যেন সেই প্রথম সব-কিছু মনে পড়ল আমার। মনে পড়ল, সুপর্ণা এসেছে—সারা রাত থাকবে এখানে—আমার এ-ঘরে—রাত্রি দশটা এখন। আমার অতীত থেকে বর্ত্তমান মনে পড়ল।

মুখ তুলে তাকাল সুপর্ণা। মসৃণ। ওর চোখ, ঠোঁট, হাসি, তাকানো।

"একটা কথা জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেবে, মিতা?"

"দেব, বলো।"

"না, থাক্।" হাসতে লাগল ও, যেন আমার মুখে চুণ-কালি দেখতে পেয়েছে তোতার মতো এক মেয়ে।

"বলোনা।" বরশয্যায় বরের মতো নির্লিপ্ত শোনাল আমার গলা।

"আচ্ছা, বল্‌ছি—"

"যা বলতে এতো সঙ্কোচ – কি তবে দরকার তা বলে।"

"সঙ্কোচ নয় ত। জিজ্ঞেস করতাম তুমি বিয়ে করলেনা কেন ?"

"ও।" অনেকের মতো সুপর্ণারও এ-জিজ্ঞাসা উড়িয়ে দেওয়া যায় ভেবে বললাম। কিন্তু তক্ষুণি ভয় হল আমার। ভয় হল, বুঝিবা ও আমার কয়েক মুহূর্ত্ত আগেকার মন পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে। তাই আবার বলতে হল: "বিয়ে করা মানে ত একটা ভাঙা আসর সাজাবার চেষ্টা। আমাদের পরিবার ভেঙে গেছে—ওকে আর সাজিয়ে কি লাভ ?"

"তোমার মা-বাবা নেই, না মিতা ?" অতল অন্ধকার চোখ সুপর্ণার।

"আমার বয়সীদের কি মা-বাবা থাকেন ? থাকলেও তাঁরা আর মা-বাবার মতো থাকেননা।"

"যা-ও—কি-সব বলছ্ তুমি—শুনতে আমার একটুও ভালো লাগছেনা।"

"আমার কথা শুনতে কি কখনও ভালো লাগে তোমার ?"

সুপর্ণা আমার মুখে নিবিড় ভাবে তাকিয়ে রইল—অথচ মনে হচ্ছিল ও বার-বার তাকাচ্ছে। বারবার চোখের পাতা পড়ছে ওর। মুখ ফিরিয়ে নিলাম। কাঁদুক ও—যদি কাঁদতে চায়। কাঁদুক ও—দেখি কান্নাতেই যদি ওকে আজ ভালো লাগে আমার।

"যাক্, তবু বলছি"—একটু থেমে শুনতে চাই সুপর্ণা কিছু বলে কিনা। কিন্তু আশ্চর্য্য চুপচাপ ও, যেন শ্বাসও নিচ্ছেনা। সুপর্ণা চুপচাপ! তোতার মতো! ভাল লাগছে—কী যে ভালো লাগছে আমার সুপর্ণা যে আর সুপর্ণা নয়! বলতে সুরু করি: "আমার মা আমায় ভালবাসতেন না—ভালো বাসতেন দাদাকে। মরবার সময়ও আমাকে দেখতে চাননি তিনি, আমিও যাইনি। আমি ভালোবাসতাম মাকে—তবু যাইনি—সারা জীবনের অনাদর ফুঁসে উঠেছিল আমার মনে। একটি দিন বলতে পেরেছিলাম মনে মনে: মাকে আমি ভালোবাসিনে।"

"জানি আমাকেও তুমি ভালোবাসোনা—কাউকেই হয়ত ভালোবাসোনি।"

তোতা যা বলতে পারত সুপর্ণা বলছে আজ। অনেকবার অনেককে 'ভালোবাসি' বলেছি—হয়তো ভালোবাসিনি—পারিনি ভালোবাসতে। হয়তো কোনো পুরুষই পারেনা মেয়েদের ভালোবাস্‌তে। যে-মন, তুমি জানোনা—গাছের পাতার মতো হাওয়ায় এলোমেলো তুলছে যে-মন কি করে পারো তার গায়ে আদর বুলোতে ? পারোনা ! আমি পারিনি। যাদের বলেছি, ভালোবাসি, হয়তো তারা বলার উপলক্ষ ছিল শুধু। ভালোবেসেছি আমি কোনো একটি মেয়ের সত্তাকে—একটি ভাবকে—তা আমার মা নন, শেফালি নয়, ময়না নয়, বীণাদি নয়, তোতা নয়, সবিতা নয়। সুপর্ণা ? সুপর্ণাও কি তা হতে পারে ? সবাই ওরা ভঙ্গী, যেসব ভঙ্গী মিলেমিশে একটি ভাবকে মেয়ের রূপ দেয়। ভালোবাসিনি – সত্যি, সুপর্ণাকেও আমি ভালোবাসিনি। ভালোবেসেছি ওর উপাধিকে ও মেয়ে। গান্ধীজির ভালোবাসা আমাকে-তোমাকে ছাড়িয়ে যেখানে পৌঁচেছে সেখানে তুমি-আমি কেউ নেই—আছে একটি উপাধি—মানুষ।

তবু আমার দৃষ্টি, আমার শ্রুতি, আমার স্পর্শ সুপর্ণাকে চায়। এ-চাওয়া থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারোনা তুমি—কি করে বাঁচতে পারো দেহের জীবন থেকে পালিয়ে ? দরিদ্র, উৎপীড়িত ভারতবর্ষের মানুষগুলো থেকে পালিয়ে যেতে পেরেছেন কি গান্ধীজি ? সুপর্ণাকে তোমার চাই। চাই কিছু পেতে, কিছুবা দিতে। সুপর্ণার সবটুকুই পেতে পারো তুমি কিন্তু তোমারও সবটুকু তাকে দিতে হবে। নেবে কি—নিতে পারবে কি সুর্পণা ? পারবে ও ভালোবাসতে পুরুষকে—ওর বাবাকে নয়, দাদাকে নয়, সিতাকে নয়, কোনো সহপাঠী বন্ধুকেও নয়—আবার সবাইকে—সবাইকে সমান। পারে কোনো মেয়ে ? সবিতা চেষ্টা করেছিল –কিন্তু ওর স্নায়ু রুখে দাঁড়িয়েছে। সুপর্ণা পারবে ? ''যদি না পারে তোমার কাছে কেন দিলাম ওকে, পানু ?" কে দিলো ? কে ? বীণাদি ? কেন, কেন দিলে বীণাদি ?

"নিজেকেই ত সৃষ্টি করলে তুমি—এখনো করছ। শুধু নিজেকে সৃষ্টি করে কি লাভ ? আর কাউকে করো। দাও তাকে হৃদয়, মন, ভালোবাসো—এম্নি করে দাও যেন সে তোমাকে অনুভব করতে পারে—প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তে যেন তোমাকে পায় – পায় তোমার আদর্শকে। নিজেকে সৃষ্টি কর ত অপরের ভোগ্য হবে বলে—অপরকে সৃষ্টি করে ভোক্তা হতে ইচ্ছে করেনা তোমার ?''

মনে-মনে বলিনি। মনের ওপার থেকে কে যেন বল্‌লে। যেন তোতা।

সুপর্ণার কপালে হাত রাখলাম। ও চোখ বুঁজল।

"ভালোবাসতে ভয় করে আমার, জানো পান্নু?" সুপর্ণার ঠাণ্ডা কপালে মৃত্যুর স্বাদ। তোতার মৃত্যুর স্বাদ।

"তুমি ওসবই বলবে এখন, জানি।"

"একটি মেয়েকে ভালোবাসতাম আমি—সে নেই।"

চোখ মেলে তাকাল সুপর্ণা। সমস্ত শরীর নড়ে চড়ে উঠ্‌ল। চোখও। সাপের জিভের মতো কৌতূহলে কি পিচ্ছিল ওর চোখ? নাকি আক্রোশে চিকচিক করছে?

"কে? কাকে ভালোবাসতে তুমি?"

"তার নাম ছিল তপতী।"

"সত্যি?" হেসে উঠ্‌ল ও, যে-হাসি কান্নার সুরে ভরা।

"তোমার কাছে আমি মিছে কথা বলব না।"

"দেখতে কেমন ছিল তপতী—আমার মতো?"

"দু'টি মেয়ে কি একরকম হয় দেখতে?"

"হয়না।" একটা উত্তেজনার স্পন্দন অবসাদে স্থির হয়ে গেল।

"শুনবে সে-গল্প?"

"না।"

"না কেন?"

"আমি ত জানলাম কেন আমায় ভালোবাসোনা।"

"তুমি জানো, ভালোবাসি।"

আমার কথা হয়ত ওর সুন্দর মনের উপর হাত বুলিয়ে দিতে পারল। ঘুমন্ত শিশুর হাসি ওর ঠোঁটে।

"আমি জানি কিন্তু তুমি?"

"আমিও তা-ই জানি।" রাত্রির সুরে, হাওয়ার মতো ওর কানে-কানে বললাম।

সেই সাত-সকালে সত্যেন এসে হাজির হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। বললে,

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে রাত-জাগা ছেলেদের দেখতে এসেছিল। ওখানকার কাজ সেরে অকাজে এসে এখানে উঁকি দিল।

সুপর্ণা চলেই যাচ্ছিল, সত্যেনকে দেখে আরো তাড়াতাড়ি করলে।

"মেয়েটি কে ?" সত্যেনের কৌতূহল স্বাভাবিক।

"কে হতে পারে, বল্‌তো—" আমিও সংযত ছিলাম না।

"তোর স্ত্রী বলতে পারলে সুখী হতাম, কিন্তু বড্ড কচি।"

আমরা ভুলে যেতে পারি। এ যে আমাদের মনের কতো বড়ো প্রতিভা—জীবনের কি সুন্দর ষড়যন্ত্র, ভেবে অবাক হয়ে যাই। পর পর জীবনের দৃশ্য-গুলো যদি মনের উপর তাদের শব্দ-স্পর্শ-বর্ণ নিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকত তাহলে কি আর জীবনের মানে ছিল কিছু? হাল্কা পায়ে এক-পা এগোতে পারতাম না, ফুসফুসে হাওয়া যেতো না এক বিন্দু। ভুলে যাই—তাই বাঁচি। সব যদি ভুলে যেতে পারতাম·· কি চমৎকারই না হত তবে জীবন—প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তে আমি নূতন– নির্ভার, নির্ম্মল, সতেজ। কিন্তু পৃথিবী তোমাকে তা হতে দেবে না—নিতেই হবে কিছু—কয়েকটি দৃশ্য মনে তুলে নিতে হবে—সাজিয়ে রাখতে হবে স্মৃতির লেবেল এঁটে। আজীবন তোমার সঙ্গী হয়ে চলবে তারা।

জাপানী বোমার আক্রমণ আজ আর মনে নেই কিন্তু মনে আছে কলকাতার নরমেধযজ্ঞের কথা। হয়ত আর ভুলবনা। এ-দৃশ্য জীবনের এতো গভীরে চলে গেছে যে ১৯৪৬-এর গায়ে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসতে পারিনি। আমার মনের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে তার বিভীষিকা—উর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে চলেছে মন যদি এ-বিভীষিকা থেকে মুক্তি পায়।

আজও দেখতে পাচ্ছি, নন্দ জড়সড় হয়ে এক কোণে বসে আছে। পাশের ফ্ল্যাটের এক চীনা ভদ্রলোকের বাজারের সঙ্গে বাজার হচ্ছে আমার তাঁর মেয়ে দুধ-চিনি-চা পাঠিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের গঞ্জামী বাবুর্চিকে দিয়ে—পয়সার কথা বলতেই জিভ কেটে পালায় বাবুর্চি। বাজার নিয়েও খানিকক্ষণ বসে থাকে নন্দ—হাত চলতে চায় না।

আমার টেবিলে, বিছানায় দৈনিক কাগজগুলোর গাদা। সব পড়ি কিন্তু তবু কি যেন জানতে বাকি থেকে যায়। "আমাদের প্রিমিয়ার আজ একটা বক্তৃতা দিচ্ছেন, তোমার রেডিও-টা খুলতে দেবে, দয়া করে?" চীনা ভদ্র-লোককে বলি। "ও নিশ্চয়"—তিনি রেডিওর ঘর দেখিয়ে দেন, মেয়েকে বলেন, আমাকে দেখাশোনা করতে। রেডিও-র চোস্ত ইংরেজি যেন কানে যায় না। ভাবি, এই তো মানুষ তেমনি আছে—এই তো এঁরা, এই চীনা পরিবার,

সৌজন্যে, প্রীতিতে মন ভরিয়ে তুলতে পারে—তবে যে ভাবছি মানুষের চেহারা বদলে গেছে, কেউ কারো প্রতিবেশী নয়—সব ঘাতক—সবাই—এমন কি, যে মানুষকে আমি চিনতাম সে-মানুষও ঘাতক বলে।

'টিপু সুলতান আমাদের প্রথম শহীদ'—শোভাযাত্রায় কাপড়ের গায়ে লেখা ছিল! টিপু সুলতান কি তোমার শহীদ, যে রিক্সা ভাঙছ, লুট করছ গেঞ্জির দোকান, সোডার বোতল ছুঁড়ে মারছ একজন দিন-মজুরের গায়ে? তোমারই ভাই—যে মরতে চায়নি, যে জানেনা তোমার লড়াই-এর খবর, তার শবদেহ যখন ম্যানহোলে—বলো, সে কি শহীদ হ'ল? কাল তোমার আলিঙ্গনে বুক পেতে দিয়েছি, আজ তোমার ছায়ায় শিউরে উঠি!

রাজনীতি? আদিম অন্ধকারে ডুবে যাওয়াই কি রাজনীতি? মানুষ পশুর চাইতেও বেশি পশু হতে পারে জানি—আমরা কি তা-ই হ'ব? এই কি আমাদের রাজনীতির নিয়তি ছিল?

দেয়ালকে প্রশ্ন করতাম। এ-প্রশ্ন শুনবার কেউ ছিল না কলকাতায়।

ঘুম ছিল না। সমস্ত রাত্রি জেগে জেগে মৃত্যুকেই দেখতাম। চারদিকের আগুন, রক্ত, উল্লাস, কান্না যেন একটা অতিকায় শরীর নিয়ে আমার চোখের উপর এসে দাঁড়াত। মরতে চাইতাম না, কিন্তু তিল তিল করে মরতে হত সমস্ত রাত্রি।

তবে ভোরের আকাশ কয়েক মুহূর্তের জন্যে ভুলিয়ে দিত সব—মনে হ'ত বুঝি সবই দুঃস্বপ্ন। আগেকার মতোই পাব বুঝি সবাইকে, রাস্তায়, পার্কে, মাঠে, ময়দানে। ট্র্যাম চলছে? না। চলবেনা—কাল যেমন চলেনি, আজও তেমনি না। রায়ট। মনের উপর হঠাৎ খট করে শব্দ হতো: রায়ট। আকাশ মুছে দেবার জন্যে চোখ বুঁজে ফেলতাম।

আজ আমি মরতে পারি: মনের উপর কথার মিছিল চলছিল: মৃত্যুর তালিকায় আজ যাদের নাম বেরবে কাগজে, কাল ত তারা ঠিক আমারই মতো বেঁচে ছিল। জানেনি মরবে। জানা কি ভালো? আমি জানছি—ভালো কি লাগছে আমার? কেন ভালো লাগে না? কে তোমায় টেনে রাখছে—কি তোমার আকর্ষণ-জীবনের কোন্ ছবিতে মন পড়ে আছে তোমার? সুপর্ণা। পিয়ানোর টুং-টাং-এ যেন ফুটে উঠল তিনটি ধ্বনি। তারপর আবার কথার মিছিল: সুপর্ণা ত এলো না খোঁজ করতে! আসবে কি? এলে

নিশ্চয় বলবে, এক মুহূর্ত্তও আর এখানে না। চলো এক্ষুণি আমার সঙ্গে। যাঃ, সুপর্ণা আসতে পারে এখন এখানে? কে দেবে ওকে আসতে? তুমিও কি খুশী হবে ওকে দেখলে! ভয় হবে না, ভাবনা হবে না তোমার?

বিছানায় আর থাকা যায় না। উঠে যাই টুথ ব্রাশ হাতের নেবার জন্যে। আবার একটি দিন—হয়ত অবিকল কালকের মতো। পাঁচ মিনিটের জন্যে নীচে ফুটপাতে নেমে-যাওয়া—একটি ছোট জটলার পাশ ঘেঁষে কান পাতা—অশ্রাব্য গুজবে কেমন শীত-শীত লাগতে থাকা। তারপর আবার এই ঘর। আজ কি বাজারে যেতে রাজি হবে নন্দ? কাজ নেই।

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। দুটো কাগজ পড়া হয়ে গেছে—তৃতীয় কোনো কাগজের সন্ধানে। দোর-গোড়ায় একটা জীপ এসে থামল। সত্যেন! সত্যেন আসছে!

বাসবকে দেখলে একদিন যেমি বুক ভরে উঠত আমার, সত্যেনকে দেখে আজ তেমি হ'ল। সত্যেনের আসা এমন ভালো বুঝি আর কোনোদিন লাগেনি! বুক থেকে যতোটা রক্ত বেরিয়ে গিয়েছিল, এক-ঢেউয়ে তা যেন ফিরে এলো। হয়ত রায়ট নেই—সত্যেন আসছে!

আদ্ধেক সিঁড়ি থেকে ধরে নিয়ে এলাম ওকে। ক্লান্ত, বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল, তবু হেসে বললে: "যাক্ বেঁচে আছিস্।"

চা? তা হলে দুকাপই হবে।

"না, চা খাবার সময় নেই। জানতে এলাম নিরাপদ এলাকায় যেতে চাস কি না। কালই আসব ভাবছিলাম কিন্তু গাড়ি জুটল না! যাবি ত তৈরী হয়ে নে এক্ষুণি!"

মনে হল, এক্ষুণি বুঝি হাজার লোক চেঁচিয়ে উঠবে রাস্তায়।

"কোথায় যাব?"

"ভবানীপুর-কালিঘাট। ওদিকে না তোর কে আত্মীয় আছেন!"

"যাব।"

"নন্দ থাকবে?"

"না। ও-ও যাবে।"

"জিনিষপত্র ওম্নি থাক চীনা-সাবেবের জিম্মায়। দু'দিনেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—আজ মিলিটারির হাতে গেছে শহর।" দস্তুরমতো ডিউটি দিয়ে

চলেছে সত্যেন। অন্য সময় হলে হয়ত দু-একটা বাঁকা কথা শুনতে হত ওকে। কিন্তু তখন মনে হল সব স্পর্দ্ধা বুঝি আমি হারিয়ে ফেলেছি—সত্যেন যা বলবে তা-ই শুনতে হবে, তা-ই করতে হবে।

বাড়ির গেটে আমাদের নামিয়ে দিয়ে সত্যেন মুচকি হেসে চলে গেল।

বারান্দায় সুপর্ণার বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। একটু যেন উদ্বিগ্ন। আমাকে দেখে হাসলেন কিন্তু ততোটা পরিষ্কার হাসি নয়।

"আপনার অতিথি হতে এলাম—" ভূমিকার মুখোস ছিল না আমার কথায়: "আমরা দু'জনই। নন্দ—আমার কুক।"

"তিনদিন আজ তোমার ভাবনাই ত ভাবছি আমরা—" মুখে উদ্বেগ নিয়েও কথাব ঝুলি খুলতে বাধলনা তাঁর: "টাটানগরে এনগেজমেণ্ট ছিল কাল—যাওয়া হলনা। বাড়ি বসে-বসে শুধু দুর্ভাবনা। অবশ্যি এ-সময়ে ওদের একা বাড়িতে রেখে গেলেও দুর্ভাবনা। কাজকর্ম্ম চুলোয় গেছে। তিন প্রাণীতে এখন দু'বেলা বসে জটলা। প্রত্যেক কথার পিঠেই তোমার কথা এসে পড়ছে, বলাবলি করছি তোমার ওখানে যাওয়া দরকার। কিন্তু বাধা দেয় সবাই—বলে, ও এলেকায় আগুন ছাড়া না কি কিছু নেই। সত্যি না কি? সত্যি বা বলি কেন? তা-ই যদি হবে তুমি এলে কি করে?"

আমার আসা-টাকে কি ভাবে নিলেন উনি, বুঝতে পারছিলাম না। তাই হয়ত সঙ্কোচ ফুটতে সুরু করল আমার চোখে-মুখে। নিরীহ গলায় বললাম: "তেমন কিছু নয় তবে অঞ্চলটা বিপজ্জনক। আমার এক বন্ধু—পুলিশের লোক পৌঁছিয়ে দিয়ে গেলেন আমাদের এখানে।"

"তা-ই বলো।" উনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন: "কিন্তু ওরা কি কাণ্ড করেছে জান ত—নীলু আর পানি। পাড়ারই এক পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টরের কাছে ধর্না দিতে গেছে! ওঁকে নিয়ে তোমার ওখানে যাবে।"

"সে কি? আপনি ওদের যেতে দিলেন কেন?"

"ওরা আমার যাওয়া বন্ধ করতে পারে কিন্তু আমি কি ওদের যাওয়া বন্ধ করতে পারি, ভাই?"

"অবশ্যি গেলে জানতে পারবে আমি এদিকে চলে এসেছি—আমার

প্রতিবেশী এক টীনা সাহেবের কাছেই খবর পাবে।" খুশী চাপতে গিয়ে ফাঁকা শোনাল আমার গলা।

কিন্তু আমার গলা উনি যেন শুনতে পেলেন না—কথাগুলোও শুনেছেন বলে মনে হলনা। শুধু প্রথম কথাটা যেন এইমাত্র শুনতে পেলেন। এবার স্পষ্ট হয়ে আপ্যায়ন ফুটে উঠল ওঁর চোখে-মুখে: "ঘরে এসো—বাইরে দাঁড়িয়ে কি?" নন্দকেও ভুললেন না, বললেন: "যাও ত বাবা তুমি রান্নাঘরে এদিকে সোজা চলে যাও, কাউকে পাঠিয়ে দাও গিয়ে।"

ঘরে এসে হয়ত স্বাভাবিক হতে পারলেন উনি। ঠাকুরকে চা আনতে বলে অবলীলায় টাটানগরের গল্প জুড়ে দিলেন। নীলু আর সুপর্ণাকে ভাবছিলাম আমি কিন্তু উনি পুত্র-কন্যাকে বেমালুম ভুলে গিয়ে ভারতীয় হেভি ইণ্ডাষ্ট্রিতে টাটার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে ব্যস্ত হলেন। ভালো লাগছিল না। আর-আর দিনের মতো কোনো অজুহাতে পালিয়ে বাঁচতে পারতাম। কিন্তু পালিয়ে আজ আর যাব কোথায়?

চা শেষ হল, ওঁর মুখে একটা আস্ত সিগার ছাই হয়ে গেল কিন্তু গল্পে ছেদ পড়ল না। নীলু এসে হাজির না হলে এ-আরব্যোপন্যাস কখন শেষ হত জানি নে। নীলুকে দেখেই ওঁর সব কথা যেন এক মুহূর্ত্তে ফুরিয়ে গিয়ে একটা অপ্রতিভ হাসির বিন্দুতে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

"বাঃ বেশ তুমি—" যেন সারা কলকাতা আমায় খুঁজে এসেছে এম্নি ভঙ্গীতে এসে দাঁড়াল নীলু।

"তোরাও বেরিয়ে গেছিস আর ও-ও এসে হাজির—"অমায়িক হয়ে গেল হাসিটা বাবার মুখে। বাৎসল্যে বিগলিত নয়, সমীহে বিশীর্ণ—চুলচেরা বিচারে ধরা পড়ে। "ওর এক পুলিশ-বন্ধু পৌঁছিয়ে দিয়ে গেলেন।" পিতা সবিনয়ে নিবেদন করলেন পুত্রের কাছে।

"আর আমরা, জানো, পুলিশ-প্রতিবেশীর পাত্তাই পেলাম না—"

"তার ঝাল এখন আমার উপর?" বললাম: "আমি ত মনে মনে লজ্জিতই হয়ে উঠেছিলাম আমাকে খুঁজে এসেছ ভেবে!"

সুপর্ণার বাবা সরে পড়বার উদ্যোগ করলেন—হয়ত আলোচনাটা বিরস লাগতে সুরু করেছিল ওঁর: 'যাই—তোমার নন্দকেও দেখা দরকার।"

"হেঁ— ও আবার ভীষণ মুখচোরা—চা-টা হয়ত খাওয়া হয়নি!" বাবার

যাওয়ার পথটা আরেকটু প্রশস্ত করে দিলে নীলু, তারপর আমাকে একা পেয়ে বললে : "নন্দ শুদ্ধ পালিয়ে এলে, মামু -রীতিমতো রিফিউজি।"

"রিফিউজি হওয়াটাই শালীন মনে হ'ল।"

"জানো, তোমার উপর ভীষণ রাগ হচ্ছিল আমাদের! তুমিও আসছনা, আমরাও যেতে পারছিনে। আজও কিন্তু আমার দারোগা সাহেবের খোসামোদ করতে একটুও ইচ্ছে ছিল না, পানির জেদেই যেতে হ'ল!"

ওর সব কথা বাতিল করে পান্নুর নামটাই তুলে নিলাম, ছোট্ট ক'রে জিজ্ঞেস করলাম : "পান্নু কোথায়?"

"বসে বসে দারোগা সাহেবের দেখা না পেয়ে মেজাজ বিগড়ে গেছে— দারোগা সাহেবের মেয়ে ওর বন্ধু—তার সঙ্গে এক পশলা ঝগড়াও করে এসেছে। এখন উপবে।"

"আমি, দেখছি, তোমাদের মহা-হাঙ্গামায় ফেলেছিলাম!"

"তুমি ত মনে করো সবার ভাবনা তোমার উপর—তোমার জন্যে কারো ভাববার দরকার নেই।"

অনেক সহজ, অনেক আন্তরিক শোনাচ্ছিল আজ নীলুকে—প্রায় সুপর্ণার মতো। পলিটিক্সের পোষাক-পরা ছাত্র নয় আর ও। তাই ভালো লাগল কিন্তু নিজেকে ধরা দিতে ইচ্ছে করলনা।

বললাম : "নীলু তোমার মনে আছে এক বছর আগে গান্ধীজি কি বলেছিলেন? হিন্দু-মুসলমান মিলে যখন সাহেব পিটোচ্ছিলে, গান্ধীজি আশঙ্কা জানিয়েছিলেন কবে না তোমরা এই হিংসায় নিজেরা মেতে ওঠো। কি আশ্চর্য্যভাবে ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন তিনি!"

"আমি কিন্তু কাল খানিকটা পুণ্য অর্জ্জন করলাম, মামু!" নীলুর চোখ স্থির হ'ল আমার মুখে।

"কি করে?"

"এক ধুন্নুরীকে কোথেকে পাকড়াও করে টেনে নিয়ে চলেছিল কয়েকটি ছেলে। ছিনিয়ে নিতে গেলাম—একা হয়ত পারতাম না, আমার সঙ্গে ছিলেন একজন কংগ্রেসের ভলাণ্টিয়ার—ছিনিয়ে নিলাম কিন্তু দু'চারটা ঘা খেয়ে দাম দিতে হ'ল। ধুন্নুরীর মাথাটাই হয়ত একটা লাঠির লক্ষ্য ছিল কিন্তু পড়ল আমার কব্জির উপরটায়। তখন তেমন খেয়াল হয়নি। রিক্সায় পর্দ্দা টেনে ত

ধুন্ধুরীকে থানায় পৌঁছিয়ে দিয়ে এলাম—তারপর দেখছি জায়গাটা কনকন করছে !"

"দেখি—" যন্ত্রের মতো হাত বাড়িয়ে ওর হাত টেনে নিলাম।

"এখন ব্যথা নেই—তবে ফুলে আছে।"

ফোলা জায়গাটাতে হাত বুলোতে লাগলাম আমি।

"থাক তোমাকে আর ম্যাসেজ করতে হবে না—কাল সমস্ত দিনই ওর শুশ্রূষা করা হয়েছে—" হাতটা সরিয়ে নিতে চাইল নীলু। আমি সরিয়ে নিতে দিলাম না, ও হয়ত বুঝলনা হাত বুলোতে যে আমার ভালো লাগছে।

দুপুরেও সুপর্ণার দেখা নেই—বিকেলেও না। আমি খুঁজে দেখা করতে পারতাম কিন্তু হয়ত অভিমানই আমাকে চুপচাপ বসিয়ে রাখলে। বিকেলে নীলু দেড় ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে গেছে—তার বাবা আমাকে ঘুমোবার উপদেশ দিয়েও প্রায় এক ঘণ্টা গল্প করে গেলেন। কিন্তু সুপর্ণা অনুপস্থিত। সংযম ? হঠাৎ এ-সংযমের কি মানে হয় ?

অভিমানই আমায় উস্কানি দিলে বেরিয়ে যাবার জন্যে আর বেরিয়ে মনে হল রাস্তাগুলো লোভনীয়। কারফিউ নেই—কেউ পেছনে আসতে থাকলে সন্তর্পণে তাকানো নেই—খোলামেলা, নিরাপদ। ফিরতে দেরি হল। রাস্তার আরামে আর বাড়ি-বসা উদ্বেগ এড়বার জন্যে। এখন খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ার সময়। আর শুয়ে পড়লে ঘুমও হয়ত আসে। সুপর্ণার ভাবনা ভাবতে লাগেনা।

খেতে বসেও অভিমান আরো কয়েক মাত্রা চড়ে যেতে পারত যখন ঠাকুর জানাতে এলো এ-বেলার অন্ন-ব্যঞ্জন সব দিদিমণির নির্দ্দেশে তৈরী, কিন্তু অভিমানের মেয়াদ ফুরিয়ে এখন বিস্ময় উঁকি দিচ্ছিল মনে। অবাক হয়ে ভাবছিলাম এমন আড়ালে গা' ঢাকা দিয়ে আছে কেন সুপর্ণা ? মেয়েরা দুর্বোধ্য হয় কিন্তু সুপর্ণাও কি তা-ই ? তাহলে আর কি দিতে পারল আমাকে ও ?

চুপচাপ শুয়ে পড়ব ভেবেছিলাম কিন্তু দেখা গেল শোওয়া যাবে কিন্তু চুপচাপ থাকা যাবে না। কথার ঢেউ ভাঙছে মনে। সুপর্ণার কথা। এ-কথা চেপে দেওয়া যায় পুঁথির কথায় মন টেনে নিলে। নীলুর দেওয়া বইটা তাই হাতে নিলাম। কোয়েস্টলারের 'যোগী এণ্ড দি কমিশার'।

পলিটিক্সের কড়া মদে মুখ ফিরে আসছে য়ুরোপেরও—কিন্তু পলিটিক্স ছেড়ে আঁকড়ে ধরবার মতো আর কি আছে তার? ওই একটি রঙেই জীবনকে রাঙিয়েছে সে শতাব্দীর পর শতাব্দী—রঙ-ছুট জীবন আজ পোড়ো জমি।

আর তুমি? তুমিও বা কি? পলিটিক্সের সঙ্গে-সঙ্গে তোমার জীবন থেকেও কি অনেকখানি আলো আর তাপ উবে যায়নি? উপন্যাসের উষ্ণতায় কতোটুকু আনন্দ পেয়েছ, সত্যি বলো ত! উপন্যাস লেখা-ই একটা জীবনের পুরোপুরি ভঙ্গী হতে পারে না। অনেক কিছু চায় জীবন—প্রচুর আলোর সঙ্গে প্রচুর অন্ধকার। আদর্শ চায়, তাই বলে রক্তমাংসের স্থূলতাকে ফিরিয়ে দেয় না! জীবনকে কোণ-ঠাসা করেছ তুমি!

বইটা চোখের উপর ধরে কথা-ই বলছিলাম—সুপর্ণার কথা ঠেকিয়ে রেখেও নিজের কথা ঠেকানো গেল না। আজ যেন মনে হচ্ছিল, আমি সত্যি একা। নিজের সঙ্গে ছাড়া আর কারো সঙ্গে কথা বলবার জীবন নয় আমার। তাই আমি উপন্যাস লেখার নিয়তি তৈরী করেছি—নিজেকে সাজিয়ে নেওয়া নানা পোষাকে, নানা চেহারায় নিজের সঙ্গে কথা বলব বলে। নার্সিসাস!

আমার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। কতো বিশেষণেই কতো সময় নিজেকে বিশেষিত করলাম—অদ্ভুত! সত্যি, একটা মানুষ সব কিছুই হতে পারে—স্বর্গ থেকে নরক, আকাশ থেকে পাঁক পর্য্যন্ত তার পথ বিছানো। সব-কিছু হতে পারাই হয়ত মনুষ্যত্ব। তুমি নার্সিসাস, ইডিপাস, স্যাডিষ্ট—তুমি প্রেমিক, পোলিটিশিয়ান, দার্শনিক—তুমি ইতর, সামাজিক, শালীন—তবেই তুমি মানুষ। আশ্চর্য্য বিভূতি তোমার—ঈশ্বরও এমন ঐশ্বর্য্যময় নন!

আবারও কথা! বই রেখে জানালায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

নীলু পাড়া-পাহারায় গেছে।

ও থাকলে বেশ হ'ত—গল্প করে করে ঘুম আনতে পারতাম চোখে! ঘুম! দু'রাত্রি ঘুমুইনি। শুয়ে থাকলে হয়ত এতোক্ষণে ঘুমিয়ে পড়তাম। আশ্চর্য্য, দাঁড়িয়ে আছি কেন আমি?

সুপর্ণা ঘরে ঢুকে আমার প্রশ্নের জবাব দিলে। ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিচ্ছিল—হয়ত সে-শব্দেই কিম্বা কোনো শব্দ না শুনেই ফিরে তাকিয়ে দেখলাম সুপর্ণাকে। আর আমার মনে হ'ল এজন্যেই দাঁড়িয়ে আছি এতোক্ষণ। ভুলে গেলাম, আমি যে অভিমান করেছিলাম। কিন্তু ভুলে গেলামনা নিজেকে।

এ কী করছে সুপর্ণা ? দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে আমাকে—আমার বুকে মুখ গুঁজে নিজেকে যেন পেতে চাচ্ছে। সান্ত্বনা ? এম্নি অস্থির কান্না কি সান্ত্বনা পাবার জন্যে ? না, কিছু পেতে চায়না ও। দিতে চায়—ব্যথা ঢেলে দিতে চায়। বলতে চায়, আমার এ-ব্যথার নৈবেদ্য তোমাকে ছাড়া আর কাকে দেব ? যদি আমার দিকে চেয়ে থাকো তুমি—নাও, আমার ব্যথাকেও নাও।

ওর কান্না বুকে মেখে নিলাম, চুপচাপ, খানিকক্ষণ। স্নাত, পবিত্র হচ্ছিলাম আমি। তারপর বোঁজা-বোঁজা গলায় বলেছিলাম: "পান্নু—ছিঃ—এমন বুঝি করে কেউ ?"

কান্না থামল একটু—আধোআধো কথা ফুটল: "তুমি যদি মরে যেতে, মিতা !"

"যদি মরে যেতাম—" খানিকটা স্পষ্ট হল আমার গলা, ওর কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিলাম: "কিন্তু মরিনি ত। আর মরে গেলেও বা কি ? আমাকে যে-মন ভালোবাসে, তা ত আর মরত না। অনেক মানুষকে তুমি ভালোবাসতে পারতে—"

মুখ তুলে আমার চোখে তাকালো সুপর্ণা: সৃষ্টির শেষ আগুন এক নারী: "না। তুমি আমাকে জানো না—তাই যা-খুশী বলো, বল্‌তে পারো।"

আমি সবিতাকে দেখলাম—কিন্তু চোখে জ্বালা ধরল না আজ।

"যা বল্‌ছি শোনো—" ওকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে আমি বিছানায় সরে এসেছিলাম: "তুমি মেডিসিন পড়বে। রোগীকে অষুধ দেওয়াই বড়ো কথা নয়—রোগীকে যদি ভালোবাসতে পারো, তাহলেই তোমার মেডিসিন পড়া সার্থক। জানো পান্নু, আজ ক'দিন শুধু এ-কথাটাই মনে পড়ছে আমার, ভালোবাসা বুঝি পৃথিবী থেকে চলে গেছে। কী অসুখী পৃথিবীতেই আমরা জন্মেছিলাম ! তোমাদের যেন সে-দুর্ভাগ্য না হয় !"

তাকিয়ে আছে সুপর্ণা - চোখে স্থির-বিদ্যুৎ। আমাকে দেখা যেন আর ফুরোচ্ছে না ওর। চুপ করে গিয়েও তাই আবার কথা বলতে হল। হয়ত বলেছিলাম, ভালোবাসা ওর আদর্শ হোক, ইন্দ্রিয়ের প্রীতি নয়। মনে হয়েছিল, এ-ক'দিনে সুপর্ণার সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধান যেন আগেকার চাইতে দ্বিগুণ হয়ে গেছে—এমন এক জায়গাতেই যেন এসে আমি পৌঁচেছি যেখানে থেকে শত ইচ্ছায়ও আর ছোট হওয়া যায় না।

আমার এ অনুভূতিরই একটা বাঁকা ভঙ্গী অনুভব করে নিল সুপর্ণা, বললে :
"আমাকে তুমি দূরে সরিয়ে দিতে চাও, না মিতা ?"

"তোমাকে কাছে আনতে চাই—মনের অনেক কাছাকাছি।"

"তুমি যা পারো, আমিও তা-ই পারব ?"

"পারলে খুশী হব।"

হাসতে চাইল সুপর্ণা কিন্তু বিষণ্ণতার কুয়াশা তখনও ওর চোখে-মুখে।

'সত্যি কি ওকে আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি'—ভাবলাম। মনে হল, আজ—এই মুহূর্তে সত্যি যেন ওকে ফিরিয়ে দিতে পারি। সবিতার মতো ফিরিয়ে দিতে পারো কিন্তু তারপর? তারপর কি আর কিছু থাকবে তোমার? থাকবে কোনো স্বপ্ন,—জীবন? স্বপ্নহীন জীবন নিয়ে কি করে বাঁচবে তুমি। উপন্যাস লেখা। কী আর এমন নেশা তার। নেশা ধর্ম্মের গভীরতায় যেতে পারে না। জীবন ধর্ম্ম চায়।

"পানু—" বিষণ্ণতায় আমাকেও অস্পষ্ট শোনাল : "বহুযুগের অভিশাপ থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে কি ইচ্ছে করেনা তোমার ?"

শাড়ির আঁচলটা সারা গায়ে জড়িয়ে নিল সুপর্ণা—মনে হচ্ছিল ওর শীত করছে।

"দুর্ভিক্ষে-যুদ্ধে-দাঙ্গায় আমি দেখতে পেলাম মেয়েদের জীবনের কোনো দাম নেই। এ-অভিশাপ, এ-অন্যায় তুমি কি সয়ে যেতে চাও? মুক্তি চাও না? চাওনা নিঃশঙ্ক জীবন ?"

বাইরে চোখ নিয়ে গেল সুপর্ণা : 'আমি যা চাই, তুমি তা জানো। তুমি যা চাও আমি তা জানি।"

সুপর্ণা দাঁড়াল। আমি তাকিয়ে রইলাম। দেখছিলাম ওর দৃপ্ত অথচ নরম চোখ। সবিতার চোখ।

"তোমার ঘুম নষ্ট করে দিয়ে গেলাম, না ?" দরজায় এগিয়ে গেল ও।

তখনও চুপ করেই রইলাম আমি – নিজেকে নষ্ট হতে দিলাম না। আর মনে হল, আমার এ ভঙ্গী যেন অভিমানেরই এক অদ্ভুত রূপান্তর।

রাত ক'টায় ঘুম এসেছিল জানিনে। তবে ঘুমোবার আগে অনেক দিনের

অনেক কথা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মনে। আর সব কথায়ই একটি নামের অক্ষর আনাগোনা করছিল : সুপর্ণা।

ভাবছিলাম : এ কি খেলা আমার সুপর্ণাকে নিয়ে! আমারই খেলা—সুপর্ণা শুধু উপলক্ষ। আমি কি সত্যি সুপর্ণাকে গড়ে তুলতে চাই—না কি গড়ে তুলতে চাই নিজেকে! আয়নার মতো সুপর্ণাকে সামনে রেখে দেখতে চাই নিজের ছায়া।—তা-ই ঠিক। দেখতে চাই আমি কতো বড়ো হলাম, কতো বিশুদ্ধ, পবিত্র ঝক্‌ঝকে—জানতে চাই নিজেকে, একা-একা নিজেকে জানা যায়না বলেই ওকে চাই। শ্মশানের ফুল!

ত্রিশ

আনন্দিত ভোর। স্বাধীনতা। রাত্রি জেগে প্রথম ভোরের তারাটি দেখা উচিত ছিল। তবু আমি যবন অ্যারিস্‌টটলের মতো ভাবছিলাম যে মানুষ চিরদিনের নাগরিক। অন্তত আমি ত তা-ই।

হস্তিদর্শন-বিমানদর্শন-অগ্নিসন্ধান করতেন পুরাকালে নাগরিকরা। আমি যে-নগরে ছিলাম সেখানে এসব দর্শন আর সন্ধান ঢের করা গেছে। তাই কলকাতা এসেছিলাম অন্যকিছুর দর্শন পেতে। জ্যুতে শুধু হাতিগুলোকে বেঁধে রাখা হয়েছে, নইলে আর সব একই রকম। বিমান-দর্শন অবশ্যি একটু গোলমেলে আওয়াজ তুলেছিল যুদ্ধের সময়টাতে, নইলে তেম্নি নীল সাত রঙে। রাত্রিজেগে আগুনে তারা দেখা উচিত ছিল। রবীন্দ্রনাথও দেখতেন।

নাগরদোলায় কস্মিনকালেও চড়িনি মাথা ঘুরবে বলে। কিন্তু কী বিশ্রী একটা মাথা-ব্যথা আজ। আজই কি না মাথা-ব্যথা যেদিন সুপর্ণাকে আলাদা চোখে দেখবার ইচ্ছা!

পুরুষভাগ্য বেশ শোনা যাচ্ছে আজ মাথার ভেতরে। কিন্তু কী তুমি করতে পারতে পানু যদি অশ্বমনোরথের জিন-লাগাম ছেড়ে গাছের ছায়ায় বসতে প্রাণ চাইত? পাকা বাড়ি উঠ্‌ত? উহুঁ। পাকা বাড়ির বরাত নেই তোমার, হও না শত-সহস্র-লক্ষ বছরের পুরনো নাগরিক। দৌড় খেলায় বুড়ি ছুঁয়ে দিতে পারতে কি ছেলেবেলায়?

চমৎকার করে দিচ্ছে সিল্কের নিশান উড়িয়ে কলকাতার আকাশটাকে। সুপর্ণা আজ কী রঙের শাড়ি পরে আসবে? আজ, কী অবাক, দীপায়ন, তুমি হয়ত মশলিনের কথাও ভাবছ! এমন নষ্ট করে ফেললে নিজেকে!

বিনষ্টি কথাটা মহতী। গান্ধীজি—তুমি জানো, কতো মহৎ নিজেকে নষ্ট করে ফেলা! তুমি কী স্থাখোনি রায়ট, তুমি কি বাঁচাতে পারলে দুধের মতো শাদা তোমার পবিত্র খদ্দর? তোমাকে আমি দেখেছিলাম, আমার আশ্রয়কে দেখতে গিয়েছিলাম সোদপুরে। সুপর্ণা তোমার প্রার্থনা-মঞ্চ নমস্কার করেছিল। তোমাকে আমরা নমস্কার করছি আজও!

বাবাকে কি নমস্কার করেছিলেন মা—আমার সেই নিঃসঙ্গ আর্দ্র রাত্রিতে? খুঁজে কি পেয়েছেন এখন, 'আমাদের সহরের মতো কোনো একটা পুরোনো সহর, অন্য কোনো সূর্য্যের, অন্য কোনো পৃথিবীর নুতন মাটিতে? পেয়েছেন বাবাকে—ন'দাদুকে? আবার কি এখন—ঠিক আজ, তাঁদের বিয়ের বাজনা বাজছে! তারপর ডাক পড়বে দাদার—খোঁজ পড়বে বীণা-দির। তোতা জন্ম নেবে, তবে ত—তবে ত পানু যাবে তাঁদের ঘরে।

সত্যি যদি এমন হত—হতে যদি পারত এমন—আমি আর কলকাতায় আসতাম না!

কিন্তু কলকাতায় না এলে কি সুপর্ণাকে পাওয়া যেতো? এমন সব জায়গা কি মানে হারিয়ে ফেলতনা সুপর্ণা না থাকলে? আর তাই ত সুপর্ণা মরে না। ফিনিক্স-পাখীর মতো পুড়ে গেলেও বেঁচে ওঠে।

বৃষ্টি। সুপর্ণার ঘর। চুপচাপ।

কবিতা নয়। অথচ কতো গাঢ়—কবিতার সব কথার চাইতে গাঢ় সুপর্ণার বিষণ্ণ চোখ। বীণাদি কোথায় পাবেন এমন দু'পর্দ্দা ছায়া।

বলেছিলাম: "এমন দিনে তারে বলা যায়..."

অপলক দৃষ্টি একটু কেঁপে বল্‌ল: "না বলা যায়না..."

"কী বলা যায়না?

"কিছুই বলা যায়না।"

"বলা যায়।"

"তুমি পারবেনা।"

"উপাস্য আর উপহাস্য মানে জানো, পানু?"

"জানি।" সুপর্ণা ব্যথায় যেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল—ঠোঁট কাঁপছিল থরথর:" তুমি প্রথম আর আমি শেষ।"

ওর টেবিলের উপর ইচ্ছার ধাক্কায় আমার ডান হাতটা ছড়িয়ে পড়ল। যেন ঝাঁপির থেকে একটি সাপ বেরিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল আমার রক্তোষ্ণ হাতের আঙুলগুলো। সুপর্ণার হাত এমন সাপের মতো ঠাণ্ডা।

আমার শির থেকে উষ্ণীষ খুলে নিচ্ছে একটি মেয়ে। আমার শরীর

থেকে বর্ম খুলে নিয়ে উত্তরীয় দিলে গায়ে জড়িয়ে। শিয়রে এসে বসল সে নারী। আমি বত্তিচেল্লীর আঁকা বিবশ মঙ্গলদেবতা যেন, ভেনাসের সমুদ্র-বেলায় গা এলিয়ে দিলাম। আমার হাত কোথায়? জগন্নাথ, তোমার হাত কাকে তবু জড়িয়ে ধরতে চায়? বলো—বর্ষা থেমে যাবে—বললাম:

"আমি চাই বনছায়া আর তুমি রোদ
রাজপথে রোদের জ্যামিতি।"

"না—" চমকে দিলে আবারও সুপর্ণা!

আমি ভুল করলাম। কারো আরোগ্য যেন আমি চাইনি। আমার ঘুম যেন আফিমের লাল্‌চে ফুলের ক্ষেতে—মনের ক্ষত সারাতে। আমিও নষ্ট হলাম বীণাদি। আমায় ক্ষমা কর।

"তুমি স্মৃতি?"

সুপর্ণা যোড়হাতে নমস্কার করল আমাকে।

তারপর জেনো অনিরুদ্ধ ঘোষালের দল—আমি নিজেই ঘোষণা করছি: আমি স্রষ্টা। আমার চরিত্র নিজেই আমি জরাসন্ধের মতো চিড়ে দেখাতে পারি—দেখিয়েছি কতো—কিন্তু যারা বাংলাদেশকে চেনোনা, তারা কি শতো দেখালেও দীপায়ন চৌধুরীকে দেখতে পাবে?

"আমাদের কুয়াশা কি গেলো—হতে পারলাম কি কেউ আমরা জ্যোতিষ্মান?" আমি বলেছিলাম যখন আকাশ-মাটি রঙের পতাকায় আমাদের স্বাধীনতার প্রথম শরৎ আকাশে উড়ে চলেছিল। সুপর্ণার কপালে কিংশুকাভ একটি ছোট টিপ। আমি তাকিয়ে পঞ্চতপা নারীকে আবার দেখতে পেলাম। যেন হরকোপানলদগ্ধ হরিৎ-মৃত্তিকায় একটা নূতন আবির্ভাব। কেন—কার জন্যে? সুপর্ণা কি সবিতা? তেমন শক্তি কি আছে এর? না। এ-ও তোতা—তোতা হতেই জন্ম এর। তা-ই ও হবে। বীণাদির মেয়ে আর কী-ই বা হতে পারে! দীপায়ন আবার ক্ষমা চাইল বীণাদির কাছে।

সুপর্ণাকে ওদের বাড়ির উৎসবের শেষে একা গঙ্গার ধারে বিকেলের সূর্যক্লান্ত রঙে কেমন যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। এ-ক্লান্তি বিশ্রামের—আশ্রয়ের।

গঙ্গার একটা নিজস্ব ষড়যন্ত্র আছে। এ-নদী মানুষকে উদাস বানিয়ে দেয় —কাছাকাছি টেনে আনেনা। হাওড়া যেন কলকাতা থেকে অনেক দূর। ভাগিরথী ভাগ করে দেয়। আমি কেন বিশ্বাস হারাচ্ছি জানিনে!

পাশাপাশি হাঁটছিলাম আমরা। যে-কেউ আমাদের দেখতে পেলে সুখী পরিবার ভাবতে পারত! অন্তত আমি ত ভাবতাম, অন্য দুটি নর-নারীকে সেদিন ইংরেজের শড়কে এমন বুক ফুলিয়ে হাঁটতে দেখলে!

অনেকক্ষণ পর সুপর্ণা ব্যথিত চোখে আমার মুখে তাকাল। ওর ব্যথাভরা সুন্দর হাসিতে আমার হাসির চাইতে যে বেশি আকর্ষণ আছে, তা ও অন্তত জানত। আমি যে আর জ্যোতিষ্মান্ বৃহস্পতি নই ওর দৃষ্টিতে—আমি যে ওর ছায়ায় আচ্ছন্ন বিকেলের বিক্রান্ত সূর্য্য, তা দেখাবার জন্যেই কপালে এই কুঙ্কুম আয়োজন! আমার প্রাণে প্রমিতার সত্তা প্রতিহিংসা নিচ্ছে,—মুমূর্ষু পানু চেঁচিয়ে উঠল। যেন বৃহস্পতি আর্ত্তনাদ করে বললেন, দ্যাখো, দ্যাখো, ময়ুরী এই রমণী, বোঝনা অমর মানুষ? গঙ্গাব ওপারে সোণালি মেঘের আশেপাশে কালোমেঘের কুণ্ডলী আমার মনে ছবি।

"তুমি আমায় ভালোবাসোনা মিতা—আমি জানতাম।" সুপর্ণা আমার মনের গোলক ধাঁধাঁর অলিগলি ভেঙে যেন এই কথাটুকু মাত্র বল্‌তে এলো আজও আবার। নূতন নগরে।

"তোমাদের যে আমি ভালোবাসি তা আর কতোবার বল্‌ব, পানু? কতো উপন্যাস-গল্প বা লেখা যায় এই একটা নেহাৎ সহজ কথা বুঝিয়ে।" আমার পরাজিত সত্তা মন্ত্রমুগ্ধের মতো উচ্চারণ করল।

"আমাকে কেন টান্‌ছ তোমার নায়িকার ভীড়ে?" কুপিত দেখালো সুপর্ণার মুখ।

"তোমাকে? না ত!"

"আমি ত তোমার তোতার মতো নই যে ভেঙে সাত টুকরো করবে!" সুপর্ণা সামান্য ভ্রূকুঞ্চন ছাড়াও বলতে পারল।

"যে নেই তাকে ডেকে এনে কোনো সুখ আছে, পানু।"—আমিও অসামান্য কঠোরতায় তোতার কথা স্মরণ করতে পারলাম।

সুপর্ণা আমার দিকে নিবিড়ভাবে তাকালো কিন্তু ও যে পক্ষীজাতি। চোখের ভাষা বুঝব সাধ্য কী। তিতির—ব্যঙ্গমী।

"তুমি সত্যি বলতে পারো—বল্‌বে মিতা—তোতার মতো আমাকে ভালোবেসেছ ?"

"না।"

"আমি তা জানি।"

"না জানবার ত কথা নয়।"

"তা-ই বল্লাম, আমি জানি।"

"অবশ্য তুমি যেভাবে জানো, আমি তা তেমন জানিনে।" মনে পড়ে অনেক প্রিয়জনের মৃত্যুতেও পান্নু হাসতে পেরেছিল। ন'দাদুর মৃত্যুতে অসহায়ের ক্রূর হাসি কি আসেনি একটি বালকের মুখে ?

"তুমি কিভাবে জানো—শুনি।" সুপর্ণার ঠোঁটে পান্নুর সেই ক্রূর হাসি।

"একটা মেয়েকে তৈরী করার পর বিধাতা পুরুষও কি অন্য মেয়ে সৃষ্টি করেছে, পান্নু ?" অসহায় অথচ পরিহাসের কণ্ঠে শোনালাম একটি গুপ্ত মন্ত্র এখনকার একটি প্রতিমাকে।

চিন্ময়ী মৃণ্ময়ী হয়ে উঠতে চাইলেন, যাকে আমার পৌরোহিত্য যুগে-যুগে চেনে। সুপর্ণা বল্‌লে: "তোমরা হাতের পুতুল দেবীকেই চাও, মানুষ অপছন্দ তোমাদের !"

"অন্য কারো কথা আমি জানিনে পান্নু—নিজের কথা খানিকটা জানি। আমি হয়ত ভুল করেও মানুষকে দেবতা ভাবিনে।"

"তুমি কি ভাবো বড়ো-বড়ো কথা বল্‌লেই আমরা খুশী ?" সুপর্ণা মুখ নামিয়ে ছায়ার মতো আমার সঙ্গে চল্‌ল।

প্রিন্সেপ-জেটির ত্যক্ত রোমান কারুকার্য্যের থামগুলো দেখা যাচ্ছে।

"আমরা এখন ফিরব—কি বলো পান্নু ?"

"হুঁ—চলো—" বিদ্যুৎবেগে সেনা-ভঙ্গীতে ফিরে দাঁড়াল সুপর্ণা।

আমি আমার ছোটবেলাকার পান্নুর মুখে হাসতে চাইলাম—জানিনে কতো কুৎসিত যে দেখাল সে-হাসিটা। বল্‌লাম, হয়ত হাসির কদাকার মুখোসটা কথার বাঁকে ভাসিয়ে দেবার জন্যেই বলতে হ'ল: "শহরের স্বাধীনতা ছেড়ে মশিদুরে আসা ভালো নয়—কি বলো ?"

একটু-যেন হাসির কোরক রাঙা হয়ে উঠল সুপর্ণার পাখীর-ঠোঁটে। বল্‌লে

সুসংবাদের ভঙ্গীতে : "সারাটা দিন যা কাটালে তুমি—ববাবা ! এমন মুখ-কালো হয়ে থাকা পান্থুর মিতাকে মানায় !"

"সত্যি ?" আমি ঠোঁট ভেঙে হাসিটাকে নাটকীয় ভঙ্গীতে বয়ে এলাম।

"সত্যি নয় ?"

উজ্জ্বল প্রতিমা-মণ্ডপ হয়ে যেন কল্‌কাতা আবার ডাকল আমায়।

তবু আলির বাড়ির পথে তোতাকে মনে পড়ল।